প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৬৬

পরিবেশক
ওরিয়েণ্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স
সি ৪৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ১২
৪৩এ গোল মার্কেট। নতুন দিল্লী ১

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

কবি

সাহিত্য-সমালোচক

ভাষাতত্ত্ববিদ্

ও

প্রবন্ধকার

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তু অনুসারে নাটকগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব-কল্পনা, আইডিয়া বা তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে কবির প্রায় সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টিতে—কাব্যে, নাটকে, গানে, গদ্য-রচনায়। যে-ভাবানুভূতি, আইডিয়া বা তত্ত্ব কবি রূপায়িত করিয়াছেন কাব্যে, তাহাই একটা ভিন্ন রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে নাটকে, আবার নাটকে যে-কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অন্যরূপে ব্যক্ত হইয়াছে কাব্যে বা গদ্য-রচনায়। প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন ও রূপায়ণ বিচিত্র হইলেও দেখা যায়, সর্বক্ষেত্রেই ভাবের মূলগত ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে।

নাটক-আলোচনায় আমি কবির সমগ্র মানসক্ষেত্রটিকে সর্বদা দৃষ্টিপথে রাখিয়াছি এবং প্রয়োজনমতো এই ভাব-সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া নাটকের মূলবক্তব্যটিকে বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সর্বত্রই নাটকের মূলস্বরূপটি উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা আমার লক্ষ্য হইয়াছে।

রূপক-সাংকেতিক নাটক বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব শিল্পসৃষ্টি—কবির একান্ত নিজস্ব দান। এ-জাতীয় নাটক রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেও বাংলা-সাহিত্যে রচিত হয় নাই, রবীন্দ্রোত্তর যুগেও হয় নাই, ভাবী কালে হইবে কিনা জানি না। নানা দৃষ্টিকোণ হইতে এই নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাট্য-পাঠে ও তন্নিহিত রস উপলব্ধিতে সাহায্য করিলে আমার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

প্রীতিভাজন শ্রীনিশিকান্ত দাস প্রুফ-সংশোধন-কার্যে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা দ্বারাও আমি অনেকখানি উপকৃত হইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অমিয় ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি-প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, আমার অশেষ আশীর্বাদ তাহার প্রাপ্য।

বৈশাখ, ১৩৬১ — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও নানা কারণে এ পর্যন্ত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তজ্জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। এতদিনে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ধন করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দ ও আমার অশেষপ্রীতিভাজন অধ্যাপকগণ যে এই গ্রন্থখানিকে সাগ্রহে ও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের আনুকূল্য আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধন ও শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন প্রীতিভাজন সাংবাদিক শ্রীযতীন্দ্র সেন। তাঁহাকে আমার অজস্র ধন্যবাদ।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

সামাজিক নাটক :

কৌতুকনাট্য :

ঋতুনাট্য :

নৃত্যনাট্য :

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্র-নাট্যের স্বরূপ

সাহিত্যের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে নাটকের একটা বিশিষ্ট রূপ ও ধর্ম আছে। কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে লেখক যে শিল্পরীতির অনুসরণ করেন, নাটকের শিল্পরীতি তাহা হইতে পৃথক। কাব্য কবিমনের ভাব-কল্পনা ও অনুভূতির রূপায়ণ। মহাকাব্যে চরিত্র-সৃষ্টির প্রসার আছে বটে, কিন্তু চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির নিজস্ব ভাবাবেগ ও কল্পনাই উৎসারিত হয় এবং চরিত্রগুলি তাঁহার ভাব ও বাণীর অঙ্গরাগমণ্ডিত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করে। গীতিকাব্য তো একান্তভাবে কবির নিজস্ব মনোভাব বা mood-এর প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের পটভূমি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং লেখকের স্থান ও গতির স্বাধীনতাও সেখানে অনিয়ন্ত্রিত। আখ্যানবস্তুর ইচ্ছানুরূপ সন্নিবেশ, পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণে লেখকেব নিজের ভাষ্য, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত বা বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কি দার্শনিক মতবাদের প্রচার বা সংকেত প্রভৃতি উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইতে পারে। সমস্ত প্রকাশটাই লেখকের মনের পর্দার উপরে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে, তাহারই মাধ্যমে আমরা লেখক-কল্পিত রূপ দর্শন করি। আয়তন ও আঙ্গিকে পৃথক হইলেও ছোটগল্পের মূল অভিব্যক্তির ধারাও তাহাই। লেখকই এ সব ক্ষেত্রে দ্রষ্টা, বক্তা, ভাষ্যকার, দার্শনিক,—তাহারই প্রদর্শিত পথে, তাহারই নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির সাহায্যে পাঠক অগ্রসর হয়।

কিন্তু নাটকের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, পরিবেশ নির্দিষ্ট, অভিব্যক্তির ধারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটা চলমান ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নর-নারীর ভাষণ ও কার্য দ্বারা যে-রূপটি ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকের নির্দিষ্ট রূপ। নাটকে নাট্যকারের কোনো স্থান নাই—কোনো বিশ্লেষণ, মন্তব্য বা অসংবদ্ধ কল্পনাবিলাসের অবসর সেখানে নাই। নাট্যকারের স্থান নাটকের নেপথ্যে। একটি ঘটনার উদ্ভব হইতে পরিণাম পর্যন্ত ধাবিত যে অনিবার্য গতি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও কার্যকে অবলম্বন করিয়া রূপ ধারণ করে, তাহার মধ্যে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্যের স্থান নাই। যে ভাব-কল্পনা-চিন্তার বিকাশ আমরা নাটকের মধ্যে দেখি, তাহা নাট্যকারের সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া তাহাদের মুখেই ব্যক্ত হয়। সেই ভাব-কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ নাটকীয় চরিত্রের মনোজগতের চিত্র,—উহাদের দ্বারা ঐ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা স্বধর্মই উদ্ঘাটিত হয়, সাক্ষাৎ ভাবে উহাদের সহিত নাট্যকারের কোনো সম্বন্ধ নাই। জীবন এখানে বর্ণনীয় নয়—দর্শনীয়। সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রূপের মধ্যে শিল্পিমনের অকারণ দখিন হাওয়া বয় না, বা বেদনা-মেঘের ছায়াও পড়ে না। কাব্য যদি কোথাও থাকে, তাহা পাত্রপাত্রীর মনের মধ্যে। ঘটনার সহিত আবদ্ধ চরিত্রের সুখদুঃখ, উত্থান-পতনের তাগিদ অনুসারেই ভাবাভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। স্রষ্টা এখানে সৃষ্টির সহিত

একাত্মতা লাভ করে না। শিল্পীর এই নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) বা নির্লিপ্ততা (detachment)-ই নাট্যসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা নিতান্ত বস্তুধর্মী ও প্রত্যক্ষ (objective)। চলমান জীবনপ্রবাহের একটা অংশকে নাটক প্রতিবিম্বিত করে। মানব-জীবনই প্রধানত নাট্যশিল্পের মূলবস্তু। মানুষের দেহ, হৃদয় ও বুদ্ধির বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমষ্টির উপর নাটকের আসন প্রতিষ্ঠিত। দেশ, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে রূপ নাটকে প্রতি-বিম্বিত, তাহা বাস্তবজীবনের একটা খণ্ডঅংশ। বাস্তবজীবনের প্রত্যেক ঘটনার একটা উদ্ভব, গতি ও পরিণাম আছে, সেই অনিবার্য ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কার্য, ভাব-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ আবর্তিত হইতে হইতে অগ্রসর হইয়া শেষ অবস্থায় উপনীত হয়। নাটক এই প্রবহমান বাস্তব ঘটনা ও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নরনারীর ভাব, চিন্তা ও কার্যকে সংহত ও সুসংবদ্ধ আকারে রূপদান করে।

ঘটনার গতিই নাটকের প্রাণ। ঘটনার আবর্তনেই চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয় এবং ঘটনার দ্বারাই চরিত্র স্পষ্ট ও মূর্ত হইয়া ওঠে। কার্যের দ্বারাই আমরা চরিত্রকে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। নর-নারীর চরিত্রচিত্রণ যখন নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য, তখন নাটকে গতি-শীল ঘটনাপুঞ্জ (action) অপরিহার্য। বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে আখ্যানবস্তু ক্রমাগত পরিণতির দিকে অগ্রসর না হইলে দর্শকের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য স্তিমিত হইয়া আসে এবং স্বাভাবিক বাস্তবধর্মের বিপরীত একটা অবাস্তব ও কাল্পনিক উপস্থাপন বলিয়া মনে করিয়া নাটকীয় রসের চমৎকারিত্ব উপভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। নাটক আসলে বাস্তব-জীবনের একটা অনুকরণমাত্র। বাস্তবজগতের নরনারীর জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব নানা পরিস্থিতিতে নূতন আলোকের দীপ্তিতে আমরা নূতন করিয়া দেখি ও মানবজীবনের গূঢ় রহস্যের সম্মুখীন হই। সুতরাং গতিশীল বাস্তবজীবনের একটা প্রতিরূপ না দেখিলে আধুনিক দর্শকের রসপিপাসা চরিতার্থ হয় না।

এই যে ঘটনাবলী ইহারা দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত (conflict) বা বিরোধের অংশস্বরূপ সংঘটিত হয়। এই যে বিরোধ ইহাই নাটকের মেরুদণ্ড। এই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতই নাটকের প্রাণবস্তু। এই বিরোধের সূচনায় নাটকের আরম্ভ এবং ইহার পরিণতিতে নাটকের পরিণতি,—মধ্যবর্তী অংশ এই বিরোধকে অবলম্বন করিয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার দ্বারা পূর্ণ থাকে।

আধুনিক নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চের উপর। অভিনয়ের দ্বারাই নাটকের গূঢ়তম আবেদন ও সৌন্দর্য আমাদের বোধ ও কল্পনাশক্তির নিকট পরিপূর্ণ ও যথার্থরূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে নাটক একেবারে বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। পাঠের দ্বারাই ইহার সকল সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। কাব্য ও উপন্যাসের মতো ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ইহার পরিপূর্ণ রসসম্ভোগ নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চের উপর—রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দ্বারাই নাটক অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত এবং এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে সুসংহত সাহিত্যিক মূর্তি ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকের প্রকৃত রূপ।

সত্যকার নাটকের ইহাই বৈশিষ্ট্য এবং নাটকের মধ্যে আধুনিক রুচি এই রূপ ও রসই কামনা করে।

কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে নাটকের ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া নাটক বর্তমান অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে

মানুষের মন, রুচি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তির মান বদলাইয়াছে—নাটকও নব নব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। নাটক প্রতিযুগের উপযুক্ত সাজ পরিয়াছে—প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, যুগের আদর্শ ও রাজনীতি দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসের বিয়োগান্ত নাটকগুলি বিশ্বনাট্যসাহিত্যে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়। গ্রীসের সেই যুগের সভ্যতা, ধর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, মানসিক সংস্কার এবং রুচি সেই নাটকগুলিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেই প্রাচীন গণতন্ত্রে, রঙ্গমঞ্চে প্রায় কুড়ি হাজার দর্শকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এথেন্সের প্রায় সকল নাগরিকের বসিবার স্থান সেখানে সংকুলান হইত। ডায়নিসাসের মন্দিরঅভ্যন্তরে এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে উঁচু-গোড়ালি-বিশিষ্ট চামড়ার জুতা, মুখোশ ও কৃত্রিম দীর্ঘ পোশাক পরিয়া অভিনেতারা অলংকারবহুল ভাষায় একটানা আবৃত্তি করিয়া যাইত। কৃত্রিম পোশাকের প্রাচুর্যে সাধারণ মানুষের অবয়ব অপেক্ষা বহুগুণে বিশাল দেখাইত তাহাদের দেহ, তাই রঙ্গমঞ্চের উপর তাহাদের চলাফেরা ধীরে ধীরে সম্পাদিত হইত। চরিত্রের রূপদানের যে একটা প্রধান উপাদান দেহ ও চোখ-মুখের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, অভিনেতারা মুখোশ পরায় দর্শকেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইত। তারপর কোরাসের দল রঙ্গমঞ্চের একপাশে সর্বক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছন্দে ও অলংকারবহুল ভাষায় আবৃত্তি করিত এবং গম্ভীরভাবে নৃত্য করিত। এই সাক্ষী-দলের সামনে নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অভিনীত হইত। দৃশ্যপরিবর্তনের কোনো বালাই ছিল না—কারণ স্থান ও কালের ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। অভিনয়ের দিক দিয়া সমস্ত নাটকের মধ্যে একটা অবাস্তব আবহাওয়া এবং শুষ্ক নিয়ম ও প্রথার কঠোর শাসন লক্ষিত হইত।

নাটকের উদ্ভবের মূলে প্রায় সব দেশেই ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক নাটকের এই অবস্থার মূলেও ছিল ধর্মের প্রভাব। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক পুরাণের আখ্যান। দেবদেবীর মন্দিরে নাটকের অভিনয় ধর্ম-উৎসবের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই জন্য অভিনেতারা দেহ অপেক্ষা বহুগুণে বড় অতি-প্রাকৃত পোশাক পরিয়া দর্শকদের মনে দেবত্ব-বিশ্বাস জাগাইতে চেষ্টা করিত। ঘটনা প্রায় সকল দর্শকই জানিত বলিয়া নাটকের পরিণাম সম্বন্ধে দর্শকের মনে কোনো উৎকণ্ঠা বা আগ্রহ ছিল না, তাই আকস্মিকতা ও বিস্ময়, যাহা নাটকীয় ঘটনার প্রাণ, তাহা নাটকের মধ্যে কোথাও পাওয়া যাইত না। ধীরস্থির ও গম্ভীর ভাবে ঘটনা-বর্ণনাই ছিল নাটকের উদ্দেশ্য। চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ নাট্যকার পুরাণের সর্বজনবিদিত চরিত্রই অনুসরণ করিয়াছেন। তাই সেই অতি-প্রাকৃত নাটকের তুলনা করা যায় গ্রীক-ভাস্কর্যের সহিত—অচল, গম্ভীর, অতি-মানবীয়। বর্তমান যুগে ইহার আবেদন আর নাটকত্বে নাই—যা আছে তা উৎকৃষ্ট লিরিক গুণের জন্য।

তারপর ইয়োরোপে মধ্যযুগ তাহার ধর্ম, গির্জার প্রভাব ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস লইয়া অস্তমিত হইলে যখন রেনেসাঁস আরম্ভ হইল, তখন সেই যুক্তির যুগে মানুষের কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু হইতে আরম্ভ হইল। দেবতা বা দেবানুগৃহীত ব্যক্তিকে পিছনে রাখিয়া মানুষ সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অতি-প্রাকৃত প্রভাব কিছু থাকিলেও মানব-জীবন ও মানবচরিত্রের রহস্যোদ্ঘাটনই নাটকের প্রধান অবলম্বনীয় হইল। ধর্মের প্রভাব হইতে নাটকের মুক্তি ঘটিল এবং নাটক অবাস্তব হইতে বাস্তবের তটে অবতরণ করিল।

এই সময় বিরাট নাট্য-প্রতিভা লইয়া শেক্সপীয়র আবির্ভূত হইলেন। শেক্সপীয়রের

নাটকে আমরা এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের সমাজের অবস্থা, রুচি, ফ্যাশান ও জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায় মানুষকেই প্রধানত দেখি। যদিও অপ্রাকৃত ও অলৌকিক উপাদান কিছু তাঁহার নাটকে আছে, তবুও নরনারীর চরিত্রসৃষ্টিই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

শেক্সপীয়রের সময়ে সমাজ-জীবন ও মানুষের চরিত্র এত জটিল হয় নাই। প্রবৃত্তিই তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছে। লোভ, কাম, প্রেম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তীব্রভাবে তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়াছে—তাই প্রবল হৃদয়াবেগের তাড়নায় তাহারা অতো সহজে হত্যা, বিবাদ ও আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। সেই উদ্দাম প্রবৃত্তির লীলা আমরা শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে দেখি। বাহিরের যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আড়ম্বরবহুল অনুষ্ঠান আর অন্তরের বিপুল প্যাশনের আলোড়ন রোমাণ্টিক কল্পনার রঙীন রশ্মিসম্পাতে এক অপূর্ব কাব্যময় নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে। জার্মানীর গ্যেটে ও শিলারও এই কাব্যপ্রধান নাটকের স্রষ্টা। নানা অলংকারময় ভাষায় রচিত দীর্ঘ সংলাপের কাব্যোচ্ছ্বাস নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্র-বিবর্তনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একটা নূতন সাহিত্য-রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে কাব্য ও নাটকের মণিকাঞ্চন-যোগ হইয়াছে—ভাব ও রূপ, বাস্তব ও আদর্শ, চিত্র ও জীবন-দর্শনের অপূর্ব সম্মেলন হইয়াছে। ইহাই উৎকৃষ্ট নাটকীয় রোমাণ্টিক কবি-কল্পনা।

আমাদের ভারতীয় নাট্যের উদ্ভবও ধর্মের আশ্রয়ে হইয়াছিল। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে ইহাকে 'পঞ্চম-বেদ' বলা হইয়াছে। ইন্দ্রের অসুরবিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে দেবাসুরের যুদ্ধের বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রথম নাটক রচিত হইয়াছিল। দেবতাদের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনই ছিল ইহার মূল লক্ষ্য। ভরতমুনি স্বর্গে দেবতাদের সম্মুখে 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। এক্ষেত্রে বিষ্ণু-দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল মনে হয়। ভাসের নাটকে আমরা প্রাচীন কালের রাজা ও নরনারীর রোমাণ্টিক চিত্র দেখি। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত 'মৃচ্ছকটিক' একখানি চমৎকার নাটক। চারুদত্ত-বসন্তসেনার প্রেমকাহিনীর সঙ্গে সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের প্রতিচ্ছবি ইহাতে আছে। তৎকালীন নাগরিক জীবনের এক সুন্দর চিত্র চমৎকার নাটকীয় ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত। 'মুদ্রারাক্ষস' ইতিহাসের ক্ষীণ ভিত্তির উপর স্থাপিত একপ্রকার রাজনৈতিক নাটক।

প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের কাহিনী, কাল্পনিক রাজা-রানী ও প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের জীবন-কথা। বাস্তবসম্পর্কলেশহীন কাল্পনিক ঘটনা-সংস্থান, অতি-প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা, অলংকারস্ফীত গীতিকবিতায় সংলাপ প্রভৃতিতে সংস্কৃত-নাটক একটা কৃত্রিম আবহাওয়ায় ভারাক্রান্ত। এক 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়া কোনো সত্যকার সমাজ বা কোনো যুগের মানুষকে এই নাটক প্রতিবিম্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নাট্যশাস্ত্র ও দৃশ্যকাব্যের নিয়ম, ধর্ম ও আদর্শনীতির প্রভাব, উচ্চশ্রেণীর লোকের জীবন-যাত্রার কতকগুলি মামুলী রীতি নাট্যকারের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার শিল্পরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তবুও দেশকালপাত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়া, অনুশাসন ও বিধি-নিয়মের গণ্ডী ডিঙাইয়া মাঝে মাঝে নরনারীর সর্বজনীন চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। কোনো

কোনো নাটকে নাটক ও কাব্যের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছে। সেই দু'একখানি নাটক উৎকৃষ্ট নাটকীয় রোমাণ্টিক কল্পনার নিদর্শন।

বাংলার নাট্যসাহিত্য ইয়োরোপের রোমাণ্টিক নাটক—বিশেষ করিয়া শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। যে বস্তুধর্ম বা দৃষ্টরূপের যথাযথ প্রকাশ নাটকের প্রাণ, নাট্যকারের যে নির্লিপ্ত ও আত্মভাবমুক্ত দৃষ্টি জগৎ ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া অনির্বচনীয় ভাবরসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে লইয়া যায়, যে উচ্চাঙ্গের নাট্যকলা সমাজ ও যুগকে প্রতিবিম্বিত করিয়াও দেশকালকে অতিক্রম করিয়া সর্বজনীন রস-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, বাংলা-সাহিত্যে কোনো নাটকের মধ্যেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ বিলাতী রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি বা ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসা পাঁচালী ও যাত্রাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম পরিস্ফুট হয়। ভক্তিমূলক পৌরাণিক কাহিনী বা সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের মধ্যে স্বাভাবিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা কৌতুক খাঁটি বাঙালী-হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। গিরিশচন্দ্র বাঙালী-হৃদয়ের এই গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া যাত্রা ও বিলাতী নাটকের সমন্বয়ে এমন এক রসবস্তু নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে বাঙালীর হৃদয়-নদীতে ভাবের প্লাবন আসিয়াছিল। শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর হৃদয়ই তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার 'প্রফুল্ল' বা 'বিল্বমঙ্গল' ভাবপ্রবণ, গীতিপ্রাণ. কল্পনাবিলাসী বাঙালীর নিকট অপূর্ব রসবস্তু বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালও শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়াছিলেন। ঘটনা-সংস্থান-নৈপুণ্যের সহিত উচ্চাঙ্গের কবিত্বের সম্মেলন হইয়াছে তাঁহার নাটকে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকগুলির পাত্র-পাত্রী তাহাদের ঐতিহাসিকত্ব ত্যাগ করিয়া ভাবপ্রবণ, শিক্ষিত বাঙালী নরনারীতে পরিণত হইয়াছে। দেশ ও কালের যে আবহাওয়া (atmosphere) ঐতিহাসিক নাটককে বৈশিষ্ট্য দান করে, তাহা তাঁহার ঐতি-হাসিক নাটকে বজায় রাখা হয় নাই। স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তার উদ্বোধক ভাবরাজিই তাঁহার নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মার্জিতরুচি শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদও বিলাতী রোমাণ্টিক নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টির খুব ভালো সমন্বয় তাঁহার নাটকে হয় নাই,—বহুস্থানে ভাবের কবিত্বময় উচ্ছ্বাস, অসংগত কল্পনা ও অলৌকিক আবহাওয়ার দ্বারা তিনি নাটকের প্রাণকে পীড়িত করিয়াছেন। তাঁহার অনেক নাটক একটা অবান্তর রোমান্সে পরিণত হইয়াছে।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' প্রভৃতিতে অনেকটা প্রকৃত নাটকের রূপ দেখিতে পাই। বাস্তব পরিবেশ ও চরিত্র-চিত্রণে সর্বসংস্কার-নিরপেক্ষ যে বস্তুনিষ্ঠ রসের প্রয়োজন, তাহার সাক্ষাৎ দীনবন্ধুর নাটকে আমাদের কিছুটা মেলে। তাঁহার নাটকের অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও বাস্তবজীবনের একটা অংশকে যেন প্রতিবিম্বিত দেখি তাহার মধ্যে। দীনবন্ধু ছাড়া আর সব নাট্যকারের নাটক অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত রোমান্স মাত্র—অবাস্তব কল্পনার চমকপ্রদ লীলা আর ভাবের কাব্যময় উচ্ছ্বাস মাত্র,—বাস্তবজীবনের স্বত-উৎসারিত গূঢ়তম ও বৃহত্তম রসবিলাস তাহাতে নাই।

সভ্যতাবিস্তার ও মানবজীবনের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালে নাটকের বিষয়বস্তু, শিল্পরীতি ও অভিনয়পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়াছে। কেবল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা রাজারাজড়াদের জীবন ও কীর্তিকথা লইয়া যে নাটক, তাহা আর লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় যেসব দ্বন্দ্ব ও সমস্যার মধ্য দিয়া মানুষকে জীবনপথ অতিক্রম করিতে হইতেছে, তাহার অভিব্যক্তির রসই বর্তমানে পাঠক ও দর্শকদের কামনার বস্তু হইয়াছে। সমাজের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ, যুক্তি ও জ্ঞানের সহিত চিরাচরিত প্রথা ও নীতির দ্বন্দ্ব, জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য রূঢ় ও নগ্ন প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি জীবনে যে অহরহ সংকট সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রকাশই হইয়াছে আধুনিক নাটকের বিষয়বস্তু। সমাজে, জীবনে যে-সব বাস্তব সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, যাহার সুষ্ঠু সমাধানের অভাবে মানুষ জীবনের গতিপথে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে, সেই আভ্যন্তরিক বিপর্যয়ের ইতিহাস ও অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে এবং তাহারই একটা রূপদানের চেষ্টা চলিয়াছে আধুনিক নাটকে। তাই বর্তমান নাটকে নাট্যকারকে তত্ত্বালোচক, সমস্যার ইঙ্গিতবাহক ও মতবাদ-প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

বর্তমানে সমস্যামূলক সামাজিক নাটকে নাটকের পূর্বতন শিল্পরীতিরও পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বকার স্থূল ধর্মসংশ্লিষ্ট যে অনুভূতি ও আবেগ, ধর্মজগতের অতিমানবদের যে চরিত্র-চিত্রণ, তাহা আর পরবর্তী যুগের মানবচিত্তকে আনন্দ দিতে পারে নাই। আবার পরবর্তী যুগের নাটকে নরনারীর যে আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রাবল্য, যে বীরত্বগৌরবের আদর্শ, যুদ্ধবিগ্রহের কোলাহল, প্রবল দ্বন্দ্বসংঘাতের প্রত্যক্ষ আলোড়ন, অবাস্তব কল্পনার লীলাবিলাস, কবিত্বময় উচ্ছ্বাস আর অলংকারস্ফীত ভাষায় সংলাপ, এখনকার প্রখর বাস্তবতার রৌদ্রদীর্ণ, প্রবল যুক্তিবাদী, বহুসমস্যাভারপীড়িত মানুষের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে না। সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বাহিরের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির পথ ছাড়িয়া অন্তরের গূঢ় পথে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর্থনীতিক অবস্থা ও সমাজ-পরিবেশের চাপে লোকের মানসিকতা নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। এখন মানুষ আবেগের দুর্দান্ত ঘোড়াকে বুদ্ধির লাগামে বশ করিতে শিখিয়াছে। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিতে এখন সে ওস্তাদ। এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষের মন অতি জটিল, অতি বিচিত্র, তাহার ব্যক্তিত্ব নানা পরস্পরবিরোধী ভাবের সমষ্টি, জীবনে তাহার বহু সমস্যা। ইবসেন, বিয়র্নসন, বার্নার্ডশ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারেরা মানবের এই জটিল ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব এবং মানবজীবনের বিচিত্র সমস্যাকে নাটকের বিষয়বস্তু করিয়াছেন। সংঘবদ্ধ সমাজের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার সংঘর্ষ, আদর্শের সহিত বাস্তবের দ্বন্দ্ব ও জীবনের নানা সমস্যাকে তাঁহারা রূপদান করিয়াছেন।

নাটকের প্রকৃতি ও আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হইয়াছে। নানা ঘটনার আবর্তসংকুল দীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক নাটক সংকুচিত হইয়া তিন বা এক অঙ্কে পরিণত হইয়াছে। শব্দঝংকারমুখর অমিতাক্ষর ছন্দে দীর্ঘ কবিত্বময় উচ্ছ্বাস আর এখন পাত্রপাত্রীর মুখে শোভা পায় না। এখন স্বাভাবিক গদ্যেই তাহারা মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশ করিতেছে। আবেগ, যাহা নাটকের প্রাণ, তাহা বুদ্ধি দ্বারা এমন শাসিত হইয়াছে যে, উহা প্রত্যক্ষ প্রকাশের পথ ছাড়িয়া ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নাটক সব দিক দিয়া বর্তমান কালের উপযোগী রূপ ধারণ করিয়াছে। আমাদের বাংলা-সাহিত্যেও এইরূপ দু'একখানি সমস্যাসংকুল

সামাজিক নাটকের আবির্ভাব হইয়াছে—কিন্তু তাহা এতই কৃত্রিম ও দুর্বল যে, পাশ্চাত্তোর একটা ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া মনে হয়—বাঙালীর সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার তাহা প্রতিচ্ছবি নয়।

ইহাই সাধারণভাবে প্রথম যুগ হইতে নাটকের উৎপত্তি ও বর্তমান পরিণতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যে আমরা এমন একপ্রকার নাটকের আবির্ভাব লক্ষ্য করি যাহার প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে প্রত্যক্ষ স্থূল জগৎকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি, উহাই এই জগতের একমাত্র সত্য-স্বরূপ নয়। এই বস্তুজগতের অন্তরালে এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, সেখানে এক অসীম রহস্যের লীলা অহরহ তরঙ্গিত হইতেছে। এই বস্তুজগতের নীরব, নিশ্চল, জড়পদার্থ সেই অন্তরালবর্তী অসীম রহস্যের ইঙ্গিত ও সংকেত বহন করিতেছে। সেই অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, হৃদয়ের গোপন অন্তস্তলে সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে তাহা ধরা পড়ে। অন্তরের বিজন নিঃসঙ্গতা ও গভীর নীরবতার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় লীলা-রহস্য অনুভূত হয়; সেই অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ন বাঁশির সুর অন্তরের সমস্ত দিক্‌চক্রবাল ব্যাপ্ত করিয়া অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার বেদনায় করুণ-মধুর রাগিণীর সৃষ্টি করে। অন্তরের নিভৃত গুহায় সেই শক্তির পদক্ষেপে সমস্ত কল্পনা শিহরিত হইয়া উন্দাম হইয়া ওঠে, আবেগ তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তখন শিল্পীর মনে এই অনির্দিষ্ট বায়বীয় অনুভূতিকে বাহিরে রূপদানের আকাঙ্ক্ষা জাগে। অদৃশ্যকে দর্শনীয় করিতে হইলে, অসীমকে সীমায় বাঁধিতে হইলে, অনির্দেশনীয় আবেগকে রূপদান করিতে হইলে শিল্পীকে সংকেত, প্রতীক বা রূপকের সাহায্য লইতে হয়। শিল্পী তখন সেই অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যময় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এক নূতন স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করে, সেই জগতে কিছু-ব্যক্ত কিছু-অব্যক্ত, কিছু-স্পষ্ট, কিছু-ইঙ্গিত, কিছু-প্রকাশ, কিছু-ব্যঞ্জনা দ্বারা এই বস্তুজগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ও যোগাযোগের আভাস দিয়া তাহার অন্তরের গূঢ় আবেগকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করে। এই অপূর্ব রহস্যময়তা ও সাংকেতিকতার বিচিত্র অনুভূতি-লীলা এমন দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, এমন ভয়-সংশয়-আশা-নৈরাশ্যের দোলায় দোলায়িত হয় যে, মানবমনের অসীম বিস্ময় ও উদগ্র কৌতূহলকে সর্বদা জাগ্রত রাখে। তাই এই অতীন্দ্রিয়রহস্য-শিল্পীরা তাঁহাদের প্রকাশকে নাটকের বিষয়ীভূত করেন। এইপ্রকার সাংকেতিক রহস্যময় নাটকের বিষয়বস্তু ও রূপ সাধারণ নাটকের বিষয়বস্তু ও রূপ হইতে পৃথক্।

আমরা নাটকে এ পর্যন্ত মানবচরিত্রের বিপুল রহস্যের সন্ধান পাইয়াছি। মানব-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার মনের প্রবৃত্তিনিচয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য, পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জের সহিত সংঘর্ষ, ব্যক্তির সহিত সমাজের, বাস্তবের সহিত আদর্শের, নিম্নবৃত্তির সহিত উচ্চ-বৃত্তির, প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির, ধর্মের মোহজনক কুসংস্কার বা লৌকিক ধর্মের সহিত সর্বজনীন নিত্যধর্মের, প্রেয়ের সহিত শ্রেয়ের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি। এই দ্বন্দ্বে পরাজিত মানবের অসাহয়তা ও বিফলতার করুণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু মানবমনের এই গূঢ় পরিচয়ের পরেও মানুষের আর একটি উৎকণ্ঠার পরিতৃপ্তি হয় না। মানবের অন্তরাত্মার আত্মপরিচয়ের যে আকূতি, তাহার অনন্তত্ব ও অসীম রহস্য-

বোধে যে তৃপ্তি, তাহা মানবমনের এই বাহিরের পরিচয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। মানবাত্মা অনন্তপথের যাত্রী,—এই জগতের দ্বন্দ্ব-কোলাহলময়তার ঊর্ধ্বে যে নিস্তব্ধ, অনন্ত, অতীন্দ্রিয় জীবন বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, সে তাহারই সন্ধান করে—সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেই কল্পলোক বা স্বপ্নলোকের মধ্যে প্রয়াণের দ্বারা আত্মপরিচয়ের গভীর রহস্যটি জানিতে চায়। সেই অতীন্দ্রিয় জগতে, সেই সর্বব্যাপী মহাজীবনভূমিতে জীবনের গভীরতর সত্য বিরাজ করে। সেইটিই মানবাত্মার প্রকৃত জগৎ, বাহিরের জগৎটা তো একটা মায়ারাজ্য। আমাদের এই স্থূল জগতের প্রত্যক্ষতার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের, সেই মহাজীবনের বিচিত্র মধুর লীলা চলিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের ধূলি-কালিমায়, সুখদুঃখে, চিত্তের আলোড়নে সেই লীলা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু সমস্ত সাংসারিক ঘটনার বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইলে. হৃদয়ের গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সেই স্বপ্নলোকের সংকেত, ইঙ্গিত, একটা অলৌকিক চেতনা আমরা অনুভব করি। দূর আকাশের ক্ষীণ জ্যোতিষ্কের একটু অস্পষ্ট আলো, গভীর রাত্রির একটা অকস্মাৎ পুষ্পগন্ধ, একটা অচেনা, অজানা, মুখচ্ছবি বা কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে সেই স্বপ্নলোকে জাগাইয়া তোলে। বহির্জগৎ কোথায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। কিসের একটা বেদনা, একটা উৎকণ্ঠা করুণ-মধুর মূর্ছনায় চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে। মানুষ তখন একটা অসীম রহস্যের সাক্ষাৎ পায়, জীবন যে এক পরমাশ্চর্যের ইঙ্গিতে কোথায় লোকান্তরের দিকে চলিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি মনে ভাসিয়া ওঠে। জীবনে এই সুবিপুল রহস্যের লীলা, এই আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতি, এই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধানই সাংকেতিক নাট্যকারদের বিষয়বস্তু ও শিল্প-রীতির মেরুদণ্ড। এই স্বপ্নজগৎ ও ব্যবহারিক জগতের পার্থক্যে অন্তর্লোকে যে একটা করুণ-মধুর বেদনার সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যেই সূক্ষ্ম ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত আছে। তাই সাংকেতিক নাটক এক অপূর্বসুন্দর করুণ-মধুর ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারে।

এ বিষয়ে ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স্ বলেন,—

> It was only by watching my own plays that I came to understand that this reverie, this twilight between sleep and waking, this bout of fencing, alike on the stage and in the mind, between man and phantom, this perilous path as on the edge of a sword, is the condition of tragic pleasure, and to understand why it is so rare and so brief.
>
> (*Preface, Plays for an Irish Theatre*)

বেলজিয়ামের নাট্যকার মরিস মেটারলিংকের নাটকে, আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি-নাট্যকার ডবলিউ. বি ইয়েট্‌সের নাটকে, জার্মানীর নাট্যকার হাউপট্‌ম্যানের কয়েকখানা স্বপ্ন ও রূপকথার রহস্যমণ্ডিত রোমাণ্টিক নাট্যকাব্যে এবং রুশ-নাট্যকার আন্দ্রিভের সাংকেতিক নাটকগুলিতে এই সর্বব্যাপী রহস্যময়তা ও সাংকেতিকতার একটা বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই।

এই সব নাট্যকারের নিকট সাহিত্যের বিষয়বস্তু পৃথক, জীবন-দর্শন একটা পৃথক মানসিকতা ব্যক্ত করে এবং ইহাদের সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীও স্বতন্ত্র। তাহাদের মতে—সত্য এমন একটি বস্তু যাহার দর্শন হাটে-বাজারে মিলে না, প্রকৃতি ও মানবের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিব্যক্তির মধ্যেও তাহা নাই। সত্য অন্তরের নিভৃত স্থলে এক অপূর্ব অনুভূতির মধ্যে

পাওয়া যায়। এই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, সেই জগতের মধ্যেই সত্য ও সৌন্দর্যের বাস। যাহা বাহিরের ঘটনা, যাহা আমরা জানি, তাহার মধ্যে সত্য ও আনন্দ নাই—যাহা আমরা আবিষ্কার করি তাহার মধ্যেই সত্য ও আনন্দ। অন্তরাত্মার অবগুণ্ঠিত জীবন পূর্ণ-চৈতন্য ও মগ্ন-চৈতন্যের প্রান্তিক সীমায় যে সত্য ও রহস্যের ইঙ্গিত পায় তাহার আবিষ্কারই মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। জীবনের এই রহস্য-সন্ধানই মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষ এই অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃতের সন্ধানেই জীবনপথে ছুটিয়াছে। মানবজীবনের চারিদিক এই রহস্যের জালে আবৃত। সেই অদৃশ্য জগতের রহস্য আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারে ধরা দেয় না। আমরা কেবল অন্ধকারে সেই অদৃশ্যকে দেখিবার জন্য, অধরাকে ধরিবার জন্য ঘুরিতেছি। সেই অদৃশ্য সত্য-সুন্দর, বিরাট বস্তু-জগতের অন্তরাল ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মতো সময় সময় আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির নিকট প্রতিভাত হয়। গীতিকবিতায় ও নাটকে এই সব রহস্য-বাদীদের আদর্শ—মানবজীবনকে প্রতিবিম্বিত করা নয়—মানবজীবনের গূঢ় ও গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করা।

এইসব মিস্টিক ও সাংকেতিক নাট্যকারদের শিল্পরীতি ভিন্ন এবং অভিনয়ব্যবস্থাও ভিন্ন। ইহারা বাস্তবজীবন ও বাস্তবঘটনাকে নাটকে প্রতিবিম্বিত করে না, ইহাদের নাটকে নরনারীর আবেগময় ভাষণ ও চলমান কর্মপ্রবাহ নাই, এবং প্লটেরও কার্যকারণসংগত সুসংবদ্ধ কাঠামো নাই। অভিনয়ে দৃশ্যপটের বেশি পরিবর্তন করা হয় না। পাত্রপাত্রীর মুখর সংলাপ অনেকাংশে বর্জিত,—কেহ কেহ মাঝে মাঝে বিষয়বহির্ভূত ইঙ্গিতাত্মক কথা বলে, কেহ বা হেঁয়ালির ভাষায় উত্তর দেয়, কোনো চরিত্র নীরবে রঙ্গমঞ্চের একধারে দাঁড়াইয়া থাকে, কাহারো বা নাটকে প্রবেশই নাই। রঙ্গমঞ্চের সচল কর্মকোলাহল ও ঘটনা-সংঘটন কিছুই তাহাতে নাই। একটা শান্ত স্তব্ধতা ও রহস্যময় নীরবতা সমস্ত রঙ্গমঞ্চ ঘিরিয়া বিরাজ করে। মানুষের বিচিত্রকর্মমুখর, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর, সুখদুঃখ ও আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত-তরঙ্গিত জীবনে পরম সত্যের, চরম রহস্যের সন্ধান মেলে না, নীরব শান্তির মধ্যে, ধ্যানের স্তব্ধতার মধ্যে কোনো এক শুভমুহূর্তে সেই চিরন্তন সত্য ও রহস্যের স্পর্শ পাওয়া যায়।

মেটারলিংক এই সাংকেতিক নাটকের রঙ্গমঞ্চের নাম দিয়াছেন 'স্থিতিশীল রঙ্গ-মঞ্চ'— 'Static theatre'। আন্দ্রিভ এইপ্রকার নাটককে বলিয়াছেন— 'Panpsyche' 'সর্বাত্মময়' বা 'সর্বচিন্তাময়'। তাঁহাদের মতে কর্মচাঞ্চল্যহীন নীরবতার মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের অনির্বচনীয় রহস্যের স্বরূপ, অন্তরাত্মার নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

মেটারলিংক বলেন,—

> Silence surrounds us on every side; it is the source of the undercurrents of our life; and let one of us but knock, with trembling fingers, at the door of the abyss, it is always by the same attentive silence that this door will be opened. (*Silence, The Treasure of the Humble.*)

নীরবতার সাধনা দ্বারাই সেই গভীর নিস্তব্ধ রহস্যের দরজা খোলা যায়।

তিনি আরো বলিয়াছেন,—

> No sooner are the lips still than the soul awakes, and sets

forth on its labours; silence is an element that is full of surprise, danger and happiness, and in these the soul possesses itself in freedom. (*Silence, The Treasure of the Humble.*)

নীরবতার মধ্যেই অন্তরাত্মার স্বাধীন ও পূর্ণ বিকাশ।

সাংকেতিক নাটকের রঙ্গমঞ্চে কার্যকারণসংবন্ধ কোনো ঘটনার সংঘটন প্রায়ই দেখানো হয় না,—কেবল একটা ঘটনার খণ্ড-অংশ, একটা আবহাওয়া, একটা বিশিষ্ট মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত করা হয়। সেখানে কোনো বাস্তব প্রত্যক্ষ ঘটনা বেশি ঘটে না—কেবল একটা অবাস্তব, অদৃশ্য ঘটনার ফল অনুভূত হয়। যদি বা কোনো ঘটনা ঘটে, তাহা আকস্মিক, অর্থহীন ও রহস্যময় বলিয়া মনে হয়।

সত্য ও সৌন্দর্যের জন্য অন্তরাত্মার যে অশ্রান্ত ও অদৃশ্য প্রয়াস, তাহার বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের অন্তরালে যে মহান গৌরব ও সৌন্দর্য লুক্কায়িত আছে, ইহাদের ক্ষণিক আভাস এই সাংকেতিক রহস্যবাদীরা নাটকের অভিনয় হইতে পাইতে চান। কে কাহাকে কি বলিল, কে কাহাকে হত্যা করিল—এ সব তাঁহাদের কাছে অবান্তর। মেটারলিংক বলিয়াছেন,—

Indeed, when I go to a theatre, I feel as though I were spending a few hours with my ancestors, who conceived life as something that was primitive, arid and brutal; but this conception of theirs scarcely even lingers in my memory, and surely it is not one that I can share......I had hoped to be shown some act of life, traced back to its sources and to its mystery by connecting links, that my daily occupations afford me neither power nor occasion to study. I had gone thither hoping that the beauty, the grandeur and the earnestness of my humble day by day existence would, for one instant, be revealed to me.........I was yearning for one of the strange moments of a higher life that flit unperceived through my dreariest hours: whereas, almost invariably all that I beheld was but a man who would tell me, at wearisome length, why he was jealous, why he poisoned, or why he killed. (*The Tragical in Daily Life, The Treasure of the Humble.*)

এই বলা হইতে না-বলার মধ্যে, এই কর্মচাঞ্চল্য হইতে নীরবতার মধ্যে, এই ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের মধ্যেই জীবনের রহস্য নিহিত। সুতরাং নাটকের পক্ষে প্রকাশ্য ভাষণ ও কর্মোদ্যম অপেক্ষা নীরবতার বাণীকে, আত্মদর্শনের এই ইঙ্গিতকে দর্শকের মনের মধ্যে সঞ্চার করিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মেটারলিংক এই ভাবের আভাস দিয়াছেন,—

I have grown to believe that an old man, seated in his armchair, waiting patiently, with his lamp beside him, giving unconscious ear to all the eternal laws that reign about his house, interpreting, without comprehending, the silence of doors and

windows and the quivering voice of the light......an old man, who conceives not that all the powers of this world, like so many heedful servants, are mingling and keeping vigil in his room......I have grown to believe that he, motionless as he is, does yet live in reality a deeper, more human and more universal life than the lover who strangles his mistress, the captain who conquers in battle or 'the husband who avenges his honour'. (*The Tragical in Daily Life, The Treasure of the Humble.*)

এই জাতীয় নাটকে সুসংবদ্ধ ঘটনা-বিবর্তনের পরিবর্তে ঘটনার একটা অংশ বা পূর্বাভাস, হঠাৎ সাক্ষাৎ বা দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি, অজ্ঞাত, অবচেতন মনের প্রেরণায় একটা মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত, যে শক্তিকে বুঝানো যায় না, অথচ অনুভব করা যায়, এমন একটা শক্তির লীলা, সহানুভূতি বা বিরুদ্ধভাবের গোপন বিধান, অব্যক্ত বিষয়ের অনুভবগম্য অসীম প্রভাব প্রভৃতিই বেশি পরিমাণে বর্তমান থাকে।

ইহাই মোটামুটি সাংকেতিক নাটকের ভাববস্তু, শিল্পরীতি ও অভিনয়-পদ্ধতি।

মেটারলিংক, ইয়েট্‌স, হাউপট্‌ম্যানের ও আন্দ্রিভের কয়েকখানা নাটকের সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করিলেই এ-জাতীয় নাটকের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা হইবে।

The Princess Maleine (La Princesse Maliene) মেটারলিংকের প্রথম সাংকেতিক নাটক। এই নাটক-প্রকাশের পর হইতে নাকি নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হয়, এবং তাঁহাকে 'Belgian Shakespeare'-নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য শেক্সপীয়র ও মেটারলিংকের নাট্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, তবে এই নাটকের আখ্যানবস্তুর সহিত Hamletএর আখ্যানবস্তুর একটু সাদৃশ্য আছে। Gertrude-এর মতো রানী Anne এই নাটকে বিরুদ্ধ শক্তির কেন্দ্র। কিন্তু এই সামান্য সাদৃশ্যের জন্য তাঁহাকে শেক্সপীয়র বলা হয় নাই। নিয়তির যে প্রচণ্ড প্রভাব আমরা শেক্সপীয়রের নাটকে লক্ষ্য করি, এই নাটকের মধ্যেও নিয়তির সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ বিরাজ করিতেছে। ইহাই তুলনার হেতু বলিয়া মনে হয়।

Yesselmondeর বৃদ্ধ রাজা Hjalmar-এর পুত্র যুবরাজ Hjalmar। জাট্‌-ল্যাণ্ডের সিংহাসনচ্যুত রানী Anne তাহার যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছে। বৃদ্ধ রাজার উপর সে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যুবরাজ Hjalmar--এর বিবাহ ঠিক হইয়াছে রাজা Marcellus-এর কন্যা রাজকুমারী Maleine-এর সহিত। কিন্তু বিবাহের ভোজ-সভায় বিষম গণ্ডগোল বাধিল—যাহার ফলে রাজা Hjalmar-এর দ্বারা Marcellus নিহত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এদিকে রাজকুমারী Maleine Hjalmarকে ভুলিয়া যাইতে অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ পিতা কর্তৃক এক কক্ষে আবদ্ধ ছিল। সেই কক্ষে ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সে যুবরাজ Hjalmar-এর উদ্দেশে Yesselmond দুর্গে উপস্থিত হইল এবং আত্মপরিচয় গোপন করিয়া রানী Anne-এর কন্যার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল। তখন Anne-এর কন্যাব সহিত যুবরাজ Hjalmer-এর বিবাহ ঠিক হইতে চলিয়াছে। Maleine যুবরাজের কাছে তখন আত্মপরিচয় দিলে, যুবরাজ পিতাকে সব কথা বলিল

এবং আবার উভয়ের বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। তখন দুর্বৃত্ত নারী Anne কৌশলে Maleine-এর কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিল। যুবরাজ দুঃখে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রানী Anneকে হত্যা করিল, শেষে নিজেই আত্মহত্যা করিল।

এই ঘটনাটুকু এই নাটকে লক্ষ্যের বিষয় নয়, কারণ মেটারলিংকের নাটকে আখ্যানবস্তুর কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। লক্ষ্যের বিষয় একটা অদ্ভুত আবহাওয়াসৃষ্টির কৌশল। ঘটনার ক্ষেত্র সেই গম্ভীর-দর্শন, প্রাচীন দুর্গ-নিবাসে একটা গোপন ভীতি, একটা উৎকণ্ঠা যেন রাজত্ব করিতেছে। চরিত্রগুলির রক্তমাংসের দেহধারী জীবের মতো স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নাই—যেন সব অদ্ভুত, ভূতে-পাওয়ার মতো, অদৃশ্য একটা শক্তির দ্বারা চালিত, ভালো করিয়া নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, কেবল কোনো ভাবী অমঙ্গলের একটা সংকেত বা পূর্বাভাস জ্ঞাপন করিতেছে।

নিয়তি ও মৃত্যুর রহস্যকে রূপায়িত করিয়াছেন মেটারলিংক তাঁহার কতকগুলি সাংকেতিক নাটকে। এই নাটকে দেখি মানুষ নিয়তির হাতে খেলনামাত্র। এক দুর্জ্ঞেয় ও অনিবার্য শক্তি দ্বারা সে জীবনপথে চালিত হইতেছে। তাহার শত ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও সে ভবিষ্যতের হাত হইতে নিস্তার পায় না। Maleine, যুবরাজ Hjalmar প্রভৃতি সেই দুর্জ্ঞেয় নিয়তির হাতের দুর্বল অসহায় পুতুলস্বরূপ নরনারীর প্রতীক। অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক মৃত্যু তাহাদিগকে দুর্বোধ্য ভাবে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতেছে—এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তাহাদের জীবন, কার্য ও এই জগতে অবস্থিতি অমোঘভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

The Intruder (La Intruse) তাঁহার আর একখানি একাঙ্ক নাটক। একটি পরিবারে মৃত্যুর রহস্যময় আবির্ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে ইহাতে। কিন্তু বর্ণনায় ভয়ের কারণটি কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই, অবান্তর বর্ণনা ও প্রশ্নের দ্বারা একটা রহস্যময় ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এ নাটকটিতেও একটা অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া-সৃষ্টির অপূর্ব কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

একটি পরিবারের অন্ধ ঠাকুরদাদা, বাবা, কাকা, তিনটি মেয়ে বাড়ির একটি ঘরে বসিয়া আছে। পাশের ঘরে মা শুইয়া আছে। সে একটি সন্তান প্রসব করিয়া দারুণ অসুস্থ। সদ্যঃপ্রসূত সন্তানটি জন্মের পর একবারও কাঁদে নাই, বেশি নড়েচড়েও নাই। মায়ের জীবনের বিশেষ আশঙ্কা আছে, যদিও ডাক্তার বলিয়াছে যে, আর কোনো আশঙ্কা নাই। সকলেই শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু অন্ধ ঠাকুরদাদার মন হইতে রোগিণীর বিপদাশঙ্কা যায় নাই—যে-কোনো মুহূর্তে তাহার জীবনান্ত হইতে পারে এইরূপ একটা আশঙ্কা তাহার মনের কোণে যেন সঞ্চিত আছে; প্রসূতির বিপদ কাটিয়া গিয়াছে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ। বড় মেয়েটি ধাত্রীর অপেক্ষায় জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছে। বাহিরে গাছের মধ্যে বাতাসের শব্দ হইতেছে—পাখী গান করিতেছে। মেয়েটির মনে হইল, কে একজন অপরিচিত লোক বাড়ির বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। হাঁসগুলি ভয় পাইয়াছে, পাখী গান বন্ধ করিয়াছে, বাড়ির কুকুরটা চুপ করিয়া জড়সড় হইয়া পড়িয়া আছে। অন্ধ ঠাকুরদাদার উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কোনো অচেনা দুষ্টলোক বাড়িতে ঢুকিয়াছে। বাহিরে কাস্তে শান দেওয়ার শব্দ শোনা গেল—বাগানের মালী বোধ হয় অস্ত্রপাতিতে ধার দিতেছে। ঘরের বাতি নিবু-নিবু হইতেছে—সিঁড়িতে কাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। শেষে ঠাকুরদাদা

পাশের ঘরের রোগিণীকে একবার দেখিয়া আসিতে চাহিলেন; কিন্তু রোগিণী এখন ঘুমাইতেছে বলিয়া সকলে যাইতে নিষেধ করিল। হঠাৎ ঘরের বাতিটা নিবিয়া গেল—সকলে অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দুপুর রাত্রে হঠাৎ পাশের ঘর হইতে শিশুটির কান্না ও দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। ঐ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং ওখান হইতে একটা আলো আসিয়া এই ঘরে পড়িল। দরজা দিয়া এক ধর্মযাজিকা নারী বাহির হইয়া আসিয়া ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা মায়ের মৃত্যুজ্ঞাপন করিল।

এ জগতে মৃত্যু একটি অসীম রহস্যময় ব্যাপার। মৃত্যুর আগমনকে কেহ কোনোদিন বাধা দিতে পারে না, ইহার নির্দিষ্ট সময়ও কেহ বলিতে পারে না—এক অনিবার্য, অপরিবর্তনীয় মহাশক্তিরূপে মৃত্যু মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মৃত্যুর উপর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মেটারলিংকের মূল জীবন-দর্শন ও বিশিষ্ট মতবাদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার মতে,—

> It is death that is the guide of our life, and our life has no goal but death. Our death is the mould into which our life flows : it is death that has shaped our features. (*The Predestined, The Treasure of the Humble.*)

মেটারলিংকের আরো কয়েকটি নাটিকায়—The Death of Tintagiles (La Mort de Tintagiles), Interior (Interieur) প্রভৃতিতে মৃত্যুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন পাওয়া যায়। Aglavaine and Selysette (Aglavaine et Selysettee) নাটকে Selysette স্বামীর প্রণয়িনী Aglavaine-এর পথ পরিষ্কার করিবার জন্য গৃহচূড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিল। স্বামী ও তাহার প্রণয়িনীর প্রেমলীলার সুযোগদানের জন্য এবং নিজের অশোভন ও অসহনীয় জীবন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সানন্দে সে মৃত্যুকে বরণ করিল। মৃত্যুই জীবনের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, সমস্ত অসামঞ্জস্য হইতে মানুষকে মুক্তি দেয়। মৃত্যু এই দিক দিয়া মানবের পরমবন্ধু।

মেটারলিংকের আর একখানি সুপরিচিত নাটক Palleas and Melisanda (Palleas et Melisande)। সুদূর অতীতের এক রাজা Arkel-এর দুই পৌত্র Golaud ও Palleas। Golaud শিকার করিতে যাইয়া বনের মধ্যে পথ হারাইয়া এক ঝরনার নিকটে উপস্থিত হইল। সেখানে অপূর্বসুন্দরী মেলিস্যান্ডার সহিত তাহার দেখা। সে ঝরনার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছিল। এই অজ্ঞাতপরিচয় মেলিস্যান্ডাকে বিবাহ করিয়া Golaud বাড়ি ফিরিল। বাড়িতে আসিয়া Palleas-এর সহিত তাহার পরিচয় হইল। উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হইল। Melisanda সর্বদাই কাঁদে। কিসের জন্য তাহার মনে এক অব্যক্ত বেদনা। Palleas ও Melisanda নির্জনে বসিয়া উভয়েই কাঁদে। একদিন উপরের খোলা জানালা হইতে প্রসারিত Melisandaর দীর্ঘ চুলের রাশি নীচে দাঁড়াইয়া Palleas চুম্বন করিতেছিল, এমন সময় Golaud আসিয়া উপস্থিত হইল। সে Palleas ও Melisandaর এই ব্যাপারকে শিশুজনোচিত বলিয়া উভয়কে সাবধান করিয়া দিল। তারপর ঝরনার ধারে একদিন পরস্পর-চুম্বনরত এই প্রেমিকযুগলকে দেখিয়া ঈর্ষাকাতর Golaud Palleasকে হত্যা করিল। Melisandaও আহত হইল। শেষে এক ক্ষুদ্র শিশু-কন্যার জন্ম দিয়া Melisanda প্রাণত্যাগ করিল।

এই নাটকখানির মধ্যে স্বপ্নরাজ্যের অবাস্তবতা ও অসীম রহস্যের কুহেলিকা বিরাজ করিতেছে। কোথায় মেলিস্যাণ্ডার জন্ম, কোথাকার সে অধিবাসী, কে তাহার পিতামাতা, তাহা কেহই জানে না। মেলিস্যাণ্ডা তাহার বিবাহের আংটিটি ঝরনার জলে হারাইয়াছে, দীর্ঘ বিস্ময়কর চুলের রাশি দিয়া পেলিয়াসকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, একঝাঁক ঘুঘু প্রাসাদ হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া গেল—প্রভৃতি গভীর সাংকেতিক অর্থের দ্যোতনা করিতেছে। মানুষের জীবন যে নিয়তির দ্বারা পরিচালিত, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মানুষের কোনো জ্ঞান নাই, সে কি করিতেছে, কি বলিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝে না ইত্যাদি ভাব পাত্র-পাত্রীর কথার মধ্যে অনেকবার প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশেষ করিয়া এই নাটকটি মেটারলিংকের একটি প্রিয়ভাবের বাহন। মানবের আত্মা দেহের অতীত, সামাজিক বিধি-নিষেধের অতীত এক চিন্ময় সত্তা। প্রেম সেই আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। দেহের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান আত্মার নাই, সুতরাং সাংসারিক ভালো-মন্দের মাপকাঠিতে বা সমাজের আইন-কানুনের দ্বারা তাহার প্রেমের বিচার হইতে পারে না। আত্মার নিকট ব্যভিচার বা অবৈধ প্রণয় বলিয়া কিছু নাই। প্রেমের মধ্যেই তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি—সে প্রেম কোনো অবস্থাতেই নিন্দিত বা কলুষিত হইতে পারে না। তাঁহার অনেক প্রবন্ধে মেটারলিংক এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

> She knows not the numberless sins of the flesh, a thousand miles from her throne; and the soul even of the prostitute would pass unsuspectingly through the crowd, with the transparent smile of the child in her eyes" . . . . .
> "A man shall have committed crimes refuted to be the vilest of all, and yet it may be that even the blackest of these shall not have tarnished, for one single moment, the breath of fragrance and ethereal purity that surrounds his presence.
>
> (*Mystic Morality—The Treasure of the Humble*).

মেলিস্যাণ্ডা স্বামী বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার আত্মার আনন্দ পায় নাই, তাহাকে ভালোবাসিতে পারে নাই। বিবাহ তো বাহ্য সামাজিক বন্ধন, সে আত্মার বন্ধন নয়। তাই তাহার অন্যপুরুষসংন্যস্ত প্রেম বিন্দুমাত্র নিন্দনীয় নয়। পেলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডার প্রেম আত্মায় আত্মায় মিলন, স্বর্গীয় ও নিত্যসিদ্ধ। নিয়তির অন্ধকারময় পথে চতুর্দিকে বিষণ্ণ আবেষ্টনের মধ্যে এই যুগলপ্রেম যাত্রা করিয়াছে উভয়ের অন্তর্গূঢ় বেদনাময় অনুভূতি ও উৎকণ্ঠার ক্ষীণরেখা অনুসরণ করিয়া; প্রকাশ ইহার কোথাও স্পষ্ট নয়, কেবল বেদনার কয়েকটি বিদ্যুৎ-রেখায় আত্মপ্রকাশ করিয়া এই প্রেম অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। এই প্রেমের একটা ক্ষণিক রহস্যময় আভা এই নাটকটিকে একটা রমণীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

প্রেমের এই আদর্শকে মেটারলিংক অন্যভাবে রূপায়িত করিয়াছেন তাঁহার Joyzelle নাটকে।

মেটারলিংকের মতে প্রেম একান্তভাবে মানবাত্মার সম্পত্তি। প্রেম অর্থে এক মানবাত্মার সহিত অন্য মানবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা। একটি মানবাত্মার অপর মানবাত্মার প্রতি এই যে আকর্ষণ ইহার মূলে আছে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ। আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধই

সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। সৌন্দর্যই আত্মার কামনার বস্তু. সৌন্দর্যেই তাহার একমাত্র তৃপ্তি। অন্য কোনো দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। এই সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষাই প্রেমের ধারায় প্রবাহিত—উহাই একের প্রতি অন্যের আসক্তির মূল।

> Certain it is that the natural and primitive relationship of soul to soul is a relationship of beauty. For beauty is the only language of our soul ; none other is known to it. (*The Inner Beauty : The Treasure of the Humble*).

এই প্রেমের শারীরিক কুশ্রীতার দিকে লক্ষ্য নাই, কিছু গোপন করিবার নাই, সামাজিক রীতি অনুসারে অন্যের প্রতি আসক্তিতে পাপ-পুণ্যের বিচার নাই, তাহার লক্ষ্য কেবল প্রেমাস্পদের দিকে, তাহার আত্মার চিরন্তন সৌন্দর্যের দিকে। এই প্রেমের সার্থকতাই প্রেমে—কেবল আবেগময় ভালোবাসায়, আত্মদানে।

> It is in love that are found the purest elements of beauty that we can offer to the soul......And to love thus means that, little by little, the sense of ugliness is lost ; that one's eyes are closed to all the littleness of life, to all but the freshness and virginity of the very humblest of souls. Loving thus, we have no longer even the need to forgive. Loving thus, we can no longer have anything to conceal, for that the everpresent soul transforms all things into beauty......It is to transform, though unconsciously, the feeblest intention that hovers about us into illimitable movement. It is to summon all that is beautiful in earth, heaven or soul, to the banquet of love. Loving thus, we do indeed exist before our fellows as we exist before God. (*The Inner Beauty : The Treasure of the Humble*).
>
> There is in this love a force that nothing can resist.
>
> (*The Invisible Goodness : The Treasure of the Humble*).

মানবাত্মার স্বর্গীয় ঐশ্বর্য যে প্রেম, কোনো অবস্থাতেই তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, সে চিরন্তন, স্থির আলোকস্তম্ভ। Joyzelle এই নিত্যসিদ্ধ অলৌকিক প্রেমের প্রতীক। Lanceor-এর জন্য প্রেমের যে অনির্বাণ, অবিচলিত দীপ তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, কোনো অবস্থাতেই তাহার শিখা স্তিমিত হয় নাই।

Lanceor যখন Arielleকে চুম্বন করার কথা অবশেষে অস্বীকার করিল, তখন Joyzelle বলিতেছে যে. এই মিথ্যা বলার কোনোই প্রয়োজন নাই, তাহাতে তাহার উপর Lanceorএর ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া সে মনে করিবে না।

> You well know, as I do, that love has words which nothing can resist and that the greatest fault, when confessed in a loyal kiss, becomes a truth more beautiful than innocence......Speak that word to me, give me that kiss ; confess the truth, confess what I saw, what I heard ; and all will again become pure as it was and I shall recover all that you gave me (Act II).

Lanceor মিথ্যা বলিলেও Joyzelleএর প্রেম অবিচলিত। যখন Lanceor শীর্ণ, বৃদ্ধ, বাঁকা হইয়া প্রাসাদের এক ঘরে আবদ্ধ হইয়া আছে, Joyzelleএর প্রেমের অসম্মান করিয়াছে বলিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে ও Joyzelle আর তাহার মুখ দেখিবে না বলিয়া দুঃখ করিতেছে এবং দেহের এই পরিবর্তনে তাহাকে আর কেহ চিনিতে পারিবে না বলিয়া হতাশ হইতেছে, তখন Joyzelle তাহার জন্য সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছে। Lanceor তাহার চেহারার পরিবর্তনে দুঃখে লজ্জায় সরিয়া গেল, Joyzelle বোধ হয় তাহাকে আর চিনিতে পারিবে না, কিন্তু Joyzelle বলিতেছে,—

> Come, come, do not think about the lies of the mirrors......They know not what they say, but love knows.

তারপর Lanceor যখন দুঃখ ও অনুশোচনায় তাহার দোষ স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহার আর কি আছে—তাহার দেহ গিয়াছে, সম্ভ্রম গিয়াছে, Joyzelle, এর প্রেমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাহার হৃদয়ও গিয়াছে—

> What remains of me ?.........

Joyzelle তখন বলিতেছে,—

> It is you, and still you, none but you yourself !......When one loves as I love you, she is blind and deaf, because she looks beyond and listens elsewhere......When she loves as I love you, it is not what he says, it is not what he does, it is not what he is that she loves in the man she loves ; it is he and only he, who remains the same, through the passing years and troubles.
>
> (Act, III ; Scene I).

প্রেম প্রেমাস্পদকে শুধু চায়। ইহা এক মানবাত্মার অন্য মানবাত্মার প্রতি আসক্তি। দেহের পাপে, সংসারের নানা স্খলন-পতন-ত্রুটিতে সত্যকার প্রেমের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। প্রেম তো মানুষের অন্তরতম সত্তাকে আকাঙ্ক্ষা করে—তাহার বাহিরের জীবনকে নয়।

তারপর Joyzelleকে পরীক্ষা করিবার জন্য Merlin যখন অন্য নারীর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ Lanceorকে দেখাইতে চাহিল, তখন সে ঐদিকে একবারও তাকাইল না। শেষে Lanceorএর প্রাণের বিনিময়ে যখন Merlin তাহার আত্মদান আকাঙ্ক্ষা করিল, তখন সে প্রিয়তমের জন্য তাহাও স্বীকার করিল। সে পরীক্ষাতেও Joyzelle জয়ী হইল। এই অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেম মানুষের প্রবৃত্তি, হৃদয় ও বুদ্ধির উপরে রাজত্ব করিয়া জীবনে-মরণে স্বপ্রতিষ্ঠিত। অসাধারণ শক্তিশালী এই প্রেম—কোনো-কিছুই এই প্রেমকে বাধা দিতে পারে না। তাই মায়াবিনী Arielle বলিয়াছিল,—

> Joyzelle's strength is so swift, so profound, that it escapes my arm, escapes my eyes, escapes destiny. (Act V, Scene II).

এই প্রেমের উপর নিয়তিরও যেন হাত নাই!

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ভাগ্য বা নিয়তির উপর, মৃত্যুর উপর, প্রেম ও সৌন্দর্যের উপর মেটারলিংকের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ও নাটকে তাহাদের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটু ধারণা হইবে বলিয়া মনে করি।

মেটারলিংকের সুপ্রসিদ্ধ নাটক Blue Bird-এর আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি সর্বজনবিদিত।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্যের বিষয় যে, এই নাটকে তাঁহার শিল্পকুশলতা যেমন সুন্দর ফুটিয়াছে, তাঁহার মানসিকতারও একটা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। নিয়তি, মৃত্যু প্রভৃতির অমোঘতা আর তাঁহাকে পূর্বের মতো পীড়িত করে নাই—তিনি যেন একটা আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন। এটি একটি চমৎকার আশাবাদী রূপক-সাংকেতিক নাটক।

ইয়েট্সের সাংকেতিক নাট্য The Shadowy Waters-এর মর্মকথা—স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শকে লাভ করিবার জন্য মানুষের অভিযান। নীল আকাশের গায়ে সূক্ষ্ম সাদা মেঘের মতো একটা রঙীন কল্পনার স্বপ্নময় আবরণে এই নাট্যকাব্যখানি ঢাকা। এই নাটকটির মধ্যে এমন একটা রহস্যময় আবহাওয়া আছে যে, মনে হয়, অতীন্দ্রিয় স্বপ্নের জগৎই সত্য জগৎ, বাস্তব জগৎ মিথ্যা,—এ কেবল জাগতিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রকৃত সত্যের ছায়ামূর্তিমাত্র। সমস্ত মিস্টিক ও সাংকেতিক শিল্পীর উপলব্ধিই অনেকটা এই প্রকারের। এই নাটকের নায়ক Forgael-এর মুখে এই ভাবের উক্তি ব্যক্তও হইয়াছে,—

All would be well
Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense
Is shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things; for it is dreams
That lift us to the flowing, changing world
That the heart longs for.

Forgael প্রেমের স্বপ্নে বিভোর, সে এক অভাবনীয় আনন্দের উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু তাহার শিষ্য ও জাহাজের অধ্যক্ষ Aibric কঠিন বাস্তববাদী—গুরুর স্বপ্নে তাহার বিশ্বাস নাই। রূপকথার প্রেমিক-প্রেমিকা Ængus ও Edain-এর নিকট হইতে Forgael প্রেমের এই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং সেই পরিপূর্ণ আনন্দের আদর্শ তাহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়াছে। তাহাদের জাহাজ চলিতে চলিতে অন্য একটি জাহাজের সম্মুখীন হইল। Forgael-এর নাবিকগণ যখন রাজাকে হত্যা করিয়া রানী Dectoraকে ধরিয়া Forgael--এর জাহাজে হাজির করিল, তখন Forgael-এর ইন্দ্রজালময় বীণার স্বরে মৃত স্বামী Iollan-এর প্রতি রানীর প্রেম উদ্দাম হইয়া উঠিল এবং রানী কাঁদিতে লাগিল। তখন Forgael বলিল যে, Iollan আর কেহ নয়—সে Forgael—তাহাকেই রানী সহস্র বৎসর ধরিয়া ভালোবাসিয়াছে। রানীর প্রেম তখন Forgael-এর উপরে অর্পিত হইল। তারপর Forgael তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করিয়াছে বলিলেও Dectora-র প্রেম প্রতিনিবৃত্ত হইল না। একঝাঁক ধূসর রঙের পাখী ডাকিতে ডাকিতে জাহাজের ধার দিয়া উড়িয়া পশ্চিম দিকে যাইতে যাইতে অজানা অনির্বচনীয় আনন্দপুরীর সংকেত জ্ঞাপন করিয়া গেল। Forgael সেই দেশে যাইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। Dectora অবিচল দৃঢ়সংকল্প লইয়া তাহার প্রেমাস্পদ Forgael-কে আঁকড়াইয়া রহিল। এই জীবনে-মরণে অবিচল, গভীর পবিত্র প্রেমে উভয়ে অমর হইয়া গেল এবং সমগ্র বস্তুজগৎ চারিদিকে মিলাইয়া গেল।

The Hour Glass এই রহস্য-সংকেতবাদী নাট্যকারের আর একখানি নাটক। এই শ্রেণীর কবি ও নাট্যকারদের তত্ত্ব ও দর্শনের পরিচয় এই নাটকটিতে পাওয়া যায়।

Wise Man একজন কঠোর বাস্তববাদী, তার্কিক; স্বর্গ, ভগবান ও দেবদূতে প্রভৃতি অলৌকিক বস্তুতে অবিশ্বাসী, যুক্তিসর্বস্ব, বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক। যাহা তিনি ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতে পারেন না, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁহার শিক্ষায় তাঁহার ছাত্রেরা, নিজের সন্তানেরা ও দেশের যুবকেরা বাস্তববাদী, এবং অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী হইয়া গিয়াছে। কেবল সেই দেশে একটি লোক আছে, যে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করে নাই—অলৌকিকত্বে তাহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। সে হইতেছে Fool।

শেষে এক দেবদূত Wise Man-কে দর্শন দিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে জ্ঞাপন করিল। তখন তাঁহার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। মৃত্যুর পরে তিনি কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসা করায় দেবদূত বলিল, তিনি নরকে যাইবেন, তবে যদি তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই একঘণ্টা সময়ের মধ্যে এমন কোনো লোকের সাক্ষাৎ পান যে অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে, তবে তিনি কিছুদিন নরক ভোগ করিয়া স্বর্গে যাইতে পারেন। অধ্যাপক তখন তাঁহার ছাত্রদের, যুবকদের, তাঁহার সন্তানদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কেহই তাহাতে বিশ্বাস করে না। সকলেই অস্বীকার করিল। শেষে একঘণ্টার একটু বাকি থাকিতে সেই Fool-এর সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল যে, সে চিরকালই ঐরূপ বিশ্বাস করে। তখন অধ্যাপক একটু নিশ্চিন্ত হইয়া মারা গেলেন।

বুদ্ধি, যুক্তি ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর কেবল নির্ভর করিলে এই দৃশ্যমান জড়-জগৎকে আমরা জানিতে পারি মাত্র, কিন্তু অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের আলেয়াতে ভুলিলে চলিবে না। এই বুদ্ধি ও জ্ঞান শীতের শুষ্ক পাতার মতো ঝরিয়া গেলে প্রস্ফুটিত বিশ্বাস, ভগবৎপ্রেম ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে মানুষ সেই অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য জানিতে পারে। তাহারাই সত্যদ্রষ্টা, যাহারা "base their belief, not on revelation, logic, reason or demonstrated facts, but on feeling, on intuitive inner knowledge." ইহাই এই নাটকটির মর্মকথা।

হাউপট্‌ম্যানের রূপকনাট্যে মানুষের অন্তর্জীবনের ইতিহাস, রূপকথা প্রভৃতির ক্ষীণ কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের আদর্শ, তাহার অন্তর্গূঢ় ভাব-চিন্তা, তাহার অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষা ও স্বরূপ, তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির রূপকের আখ্যানবস্তুর পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। হাউপট্‌ম্যান ছিলেন একজন বাস্তববাদী নাট্যকার—তাঁহার The Feast of Peace, Lonely Lives, Colleague Crampton, The Weavers, The Beaver Cloak প্রভৃতি নাটক তাহার নিদর্শন। শেষের দিকে তাঁহার সাহিত্যিক মানসের একটা পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তিত মানস-জীবনের নূতন ভাব-কল্পনা নূতন ভঙ্গীতে রূপায়িত হয় বিশেষ করিয়া তাঁহার তিনখানি রূপকনাট্যে—Hannele, The Sunken Bell এবং Henry of Aue-তে। এই তিনখানি নাটকে একটা অবাস্তব পরি-বেশ ও অতি-প্রাকৃত আবহাওয়া থাকিলেও অপূর্ব শিল্পকৌশলে নাট্যকার ইহাদিগকে অনেকখানি বাস্তবের বর্ণ-ও-গন্ধযুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রথম জীবনে অনুসৃত শিল্পরীতির ফল বলিয়া মনে হয়। তাহাতে এই তত্ত্বমূলক নাটকও রঙ্গমঞ্চে বিশেষ

সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে এবং পাঠকের নিকটও ইহা হেঁয়ালির কুয়াশা কাটাইয়া সার্থক রসসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

হাউপট্‌ম্যানের বহু-প্রশংসিত ও বহু-নিন্দিত নাটক Hannele। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও নিউ ইয়র্কে ইহার অভিনয় হইয়াছে এবং একদল ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছে, আর একদল তীব্র নিন্দা করিয়াছে। একদল গভীর ধর্মবোধ, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পকর্মের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছে, অপরদল শিশুজনোচিত, হাস্যকর, অপদার্থ রচনা বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

রাজমিস্ত্রি Mattern-এর চতুর্দশবর্ষীয়া কিশোরী কন্যা Hannele। সে বাপের সৎ-মেয়ে; বাপ তাহার ঘোরতর অত্যাচারী। অল্পদিন হইল বালিকার মা মারা গিয়াছে, তাহাতে তাহার উপর বাপের অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়াছে। বাপ তাহাকে রাত্রিতে ভিক্ষা করিবার জন্য বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিত, অন্তত কিছু তাহাকে আনিতেই হইবে। যেদিন কিছু আনিতে পারিত না, সেদিন তাহাকে এমন প্রহার করা হইত যে, বালিকার চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিত। বাপ মেয়ের সেই ভিক্ষার টাকা দিয়া নিয়মিত মদ খাইত। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত শান্ত আর ধর্মবিশ্বাসী। একদিন সে আর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মুক্তির আশায় এক পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করে। কাষ্ঠব্যবসায়ী Seidel তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া উদ্ধার করে। তখন গ্রাম্য স্কুল-মাস্টার Gottwald এক সভা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল, সে Hannele-কে তাহার বাড়ি লইয়া গিয়া স্ত্রীর সাহায্যে তাহার ভিজা কাপড়-চোপড় বদলাইয়া প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা করে। তারপর Seidel ও Gottwald Hannele-কে গ্রামের আতুরাশ্রমে লইয়া যায়। সেখানে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অর্ধ-নিদ্রিত, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় সে নানারূপ অলীক দৃশ্য দেখিতে থাকে। শুশ্রূষাকারিণী বার বার ঘুমাইতে বলিলেও সে ঐ স্বপ্ন দেখিতে থাকে এবং মাঝে মাঝে জাগিয়া ওঠে। শেষে স্বপ্ন দীর্ঘ হয়, স্বপ্নে সে তাহার মৃত্যু, তাহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া, দেবদূতের আগমন, যীশুখৃষ্টের আগমন প্রভৃতি বহু দৃশ্য দেখিতে থাকে। তারপর, ডাক্তার আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলে, সে মারা গিয়াছে।

এই নাটকটির বিষয়বস্তু বালিকার স্বপ্নকাহিনী। একটি জটিল মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে নাট্যকার অদ্ভুত শিল্পশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শিশু-মনস্তত্ত্ব ও তাহার সঙ্গে স্বপ্নকালীন মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রণে একটি মরণোন্মুখ কিশোরীর অন্তর্জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। এই স্বপ্ন ও প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়া আমরা তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারি ও তাহার চরিত্রের স্বরূপ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়।

ছেলেবেলা হইতেই বাইবেলের নানা গল্প, খৃষ্টধর্মের নানা কথা, যীশুখৃষ্টের কাহিনী প্রভৃতি শোনার জন্য এই সরল গ্রাম্যবালিকার মনে ধর্মবিশ্বাস গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। যীশুখৃষ্ট সৎলোককে ভালোবাসেন ও অত্যাচারীকে শাস্তি দেন। সে সাধু, বিশ্বাসী ও ভক্তিমতী; তাহাকে নিশ্চয়ই যীশুখৃষ্ট স্বর্গে লইয়া যাইবেন, এবং সংসারে যে-আনন্দ সে পায় নাই, তাহাকে তাহাই দিবেন—এই ছিল তাহার গভীর বিশ্বাস। ইহার সঙ্গে সে যে-রূপকথার গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে মেয়েরা বেশভূষার চাকচিক্যে খুব প্রধান বলিয়া গণ্য ছিল, কল্পনায় সে তাহাদের ভূমিকা অভিনয় করিত। কারণ, সে মনে করিত যে, সে নিজে অত্যন্ত ভালো মেয়ে এবং অন্যান্য মেয়ে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রূপকথার

নায়িকা হইবার যোগ্য। তাহার উপযুক্ত বেশভূষা প্রয়োজন এবং তাহার পায়ে কাচের জুতো শোভা পাওয়া উচিত। এই অভিমানটি তাহার মনে ছিল। তারপর তাহার কিশোরী-হৃদয়ে স্কুলমাস্টারের উপর অজানিতে একটা পবিত্র ভালোবাসার সঞ্চার হইয়াছিল; তাহার চেহারা, চুল-দাড়ি তাহার ভালো লাগিত, সে তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। সে যখন যীশুখৃষ্টের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তখন যীশুখৃষ্টকে Gottwald-এর বেশেই দেখিতে পাইল। মনের এইসব গূঢ় আবেগের সহিত মৃত মায়ের প্রতি তাহার স্নেহ, বাপের প্রতি বিরক্তি ও ভয় মিশ্রিত হইয়া তাহার সমস্ত মনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছিল। মনের এই প্রবৃত্তি ও কল্পনা Hannele-এর স্বপ্নে অপূর্ব কলাকৌশলের সহিত রূপায়িত হইয়াছে। বাপের দারিদ্র্য, অনাহার, মৃত মায়ের জন্য ব্যাকুলতা প্রভৃতি তাহার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাকে বলবতী করিয়াছে। মৃত্যুতেই সে মুক্তি পাইয়া তাহার বিশ্বাস ও কল্পনানুযায়ী স্বর্গে আনন্দময় জীবন লাভ করিবে—এই বিশ্বাসই তাহাকে জলে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করিয়াছে।

এই নাটকটির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে নাট্যকারের একটা বাণীর আভাস আছে বলিয়া মনে হয়—সে বাণী মৃত্যুর বাণী। মৃত্যুই জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা হইতে মানুষকে মুক্তি দেয়। মৃত্যুর দ্বার দিয়াই মানুষ শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইহা দেহের বিলোপ হইলেও আত্মার নবজীবন—নবজাগরণ।

Hannele.

Who is he?

The Sister.

Death.

Hannele.

Death! [She looks for a while at the Black Angel, in awe-stricken silence.] Must it be, then?

The Sister.

It is the entrance, Hannele..

Hannele.

Must every one pass through the entrance?

The Sister.

Every one.

The Sunken Bell হাউপট্‌ম্যানের আর একখানি অপূর্ব রূপকনাট্য।

এই নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটি এই—শিল্পীর প্রাণে একটা অতি উচ্চ ও পরিপূর্ণ আদর্শ আছে। বিশ্ব-শিল্পীর অনুকরণে সে তাহার শিল্পকে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত করিতে চায়, সেই উচ্চ সুরে তাহার জীবন-তন্ত্রী ও শিল্প-তন্ত্রী বাঁধিতে চায়, কিন্তু মানুষের রচিত শিল্প বিশ্ব-শিল্পীর শিল্পের উচ্চ আদর্শ, সমুন্নত মহিমা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; সেই উচ্চসুরের সহিত সে কণ্ঠ মিলাইতে পারে না। তবুও মানুষ-শিল্পী সেই উচ্চ লক্ষ্যের আদর্শে শিল্প-রচনায় সারাজীবন রত থাকে, কিন্তু তাহার শিল্প-কার্য পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হয়; তাহার মনোমত আদর্শকে রূপায়িত করিতে না পারায় তাহার অন্তরের বেদনার সীমা থাকে না, ব্যর্থতায় সে মৃত্যুকামনা করে। তাহার চারিপাশের সাধারণ লোক তাহার অন্তরের অপূর্ণতার বেদনা বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করে, শিল্পীর

শিল্প সংসারের সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু শিল্পী তাহাতে সন্তুষ্ট নয়, সে পরিপূর্ণতার আদর্শ কামনা করে। যখন অসন্তুষ্টিতে ও ব্যর্থতার বেদনায় সে ম্লান, দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, তখন বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী তাহাকে আবার অনুপ্রেরণা দিয়া তাহার অলৌকিক সৌন্দর্যচেতনাকে উম্বুদ্ধ করে,—শিল্পী নবজীবন লাভ করিয়া আবার একাগ্রমনে তাহার শিল্প-সাধনায় নিমগ্ন হয়। তখন সে বাস্তব পরিবেশ ভুলিয়া যায়, স্ত্রী-পুত্র-সংসার ভুলিয়া যায়, তন্ময় হইয়া শিল্পসাধনায় ডুবিয়া থাকে। কিন্তু তাহার সৃষ্টিতে কোনো পরিপূর্ণতা আনিতে পারে না, প্রতি সকালে পূর্ণ উদ্যমে কাজে লাগে, সন্ধ্যায় আদর্শ-অনুযায়ী কাজ হয় নাই বলিয়া নৈরাশ্য ও ক্লান্তিতে ভাঙিয়া পড়ে। আবার, তাহার এই সাধনায় নানা অদৃশ্য শত্রু—নানা প্রতিকূল অবস্থা তাহাকে বাধা দেয়। সব চেয়ে বড় বাধা তাহার বাস্তব সংসার—তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। যাহাদের উপেক্ষা করিয়া বিশ্বসৌন্দর্যের প্রেরণায় সে শিল্প-সাধনায় নিবিষ্ট থাকে, তাহাদের স্মৃতি, তাহাদের করুণ অসহায়তা তাহার স্পর্শকাতর মনে প্রবল আলোড়ন তোলে। সে না পারে তাহার মনোমত শিল্প-রচনা করিতে, না পারে তাহার স্ত্রী-পুত্রদের ভুলিয়া থাকিতে। তখন মৃত্যু ছাড়া আর তাহার শান্তির উপায় থাকে না। তাই তাহার পরিপূর্ণ আদর্শ বুকে করিয়া সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

শিল্পী Heinrich নানারকম ঘণ্টা বানাইয়াছে, পৃথিবীর নানাস্থানে তাহার ঘণ্টার মধুর ধ্বনি ও বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহার সুখ্যাতি, গ্রামের মধ্যে সে উৎকৃষ্ট শিল্পী বলিয়া সমাদৃত। তবুও তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পাহাড়ের উপরে গির্জার উচ্চচূড়ায় সে বহুদিনের পরিশ্রমে রচিত অপূর্ব ঘণ্টা বাঁধিতে গিয়াছে; তাহার আকাঙ্ক্ষা—পাহাড়ের উচ্চচূড়ায় এই ঘণ্টার ধ্বনিতে সমস্ত অঞ্চলে অপূর্ব প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হইবে, এক অপূর্ব শিল্পের নিদর্শন বলিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া সেই অলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি শুনিবে। কিন্তু সে এই ঘণ্টা বাঁধিতে গিয়া বাঁধিতে পারিল না, ঘণ্টা নীচে এক গভীর কূয়ার মধ্যে পড়িয়া গেল, সে উচ্চচূড়া হইতে পড়িয়া গিয়া পাহাড়ের মধ্যদেশে এক জঙ্গলের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ দেহে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল।

এদিকে পাহাড়ের নীচে গ্রামের মধ্যে Heinrich-এর বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও দুই ছেলে রবিবারের পোশাক পরিয়া গীর্জায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সকলেই আশা করিতেছে, শীঘ্রই পর্বতের উপর হইতে ঘণ্টা-নির্মাতার অদ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু এক প্রতিবেশিনী জানাইল যে, পাহাড়ের উপর হইতে ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে এবং গ্রামের বিশিষ্ট লোকেরা সেইদিকে ছুটিয়াছে। শীঘ্রই মরণোন্মুখ Heinrich-কে স্ট্রেচারে করিয়া শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গ্রাম্য ধর্মযাজক, স্কুলমাস্টার, নাপিত প্রভৃতি গ্রামবাসীরা তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিল। আর তাহার জীবনের আশা নাই। এমন সময় পরীকন্যার মতো সুন্দরী Rautendelein নামে এক যুবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মন্ত্র পড়িয়া কিছুক্ষণ Heinrich-এর শুশ্রূষা করিলেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া নবজীবন লাভ করিল।

তারপর ঘণ্টানির্মাতা Heinrich স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের উপরে চলিয়া গিয়া Rautendelein-এর আশ্রয়ে কামারশালা স্থাপন করিয়া আবার তাহার মনোমত ঘণ্টা-নির্মাণের চেষ্টায় নিমগ্ন হইল। একদিন ধর্মযাজক তাহার নিকটে গিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রের দুঃখের কথা জানাইল, কিন্তু বাড়ীতে এখন আর তাহাকে মানাইবে না বলিয়া সে ফিরিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু একদিকে তাহার সাধনা, অন্যদিকে Rautendelein-

এর প্রেম—কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইল না। তাহার উদ্দেশ্য সে সিদ্ধ করিতে পারিল না। পাহাড়ের উপরের জলদেবতা, বনদেবতা প্রভৃতি তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইল—তাহারা শত্রুতা করিতে লাগিল। শেষে একদিন সে এক মায়াময় দৃশ্য দেখিল—তাহার দুইটি ছেলে একটা ছোট বাক্স টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে। তাহারা আসিয়া তাহাকে বলিল যে, তাহাদের মা এই বাক্সটা পাঠাইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের মায়ের চোখের জল আছে। তাহার মা ডুবিয়া মরিয়াছে। সেই সময় জলমগ্ন ঘণ্টাটা বাজিয়া উঠিল। Heinrich উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শেষে Rautendeleinকে মায়াবিনী, ডাইনী বলিয়া তাড়াইয়া দিল। অবশেষে পাহাড়ের উপরে গির্জায় আগুন ধরিয়া গেল। আর তাহার প্রতিরোধ করিবার কোনো শক্তি নাই। দুঃখে ও নৈরাশ্যে সেই পাহাড়ের উপরেই সে মারা গেল।

Heinrich শিল্পীর প্রতীক। Rautendelein বিশ্বসৌন্দর্য—প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের প্রেমের সম্মিলিত মূর্তি। এই সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতিই শিল্পীকে চিরন্তন প্রেরণা দেয়। পাহাড়ের উপর ঘণ্টা ঝুলানো অর্থে দেবশিল্পের সমকক্ষ শিল্প রচনা করা।

হাউপট্‌ম্যানের আর একখানি নাটক Henry of Aue। ইহাতে হাউপট্‌ম্যানের বক্তব্য এই যে, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিলে জীবনের সর্ব দুঃখ-বেদনা-লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

রুশ-নাট্যকার আন্দ্রিভের সাংকেতিক নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যে একটা অপরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। রূপক ও সংকেতের সাহায্যে মানবজীবনের সত্যকার রূপ, এই সংসারে মানুষের সুখদুঃখের স্বরূপ, তাহার জীবনের অনিবার্য পরিণাম, অদৃশ্য এক মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অপূর্ব কৌশলের সহিত রূপায়িত হইয়াছে তাঁহার সাংকেতিক নাটকগুলিতে। আন্দ্রিভের সাংকেতিক নাটকে মানুষের মনের গূঢ় ভাব, চিন্তা, কল্পনা ও প্রবৃত্তিকেই ভিত্তি করিয়া তাহাদের সত্যস্বরূপকে দেখাইবার প্রচেষ্টা আছে। হাউপট্‌ম্যানও অনেকাংশে ইহাই করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের নাটকে বাস্তব মানুষেরই আভ্যন্তরিক স্বরূপ আমরা রূপক ও সংকেতের মধ্য হইতে দেখিতে পাই। তাই তাঁহাদের নাটকের পাত্র-পাত্রীগুলি এই বাস্তব নরনারীরই অন্তর্গূঢ় রূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু মেটারলিংক বা ইয়েট্‌সের নাটকের পাত্রপাত্রী একেবারেই নিরবচ্ছিন্ন ভাব বা তত্ত্বের বাহন, তাহাদের রক্ত-মাংসের গন্ধ খুব কম। এই দিক দিয়া আন্দ্রিভের নাটক সার্থক রচনা—এই সংসারের মানুষের জীবনেরই গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে বলিয়া অনেক পরিমাণে আমাদের বাস্তবতৃষ্ণা নিবৃত্তি করে।

আন্দ্রিভের দুইখানা সাংকেতিক নাটক The Life of Man এবং The Black Maskers.

The Life of Man রুশ-সাহিত্যে সর্বপ্রথম সাংকেতিক নাটক। মানুষের সমগ্র জীবনকে এই নাটকের বিষয়বস্তু করা হইয়াছে। মানুষের জন্ম, শিক্ষা, কার্য, দারিদ্র্য-দুঃখ, আনন্দ-উপভোগ, ঐশ্বর্য, কীর্তি, দুর্ভাগ্য, শোক প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অগ্রসর হইতেছে। তাহার কতো দুঃখ, কতো আনন্দ, কতো আশা, কতো আকাঙ্ক্ষা, কতো অন্তর্দ্বন্দ্ব, কতো ভয়-সংশয়, আদর্শের সহিত, পারিপার্শ্বিকের সহিত কতো ভীষণ যুদ্ধ! ইহাই মানুষের জীবন। কিন্তু এই যে মানুষের জীবন, প্রতিনিয়ত এই যে প্রচেষ্টা, এই যে সংগ্রাম, এই যে সুখ-দুঃখ, সাফল্য-নৈরাশ্য—ইহার স্বরূপ কি? ইহার সার্থকতা কি? ইহার অন্তর্নিহিত মূল সত্যটা কি? জীবনের এই যে অপরিহার্য ধারা

ইহার প্রকৃত রহস্য কি? আন্দ্রিভ তাঁহার এই নাটকে ইহার একটা সংকেত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাটকের আখ্যানভাগটি মোটামুটি এইরূপঃ মাতার প্রসব-বেদনা, পিতার চাঞ্চল্য, প্রতিবাসীদের ঔৎসুক্য প্রভৃতির মধ্যে Man-এর জন্ম হইল। তারপর শৈশবেই Man-এর পিতামাতা মারা গেল, আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে মানুষ করিল। তারপর সে নিজের চেষ্টায় ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া শেষ করিল এবং স্থপতি-বিদ্যায় সে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু তাহার ভাগ্য খারাপ। সে অর্থ উপার্জন করিতে পারিল না, কোনো মুরুব্বিও তাহার জুটিল না। সে একজন সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিল। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। তবুও দারিদ্র্য ও অনাহারে তাহাদের জীবন কাটিতে লাগিল। ভগবানের কাছে অর্থের জন্য তাহারা কতো প্রার্থনা করিল, কিন্তু দুঃখ আর তাহাদের ঘুচে না। স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া কতো সুখস্বপ্ন দেখে, কতো জীবন-উপভোগের কল্পনা করে, কিন্তু সুদিন আর তাহাদের আসে না।

তারপর হঠাৎ তাহাদের সুদিন আসিল। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য লাভ করিল; প্রভূত ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাশালী ও যশস্বী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইল। রাজপ্রাসাদের মতো তাহার বাড়ী। সেই বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীতে দেশের গণ্যমান্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিরাট ভোজ দিল। এই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে ধন্য। সকলের মুখে Man-এর প্রশংসা, তাহার ঐশ্বর্য, প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রশংসায় সকলেই মুখর।

তারপর Man-এর ভাগ্যবিপর্যয় আরম্ভ হইল। আবার সে গরীব হইল। ধন-সম্পদ সব উড়িয়া গেল। সেই সুরম্য প্রাসাদ আজ ইঁদুর ও চামচিকার আবাসস্থল। একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা মাত্র আছে। সে বেতন পায় না, কেবল সেই শ্মশানতুল্য প্রাসাদে অন্ধকারে বসিয়া থাকে। Man বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তাহার স্ত্রীও বৃদ্ধা। একমাত্র পুত্র আহত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত। স্বামী ও স্ত্রী পুত্রের জীবনের জন্য ভগবান বা ভাগ্যের কাছে কতো প্রার্থনা করিল! তবুও তাহাদের ছেলে মারা গেল।

তারপর Man ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যু। Man-এর মৃত্যুশয্যায় উত্তরাধিকারিগণের ভিড় ও আনন্দ তাহার মৃত্যুকে আরো নিকটবর্তী করিল।

এই নাটকের পাঁচটি দৃশ্যে Manএর জীবনের এই অবস্থাগুলি বর্ণিত। সাংকেতিকতার মূলসূত্রটি নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান আছে। সেটি এই—একটি ধূসর বর্ণের পোশাক-পরিহিত, পাথরে-খোদাই-করা মূর্তির মতো এক ব্যক্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের একধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটা প্রজ্বলিত মোমবাতি। এই মোমবাতিটি মানুষের আয়ুষ্কালের প্রতীক। তাহার সম্মুখেই নাটকের ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, সে নির্বাক দর্শক। Man তাহাকে কোনো সময় উত্তেজিত অবস্থায় কিছু বলিতেছে, কখনো আনন্দজ্ঞাপন করিতেছে, কখনো অভিসম্পাত করিতেছে,—কিন্তু সে নির্বিকার। মৃত্যু পর্যন্ত সে উপস্থিত। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাতের মোমবাতিটি নিবিয়া গেল। তখন সেই মূর্তিটি চীৎকার করিয়া বলিল, 'Silence, Man is dead'। নাটকও শেষ হইল।

জীবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের স্বরূপ এই যে, তাহার নিজের জীবনকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করিয়া সফল করিবার কর্তৃত্ব তাহার নাই। সে জানে না, পরবর্তী মুহূর্তে

তাহার কি হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, জয়-পরাজয় লইয়া এক অদৃশ্য নিয়তির হাতে সে আত্মসমর্পণ করিতেছে। এই শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া সর্বদা তাহার সঙ্গে আছে। সেই অদৃশ্য শক্তিকে Man বলিয়াছে—God, or Fate, or the Devil। সে নিজে জানে না এ শক্তি কে। নাটকের আরম্ভেই The Being in Grey-র মুখে মানুষের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে। দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া The Being in Grey বলিতেছে,—

Lo, there will pass before you all the life of Man, with its dark beginning and its dark end. Hitherto non-existent, mysteriously hidden in infinite time, without thought or feeling, utterly unknown, he will mysteriously break through the barriers of non-existence and with a cry will announce the beginning of his brief life. In the night of non-existence will blaze up a candle, lighted by an unseen hand. This is the life of man. Behold its flame. It is the life of man.

After birth he will take on the image and the name of man, and in all respects he will be like other people who already live on the earth, and their cruel fate will be his fate, and his cruel fate will be the fate of all people. Irresistibly dragged on by time, he will tread inevitably all the steps of human life, upward to its climax and downward to its end. Limited in vision, he will not see the step to which his unsure foot is already raising him. Limited in knowledge, he will never know what the coming day or hour or moment is bringing to him. And in his blind ignorance, worn by apprehension, harassed by hopes and fears, he will complete submissively the iron round of destiny.

Behold him, a happy youth. See how brightly the candle burns.

Lo, he is a happy husband and father.

Lo, now he is an old man, feeble and sick. The path of life has been trodden to its end and now the dark abyss has taken its place, but he still presses with tottering foot. The livid flame, bending toward the earth, flutters feebly, trembles and sinks, and quietly goes out.

Thus Man will die. Coming from the night he will return to the night. Bereft of thought, bereft of feeling, unknown to all, he will perish utterly, vanishing without trace into infinity. And I, whom men call He, will be the faithful companion of Man throughout all the days of his life and in all his pathways. Unseen by Man and his companions, I shall unfailingly be near him both in his waking and in his sleeping hours ; when he prays

and when he curses; in hours of joy when his free and bold spirit soars high; in hours of depression and sorrow when his weary soul is overshadowed by deathlike gloom and the blood in the heart is chilled; in hours of victory and defeat; in the hours of heroic struggle with the inevitable I shall be with him—I shall be with him.

আন্দ্রিভ নিয়তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষকে নিষ্ক্রিয়, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, স্বপ্নালু করিয়া চিত্রিত করেন নাই। মানুষ সংগ্রামশীল, সে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া উন্নতিও করিতেছে, কিন্তু তাহার জীবনের চরম রূপ আছে নিয়তির হাতে। তাহার উত্থানেও সে যেমন সচেষ্ট, তাহার পতন নিবারণ করিতে, দুঃখ-দুর্ঘটনার আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেও সে তেমনিই সচেষ্ট। তবুও তাহার জীবনে যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটিবেই, ভবিষ্যতের উপর তাহার কোনো হাত নাই। সৌভাগ্য যেমন আসে, দুর্ভাগ্যও তেমনি আসে। কোনোটাই তাহার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার অধীন নয়।

যখন দুঃখ ও দারিদ্র্যে Man নিষ্পেষিত, তখন তাহার দৃঢ় সংকল্প, অক্লান্ত চেষ্টা ও আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস তাহাকে দেহমনে অসীম শক্তিশালী করিয়াছে। সে এই অবস্থাকে অতিক্রম করিবেই। তাই The Being in Greyকে সে বলিতেছে,—

Ho, you, whatever your name be—Destiny, the Devil, Life—I throw down the gauntlet to you. I challenge you to battle. The faint-hearted bend their knees before your mysterious power. Your stony face fills them with horror......But I am bold and strong, and I challenge you to battle..... To your inertness, sinister being, I oppose my bold living strength. To your gloom I oppose my clear and ringing laughter......If I conquer, I shall sing songs which all the world will echo; and if I fall dumbly under your blows, then I shall think only of how I may rise again and rush to battle. There are weak spots in my armour, I know, but, though covered with wounds and dripping with crimson blood, I shall yet gather strength to cry : You have not yet conquered, malicious enemy of mankind!

And dying on the field of battle as brave men do, I shall mar your brute pleasure with one last cry : 'I have conquered!' I have conquered, malicious foe, for with my last breath I shall refuse to acknowledge your supremacy. (Act II)

তারপর নিঃস্ব, বৃদ্ধ Man ও তাহার স্ত্রীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশয্যায় ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াও যখন তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিল না, তখন Man এই অজানিত শক্তির উদ্দেশে বলিতেছে,—

I know not who you are, God, theDevil, Fate or Life, but I curse you! I curse all that you have given me! I curse the

day on which I was born ! I curse the day on which I shall die ! I curse my whole life, my joys and my grief ! I curse myself ! I curse my eyes, my ears, my tongue ! I curse my heart, my head ! And I hurl all back into your cruel face, senseless Fate ! Be accursed, be accursed for ever ! Through my curse I rise victorious above you. What more can you do with me ? Hurl me upon the ground; yes, hurl me down ! I shall only laugh and cry out : 'Be accursed !'......over the head of the woman you have offended, over the body of the boy whom you have killed, I hurl upon you the curse of Man. (Act IV)

সমস্ত মানবজাতির পক্ষ হইতে Man এই অনিবার্যশক্তি নিয়তিকে অভিসম্পাত দিতেছে। এ অভিসম্পাত কিন্তু দুর্বল, ভীরুর অভিসম্পাত নয়, ইহা কর্মী, সংগ্রামশীল মানবের ন্যায়বিচার না পাওয়ার জন্য অভিসম্পাত। এই দুর্জ্ঞেয় নিয়ন্ত্রণকারীর বিধান সকল ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের ঊর্ধ্বে এক নির্মম, অপরিবর্তনীয়, অবিচলিত নির্দেশ।

আন্দ্রিভের আর একটি নাটক The Black Maskers। ইহাও মানুষের অন্তর্জীবনের রূপায়ণ। মানুষের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি, অনেক নিরুদ্ধ আবেগ, বুদ্ধি ও চিন্তার বিভিন্ন ধারার সম্মিলিত ফল তাহার মনোজীবন—তাহার অন্তর্জীবন। মনের এই জটিল স্বরূপকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক অন্ধকারময় জঘন্য অংশ আছে, যাহা মানুষ বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে না। এইসব ভাব-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের গোপন তলে সঞ্চরণ করে। মানুষের বাহিরের প্রকাশের মধ্যে অনেক সময় তাহার অন্তরের যথার্থ স্বরূপকে ধরা যায় না। মানুষ তাই দুইটি জীবন যাপন করে। বাহিরের জীবনে যাহা তাহার প্রকাশ, অনেক সময় তাহার বিরুদ্ধ ভাব-চিন্তা সে মনোজীবনে পোষণ করে। তাই মানুষের দুইটি সত্তা—একটি আসল আর একটি নকল। সে যেন মুখোশ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সে প্রকৃত যাহা, তাহা সে ঢাকিয়া রাখে। সংসারে সকল মানুষই এই মুখোশ পরিয়া নিজেকে প্রতারণা করে, জগৎকে প্রতারণা করে। এই মুখোশের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেই দেখা যায়, এক মানুষের মধ্যে দুইটি মানুষ আছে—বাহিরে যে মানুষকে দেখা যায়, আসল মানুষ সে নয়। ইহাই আন্দ্রিভের The Black Maskers-এর অন্তর্নিহিত ভাব।

Duke Lorenzo ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাশালী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাহার অন্তর্জীবনই এই নাটকের বিষয়বস্তু। তাহার মনের অন্ধকারময়, ঘৃণ্য অংশই, তাহার জঘন্য প্রবৃত্তিই Black Maskers-এর রূপ ধরিয়া তাহার নিকট প্রতারিত হইয়াছে। Lorenzo তাহার প্রাসাদে মুখোশ-অভিনয়ের জন্য মুখোশ-পরা অভিনেতাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অভিনেতারা যে-সমস্ত কথা বলিতে লাগিল, যে-কাজ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার মনের সমস্ত নিগূঢ় ভাব-চিন্তা, প্রবৃত্তি-আবেগ সবই যেন রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার জীবনের মিথ্যার রূপ সে দেখিতে পাইল। সেই মুখোশ-উৎসবে সে তাহার এক স্ত্রীর স্থলে তিনটি স্ত্রী দেখিল, তাহার দ্বিতীয় সত্তা তাহারই রূপ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে কে হত্যা করিল, জঘন্য প্রবৃত্তিগুলি Black Maskers-এর রূপ ধরিয়া অনাহূত অবস্থায় সেই সভায় আসিয়া আলোগুলি নিভাইতে চেষ্টা করিল। তাহার জন্ম সম্বন্ধে সে কানাঘুষা শুনিয়াছিল যে, সে তাহার

পিতার সন্তান নয়, তাহার পিতার ঘোড়ার সহিসের সন্তান, Black Maskersদের আগমনে সেই সন্দেহে তাহার ঘনীভূত হইল। সে পাগল হইয়া গেল। তাহার বিদূষক Ecco তাহার প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দিল। Lorenzo তাহার দ্বিতীয় সত্তাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার আত্মার জঘন্য অংশকে ধ্বংস করিয়াছে, নিজের জীবনের যথার্থ পরিচয় পাইয়াছে, এখন সে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। তাহার নির্দোষ আত্ম-সত্তার কাছে ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। তাই যখন আগুন চারিদিকে সমস্ত ভস্মীভূত করিতেছে, তখন উন্মত্ত Lorenzo বলিতেছে,—

> He whom I have invited to my festival and who now deigns to appear—uncover, gentlemen—is the Lord God, the ruler of heaven and earth. On your knees, knights and ladies.
>
> (Act II, Scene V).

তারপর যখন তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে আত্মরক্ষার জন্য হল ছাড়িয়া পালাইল, তখন শেষ মুহূর্তে Lorenzo বলিতেছে,—

> Up, Ecco, The Lord is coming. [*He touches Ecco, but the jester falls lifeless from him. The flames now completely surround them. The Black Maskers have disappeared. The crackling and roaring of the triumphant fire is heard. Solemnly*]
>
> I greet thee, O Lord.........Do thou love me, O Lord...... Lorenzo, Duke of Spadaro, has no serpent in his heart.
>
> (Act II, Scene V).

এতদূর পর্যন্ত আলোচনায় আমরা প্রকৃত নাটক কাহাকে বলে দেখিয়াছি, সব দেশে নাটকের ক্রম-বিবর্তনও লক্ষ্য করিয়াছি, এবং রূপক ও সাংকেতিক নাট্যসাহিত্যের স্বরূপ ও বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপক ও সাংকেতিক নাটক কয়খানির তত্ত্ব ও শিল্পকৌশল সম্বন্ধেও কিছু ধারণা করা গিয়াছে, এখন এই আলোচনার পটভূমিকায় রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক পরিচয় সংক্ষেপে এইটুকুই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি বা গীতিকবি এবং তাঁহার প্রতিভার স্বরূপই হইতেছে লিরিক্যাল বা গীতিধর্মী। আত্মভাবমূলক গীতিকবিতা বা গান তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বিকাশস্থল। তাঁহার কবি-মানস একান্তভাবে স্বতন্ত্রধর্মী। একটা নিবিড় subjectivity বা মন্ময়তাই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতির দর্পণে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছেন। বস্তুজগৎ তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনার বিচিত্রবর্ণে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার একান্ত মনোজগতের জিনিস হইয়া গিয়াছে। গীতিধর্মী প্রতিভার রহস্যই এই যে, যাহাকেই উহা সাহিত্যের বিষয়ীভূত করে, তাহাকেই মনোরাজ্যের বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করে এবং যে সুর সেই মনোরাজ্যে বাজে, সেই সুরেই তাহাকে ঝংকৃত করে। সাহিত্যিক জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়, তাঁহার সন্ধানপর দৃষ্টি বস্তুর মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, বাহ্যরূপের অন্তরাল ভেদ করিয়া ভাব, আদর্শ বা তত্ত্বের একটা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমি কামনা করিয়াছে। একটা বিশিষ্ট অনুভূতি, সংস্কার, ধারণা, ভাব, চিন্তা, তত্ত্ব বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত মনের দ্বারে যখন বাহিরের বস্তু বা ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের গায়ে

সেই মনের রঙ লাগিয়া যায়, তাহাদের নিজস্ব সত্তা অবিকৃত থাকে না। রবীন্দ্রনাথের এই একান্ত আত্মভাব-কল্পনা-প্রধান গীতিধর্মী কবি-মানস তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

এই একই কবিমানসের প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার কাব্যে, গানে, নাটকে। ছোটগল্পের শিল্পে বাস্তবকে ভিত্তি করা হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পে দেখি ক্ষুদ্র, সামান্য, তুচ্ছ বস্তু অসামান্যের গৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ঘটনার মধ্য হইতে একটা অন্তর্নিহিত সুর যেন রাগিণীর আলাপের মতো সমস্ত গল্পটিকে ঘিরিয়া ধ্বনিত হইতেছে। সেই সুরটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মনের সুর—তাঁহার ভাবানুভূতির সুর। কাব্যেও দেখি, যেখানে কেবল ভাবের লীলা-বিলাস, সেখানে তাঁহার প্রতিভা চমকপ্রদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর যেখানে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কারবার, সেইখানেই তাঁহার চরম সাফল্য।

এইরূপ প্রতিভা নাটকে খুব বেশি সাফল্য লাভ করিতে পারে না, কারণ নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে বস্তুময়তার উপরে—দৃষ্টরূপের যথাযথ প্রকাশের উপর। ইহাদের হাতে নাটক হয় নিজস্ব অনুভূতি, কল্পনা ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের লীলাক্ষেত্র বা কোনো ভাব, অনুভূত সত্য বা তত্ত্বের বাহন। ইহার প্রাণটা হয় গীতিকাব্যের কিংবা সংকেত বা রূপকের, আর দেহটা হয় নাটকের। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও নাটকে আমরা তাই দেখি, তাঁহার নাটক গীতিকাব্য হইতে স্বতন্ত্র নয় এবং অনেক নাটক কেবল কোনো ভাবানুভূতি বা তত্ত্বের বাহনমাত্র।

এই ভাবধর্মী ও গীতিধর্মী কবিমানস যখন নাটকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন অনেকটা বাস্তবতার দাবী এড়াইয়া তাঁহার নাটক এক কাব্যসমৃদ্ধ ও ভাবসমৃদ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছে। সুসংবদ্ধ আখ্যানভাগ বর্তমান থাকিলেও কাব্য এবং অন্তরালবর্তী ভাবের ইঙ্গিতটা সহজে অনুভবগম্য হইয়াছে। কাব্য ও তত্ত্বের মূর্তিই তাঁহার নাটকের বিশিষ্ট মূর্তি।

এইরূপ প্রতিভার উপযুক্ত বিকাশক্ষেত্র সংগীত, কারণ কবিমনের সূক্ষ্ম অনুভাবগুলি সংগীতের মাধ্যমে একটা অনির্বচনীয় রসে প্রকাশ পায়, তাই সংগীত তাঁহার নাটকে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা একমাত্র সংগীতকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র মতো গীতসর্বস্ব নাটক বাংলা-সাহিত্যে বিরল; ইহা তাঁহার সংগীত-প্রাণ প্রতিভার নূতন সৃষ্টি।

কবি প্রথমে পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে নাটক লিখিতে অগ্রসর হন। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' এবং 'মালিনী'তেও কবি স্থূল, দ্বন্দ্বসংঘাতময় সুবিন্যস্ত আখ্যানভাগ গ্রহণ করিলেও ইহার বাহিরের বিরোধ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের একটা ভাব বা তত্ত্বের উত্থান-পতন ও পরিণতির ধারা সুস্পষ্টরূপে আমাদের চোখে পড়ে। 'রাজা ও রানী'র মধ্যে দেখি, প্রেমকে সংকীর্ণ ভোগের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র লালসাতৃপ্তির উপায়স্বরূপ মনে করিলে প্রেম হয় জ্বালাময়, অতৃপ্তিকর ও নানা অনিষ্টের মূল। বিক্রমদেবের জীবনে এই ভোগাকাঙ্ক্ষামূলক প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগ প্রতিহত হওয়ায় প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়া তাঁহার জীবনে দারুণ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই প্রেমের প্রতি কবির সুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গী। 'ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নহে যে মানব', 'হৃদয়ের ধন কভু ধরা দেয় দেহে?' এই ভাবধর্মী, শান্ত, সংযত, দেহাতীত, বিশুদ্ধ

আনন্দরসসম্ভোগমূলক প্রেমই রবীন্দ্রনাথের প্রেম, এই প্রেমই মানসীর যুগে নানা অনবদ্য লিরিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিসর্জনের মধ্যে দেখি যুক্তিহীন শাস্ত্রাচার ও চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে চিরন্তন মানবধর্মের সংঘর্ষ; ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ শাস্ত্রধর্মের সহিত বিশ্বধর্মের দ্বন্দ্ব—পুঁথির বিধানের সহিত প্রেমের বিধানের বিরোধ। এই দ্বন্দ্বে পরাজিত বিপুল শক্তিশালী রঘুপতির জীবনের ট্র্যাজেডিই এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। 'মালিনী'তেও এই দ্বন্দ্বই রূপায়িত।

তারপর, কবি-প্রতিভার ইন্দ্রজালময় কাব্যৈশ্বর্যের অপূর্ব নিদর্শন যে কাব্যনাট্যগুলি, তাহাতেও দেখি মূলদ্বন্দ্বটি ভাবের দ্বন্দ্ব। চিত্রাঙ্গদায় দেখা যায়, দেহের সৌন্দর্যের সহিত হৃদয়ের সৌন্দর্য, রূপজ মোহের সহিত সত্যকার প্রেমের, প্রণয়িনীর সঙ্গে কল্যাণী গৃহিণীর, উর্বশীর সহিত লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানই এই কাব্যনাট্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'বিদায়-অভিশাপে' আত্মবিলোপ কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব। 'কাহিনী'-কাব্যের অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'সতী', 'নরকবাস' প্রভৃতি কাব্যনাট্যে ধর্মের বিভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব রূপায়িত। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ সমাজ-ধর্ম, বা লৌকিক ধর্ম বা ব্যবহারিক ধর্মের সহিত নিত্য-সত্য মানবধর্মের বিরোধ এইসব কাব্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীর চিন্তায় ও কর্মে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সংকেত-পর্বযুগের নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যে ভাবের রূপায়ণে কবি একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যানভাগকে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ভাবজীবনের ক্রমপরিণতিতে কবি এমন এক অতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভবের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন যে, সুনির্দিষ্ট, বাস্তবরসগন্ধী আখ্যানভাগ পরিত্যাগ হইল। অরূপ, অসীমের যে লীলাচঞ্চল অনুভূতি, বিশ্বাত্মার সহিত মানবাত্মার যে নিগূঢ় রস-লীলা, যে বিচিত্র সম্বন্ধের যোগ, সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার যে স্বরূপ, তাহা কোনো সুসংবদ্ধ আখ্যান-ভাগের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া একটা স্থির রূপে দেখানো যায় না, তাই কবি এই সূক্ষ্ম ভাবকে শিল্পসম্মতরূপে সুন্দর করিয়া অনুভবগম্য করিবার জন্য রূপক-সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ নাটকের পথ ছাড়িয়া তিনি তাঁহার নিগূঢ় ভাব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির একটা রসরূপ দিবার জন্য এই নূতন শিল্পরীতি অবলম্বন করিয়াছেন। 'শারদোৎসব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়া 'তাসের দেশ' পর্যন্ত এই রূপক-সাংকেতিক নাট্যশিল্পরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাংলার নাট্যসাহিত্যে ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক পরিবেশমূলক কয়েকখানি নাটক-নাটিকা আছে। 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পরিত্রাণ', 'গৃহপ্রবেশ', 'শোধবোধ', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'বাঁশরী', 'মুক্তির উপায়', এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই তাঁহার কোনো উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতার নাট্যরূপ। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটকের বিষয়বস্তু 'বৌঠাকুরানীর হাট' হইতে গৃহীত; 'শেষের রাত্রি' গল্প 'গৃহপ্রবেশ'-এ, 'কর্মফল' গল্প 'শোধবোধ'-এ নাট্য-রূপায়িত; 'নটীর পূজা'র মূল 'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিণী' কবিতা; 'মুক্তির উপায়' ঐ নামের গল্পের রূপান্তর; 'চণ্ডালিকা'র কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বৌদ্ধসাহিত্য হইতে লওয়া। এই পর্যায়ের নাটকের মধ্যে 'বাঁশরী' কবির মৌলিক সৃষ্টি। এই শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে তত্ত্বের প্রভাব কম, কিন্তু ইহারা একেবারে মুক্ত নয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ'-এর মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটি কবির নূতন সৃষ্টি, ইহার স্থান রূপকসাংকেতিক নাটকের আসরে হইলেই মানাইত

ভালো, কারণ ইহার চরিত্রের অভিব্যক্তিতে একটা ভাবেরই রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ধনঞ্জয়-চরিত্র কবির বিশিষ্ট টাইপ-চরিত্র ঠাকুরদাদা-দাদাঠাকুর-এর একটা ভিন্ন রূপ মাত্র। 'চণ্ডালিকা'র মধ্যেও আয়না প্রভৃতির অবতারণায় ভাবের একটা সংকেত দেওয়া হইয়াছে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির সঙ্গে সন্ন্যাসের আদর্শের দ্বন্দ্ব কবি প্রত্যক্ষ-ভাবে মানুষের মধ্য দিয়া রূপায়িত না করিয়া আনন্দের মানসিক অবস্থা পরোক্ষভাবে একটা আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত করাইয়া দেখাইয়াছেন। 'বাঁশরী'র পটভূমি উচ্চ মধ্যবিত্ত ইঙ্গ-বঙ্গ নাগরিক সমাজ। কিন্তু ইহার মধ্যে নরনারীর স্বাভাবিক বাস্তবমূল চিত্তদ্বন্দ্বের অভাব লক্ষ্য করা যায়। বেশ বুঝা যায় কবির প্রেম ও বিরহ সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ভাবাদর্শ বা জীবন-দর্শন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা 'শেষের কবিতা'রই আর একটা দিক। ভাব বা তত্ত্বই ইহার মূল উপজীব্য মনে হয়। তাহাই পাত্রপাত্রীর চমকপ্রদ ভাষণের মাধ্যমে অভিনব গদ্যকাব্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। নাটকীয় গুণ ইহাতে কম। 'চতুরঙ্গ' বা 'শেষের কবিতা'র মতো ইহাকে প্রচ্ছন্নতত্ত্বমূলক চরিত্রাশ্রয়ী গদ্যকাব্য বলা যায়।

কবির আর এক পর্যায়ের কয়েকখানি প্রহসন ও রঙ্গ-নাটিকা দেখা যায়। 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' এই শ্রেণীভুক্ত। কৌতুকই ইহাদের উপজীব্য। বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাগ্‌ভঙ্গী, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্নিগ্ধ-মধুর দীপ্তি, অনাবিল হাস্যরস, কৌতুকাবহ ভ্রান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব প্রভৃতিতে এগুলি বিশেষ উপভোগ্য। বাক্‌চাতুর্যে যে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়, সেই রসসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সমানধর্মা বাংলা সাহিত্যে আর কেহ নাই।

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রতিভার আর একটি রূপ কতকগুলি নাটকাকারে গ্রথিত গদ্য-পদ্য-গীতসংবলিত রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। সেগুলি ঋতু-আশ্রয়ী ও সংগীতপ্রাণ। এগুলি মূলত ঋতু-উৎসবের নাটক। 'শেষবর্ষণ', 'বসন্ত', 'নবীন', 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা', 'শ্রাবণ-গাথা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর। ইহাতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অভিনেতা। মানুষ ইহার দ্রষ্টা, ভাব-রস-ব্যাখ্যাতা ও ঘটনাবিবৃতিকারক। প্রকৃতি-প্রতিনিধিরা গানে ও নৃত্যে অভিনয় করিয়া মূলভাবের রসরূপ পরিস্ফুট করিতেছে।

তারপর কবি শেষজীবনের গানের সহিত নৃত্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'নটীর পূজা', 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যগুলি কবির এক অপরূপ সৃষ্টি। নৃত্যই এখানে ভাবের প্রধান বাহন। ইহার সহিত গান যুক্ত করিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাবকে অনির্বচনীয় রসে উদ্ভাসিত করা হইয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'নটীর পূজা' নাটকাকারে আছে, 'শ্যামা' 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' কবিতা ও 'শাপমোচন' 'পুনশ্চ'-র ঐনামের কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ। এই সব নাটক ও কবিতার মূল ভাব-দ্বন্দ্বটি নৃত্যগীতের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যমানসলোকের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, ইহার আরম্ভ হইয়াছে গীতিনাট্যে। তখন উদ্দেশ্য ছিল, ঘটনার প্রবাহে পাত্র-পাত্রীর মনে যে আবেগ উপস্থিত হয়, সেই বিভিন্ন প্রকারের আবেগ বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করা। সেই গীতিনাট্যে কোনো সজ্ঞান তত্ত্ব বা আইডিয়া প্রকাশের চেষ্টা ছিল না। তারপর, রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডিতে যখন একটা বহির্মুখ, বাস্তব আখ্যানভাগকে অবলম্বন করিয়া ঘটনাসংকুল দীর্ঘ নাটক লিখিয়াছেন, তখন দেখা গিয়াছে, পাত্রপাত্রীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মূলত একটা বিশিষ্ট আদর্শ ও ভাবের দ্বন্দ্ব, ঘটনাবহুল আখ্যানের পিছনে সেই

ভাববস্তুটি উঁকি মারিতেছে। কাব্যনাট্যেও সেই ভাব ও আদর্শের দ্বন্দ্বই দেখি। তারপর কবি বাস্তবপন্থী আখ্যানভার ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিগূঢ় ভাব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রকাশের জন্য রূপক-সাংকেতিকার আশ্রয় লইয়াছেন। মাঝে মাঝে যে কবি সমাজপরিবেশ-মূলক কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছেন বা কৌতুকনাট্য রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ করে না। সংগীতেই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই শেষের দিকে সংগীতকেই ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন করিয়াছেন। ঋতুনাট্যগুলিতে তাই একটা মূলভাব ও তত্ত্ব সংগীতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তারপর আরো অগ্রসর হইয়া কবি সংগীতের সঙ্গে নৃত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের সম্মেলনে অতি সূক্ষ্ম-ভাবকে অভিনব রূপে ও রসে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। নৃত্যনাট্যগুলি আসিয়াছে শেষ পর্যায়ে। শেষবয়সে নটরাজ শিবের কল্পনা কবিমানসকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কবি নটরাজেরই লীলানৃত্য দেখিয়াছেন, সেই নৃত্যের গভীর উপলব্ধির রসে মন আনন্দ-নৃত্যে মাতিয়াছে। নৃত্যের মধ্য দিয়াই কবি তাঁহার সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

এই আমরা এই বিভিন্ন পর্যায়ের নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব।

আলোচনার সুবিধার জন্য নাটকের প্রকৃতি-অনুসারে সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। প্রকাশ-সময়ের পারম্পর্য অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির ঐক্য শ্রেণীবিভাগে সহায়তা করে বলিয়া মনে হয়। তাহাতেই এক এক শ্রেণীর নাটকের রূপবস্তু ও রসবস্তু সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইয়া উঠা সম্ভব হয়।—

(১)

গীতিনাট্য (সংগীতপ্রধান)

১। বাল্মীকি-প্রতিভা
(কালমৃগয়া)
২। মায়ার খেলা
(নলিনী)

(২)

কাব্যনাট্য (কাব্যপ্রধান)

১। চিত্রাঙ্গদা
২। বিদায়-অভিশাপ
৩। গান্ধারীর আবেদন
৪। সতী
৫। নরকবাস
৬। কর্ণকুন্তীসংবাদ
৭। লক্ষ্মীর পরীক্ষা

(৩)

রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি (কাব্য ও নাটকের সমন্বয়)

১। রাজা ও রানী
(তপতী)
২। বিসর্জন
৩। মালিনী

(৪)

রূপক-সাংকেতিক নাটক (ভাব বা তত্ত্বপ্রধান)

১। প্রকৃতির প্রতিশোধ
২। শারদোৎসব
(ঋণশোধ)
৩। রাজা
(অরূপ-রতন)
৪। অচলায়তন
(গুরু)
৫। ডাকঘর
৬। ফাল্গুনী
৭। মুক্তধারা
৮। রক্তকরবী
৯। কালের যাত্রা
১০। তাসের দেশ

(৫)

সামাজিক নাটক (সামাজিক পরিবেশমূলক)

১। প্রায়শ্চিত্ত
(পরিত্রাণ)
২। গৃহপ্রবেশ
৩। শোধবোধ
৪। নটীর পূজা
৫। চণ্ডালিকা
৬। বাঁশরী
৭। মুক্তির উপায়

(৬)

কৌতুকনাট্য (কৌতুকপ্রধান)

১। গোড়ায় গলদ
২। বৈকুণ্ঠের খাতা

৩। চিরকুমারসভা
৪। হাস্যকৌতুক
৫। ব্যঙ্গকৌতুক

(৭)

ঋতুনাট্য (ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান)

১। শেষবর্ষণ
২। বসন্ত
৩। নবীন
৪। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা
৫। শ্রাবণগাথা

(৮)

নৃত্যনাট্য (নৃত্যপ্রধান)

১। চিত্রাঙ্গদা
২। চণ্ডালিকা
৩। শ্যামা
৪। নটীর পূজা
৫। শাপমোচন

১

গীতিনাট্য

বাল্মীকি-প্রতিভা

(কালমৃগয়া)

বাল্মীকি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্নিবেশ দ্বারা ইহাকে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে পাত্র-পাত্রীর মুখে কোনো গদ্য বা পদ্য-সংলাপ যোজনা করা হয় নাই, উহাদের বক্তব্য কেবল নানা সুরের গানকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তুটা কেবল সুরের মাধ্যমেই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা নানান সুরের ফুল দিয়া গাঁথা একখানা সুদীর্ঘ সুরের মালা। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,—

"বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই. ইহার নাট্যবিষয়টা সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ-২০২)

এইপ্রকার সুরের দ্বারা নাটকের কথাবস্তু-অভিনয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ হার্বার্ট স্পেনসরের একটা প্রবন্ধ হইতে পান।

> "হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়, আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন? আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান-সংগত রীতিমতো সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ—ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই—একটা লয়ের মাত্রা আছে,—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ-২০৩-৪; স্পেন্সারের The Origin

and Function of Music, 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধ [রবীন্দ্রনাথ], ভারতী ১২৮৮, আষাঢ় দ্রষ্টব্য)

প্রথমবারের বিলাত-যাত্রার পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় বিদেশী সুরের সঙ্গে পরিচিত হইতেছিলেন। যৌবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাইয়া বিলাতী গানের ও সুরের চর্চা করিতেন। পিয়ানো বাজাইয়া নূতন নূতন সুরসৃষ্টি করা ছিল তাঁহার অন্যতম শখের কাজ। কিন্তু সুরে তিনি উপযুক্ত কথা সংযোগ করিতে পারিতেন না। কথা-রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িত। রবীন্দ্রনাথ এই গান-রচনার ভার লইয়াছিলেন। 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নূতন নূতন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন, "সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।" তারপর বিলাতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কবি মূরের 'আইরিশ মেলডিজ'-এর গান শিখিলেন ও অন্যান্য বিলাতী গানও শিখিলেন। দেশে ফিরিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-রচনার সময় কবি দেশী ও এই বিলাতী সুরের সাহায্য লইয়াছেন।

"এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধন-মোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি গান ভাঙা—অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো—এবং গুটিতিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ-২০১-২)

বাল্মীকি-প্রতিভার আখ্যানভাগ এইরূপ : কবি বাল্মীকি পূর্বে রত্নাকর নামে দস্যুসর্দার ছিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতেন এবং বনমধ্যে রাত্রিকালে কালীপূজা করিয়া নরবলি দিতেন। একদিন তাঁহার অনুচরেরা বলির জন্য এক বালিকাকে ধরিয়া লইয়া আসিল। রত্নাকর পূজা শেষ করিয়া তাহাকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ রত্নাকরের মনে একটা দারুন পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। বালিকার করুণ রোদনে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি অনুচরগণকে বালিকার বন্ধন খুলিয়া মুক্তি দিতে আদেশ দিলেন। তারপর রত্নাকর দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেবল শূন্যমনে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একদিন এক ব্যাধকে ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে তীক্ষ্নবাণে ভূপাতিত করিতে দেখিলেন। তখন এই শ্লোকটি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল,—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

বাল্মীকি কবিত্ব-শক্তি লাভ করিলেন, তাঁহার হৃদয় এক অলৌকিক আনন্দে পূর্ণ হইল। তখন লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন, কিন্তু বাল্মীকি ধন-মান কিছুই চাহেন না, বলিলেন,—

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না, এস না, এস না এ দীন-জন-কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর,—
আর কিছু চাহি না, চাহি না।

তখন সরস্বতী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাল্মীকি পরম আহ্লাদিত,—

এই যে হেরি গো দেবী আমারি!
এবে কবিতাময় জগৎ চরাচর
সব শোভাময় নেহারি।

সরস্বতী বলিলেন যে, তিনি পূর্বে দীনা বালিকার বেশে বাল্মীকিকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন,—বাল্মীকির দয়া দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন সরস্বতী বাল্মীকিকে বর দিলেন,—

আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারিদিকে দিক্‌বধূ আকুল নয়ন জলে।...
... ...
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।...
... ...
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার!
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

বাল্মীকি-প্রতিভার মূল আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল রামায়ণের সহিত ইহার কোনো মিল নাই। বাল্মীকি পূর্বে দস্যু রত্নাকর ছিলেন, পরে ব্রহ্মার নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া ষাট হাজার বৎসর একস্থানে বসিয়া রামনাম জপ করাতে তাঁহার চারিদিকে উঁইএর ঢিবি সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাকে বাল্মীকি নাম দিলেন।

ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হইতে তব নাম বাল্মীকি হইল।
বল্মীকেতে ছিলা যেই তেঁই এ বিধান।
সাতসাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ॥
সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ॥

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড)

বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদামঙ্গল'-এর প্রভাব বাল্মীকি-প্রতিভার উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ক্রৌঞ্চবধের চিত্রখানি রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

'সারদামঙ্গল'-এর দু-একটি কবিতাও রূপান্তরিত হইয়া গানরূপে রবীন্দ্রনাথের এই গীতি-নাট্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বাল্মীকির হাতে সরস্বতীর বীণাদান—এই কল্পনার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে রক্ষিত কবি ম্যুরের 'আইরিশ মেলডিজ' গ্রন্থের উপর একখানি বীণার চিত্র।

"আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডিজ ছিল।............ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ২০০)

বিদ্বজ্জনসমাগম-সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্যরসিক ও মনীষী দর্শকদের সম্মুখে বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম অভিনীত হয় (১২৮৭ সাল, ফাল্গুন ১৬; ১৮৮১, ফেব্রুয়ারী ২৬, শনিবার)। ঐ সময়ে উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র নাটিকার সংগীত-অভিনয় সেদিনের বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীকে যে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহারা যে এক নূতন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রশংসাসূচক গানরচনায় বুঝা যায়। এই অভিনয় দেখিয়া আসিয়া তিনি এই গানটি রচনা করেন,—

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।

(রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আহূত টাউন হলের সংবর্ধনা-সভায় গুরুদাসবাবু এটি পাঠ করিয়া সকলকে শুনান।)

বাল্মীকি-প্রতিভার 'নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া' রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া' নামে আর একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। উহার নাট্যবিষয় রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধ। ইহাও বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষ্যে অভিনয়ার্থ রচিত হয় এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তেতলার ছাদে স্টেজ বাঁধিয়া ইহার অভিনয় হয়। (১২৮৯, পৌষ ৯; ১৮৮২, ডিসেম্বর ২৩, শনিবার)

তারপর বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা ও 'কালমৃগয়া'কে ভাঙিয়া বাল্মীকি-প্রতিভার নব রূপ দান করিলেন। বনদেবী-অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম সংস্করণে ছিল না, ঐ অংশগুলি 'কালমৃগয়া' হইতে গ্রহণ করা হইল। "কালমৃগয়া হইতে দশটি গান কোনোটি বিশুদ্ধ আকারে, কোনোটি কিছু পরিবর্তন করিয়া গৃহীত হইল। কালমৃগয়ার শিকারীদের প্রতি দশরথের আদেশ 'গহনে গহনে যা রে তোরা" গানটিকে বাল্মীকি-প্রতিভায় দস্যুসর্দার রত্নাকরের মুখে বসাইয়া দিলেন। কাল-মৃগয়ার রাজবিদূষক রূপান্তরিত হইল প্রথম দস্যুতে। বনদেবীর অংশগুলি কালমৃগয়া হইতে গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মুখেও একটি নূতন গান যোজনা করিয়া দিলেন, 'মরি ও

কাহার বাছা'; আইরিশ সুরে গানটি বসানো হইল; এইরূপ পরিবর্তন ছাড়া কুড়িটি নূতন গান রচিত হইয়াছিল।"

(রবীন্দ্র-জীবনী)

এইভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল (১২৯২, ফাল্গুন; ১৮৮৬, ২০শে ফেব্রুয়ারি)। বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি-প্রতিভা এই দ্বিতীয় সংস্করণ। কালমৃগয়া আর স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

"বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ২০৪)

জীবনস্মৃতি লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি-প্রতিভার এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের কথাই বলিয়াছিলেন, প্রথম সংস্করণের মূলরূপটির কথা তাঁহার মনে ছিল না। কারণ, যে "আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি" বলিয়া জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণের গান—প্রথম সংস্করণে উহা ছিল না।

বাল্মীকি-প্রতিভার সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হোক, সংগীতের একটা নূতন পরীক্ষা হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। দেশীয় সংগীতের ধারা বদলাইয়া দিয়া ইয়োরোপীয় সংগীতের সহিত মিলন করিতে পারিলে আমাদের সংগীত নূতন প্রাণ লাভ করিবে এবং আমাদের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভাবাবেগ-প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হইবে, রবীন্দ্রনাথ এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমাদের দেশীয় সংগীত এমন একটা দৃঢ়, অবিচল নিয়মে আবদ্ধ ও শুষ্ক অনুষ্ঠামাত্রে পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহার প্রাণধর্ম নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, উহা কেবল ওস্তাদের কসরতের মধ্যেই নিজের কলঙ্ক রক্ষা করিয়া বর্তমান ছিল।

"আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত ব্যাকরণগত অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের (feeling) সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।"

(সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা—ভারতী, ১২৮৮, আষাঢ়)

বাল্মীকি-প্রতিভার অধিকাংশ সুরই দেশী রাগরাগিণী অবলম্বনে গঠিত বটে, কিন্তু কবি তাহাদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মুক্তি দিয়াছেন; তাহাদের স্থবির, প্রাণহীন 'বৈঠকী' মূর্তি ভাঙিয়া তিনি নানাভাবের বাহন করিয়াছেন—একটা নির্জীব কাঠামোর মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছেন ও অপূর্ব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন, আমাদের সংগীতের বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে এমন একটা বিশালতা, উচ্চতা ও গাম্ভীর্য আছে যে, উহারা যেন একটা বিশ্বব্যাপী স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক। মনুষ্যজীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া উহারা বিশ্বজগতের একটা গভীর

সর্বজনীন ভাবকে প্রকাশ করে। কিন্তু ইয়োরোপীয় সংগীত বাস্তব মানবজীবনের সঙ্গে জড়িত। উহা মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দ-উল্লাস, ক্রোধ-ভয় ও বিচিত্র কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হৃদয়াবেগকে গানে ফুটাইতে চেষ্টা করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব স্বীকার করিয়া একটিমাত্র স্থায়ী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হইতে চাহেন নাই এবং নানা প্রসঙ্গে উত্থিত হৃদয়াবেগকে বিভিন্নরূপের গানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাকে তাঁহার গানে একটা অসাধারণ বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরবৈচিত্র্য আসিয়াছে।

"আমাদের সংগীতে অভাব ছিল মানবিক বৈচিত্র্যের। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্রবে আমাদের মনোজগতের পরিবর্তন হল, আমরা একটিমাত্র স্থায়ী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলাম না। আমরা সংগীতের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত ছোটো-খাটো সুখদুঃখ ও নানা হৃদয়াবেগকে গানে ফোটাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারই ফলস্বরূপ আরো এগিয়ে গিয়ে আমরা বাঙলা গানে জাতীয় সংগীত, উদ্দীপক সংগীত, যুদ্ধ-সংগীত, হাসির গান, ধানকাটার গান, নলকূপের গান, চায়ের গান, চলার গান, খেলার গান ইত্যাদি আরো কত কি পেলাম। এইরূপ বিষয়বৈচিত্র্যে গুরুদেবের গান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইটিই হল আমাদের সংগীতে ইয়োরোপের একটি বিশেষ দান।"

(রবীন্দ্র-সংগীত, শান্তিদেব ঘোষ; পৃঃ ১৩৪)

ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশীয় রাগরাগিণীকে গতানুগতিকতা ও কৃত্রিমতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নানা ভাবের বাহন করিবার পরীক্ষা করিয়াছেন এই বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে। বাংলা গানের যে মুক্তি সাধিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, বাল্মীকি-প্রতিভা সেই মুক্তির প্রথম বিজয়চিহ্ন।

সংগীতের এই বিপ্লবসাধনার উত্তেজনায়, সুরের নব নব রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে ও তরুণ যৌবনে আত্মপ্রকাশের আনন্দে কবি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থার কথা কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটিব অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলি যেন নানা প্রকারে কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"...

"এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতিবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজী বাংলার বাছবিচার নাই।"...

"তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;— তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল-বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনে নবনব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে;

তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি--আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি।"

(জীবনস্মৃতি, পৃঃ ২০৪-৬)

রবীন্দ্রনাথের যে গীতিধর্মী প্রতিভা কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকেও তাহাই একটু ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কবিমানস এক একটা স্তরে এক একটা বিশিষ্ট ভাবচক্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াছে, আবার তাহা অতিক্রম করিয়া অন্য ভাবগণ্ডীতে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিভিন্ন সময়ের বিশিষ্ট ভাবানুভূতি বা তত্ত্বোপলব্ধি বিশেষ করিয়া সেই সময়ের নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং নাটকের রসবিচার বা তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে হইলে সমসাময়িক কাব্যরচনা ও তৎকালীন মানসিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে অনেকটা আলোক বা ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

কবি এ সময় সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। নিজের এতদিনকার জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডী, গৃহের নির্দিষ্ট আবহাওয়া সর্বপ্রথম ত্যাগ করিয়া বিদেশে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। মানব-প্রকৃতির ভিতরকার রহস্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের খানিকটা আলো তাঁহার প্রথম জীবনপথে আসিয়া পড়িয়াছিল। মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের স্বরূপটার মধ্যেও তাঁহার কবি-দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মানুষের নিত্য-প্রকৃতিকে, তাহার স্বাভাবিক মানবতাকে কোনো সংস্কার, অভ্যাক বা অস্বাভাবিক পারি-পার্শ্বিকের চাপে নষ্ট করা যায় না, সে রুদ্ধ হইলেও, অবরোধ ভাঙিয়া বাধা মুক্ত করিয়া একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই—এই ধারণা, বিশ্বাস, অনুভূতি বা বোধ কবির মনে সেই সময় হইতেই সৃষ্ট হয়। দস্যু রত্নাকর নিষ্ঠুর, পরস্বলোলুপ মানসিকতার মধ্যে লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি কর্মের আবেষ্টনে পড়িয়া অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার চিরন্তন মানবিক প্রবৃত্তি স্নেহ, প্রেম, করুণা, ধর্মবোধকে যে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু শেষে মানবধর্মেরই জয় হইল, বালিকার প্রাণ রক্ষা পাইল এবং 'করুণার উৎসমুখে' ছন্দ, 'পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত', প্রথম পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইহার আভাস দিয়াছেন,—

"বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্রে দিয়া গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতি-কাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।"

(বাল্মীকি-প্রতিভা, সূচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড)

মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক গতিই তাহার জীবনের প্রবাহ; এই প্রবাহকে রুদ্ধ করিলে তাহার মানবতা মরিয়া যায় এবং জীবন অ-স্বাভাবিক ও

অ-মানবিক পথে চলে। স্বাভাবিক নিত্যপ্রবাহমান ধারাকে অব্যহত না রাখিলে প্রকৃত জীবনের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। এই সংস্করাচ্ছন্ন, বন্ধ মানুষ ও সংস্কারমুক্ত, স্বাভাবিক নিত্য-মানুষের দ্বন্দ্ব পরবর্তী কালের বহু নাটকে বহুভাবে এবং অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী সকল বাঁধন-ভাঙার বাণীই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম বাণী।

মায়ার খেলা

(নলিনী)

মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণের (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৮) বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—"আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।" এই অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার নাম 'নলিনী'। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক।

এই নাটকখানি ১২৯১ সালে (১০ মে, ১৮৮৪) প্রকাশিত হয়। উহার পর আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। বর্তমানে অচলিত-সংগ্রহের ১ম খণ্ডে ইহা স্থান পাইয়াছে। জীবন-স্মৃতিতে এই নাটকের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনো উল্লেখ করেন নাই।

'নলিনী' গদ্য নাটিকার গল্পাংশ এইরূপ : নীরদ নামে এক যুবক নলিনী নামে এক প্রতিবেশী-কন্যাকে ভালোবাসে। নলিনী বালিকা—তাহার হৃদয়ে তখনো ভালোরূপ প্রেমোন্মেষ হয় নাই। সে নীরদকে ভালোবাসে, কিন্তু তাহার প্রেমে উচ্ছ্বাস বা চপলতা নাই। তাই সে নীরদের উদ্দাম প্রেমনিবেদনে কোনোরূপ সাড়া দিতে পারে নাই। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে নীরদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিত। নলিনীর নিকট হতে প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া নীরদ দেশত্যাগ করিল।

নীরদ বিদেশে চলিয়া গেলে নলিনীর পরিবর্তন আরম্ভ হইল। নীরদের প্রতি তাহার ভালোবাসা বিকশিত হইল। সে ঘর হইতে বাহির হয় না, কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না, সর্বদা নীরদের কথাই ভাবে।

নীরদ বিদেশে গিয়া নীরজা নামে এক যুবতীর প্রেমে পড়িল ও তাহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইল। সে নীরজার প্রেমে নলিনীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল।

নীরদ নীরজাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল। নলিনীদের বাড়িতে বসন্তোৎসব। নীরদ নীরজাকে লইয়া সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইল।

নলিনীদের বাগানে নীরদ ও নীরজা প্রবেশ করিল। বাগানের গাছপালা দেখিয়া নীরদের পূর্বকথা মনে পড়িয়া গেল। এমন সময় দূরে নলিনী প্রবেশ করিল। সে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নলিনী নীরদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিতেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। নীরজা তাহাকে সেবা করিয়া সুস্থ করিল। নীরদের প্রতি নলিনীর প্রেম বুঝিতে পারিয়া নীরজা বলিল, "আর বেশি দিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।" নলিনী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নীরজা বলিল, "আমি তোর দিদি হই বোন।"

তারপর নীরজার মৃত্যুদৃশ্য। সে নলিনীকে ডাকিয়া নীরদের হাতে তাহার হাত রাখিয়া উভয়ের মিলন করাইয়া দিল ও 'তবে আমি চল্লাম বোন' বলিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মায়ার খেলার আখ্যানভাগ এইরূপ ঃ নবীন যুবক অমর তাহার মানসী প্রতিমাকে জগতে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু শান্তা অমরকে ভালোবাসে—তাহার প্রাণমন অমরকে সমর্পণ করিয়াছে। চিরদিন নিকটে থাকাতে অমর তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং শান্তার প্রতি তাহার প্রেমও জন্মে নাই।

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া তাহার মানসী প্রতিমার সন্ধান পাইল না। শেষে প্রমদার উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদাকে দেখিয়া সে প্রাণে এক নূতন আনন্দ লাভ করিল ও তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। প্রমদাও তাহার অন্য দুইজন প্রণয়-প্রার্থীকে উপেক্ষা করিয়া অমরের প্রতি আকৃষ্ট হইল ও অমরকে ভালোবাসিল।

অমর তাহার ব্যাকুল প্রেম প্রমদাকে নিবেদন করিল। কিন্তু প্রমদার সখীগণ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ফিরাইয়া দিল। প্রমদাও লজ্জা ও সংকোচে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিল না।

নিমেষের তরে শরমে বাধিল
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল হৃদয়-বেদনা।

তারপর যখন প্রমদার সখীরা প্রমদার মনের ভাব জানিতে পারিল, তখন নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিল, কিন্তু সে সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না। হতাশ হইয়া সে ফিরিয়া গেল। ব্যর্থ প্রেমে প্রমদার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল।

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

অমর তাহার অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় লইয়া শান্তার কাছে ফিরিয়া আসিল। "এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল।"

শান্তা ও অমরের বিবাহোৎসব। অমর ফুলের মালা লইয়া শান্তার গলায় দিতে যাইতেছে, এমন সময় ম্লানমুখী প্রমদা বিবাহ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। "সহসা অনপেক্ষিতভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা প্রমদার দীন করুণভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, 'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাক।' অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ, এই ম্লান মালা কাহাকে দিব. কে লইবে?' শান্তা ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর

হইয়া জীবনের সুখ-নিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।' অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল।"...

[প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন (কবি-লিখিত), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মায়ার খেলা]

এই দুইটি নাটকেই প্রেম সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভাবের দিক দিয়া উভয় নাটকের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শুধু সুখের মোহে, ভোগের আকাঙ্ক্ষায়, নিজের মনঃকল্পিত প্রেম কামনা করিলে প্রেম পাওয়া যায় না, প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না,—সে প্রেমের স্বপ্ন কেবল শূন্যে মিলাইয়া যায় এবং জীবন নৈরাশ্য ও দুঃখ-বেদনায় ভরিয়া ওঠে। প্রেমের মোহভঙ্গ হইলে, দুঃখের আগুনে প্রেমকে পোড়াইয়া খাঁটি করিলে, মানস-বিহারী প্রেমকে তাহার দূর মায়াময় স্বর্ণবেদী হইতে নামাইয়া আনিয়া নিকটের বাস্তব-প্রেমের আসনে স্থাপন করিলে, তবেই প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

'নলিনী' নাটকে নীরদ উগ্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় নলিনীর অপরিস্ফুট ও গোপন ভালোবাসা বুঝিতে না পারিয়া বিদেশে চলিয়া গেল এবং নীরজার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল। কিন্তু নীরদের দেশত্যাগের পর হইতে নীরদের প্রতি নলিনীর প্রেম প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাহার জন্য সে হতাশা ও বিরহ-দুঃখের তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তারপর নীরদ নলিনীর হৃদয় বুঝিতে পারিল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। শেষে নীরজার মৃত্যুতে সে নলিনীর সহিত মিলিত হইল। নীরদের নিবেদিত প্রেম নলিনী উপেক্ষা করিয়াছিল, তাই তাহার মিলন হয় নাই, পরে দুঃখের তপস্যার দ্বারা যখন সে পরিশুদ্ধ হইল, তখন তাহার মিলন হইল। নীরদও নলিনীর বালিকা-হৃদয় ভালোরূপ না বুঝিয়া, কাছের জিনিস পরিত্যাগ করিয়া ভোগাভিলাষী হইয়া প্রেমের দুরাশায় ছুটিয়াছিল, কিন্তু সে যে প্রেম পাইল তাহা ক্ষণস্থায়ী—তাহা টিকিল না। দুঃখশোকের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আবার সে নিকটের নলিনীকেই অবলম্বন করিল।

'মায়ার খেলা'তে অমর নিকটের মানুষ শান্তার প্রেম উপেক্ষা করিয়া তাহার কাল্পনিক মানসী প্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া প্রমদার প্রতি আসক্ত হইল। কিন্তু প্রমদার কাছে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আবার নিকটের স্নিগ্ধ, শান্ত প্রেমের কাছে ফিরিয়া আসিল। প্রমদাও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অমরের কাছে ছুটিল। প্রেমের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চলচিত্ত অমর কাহাকেও স্থির আশ্রয়স্বরূপ ধরিতে না পারিয়া অতৃপ্ত প্রেমের বেদনায় গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবিয়া গেল। তখন শান্তাই তাহার গভীর, স্থির, স্নিগ্ধ-মাধুর্যময় প্রেম দ্বারা তাহার হৃদয়কে শান্ত ও তৃপ্ত করিল। আত্মতৃপ্তিমূলক প্রেমের দুরাকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হইয়া সে দূরে ছুটিয়াছিল, কিন্তু প্রতিহত হওয়ায় তাহার জীবনে দুঃখ-বেদনা ও নৈরাশ্যের কালো মেঘ নামিয়া আসিয়াছিল। জীবনের এই বেদনাদায়ক অনুভূতির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া বিগতমোহ হইলে সে শান্তার প্রেম লাভ করিল। প্রমদাও অহংকার ও চপলতায় যে ভুল করিয়াছিল, তাহা ভাঙিল বটে, কিন্তু সে সুখী হইতে পারিল না—তাহার জীবন ব্যর্থ হইল। কিন্তু এই ভুল-ভাঙার বেদনার মধ্য দিয়া সে প্রেমের স্বরূপ চিনিল।

নীরদের সহিত নলিনীর পুনর্মিলন-সমস্যা-সমাধানের জন্য কবি নীরজার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটাইয়াছেন—অত্যন্ত সহজ ও সুলভভাবে এ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু

'মায়ার খেলা'তে শান্তার প্রেমের গভীরতা, দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তিত্বের দ্বারা এবং প্রমদার আত্মত্যাগ দ্বারা এই পুনর্মিলন-সমস্যার সমাধান হইয়াছে। বাহির হইতে সমাধান আমদানি করিতে হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভুলের মধ্য দিয়া প্রেমের স্বরূপ বুঝিয়াছে। 'নলিনী' নাটকের সংশোধন এই শিল্পগত সংশোধনই মনে হয়।

'মায়ার খেলা'র রচনার সময় কবি 'মানসী' কাব্যের ভাব-চক্রে অবস্থান করিতেছিলেন। ভোগবাসনা পরিত্যক্ত না হইলে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না—এইটাই সে যুগের কবি-মানসের একটা বিশেষ সুর। সেই সুর এই 'মায়ার খেলা'তেও ধ্বনিত হইয়াছে,—

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়!
এমনি মায়ার ছলনা।"

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মনোভাব এই গীতিনাট্যে লক্ষ্য করা যায়। সেটি তাঁহার প্রথম বয়সের কাব্য 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র মধ্যেও পাওয়া যায়। কামনার বস্তু নিকটে থাকিতেও ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া দূরে তাহাকে খুঁজিতে গেলে মানুষ তাহাকে পায় না, নিকটের বস্তুকেও হারায়।

"কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।"

প্রেম সম্বন্ধে কবির আর একটি বিশিষ্ট মত এই যে, দুঃখ ও বিরহের আগুনে পরিশুদ্ধ না হইলে প্রেম সত্যকার ও পরিপূর্ণ হইতে পারে না। পরবর্তী বহু রচনার মধ্যে কবির এই মনোভাবের প্রকাশ আছে। এই গীতিনাট্যেও দেখি—

"দুখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।"

এই গীতিনাট্যে গানের একটা প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। কত বিচিত্র সুরের কলধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের লিরিক-প্রতিভার সঙ্গে উৎকৃষ্ট সংগীত-প্রতিভার মিলন হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ গীতিকবির সহিত শ্রেষ্ঠ সুরকার মিশিয়া গিয়াছে। একটা বিশিষ্ট অনুভূতি বা ভাব সুরের অনির্বচনীয়ত্বের মাধ্যমে বস্তুভারমুক্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে, তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম বাহন হইয়াছে গান। এই গীতিনাট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসে সমস্ত মন অভিসিক্ত হইয়া ছিল।"

(জীবনস্মৃতি, পৃঃ ২৯৪)

ইহার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু বাল্মীকি-প্রতিভার ভাবের সমগোত্রীয়—ভুল ভাঙিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়ার কাহিনী। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"মায়ার খেলার গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা। ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।"

(বাল্মীকি-প্রতিভা, সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

২

কাব্যনাট্য

এই পর্যায়ের রচনাগুলির আকার নাটকের হইলেও ইহাদের অন্তর গীতিকাব্যের। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া একটি বিশিষ্ট কবিমনেরই বিচিত্র ভাবের উৎসরণ হইয়াছে ইহাদের মধ্যে। সমস্ত প্রকাশটি কবির ভাব-কল্পনার বহুবর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া একটা সংহত একক মূর্তি ধারণ করিয়াছে—বহু সুরের আলাপন মিলিয়া একটি ঐকতান সৃষ্টি হইয়াছে। কথাবস্তু একটি অন্তর্মুখী বিশ্লেষণাত্মক কবিমনের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

এইপ্রকার নাটকের মধ্যে ঘটনার গতি মন্থর, কার্যকারণসূত্রে ইহার অনিবার্যতা নাই। কেবল পাত্রপাত্রীর মনের ভাব-চিন্তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কবি কাব্যের মায়াজাল রচনা করিয়া চলিয়াছেন। সমগ্র ঘটনার বা রসের পরিণামের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া খণ্ড খণ্ড অংশকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের মধ্যে তিনি আবেগ ও কল্পনার শতমুখী ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

এইপ্রকার রচনার প্রতি গীতিকবির একটা অন্তরের টান থাকা স্বাভাবিক। ইহা তাঁহার প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত স্থল। তাই প্রথম বয়সে কবি কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া নাটকের আকারে কাব্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর রচনায় গীতিকবির পক্ষে সুবিধা এই যে, কবি বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মনের বিভিন্নমুখী বিচিত্র ভাবের সংস্পর্শে আসেন, আর এক-একটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার লিরিক-উচ্ছ্বাসের প্লাবন চলে। ঘটনার সমাবেশ, দ্রুত-আবর্তন ও সমগ্র পরিণতির উপর তাঁহার কোনো লক্ষ্য নাই। কাহিনীটির কাঠামো তাঁহার মনে থাকে মাত্র, তারপর পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া নানা ভাবের বক্তৃতা করিয়া চলেন, নানা ভাবের বক্তৃতার ঘাটে ঘাটে থামিতে থামিতে যখন ইচ্ছা হয় গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবেন। তাহার জন্য তাগিদ নাই। এইরূপ দীর্ঘ আখ্যায়িকাকে নাটকাকারে রূপ না দিয়া মহাকাব্যের বিষয়বস্তু করা যাইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বস্তুধর্মী, তাহার বর্ণনায় বস্তুধর্মিতা ও সমুন্নতি (Sublimity)-র সমাবেশ প্রয়োজন, চরিত্রসৃষ্টিতে একটা তা ও গৌরব বর্তমান থাকা দরকার। তাই অন্তর্মুখী, বিচিত্র, সূক্ষ্মভাবরূপায়ণক্ষম ্য-প্রতিভার তাহা বাহন হইতে পারে না। তাই দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য দিয়া কবি-জীবন আরম্ভ করিলেও রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ঐ পথ হইতে ফিরিয়াছিলেন।

কবি-প্রতিভার পরিণতির সময় যখন রবীন্দ্রনাথ নাটকের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ংগম করিলেন, তখন নাটক ও কাব্যের সংমিশ্রণে এইপ্রকার কাব্যনাট্য সৃষ্টি করিলেন। এই কাব্যনাট্য তাঁহার ভাবপ্রকাশের উৎকৃষ্ট বাহন হইয়াছে। পুরাণ বা ইতিহাসের একটা আখ্যায়িকার ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে দুইটি ভাবের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করিয়া তাহাকে নাটকীয় সম্ভাবনার যোগ্য করিয়াছেন। তারপর বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, কামনা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা—তাহাদের মনের নিগূঢ় পরিচয় লিরিক কাব্যের অন্তর্মুখী আবেগ ও কল্পনায় অনবদ্য রূপদান করিয়াছেন। ইহার বহিরঙ্গ হইয়াছে

নাটকের—অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার রসধারায় উচ্ছল। অব্যর্থ ও সুললিত শব্দযোজনায়, নিপুণ অলংকারপ্রয়োগে, ভাব-কল্পনার সাবলীল ও স্বতঃ-উৎসরিত প্রবাহে, ব্যঞ্জনাশক্তির চরমোৎকর্ষে এগুলি রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের চরম নিদর্শন এবং বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য রত্ন।

চিত্রাঙ্গদা

(২৮শে ভাদ্র, ১২৯৯)

এই ক্ষুদ্র কাব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি। বাহিরের দিক হইতে যেমন ইহা রচনা-শিল্পের পরাকাষ্ঠা বহন করিতেছে, ইহার অন্তরের ভাবানুভূতিও তেমনি নর-নারীর চিরন্তন যৌবন-সমস্যাকে অভিনব কাব্যে রূপায়িত করিয়াছে। যৌবনের একখানি পরিপূর্ণ রাগিণী যেন অনাহত শব্দে নিরন্তর হইয়া অন্তস্তল হইতে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের নিত্যবাণীর অনুসরণে আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধিকে চমৎকৃত করিতেছে। এই কয়খানি পাতা যেন এক অপূর্ব কল্পলোকের দ্বার আমাদের চোখের সামনে খুলিয়া দেয়—একটি জাগ্রত মনোরম স্বপ্নে আমাদের বোধ ও অনুভূতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

প্রথমে ইহার ভিতরের স্বরূপ ধরা যাক। ইহার অন্তরে একটা ভাব, তত্ত্ব বা আইডিয়া অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মনোজগতের আলোড়ন ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে রূপ ধরিয়া বিরাজ করিতেছে।

নরনারীর পরস্পর আকর্ষণের মূলে যৌনপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। সে আকাঙ্ক্ষা দেহ-সম্ভোগের সহিত জড়িত। এই আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির জন্য নরনারী দেহকেই কামনা করে। দেহের সৌন্দর্য ও রমণীয়তা যাহার যত বেশি, তাহার আকর্ষণী-শক্তিও তত প্রবল। রূপই তাই দেহকে লোভনীয় করে, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং দেহমিলনে একটা সার্থকতা দেয়। এই দেহসম্ভোগ নরনারীর আদিম অনুপ্রেরণা। ইহার মধ্যে যে একটা বিস্ময়কর উল্লাস ও নিবিড় আনন্দানুভূতি আছে, তাহা অনস্বীকার্য। তাই নরনারীর মিলনের জন্য এই ব্যাকুলতা—প্রেমের এই বিচিত্র লীলা।

কিন্তু এই যে দেহ-কেন্দ্রিক মিলন-ব্যাকুলতা বা ভোগাকাঙ্ক্ষামূলক প্রেম, ইহাই কেবল নরনারীকে চরম তৃপ্তি, পরম সার্থকতা বা কোনো সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। দেহের সৌন্দর্য বা রূপের প্রকাশ ক্ষণিকের, জরা-ব্যাধির হাতে তাহার হ্রাস-ক্ষয় আছে এবং তাহার প্রকাশ একই রকমের। তাই এই দেহ-কেন্দ্রিক মিলন ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দেয়, এবং কিছু-দিনের মধ্যেই ইহাতে একঘেয়েমি, অতৃপ্তি ও অবসাদ আসে। দেহের ঊর্ধ্বে যে হৃদয় আছে, যে অন্তরাত্মা আছে, তাহার সহিত দেহের মিলন হইলে, তবেই সেই মিলনের প্রকৃত সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা আসে। এই হৃদয়, এই অন্তরাত্মা চিরন্তন। ক্ষণিক চিরন্তনের সহিত যুক্ত হইলে, চিরন্তনের দ্বারা বৃহত্তর ও মহত্তর হইলে সে মিলন হয় সার্থক, প্রেম হয় পরিপূর্ণ ও সত্যকার। দেহের সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণের বস্তু, হৃদয়ের সৌন্দর্য তাহা অপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বস্তু, কারণ তাহা চিরন্তন। এই দেহ ও হৃদয়ের—ক্ষণিক ও চিরন্তনের মিলন হইলে প্রেম প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে—রূপজ মোহ সত্যকার প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

এইটি মূলভাব। ইহার সহিত জড়িত হইয়া আছে আর একটি ভাব।

নারীকে যথার্থভাবে পাইতে হইলে তাহাকে পত্নীরূপে, সহধর্মিণীরূপে পাইতে হইবে, কেবল নিরবচ্ছিন্ন ভোগের পাত্রী করিয়া রাখিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। গৃহ ও সমাজের সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া দেহভোগের আবহাওয়ার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া কেবল লালসার আগুনে ইন্ধন যোগাইলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। সে প্রেম শীঘ্রই একটা জ্বালাময়, পীড়াদায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। গৃহের আবেষ্টনের মধ্যে নারী যেখানে জগদ্ধাত্রীরূপে প্রসন্ন কল্যাণহস্তে সকলকে মঙ্গল বিতরণ করিতেছে, যেখানে অন্তরের অম্লান শুভ্রতায় সকল দুর্দম বাসনাকে শান্ত, নম্র করিতেছে, যেখানে ভাব-চিন্তা-কর্মে সতত প্রিয়তমের জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া যুগল-জীবনের মাধুর্য আহরণ করিতেছে, সেইখানেই নারীকে পাইলে প্রকৃত পাওয়া হইবে। নারীর দুই মূর্তি—প্রণয়িনী ও গৃহিণী। কেবল প্রণয়িনীভাবে পাইলেই তাহাকে যথার্থরূপে পাওয়া যায় না—তাহাকে গৃহিণীভাবে পাইতে হইবে। সেখানেই তাহাকে যথার্থ পাওয়া। ভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমকে শান্তি ও মঙ্গলের ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে হইবে। প্রণয়িনী-জীবনে দেহ-সৌন্দর্যের আবেদন প্রবল, কিন্তু গৃহিণী-জীবনে হৃদয়-সৌন্দর্যই বেশি আকর্ষণ করে। এই পরিপূর্ণ হৃদয়-সৌন্দর্যে নারীর যথার্থ পরিচয়। এই প্রণয়িনী ও গৃহিণী, এই দেহ ও হৃদয়, এই বাহির ও ভিতর, এই উর্বশী ও লক্ষ্মী, এই প্রাণেশ্বরী ও দেবীর সমন্বয়ই নারীর প্রকৃত রূপ। পুরুষ তাহাকে এই দ্বৈতমূর্তিতে কামনা করিলে তাহাকে প্রকৃতভাবে পাওয়া যাইবে। এই প্রেমই প্রকৃত প্রেম—কেবলমাত্র ভোগবাসনার সহিত জড়িত প্রেম প্রেম নয়।

এখন দেখা যাক, এই ভাব বা তত্ত্ব কিরূপে এই নাটকের আখ্যানবস্তুর মধ্যে কাব্য-রূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্বের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পরিণয়-ব্যাপারের কাহিনীটার ছায়া অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত কল্পনার বিচিত্র মাল-মসলা-যোগে কবি ইহার অভিনব আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন।

মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পুত্রহীন পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা তাহাকে পুত্রের মতো বেশভূষা পরাইয়া, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়া, রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরুষের বেশে, পুরুষের মনোবৃত্তি ও হাবভাব গ্রহণ করিয়া সর্বদা সে অন্তঃপুরের বাহিরে পুরুষ-জনোচিত কার্যে নিযুক্ত থাকিত। একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া হরিণের সন্ধানে গভীর বনে ঘুরিতে ঘুরিতে অর্জুনের সঙ্গে তাহার দেখা। অর্জুন তখন সত্যপালনের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ঘুরিতেছিল। অর্জুনকে দেখিয়া তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

> শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
> বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
> ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
> আপনাতে-আপনি-অটলমূর্তি হেরি
> সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
> আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
> সম্মুখে পুরুষ মোর।

এতদিন অর্জুনের বীরত্বখ্যাতি শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা মনে করিয়াছিল, পুরুষের ছদ্মবেশে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার বীরত্বখ্যাতি ম্লান করিবে। শৌর্যবীর্য দ্বারা বীরহৃদয়কে আকৃষ্ট করিবে। বীরই বুঝিবে বীর-নারীর মর্যাদা। কিন্তু আজ

হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর! যে-ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে-ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্য-বীর্য-যাহা-কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে।

নারী যতই পুরুষের বেশ পরিয়া পুরুষের কাজে লিপ্ত থাকুক না কেন, অন্তরের দৃঢ়তা ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বলে অশেষ শক্তিশালিনী হোক না কেন, সে তাহার চিরন্তন নারী-হৃদয়কে লুপ্ত করিতে পারে না। পুরুষের প্রতি যৌবনোচিত আবর্ষণ তাহার হইবেই এবং পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে একটা নিগূঢ় আনন্দ সে পাইবেই। প্রেমই তাহার জীবনের অদৃশ্য পরিচালনী শক্তি।

তারপর চিত্রাঙ্গদা পুরুষের বেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ নারীর মতো অর্জুনের নিকট গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল। ব্রহ্মচর্যের অজুহাতে অর্জুন সে প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। চিত্রাঙ্গদার প্রেম উপেক্ষিত হইল।

চিত্রাঙ্গদা বুঝিল, সে রূপহীনা বলিয়া উপেক্ষিত হইল। কিন্তু সে যে হৃদয়ের সৌন্দর্যে ও চরিত্রের ঐশ্বর্যে সাধারণ নারীদের অপেক্ষা বহু উচ্চে। অর্জুন যদি তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য দেখিত, তবে তাহার মতো চরিত্রগৌরবে গৌরবিণী নারীকে পার্থের মতো বীরের উপযুক্ত সহধর্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিত। কিন্তু তাহার অন্তরের পরিচয় দিয়া অর্জুনের মন আকৃষ্ট করা বহুসময়সাপেক্ষ।

সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার,......
সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।......
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা।......
কিন্তু হায়,
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে
বহুদিন ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত।

অসীম চরিত্রবল, পুরুষসুলভ তেজ-বীর্য ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাস লইয়া সেই পার্বত্য-নারী মনে করিয়াছিল, অর্জুনের নিকট তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে অর্জুনকে লাভ করিবে।

যে-নারী নির্বাক ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথ-নয়নজলে করয়ে লালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম-বিধবা, অমি সে-রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল।
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি,
নিশ্চয় সে দিবে ধরা।

কিন্তু সে দেখিল বাহিরের সৌন্দর্য ছাড়া অর্জুনকে অতি শীঘ্র পাওয়া যাইবে না তাই সে রূপ-লাবণ্য-লাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিল এবং মদন ও বসন্তের বরে একবৎসরস্থায়ী অপরূপ রূপলাবণ্য লাভ করিল। যাহাকে সে বেশি মূল্য দেয় নাই, যাহা তাহার স্বরূপের সহিত স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধহীন, যাহা তাহার জীবনে অসত্য ও কৃত্রিম, অর্জুনকে জয় করিবার জন্য সেই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অর্জুন এই রূপলাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল, তাহার ব্রহ্মচর্য ভুলিয়া, খ্যাতি-বীর্য সব ভুলিয়া চিত্রাঙ্গদার নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রাম-রূপিণী।

এইবার চিত্রাঙ্গদার মনে বিষম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল।

যে ছিল স্থির-বিশ্বাসী অন্তরের ঐশ্বর্যে, নারী-হৃদয়ের মোহমুক্ত, স্থির, অচপল প্রেমে, নারীর বুদ্ধি, তেজস্বিতা ও দৃঢ়তায়, কর্ম-জীবনে স্বামীর পশ্চাতে বিশাল শক্তি-স্তম্ভের মতো দাঁড়াইবার ক্ষমতায়, সে আজ দেখিল, তাহার প্রেমাস্পদ অর্জুন তাহার অন্তরের দিকে না তাকাইয়া তাহার দেহ-সৌন্দর্য দেখিয়া উন্মত্ত আবেগে তাহার পদতলে নিজেকে লুটাইয়া দিতেছে। অর্জুন যাহাকে দেখিয়া এত অধীর হইয়া পড়িয়াছে সে রূপলাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদা, অন্তরের ঐশ্বর্যে গরবিণী চিত্রাঙ্গদা নয়। বাহিরের ধার-করা সৌন্দর্য তাহার আসল সৌন্দর্য হইতে বড়ো হইল। বাহির তাহার ভিতরকে পরাজিত করিল। এই পরাজয় তাহার ব্যক্তিত্বের বিরাট পরাজয়। যে ব্যক্তিত্বের অটল বেদীর উপর সে প্রতিষ্ঠিত, আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িল। যাহাকে কিছুদিন পূর্বে অর্জুন ব্রহ্মচর্য-ব্রতের অছিলায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরাইয়া দিয়াছিল, আজ সেই ব্রত ভাঙা কাচখণ্ডের মতো কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার কাছে প্রেমভিক্ষা করিতেছে! বড় দুঃখে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—

হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,

মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।

মিলনের পর হইতেই এই দ্বন্দ্ব চিত্রাঙ্গদার মনে প্রবল আকার ধারণ করিল। সে তাহার মধ্যে দুইটি সত্তা অনুভব করিতে লাগিল। একটি তাহার বরপ্রাপ্ত সৌন্দর্য-বিভূষিত, লাবণ্যদীপ্ত সত্তা, আর একটি তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বপূর্ণ সত্তা। অর্জুনের প্রেম-নিবেদন, সোহাগ-আদর প্রথম সত্তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত আর দ্বিতীয় সত্তা তাহার সাক্ষী-মাত্র। এই দ্বৈতসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সে ঘোরতর অশান্তি বোধ করিয়া মদনের নিকটে গিয়া এই বর প্রত্যাখ্যান করিবার অনুরোধ জানাইল,—

সে চুম্বন, সে প্রেমসঙ্গম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকারসম, সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দন্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে-মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি!...
মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাৎ! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান।...
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

মদন বলিল, এই বর এখন প্রত্যাখ্যান করিলে অর্জুন তাহার রূপহীন দেহ দেখিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। চিত্রাঙ্গদার উত্তর,—

সে-ও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি রব।

বসন্ত তখন উপদেশ দিল,—

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে। হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

এইবার অর্জুনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

বৎসরের শেষের দিকে এই নিরবচ্ছিন্ন ভোগে তাহার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব আসিল। গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে নামগোত্রহীন নারীর সঙ্গে প্রেমলীলায় তাহার সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি মিলিতেছিল না। ক্ষত্রিয়-বীরের হৃদয় সংসারের কর্মের আবেষ্টনী হইতে দূরে নিষ্ক্রিয়. আলস্য-সুখ-স্বপ্নে দিন কাটাইতে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাই চিত্রাঙ্গদার নাম, পরিচয় জানিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অর্জুন আগ্রহ বোধ করিতে লাগিল।

অর্জুন

কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে-ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?

চিত্রাঙ্গদা

যা দেখেছি তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়।...

অর্জুন

তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই. ছান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস
নামধামগোত্রগৃহ বাক্যদেহমনে,
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমারে।
নির্ভয়ে নির্ভয়ে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দির মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

চিত্রাঙ্গদা

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জুন

তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

তারপর একটি ঘটনা অর্জুনকে মোহমুক্তির দিকে, রঙীন স্বপ্ন-ভাঙার দিকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিল।

উত্তর পর্বত হইতে দস্যুদল চিত্রাঙ্গদার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে, রাজ্যের একমাত্র রক্ষক রমণী চিত্রাঙ্গদা ব্রত গ্রহণ করিয়া অজ্ঞাতস্থানে তীর্থপর্যটনে গিয়াছেন; তিনি ছিলেন, স্নেহে রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ, এখন রাজ্য অরক্ষিত—এই সংবাদ অর্জুন একজন ভীত বনবাসী প্রজার কাছে শুনিল। আর্তত্রাণের জন্য তাহার বীরহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল আর একাধারে স্নেহপ্রেমদয়াময়ী ও বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদার কথা সে বিস্মিতমনে ভাবিতে লাগিল।

অর্জুন

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা

কুৎসিত, কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জুন

কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ,

চিত্রাঙ্গদা

ছি ছি, সেই
তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে, হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীর্তি বীর্যবল শিক্ষাদীক্ষা তার।

হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে,
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে যেতে।

অপরিচয়ের অন্তরালে থাকিয়া চিত্রাঙ্গদা তাহার মনের স্বন্দ্বটি, তাহার হৃদয়ের ক্ষোভটি অর্জুনের কাছে প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিল। আজ নারীর যে হৃদয়ের কথা, নারীর পৌরুষ ও বীর্যবত্তার কথা অর্জুনের মুখে শুনিতেছে, তাহা অর্জুনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাই, বরং নারীর রূপ-লাবণ্যই তাহাকে সুকোমল নাগপাশে বাঁধিয়াছে। হৃদয়বতী চিত্রাঙ্গদা তাহাকে বাঁধে নাই, রূপবতী চিত্রাঙ্গদাই তাহাকে বাঁধিয়াছে। তাই সে বলিতেছে, যে-নারী তাহার রূপে, তাহার সুমধুর ছলকলায়, তাহার মাধুর্যের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া শত-সহস্র প্রকারে পুরুষকে মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে, সেই নারীই ধন্য। নারীর শৌর্য-বীর্য, কর্মখ্যাতি, শিক্ষাদীক্ষা, হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রভৃতি মূল্যহীন—এসব বিন্দুমাত্র পুরুষের মনোহরণ করিতে পারে না। ইহাই চিত্রাঙ্গদার জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

অর্জুনের এই মানসিক পরিবর্তনে, এই মোহভঙ্গের সূচনায় চিত্রাঙ্গদার ভয় হয়, পাছে অর্জুন তাহার সত্যপরিচয় পাইয়া এই সুখ-স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ত্যাগ করে। অর্জুনের এই পরিবর্তন সত্য বলিয়া তাহার মনে হয় না। তাই এই মনোহর স্বপ্নকে, এই পরমসুন্দর মায়াকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে চায়।

কিন্তু অর্জুনের হৃদয় ক্রমেই অশান্ত হইয়া ওঠে—চিত্রাঙ্গদার সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য তাহার আগ্রহ বাড়ে।

অর্জুন

ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত? কী অভাব তার?

চিত্রাঙ্গদা

কী অভাব তার? কী ছিল সে অভাগীর?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুদ্যমান রমণী-হৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি।

এইটিই চিত্রাঙ্গদার নব-অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান। হৃদয়ের প্রতিবিম্ব যদি দেহের শোভায় প্রকাশ না পায়, তবে সেই গোপনচারী হৃদয়কে কেউ সহজে সন্ধান করিয়া দেখিতে চায় না। রূপহীনার জীবনে ইহাই ট্র্যাজেডি। তাহার হৃদয়-মাধুর্য এইভাবে অনাবিষ্কৃত ও অনাদৃত থাকিয়া যায়।

অর্জুনের প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুত ও পরিণামমুখী। অজানিতা চিত্রাঙ্গদার হৃদয়-

সৌন্দর্যের আভাস সে যেন পাইতেছে। যত শীঘ্র এবং যত তীব্রতার সঙ্গে সে দেহ-সৌন্দর্যের মোহে পড়িয়াছিল, ঠিক তত দ্রুততা ও তীব্রতার সহিত সে হৃদয়-সৌন্দর্যের দিকে ছুটিয়াছে। এ অর্জুন যেন নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

অর্জুন

হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।...
দেখিতে পেতেছি তারে
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো, আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মতো, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তালজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুইবাহু 'পরে
স্বাধীন সে অসংকোচ বল ধিক থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী।

এইবার চিত্রাঙ্গদা মনে অনেকটা শক্তিলাভ করিয়াছে, তবুও অর্জুনের প্রতি—সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি তাহার অভিমান যায় নাই. হৃদয় যে রূপ হইতে বড়ো এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস আসে নাই। রূপ ত্যাগ করিলে কি সে তেমনি অর্জুনের মনোহরণ করিতে পারিবে? মনে তাহার এখনো সন্দেহ আছে,—

কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্রসুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত,—সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষ-চোখে।...
যামিনীর নর্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী
সতত প্রস্তুত থাকে বাম হস্তসম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে?

চিত্রাঙ্গদার এই কথাগুলি অর্জুনের হৃদয়-তন্ত্রীতে নূতন ভাবে আঘাত করিল। অজ্ঞাত, অপরিচিত রাজকন্যার প্রসঙ্গ হইতে ফিরিয়া অর্জুন চিত্রাঙ্গদার দিকে নূতন দৃষ্টিতে তাকাইল। বিগতমোহ বীর সৌন্দর্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের আভাস পাইয়াছে।

বুঝিতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা,...
তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা।...

সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি; তারপরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে-সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে-মিলন চিরদিবসের।

তারপর বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। চিত্রাঙ্গদার রূপ-লাবণ্য এবার নিঃশেষ হইবে। এবার রূপহীনা রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা তাহার নিজস্ব সত্তায় প্রকাশিত হইবে। মোহভঙ্গে হৃদয়ান্বেষী অর্জুনকে তাহার বিশেষ ভয় নাই। তাই সে সগর্বে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইল।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্য-পুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হ'ল পূজা
তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির বাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।
যে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে, আছে দৈন্য কতো, আছে আজন্মের

কতো অতৃপ্ত তিয়াসা। সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দু-দণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়!

এইবার রূপের ছদ্মবেশ খুলিয়া সে চরম আত্মপরিচয় দিল। একদিন সে অর্জুনের প্রেমভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেই ভিক্ষার্থিনী নারী তাহার প্রকৃত স্বরূপ নয়, আবার বসন্তের বরে ছদ্মবেশে তাহাকে ভুলাইয়াছিল, সে-ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ নয়—স্বামীর সুখদুঃখের অংশভাগিনী, কর্মসঙ্গিনী, সেবাময়ী পত্নীর রূপই তাহার প্রকৃত রূপ।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

আখ্যানবস্তুর মধ্যে ভাবকে রসরূপদানে, কল্পনার সমুন্নতি ও সৌন্দর্যে, আবেগের মনোহর প্রকাশে, বাস্তবের ঊর্ধ্বে একটা স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করায় কাব্যহিসাবে চিত্রাঙ্গদা অনবদ্য।

এখন নাটক হিসাবে ইহার বৈশিষ্ট্য দেখা যাক। অবশ্য পুরোপুরি নাটকের আদর্শে ইহার বিচার হইবে না, তবে চরিত্রসৃষ্টি যখন নাটকের প্রধান বস্তু, তখন দুইটি আকর্ষণীয় শক্তিশালী চরিত্রের একটু আলোচনা করা যাক।

প্রথমে ধরা যাক চিত্রাঙ্গদা।

পুরুষের মতো বেশ-ভূষা ধরিয়া, পুরুষের মতো অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া, পুরুষের ভাব, চিন্তা ও কর্মের সহিত একাত্ম হইয়া নারী চিত্রাঙ্গদা শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত কাটাইয়াছে। পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্যের চাপে তাহার প্রকৃতিগত নারী-হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়া অবলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। অর্জুনের বীরত্বকথা সে শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছে, তাহার কল্পনা ছিল নিজ শৌর্য-বীর্য দ্বারা সে অর্জুনকে পরাজিত করিয়া ভারতব্যাপী বীরকীর্তি অর্জন করিবে। নারী হইয়াও তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল বীরত্বে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া ও তাহাকে পরাজিত করা।

তারপর, তাহার সেই নির্যাতন, মৃতপ্রায় নারী-হৃদয় একদিন প্রচণ্ড জীবনীশক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিল। অর্জুনকে চোখে যেদিন সে দেখিল, সেইদিনই বুঝিতে পারিল, তাহার পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্য সত্ত্বেও সে নারী, আর সম্মুখে তাহার পুরুষ। নারীর হৃদয় স্নেহ-প্রেম-দয়া প্রভৃতি কোমলবৃত্তির আবাসস্থল। অর্জুনকে দেখিয়া তাহার মুহূর্তের

মাঝে অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে', তাহার 'চরণের তলে' 'দুর্লভ মরণ' লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইল। অর্জুনের প্রতি গভীর প্রেমের আবেগে সে অর্জুনের নিকট আত্মবিসর্জন করিয়া ধন্য হইতে চাহিল। চিত্রাঙ্গদার নারী-হৃদয়ের পূর্ণ জাগরণ হইল।

ধনুঃশর দূরে ফেলিয়া দিয়া পুরুষের বেশ ত্যাগ করিয়া সে অর্জুনের নিকটে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল, কিন্তু অর্জুনকে লাভ করিবার পথে তাহার অন্তরায় হইল 'জন্ম-দাতা বিধাতার বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ'। অর্জুন ব্রহ্মচর্যব্রতের উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল।

ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় অর্জুনকে পাইবার জন্য সে তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানের জন্য মদন ও বসন্ত উপস্থিত হইলে কুরূপের অভিশাপ দূর করিয়া অন্তত একদিনের জন্যও তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী করিয়া দিবার বর প্রার্থনা করিল। সে মদনকে বলিল, তাহার দেহ-সৌন্দর্য না থাকিলেও প্রচুর হৃদয়-ঐশ্বর্য আছে, কর্মের সহচরী হইয়া নিরন্তর সাহচর্যের দ্বারা ভক্তিতে, সেবায় অর্জুনের মন সে অধিকার করিবেই, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ইহার জন্য বহুসময়ের প্রয়োজন। এই দীর্ঘ অপেক্ষার জন্য ধৈর্য তাহার নাই—একবার যদি রূপের দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া অর্জুনের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, নিজেকে প্রকাশ করিবার সুযোগ সে পাইবে, তারপর অর্জুনের জীবনসঙ্গিনী-রূপে তাহার অধিকার সে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে।

বর্ষভোগ্য রূপের বর লাভ করিয়া সে অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে অর্জুন তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইল। তারপর যখন শুনিল, সেই নারী অর্জুনের জন্য বনমধ্যে শিবপূজা করিতেছে, তখন সে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া চিত্রাঙ্গদার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল। কোথায় রহিল তাহার ব্রহ্মচর্য, কোথায় তাহার সন্ন্যাসী-জীবন!

এ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। ইহার পর হইতেই তাহার চরিত্রের অভিব্যক্তিতে জটিলতার সৃষ্টি হইল।

চিত্রাঙ্গদার নিকট অর্জুনের চরম আত্মসমর্পণে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বিক্কার দিতে লাগিল।

ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কি জানো আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথয় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।..

(যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা।)

অর্জুনের উপেক্ষায় মর্মাহত হইয়া সে রূপলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিল। মদন ও বসন্তের কাছে তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল—রূপ দ্বারা অর্জুনকে ভুলাইয়া তাহাকে অর্জুনের গ্রহণযোগ্য করাইয়া তারপর ধীরে ধীরে তাহার অন্তর-সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিয়া চিরকালের মত অর্জুনের হৃদয়ে স্থান লাভ করিবে,—সে সাধারণ নারী নয়—সে নিশ্চয় ইহা করিবে। তারপর অর্জুন যখন রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করিল, তখন তাহার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পূর্বাপর সমস্ত কথা জানিয়া এরূপ ধিক্কার দেওয়া কি স্বাভাবিক? প্রথম দর্শনেই কি অর্জুন নারীর হৃদয়ের প্রেম বুঝিয়া তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিবে? সে প্রেম তো চিত্রাঙ্গদা পূর্বে জ্ঞাপন করিয়াও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিল। তাই তো রূপের সাহায্য তাহাকে লইতে হইয়াছিল। তুচ্ছ দেহ তো মৃত্যুহীন অন্তরকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়ায় সে তপস্যা করিয়া রূপলাভ করিয়াছে। কার্যকরণঘটিত যেটা স্বাভাবিক ঘটনার অভিব্যক্তি তাহাতে তো বিস্মিত হইবার কোনো অবসর নাই—বা অর্জুনের রূপতৃষ্ণা সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা দিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করার মধ্যে কোনো সার্থকতাও আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এই বক্তৃতার প্রভাবে ও বাধাপ্রাপ্তিতে সে দেহকে ছাড়িয়া হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হইবে তাহারো সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

তবে এই কথাগুলি যদি প্রণয়িনীর ছলা-কলার অঙ্গ হয়, যদি এই বাধা দিয়া প্রেমকে আরো বর্ধিত করিবার একটা কৌশল হয়, বা উদাসীন বা বিমুখ প্রেমস্পদকে জয় করিয়া তাহাকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া তাহার দুর্বলতা বা কৃত অন্যায়ের কথা অপ্রত্যক্ষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার একটা কৌশল হয়, তবে আর্টের দিক দিয়া ইহার একটা সার্থকতা আছে।

তারপর প্রথম মিলন-রাত্রির অভিজ্ঞতা ও পরবর্তী সময়ে চিত্রাঙ্গদার মনের প্রতিক্রিয়া, যাহা তাহার মুখেই ব্যক্ত হইতে শুনি, তাহাতে তাহার চরিত্রের একটা মনোবিজ্ঞানসম্মত বিকাশের ধারা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় না।

অর্জুনের আকুল আগ্রহ, তাহার হৃদয়ের 'থরথর ব্যাকুলতা', তাহার উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চিত্রাঙ্গদার 'মিথ্যা সরম সংকোচ' খসিয়া পড়িল।

শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহ মাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ।" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।

ইহা গভীর প্রেমের আবেগে আত্মদানের কথা। ইহা চির-প্রণয়িনী নারীর প্রিয়তমের কাছে সর্বস্বদানের কাহিনী।

তারপর প্রথম মিলনের 'অসহ্য পুলকে' রাত্রি কাটাইয়া, প্রাতে কাঁদিতে কাঁদিতে

চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে ছুটিয়া বর ফিরাইয়া দিতে চাহিল। তাহার দুঃখের কারণ—তাহার অঙ্গসহচরী, অন্তরের সতীন-স্বরূপা, রাক্ষসী রূপলাবণ্যময়ী সত্তা অর্জুনের চুম্বন-আলিঙ্গন গ্রহণ করিতেছে, আর তাহার নিজস্ব রূপহীনা সত্তা সাক্ষী-রূপে নীরবে বসিয়া আছে। অর্জুনের সমস্ত ভালোবাসা, আদর-সোহাগ সেই রূপময়ীই পাইতেছে, 'অন্তরের দরিদ্র রমণী', 'রিক্তদেহে' শূন্যমনে দিন কাটাইতেছে। 'দেহের সোহাগে' 'অন্তর হিংসানলে জ্বলিতেছে'। এ বুকফাটা দুঃখ তাহার অসহ্য। সে নিজেকে প্রকাশ করিবেই। তাহাতে অর্জুন যদি ঘৃণাভরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—"বুক ফেটে মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি রব।"

তপস্যা করিয়া চিত্রাঙ্গদা 'অবলার বল' 'নিরস্ত্রের অস্ত্র' রূপ-লাবণ্যের ইন্দ্রজাল-'বিদ্যা' লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল একদিনের জন্য—'তারপরে চিরদিন রহিল আমার হাতে।' সেই বিদ্যা লাভ করিয়া তাহার প্রয়োগে অর্জুনকে ধরিয়াই প্রথম দিনেই তাহার এইরূপ প্রতিক্রিয়া কি স্বাভাবিক? রূপটা তো অর্জুনকে ধরার ফাঁদ মাত্র, এই ফাঁদে অর্জুনকে ধরিয়া অর্জুনের সাহচর্য-লাভের সুযোগে তাহার নিজস্ব সত্তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবে—এইটিই তো তাহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথা একাধিকবার সে মদন ও বসন্তকে বলিয়াছে। অথচ সুযোগ পাইয়াই এই রূপের উপর সে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার বহু-প্রচারিত, বহু-গর্বিত, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 'আমি'টা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল? তবে অর্জুনকে পাইবে কি করিয়া? তাহা হইলে অর্জুনের প্রতি তাহার যে প্রেমের আবেগে আত্মদান, ইহা কি অর্থহীন? এ রূপ তো তাহার প্রেমাস্পদকে পাইবার একটা উপায়মাত্র—প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদনের একটা সোপান মাত্র। ইহা ধার-করা হইলেও, ইহার সহিত অন্তরের যোগ না থাকিলেও ইহা আবশ্যক। প্রিয়তমকে লাভ করিবার জন্য এই ত্যাগ-স্বীকার, এই আত্মোৎসর্গ না থাকিলে প্রেম মূল্যহীন। প্রেম তো প্রিয়তমের তৃপ্তির জন্য সকল আত্মবিসর্জনের সম্মুখীন হয়। তবে কি অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার প্রেম কৃত্রিম, অসত্য? তাহার গগনচুম্বী বিরাট 'আমি'র প্রতিষ্ঠাই কি তাহার আসল উদ্দেশ্য? যাহার জন্য সে অর্জুনকেও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত?

তারপর এই যে দেবদত্ত অপার্থিব সৌন্দর্য যাহা চিত্রাঙ্গদার 'মহারাক্ষসী' 'অঙ্গ-সহচরী' 'সপত্নী', তাহা তো চিত্রাঙ্গদার কুরূপ দেহটাকে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল। দেহটা তো চিত্রাঙ্গদারই। সুতরাং অর্জুনের চুম্বন, আলিঙ্গন, আদর-সোহাগ, সে-সব তো প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্গদার দেহের সঙ্গেই জড়িত—তাহারই দেহে অর্পিত। প্রথম মিলনে যে 'জীবন-মরণ'-বিস্মরণকারী 'অসহ্য পুলক', তাহা তো চিত্রাঙ্গদারই। অথচ মিলনের নানা বিচিত্র আনন্দানুভূতি সে নিজে অনুভব করিয়া, পূর্ণ আত্মসচেতন হইয়া, গভীর ও সূক্ষ্ম মননশীলতার দ্বারা দেহের মধ্যে রূপের একটা পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, তাহার উদ্দিষ্ট চুম্বন-আলিঙ্গন তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে-ই গ্রহণ করিতেছে এইরূপ অনুভব করা মনোবিজ্ঞানসম্মত ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা, একটা আইডিয়ার বাহন হিসাবেই চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রকে বিচার করিতে হইবে। সাধারণ নারীর একটা চিরন্তন প্রতীক হিসাবে আমরা চিত্রাঙ্গদাকে ধরিতে পারি না। কবি নরনারীর সৌন্দর্য ও প্রেম সম্বন্ধে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাহা বসন্তের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

কিন্তু ফলপ্রসবে ফুলেরও যে একটা সার্থকতা আছে, চিত্রাঙ্গদা যেন সেটা স্বীকার করিতেই চাহে না। ফলই যেন তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

কবি রূপযৌবনের দান অপেক্ষা চরিত্র শক্তির দানই 'যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়' বলিয়াছেন—ফুলের অপেক্ষা ফলেরই প্রাধান্য দিয়াছেন! এই তত্ত্বটিকে রূপদানের জন্যই এই কাব্যনাট্যের উৎপত্তি।

"অনেক বছর আগে রেলগাড়ীতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চারে স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিক হৃদয় ভুলিয়েছে, তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছে থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্র-শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

"এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কাহিনী! এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়াবনে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।" (সূচনা, চিত্রাঙ্গদা)

তারপর অর্জুনের চরিত্র।

সংসারের সাধারণ বাস্তব পুরুষ-চরিত্রের ভিত্তিভূমি হইতে দেখিলে অর্জুনের চরিত্র স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অর্জুনকে আমরা পুরুষের চিরন্তন প্রতীক বলিয়া ধরিতে পারি।

রূপজ মোহ পুরুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। দেহ-সৌন্দর্যের অনিবার্য আকর্ষণে পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার কাহিনী পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত সুপ্রচুর। মুনি-ঋষি তাঁহাদের তপস্যা বিসর্জন দিয়াছেন, অর্জুন ব্রহ্মচর্যব্রত ভাঙিয়াছে।

কিন্তু শীঘ্র অর্জুনের মোহভঙ্গ আরম্ভ হইল। লোকালয় হইতে দূরে, সংসারের নানা কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, অরণ্যমধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-চর্চায় অর্জুনের বীরহৃদয় তৃপ্তি পাইল না। বর্ষাকালে 'প্রণয়িনীর কণ্ঠাশ্লিষ্ট' থাকিয়াও মৃগয়ার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। শেষে এই উদ্দাম, আরণ্য প্রেমকে গৃহের মঙ্গলবেদীতে প্রতিষ্ঠার জন্য—এই প্রণয়িনীকে গৃহিণীরূপে রূপান্তরিত দেখিবার জন্য তাহার ক্রমবর্ধমান ব্যাকুলতা। নারীকে তো কেবল একান্তভাবে ভোগের বস্তু করিয়া পাইলে পাওয়া হইবে না, তাহাকে

গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে, শত সহস্র কর্তব্যের পথে নিরন্তর তাহার মঙ্গলময় শক্তির অনুভূতিতে, তাহার হৃদয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের উপলব্ধিতেই তাহাকে যথার্থ ভাবে পাওয়া, সেইখানেই তাহার ক্ষণিকতামুক্ত চিরন্তন রূপ। তাই অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীরূপে পাইবার জন্য ক্রমাগত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। শেষে চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় পাইয়া সে আনন্দিত হইল। রূপতৃষ্ণা তখন তাহার চলিয়া গিয়াছে, ফুলের বর্ণ-গন্ধে সে আর আকৃষ্ট নয়, সে ফলেই চরম সার্থকতার রূপ দেখিয়াছে। অর্জুন-চরিত্রে তাই আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য বর্তমান আছে।

নারীর সার্থকতা এই সম্মিলিত প্রেয়সী ও দেবী, প্রণয়িনী ও গৃহিণী, উর্বশী ও লক্ষ্মীমূর্তিতে। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপ্রিয় ভাব। কেবলমাত্র প্রণয়িনী-মূর্তিতেই তাহার সার্থকতা নাই। কাব্যে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে নারীর এই মঙ্গলময়ী গৃহিণী-মূর্তিতেই যে চরম সার্থকতা, একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক বার বলিয়াছেন।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে॥
(রাত্রে ও প্রভাতে, চিত্রা)

কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর জন্য কবির চরম কাব্য-অর্ঘ সঞ্চিত।

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে॥
(কল্যাণী, ক্ষণিকা)

নারীর দুইরূপ—উর্বশী ও লক্ষ্মী। লক্ষ্মীতেই নারীর 'সফল শান্তির পূর্ণতা।'

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে

অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য-সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র-সংগমতীর্থ-তীরে
অন্তরে পূজার মন্দিরে।

(দুইনারী, বলাকা)

দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানহীন, সংসারবন্ধনবিহীন, সৌন্দর্যভোগলোলুপ, উদ্দাম প্রেমের রূপ যথার্থ রূপ নয়, প্রেমের শান্ত, সংযত, কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ। নারীর যথার্থ সার্থকতা রূপযৌবনভোগের বসন্ত-উৎসবে ইন্ধন জোগাইয়া নয়, যথার্থ সার্থকতা তাহার গৃহিণীপদে, জননীপদে, সংসারের শতসহস্র কর্তব্য-বন্ধনের মধ্যে শান্ত ও অচপল আত্মব্যাপ্তির কল্যাণময় অভিযানে। 'ফুলে' তাহার যথার্থ রূপ নয়, 'ফলে'ই তাহার চরম রূপ—পরম সার্থকতা। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যপাঠের মধ্যেও আবিষ্কার করিয়াছেন। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'তে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'তেও তিনি এই ভাবটি রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। 'কুমারসম্ভবে' যেমন কার্তিকেয়ের জন্মরূপ ফলে এবং 'শকুন্তলা'তে যেমন ভরতের জন্মরূপ ফলে উমা ও শকুন্তলার প্রেম ও নারীত্ব সার্থক হইয়াছে, তেমন চিত্রাঙ্গদাও পুত্রের মাতা হইয়া সার্থকতা লাভ করিল,—

গর্বে
আমি ধরেছি যে-সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার কতকাংশ উদ্ধৃত করা অপরিহার্য,—

"কালিদাসের সৌন্দর্য-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।...

"কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণলাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত।

"কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুইটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা

করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্রকারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ্র দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।...

"যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, দুষ্যন্তই সমস্ত, তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে; সেইজন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহ আঘাত করে না; আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসারধর্মের অকস্মাৎ পরাভব-স্বরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্ঝার মতো অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন ক'রে আনে।

"পর্যাপ্ত যৌবনপুষ্পে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরীশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।...হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে, তাঁহার তিন নেত্রকে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্যস্ত এবং মুখ একদিকে সাচীকৃত।

"কিন্তু অপূর্ব সৌন্দর্য অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই-যে হর্ষ দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না, সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের ললিতযৌবনের সৌন্দর্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

"কণ্বদুহিতাকেও একদিন তাঁহার যৌবনলাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পদ লইয়া অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। দুর্বাসার শাপ কবির রূপকমাত্র। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যেই হয়; তাহার পরে অবসাদের অপমানের, বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান।

"সেইজন্যই 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী', পার্বতীর রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন।...

"তিনি তপস্যার দ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবার গৌরী

তরুণার্করক্তিমবসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপল্লব এবং অলকে নব-কর্ণিকার পরিলেন না; তিনি কঠোর মৌঞ্জীমেখলা দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

"শকুন্তলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাগ্লানিকে দুঃখতাপে দগ্ধ করিয়া কল্যাণী তাপসীর বেশে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা, শ্লথলম্বিত-পিঙ্গল-জটাধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণহৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা আঘাত আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।...

"ধর্ম যখন তাপস-তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল তখন স্বর্গমর্ত্য এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়-রূপে অবতীর্ণ হইল; এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্ষিবৃন্দকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোনো গূঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তেব আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না। ইহার যে অম্লান মঙ্গলশ্রী তাহা সমস্ত সংসারের আনন্দসামগ্রী। সমস্ত বিশ্ব এই শুভমিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।...

"জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ,' তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব-কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাঁধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। এইজন্য কবি প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যস্থলে ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্যমোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনভূমির স্থলে আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন, তবে কুমারজন্মের সূচনা হইয়াছে।

"শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্যন্তের ব্যর্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরত-জননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।...

"দেখা গেল, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত-সংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ—বন্ধনে, যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারত-বর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ

হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র-সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।

"একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষে বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যে যাতায়াতের পথ আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে-নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ-আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান; তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গল-মহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এইজন্য তাহা বন্ধনহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান ও বিস্ময়কর।"

(কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, পৃঃ ১৮-৩২)

তারপর এই নাটকের বহিরঙ্গের কথা।

ইহার বাণীমূর্তি বাংলা সাহিত্যে এক চিরন্তন বিস্ময়। ইহার বাগ্‌বিভূতি এক অপূর্ব সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে। সুললিত, সংগীতগর্ভ, অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগে এক-একটি ভাব অনবদ্য রূপৈশ্বর্যে ঝলমল করিতেছে আর এই রূপের বিলাস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে বর্তমান থাকিয়া একটা অসাধারণ চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমত, ইহার ভাষার শব্দঝংকার—যাহাকে ইংরেজীতে বলে phrasal music—আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে এক নূতনভাবে আঘাত করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে। ইহা যে ছন্দসংগীতের কারুকলার সহিত মিশিয়া গিয়া বিচিত্র ধ্বনিমাধুর্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে তাহা নহে, এ-ধ্বনিমাধুর্য ভাষারই অন্তর্নিহিত। কারণ ছন্দ তো একটানা অমিত্রাক্ষর—বৈচিত্র্যের বিশেষ সম্ভাবনা এখানে নাই। দ্বিতীয়ত, এই অত্যাশ্চর্য শব্দপ্রয়োগের দ্বারা যে পূর্ণবাক্যটি গড়িয়া উঠিল তাহা এমনি অলংকৃত যে, বাক্যনিহিত ভাবের এক-একটি মণিমাণিক্যখচিত রাজবেশ আমাদিগকে চমকিত করে। তাই এই বিচিত্র কলধ্বনিময় অপূর্ব শব্দ-চয়ন ও অতি-সার্থক অলংকার প্রয়োগই ইহার অসামান্য সৌন্দর্যের মূলভিত্তি। কেবল চিত্রাঙ্গদাতে নহে, রবীন্দ্রকাব্যে অসামান্যতার মূলেও কবির এই দুইটি শক্তি কম-বেশী ক্রিয়াশীল। অন্যান্য কাব্যনাট্যগুলিতেও ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে।

চিত্রাঙ্গদা-পাঠে মনে হয়, যে-কবি লিখিয়াছেন, 'উপমা কালিদাসস্য', তিনি যদি রবীন্দ্রনাথের কালে জীবিত থাকিতেন, তবে রবীন্দ্রনাথকেও নিঃসন্দেহে এই গৌরবের অংশ দিতেন। এ যুগে আমাদের 'উপমা রবীন্দ্রনাথস্য' বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেবল উপমা কেন, শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বহু সার্থক দৃষ্টান্ত চিত্রাঙ্গদার মধ্যে আছে। কোথাও এই শব্দ বা অলংকারপ্রয়োগে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা কষ্টকল্পনা নাই। ইহারা যেন আত্মসচেতন আর্টের সৃষ্টি নয়,—ইহারা কবির ভাবজীবনের সহিত একাত্মা হইয়া কাব্যের আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহারা যেন কবি-হৃদয়ের রসোল্লাসের মূর্ত প্রকাশ—ভাবাবেগের দিব্যানুভূতির স্বতঃ-উৎসারিত বাণীরূপ।

নানা অলংকারের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে।

ঊষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।

শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি,—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।

নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল,
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে।
তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে

ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বন-বনান্তের
আনন্দমর্ম্মর—পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরী, সংগীতে যেমন ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা।

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।

এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের
আচম্বিতে উঠক উজ্জ্বলতম হয়ে।

বিদায়-অভিশাপ

(১৩০১)

কবির ভাষাতেই এই কাব্যনাট্যটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে,—"শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য।"

(কাব্যের তাৎপর্য, পঞ্চভূত)

মহাভারতের সঙ্গে অনৈক্যটুকু বোধ হয় এই যে, কচও দেবযানীর শাপের উত্তরে দেবযানীর ক্ষত্রিয়-স্বামী হইবে বলিয়া পাল্টা অভিসম্পাত দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কচ অভিশাপের পরিবর্তে দেবযানীকে আশীর্বাদ করিয়াছে।

এই কাব্যটির মূল ভাববস্তু হইতেছে—কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বের রূপায়ণেই ইহার নাটকত্ব। দেবযানী তাহার তীব্র, একমুখী প্রেমের প্রেরণায় কচকে জীবনসঙ্গী-রূপে পাইয়া এই মর্তভূমিতেই সুখনীড় রচনা করিতে চায়, কিন্তু কচ প্রেমের উপরে কর্তব্যকে স্থাপন করিয়া, কর্তব্যের অনুরোধেই দেবযানীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিয়া

মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে চায়। কচের অন্তর্জীবনেও এই প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। কচও দেবযানীকে ভালবাসিয়াছে, দেবযানীর সঙ্গ তাহার একান্ত কাম্য। তবুও এই প্রেমকে সে অন্তরের অন্তস্তলে চাপিয়া রাখিয়া কঠোর কর্তব্য সাধন করিতে চায়। মর্তে এই মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাশিক্ষা তাহার তপস্যা, তাহার ব্রতসাধন। এই ব্রতের উদ্দেশ্য—স্বর্গে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা লইয়া যাওয়া। তাহারই জন্য সে প্রেরিত—তাহারই জন্য সে এক হাজার বছর ধরিয়া নানা কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছে। দেবগণ এই দীর্ঘদিন তাহারই আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আজ সফলকাম, লব্ধবিদ্য কচ প্রেমকে কর্তব্যের পায়ে বলি দিয়া কর্তব্যকেই শিরোধার্য করিয়া দেবলোকে গমন করিতেছে। একদিকে দেবযানী প্রেমেই প্রেমের যথার্থ সার্থকতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রেমের পায়েই সমস্ত বিচার, বিবেচনা ও বোধকে বিসর্জন দিতে অনুরোধ করিতেছে, অন্যদিকে কচ অন্তরের প্রেমের কণ্ঠরোধ করিয়া, হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বেদনা চাপিয়া, মহান কর্তব্যবোধকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া দেবলোকে যাত্রা করিতেছে। পাত্র-পাত্রীর এই বিভিন্নমুখী অন্তর্দ্বন্দ্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে এই নাটকে।

এক প্রেমসর্বস্ব, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জীবনরসপিপাসু নারীর মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর কবি দেবযানীর চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। মনোবিশ্লেষণের কৃতিত্বে ও অপূর্ব কাব্যরূপায়ণে দেবযানী-চরিত্র সার্থক সৃষ্টি।

প্রেম নারীহৃদয়ের সর্বাপেক্ষা প্রবল সহজাত প্রবৃত্তি। প্রেমই নারী-জীবনের একমাত্র পরিচালনী শক্তি। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী ভালোবাসিয়া তাহার প্রতিদান পাইতে চায়, সেই প্রতিদান-প্রাপ্তির মধ্যে তাহার তৃপ্তি, তাহার ব্যক্তিত্বের সম্মানবোধ, তাহার হৃদয়ের ভাব-কল্পনার চরম লীলাবিলাস। প্রেমাস্পদের নিকট হইতে তাহার ভালোবাসার মূল্যপ্রাপ্তিতেই তাহার নারীজীবনের সার্থকতা। প্রতিদানহীন প্রেমের ধ্যান ও পূজা তাহার নারীহৃদয়ের সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নয়। অবশ্য প্রতিদান না পাইলেও, নিঃস্বার্থ কামনাহীনভাবে প্রিয়তমের সুখে সুখী হওয়া, ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিটিই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার দৃষ্টান্ত মেলে, কিন্তু তাহা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তাহার মধ্যে একটা অবদমনের বাধ্যতা আছে, বিকৃতির আভাস আছে, রূপান্তরিত-করণের প্রচেষ্টা আছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, জীবন-ভোগাকাঙ্ক্ষিণী, সংসারের বাস্তব নারীর পক্ষে এরূপ উচ্চস্তরের প্রেম স্বাভাবিক নয়। নারী তাহার প্রিয়তমকে একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়। এদিক দিয়া তাহার মন সংকীর্ণ, আত্মস্বার্থপরায়ণ, অনুদার। বৃহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ, পবিত্র কর্তব্য প্রভৃতির আবেদন তাহার মনে স্থায়ী ও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার স্বাভাবিক মনোধর্মে প্রেমের উপরে এগুলি স্থান পায় না। ইহাই নারীহৃদয়ের মনোবিজ্ঞানসম্মত চিরন্তন সত্য।

দেবযানী সংসারের বাস্তব নারীর প্রতীক। সুদীর্ঘকাল একত্র বাসের পর বিদায়ক্ষণে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা-শিক্ষা ছাড়া কচের আর কোনো কামনা নাই শুনিয়া দেবযানী বিস্মিত হইল। তাহাকে কি কচ কামনা করে নাই? তাহার প্রেম কি ব্যর্থ? অথচ এই প্রেম যে তাহার সর্বস্ব। তাই হাসিমুখে কচকে বিদায় দিতে বলিলে দেবযানী বলিল,—

হাসি? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,

লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।

দেবযানীর ইঙ্গিত কচ বুঝিতে পারে নাই ভাবিয়া দেবযানী সুকৌশলে ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কচকে সচেতন করিয়া পূর্বস্মৃতির উল্লেখে তাহার হৃদয়ে প্রেমের উদ্বোধনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

প্রথমে দেবযানী শুক্রাচার্যের আশ্রমসন্নিহিত বনভূমি, তরুরাজি, পল্লবমর্মর, তারপর আশ্রমের হোমধেনু, স্রোতস্বিনী বেণুমতী নদী প্রভৃতির কথা কচকে স্মরণ করাইয়া দিল। কচও ইহাদের কাছে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ইহাদের কোনো দিন ভুলিতে পারিবে না বলিল। তারপর দেবযানী নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল,—

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে;—
হায় রে দুরাশা!

কচের উত্তর,—

চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

এইবার দেবযানী নিজের কথা বলিবার সুযোগ পাইল। কচের প্রথম আগমনের দিন হইতে পরবর্তী ঘটনার মধ্যে যেখানে যেখানে দেবযানীর অংশ প্রধান ছিল, সেইগুলি মনে করাইয়া দিতেই কচ শুক্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষার সুযোগলাভের জন্য, দৈত্যগণের হাত হইতে জীবনরক্ষার জন্য, দেবযানীর নিকট চির-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

শুধু কৃতজ্ঞতা? কোনো আনন্দের স্মৃতি নয়? প্রেম নয়? দেবযানী বিস্ময় ও দুঃখের সঙ্গে বলিল,—

কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোনো দুঃখ নাই।
উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই—
নাহি চাই দান প্রতিদান। সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোনো দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী-তীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদয় উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে সায়াহ্ন আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতলে, সেই সুখকথা
মনে রেখো—দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা।

দেবযানীর স্মৃতি কি কচের মনে চির-অঙ্কিত থাকিবে না? তাই দেবযানী আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—

ভেবে দেখো একবার
কতো ঊষা, কতো জ্যোৎস্না, কতো অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা র'বে চির চিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর?

এখন কচ তাহার হৃদয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইল। দেবযানী কৌশলে নানাভাবে বারংবার কচের হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিতে করিতে, অবশেষে রুদ্ধ কবাট খুলিতে সক্ষম হইল। কচ বলিল,—

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

দেবযানীও এই কথাটি জানিতে চায়। প্রেমের দাবীই তো তাহার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী। এই প্রেমের শক্তিতে সে কচকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে; তাই আজি হেন
স্পর্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়োনাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতী-তীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল বিস্মৃত।

কচের হৃদয়ের গোপন প্রেমের বার্তা দেবযানীর অবিদিত নাই. কচের আর গোপন করিবার উপায় নাই, প্রেম যে অন্তর্যামী, দেবযানী সে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে। তাই প্রেমের গর্বে সে বিজয়িনীর মতো বলিতেছে,—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

এখন দেবযানীই কচের ইন্দ্র। তাহার আদেশেই কচের কর্তব্য নির্ধারিত হইবে। দেবযানীর কাছে প্রেমের উপরে অন্য কোনো প্রেরণার স্থান নাই।

এইবার কচের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হইল। পুরুষ আদর্শবাদী। উচ্চ আদর্শ, মহৎ ভাবের দ্বারাই তাহার জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃহৎ আদর্শের কাছে নিজের স্বার্থ-বলিদানের মধ্যে সে একটা অপূর্ব সার্থকতা অনুভব করে। সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা, নিজের স্বার্থসাধন অপেক্ষা, বৃহৎ ভাবের ক্ষেত্রে আত্মবিসর্জনের মধ্যে সে যথার্থ তৃপ্তি পায়। ইহার মধ্যেই তাহার পুরুষোচিত গর্ব ও সার্থকতা। তাই কচের জীবনে দেবযানীর মতো প্রেমই একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি নয়। তাহার কর্তব্য, তাহার কর্ম, তাহার ভাব ও আদর্শকে প্রেম চরমরূপে বিপর্যস্ত করিতে পারে না। তাই কচ বলিতেছে,—

সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা?

তাহার সহস্র বৎসরের সাধনার পরিণাম কি কেবল এক রমণীর প্রেমলাভ?

প্রেমসর্বস্ব, একমাত্র প্রেমের গৌরবে গরবিনী দেবযানীর নিকট জীবনের সমস্ত কামনা-সাধনার উপরে প্রেমেরই প্রাধান্য—অন্ততঃ প্রেম তাহাদের সমকক্ষ। তাই দেবযানী সগর্বে বলিতেছে,—

করেনি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কতো? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ।···
রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরই সখা সাধনার ধন।

কচ বলিল, সে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা লইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, সে পণ রক্ষা হইয়াছে, আর কোনো কামনা তাহার নাই।

দেবযানী যে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্পর্ধা ঘোষণা করিতেছিল, তাহা ক্রমেই শিথিল হইয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল দেখিয়া অপরিসীম বেদনা ও ক্রোধে সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কচকে নিন্দা করিতে লাগিল,—

আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে। বুঝেছি এখন
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা;
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি
মনের সন্তোষে?—

এই দারুণ আঘাতে কচ তাহার হৃদয়ের চরম সত্যপরিচয় দিল। বড়ো বেদনা বুকে চাপিয়া, ভবিষ্যতের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া, সে স্বর্গে ফিরিতেছে। তবু উপায় নাই,—সে প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ, কর্তব্যের নিদারুণ ব্রত তাহাকে সম্পন্ন করিতেই হইবে। দুর্ভাগ্য তাহার অপরিসীম যে, দেবযানী তাহার হৃদয় বুঝিতে পারিতেছে না।

হা অভিমানিনী নারী,
সত্য শুনে কি হইবে সুখ।...
ছিল মনে
কব না সে কথা। বলো কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কি না আজ
সে-তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধমৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্যমাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ।

এইবার দেবযানীর জীবনে চরম ব্যর্থতা। কচ জানাইয়া দিল দেবযানীর প্রেমের প্রতিদান দিবার শক্তি তাহার নাই। প্রেমই দেবযানীর সর্বস্ব, সমগ্র সত্তা—'the woman's whole existence'।—প্রেমের ব্যর্থতায় সে সর্বস্ব হারাইল। জীবন এখন তাহার কাছে অর্থহীন, অন্তঃসারহীন।

হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্য-পুলকে
সর্ব দুঃখ-শোক করি দূর-পরাহত;
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব।

ইহাই প্রেমের ব্যর্থতায় নারী-হৃদয়ের চরম আর্তনাদ। কোনো বৃহৎ ভাব বা ব্রত বা কর্তব্যের প্রলেপে এ ক্ষত ঢাকা যায় না। তাই দেবযানীর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পক্ষে তাহার জীবনের সর্বস্বাপহারকের উপর অভিসম্পাত কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় না। কোনো ব্যক্তিত্বাভিমানিনী নারীর পক্ষে এই প্রতিহিংসা স্বাভাবিকই মনে হয়। দেবযানীকে কবি বাস্তব নারীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদার মতো ইহাকে ভাবের বাহন করেন নাই। দেবযানী ভাবের ধূপ-গন্ধে সুরভিত না হইলেও বাস্তবের রসে রসাল। তাই জীবন-রসের একটা স্বাভাবিক চমৎকারিত্ব তাহার চরিত্রে কোনো হীনতা আনে নাই।

অবশ্য কচকে কবি মহান পুরুষ করিয়াছেন। কচের জীবনেও একটা বিরাট ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার জীবনও একদিক দিয়া বিফল। বাণবিদ্ধ হরিণের মতো তাহাকেও স্বর্গে গিয়া ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। অনির্বাণ বেদনা বুকে চাপিয়া তাহাকে কর্মের পথে, কর্তব্যের পথে চলিতে হইবে। জীবনের সুখ তাহারো গিয়াছে, তবে তাহা সহ্য করিবার মত পুরুষোচিত শক্তি তাহার আছে। দেবযানীর প্রতি তাহার গভীর প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে তাহার আশীর্বাদে—তাহার বরদানে। দেবযানীর নিদারুণ অবস্থা সে বুঝিতে পারিয়াছে, স্মৃতির সহস্রদংশনে তাহার জীবন যে জর্জরিত হইবে তাহা অনুভব করিয়াই সে বিস্মৃতির জন্য বর দিয়াছে—জীবনের ভিন্নপথে নব-প্রেমের বিপুল গৌরব-সম্ভাবনার জন্য আশীর্বাদ করিয়াছে। সে সম্ভাবনা হয়তো কচের নিজের জীবনে না-ও থাকিতে পারে, তাই তাহার বেদনা চিরস্থায়ী ও গভীরতর বলিয়া অনুমেয়।

মূল মহাভারতে দেবযানীর চরিত্রের এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই জীবন-রসতৃষ্ণা, এই অপর্যাপ্ত প্রাণচাঞ্চল্য, এই বাস্তববুদ্ধির একটা আভাস পাওয়া যায়। পত্নীরূপে নিজেকে গ্রহণ করাইবার জন্য রাজা যযাতির উপর নানাদিক হইতে চাপ দেওয়া, তাঁহাকে সর্বদা বশীভূত রাখার প্রচেষ্টা, সপত্নী শর্মিষ্ঠার উপর ব্যবহার প্রভৃতিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ দেবযানী-চরিত্রের এই মূল ভাবটাকে বজায় রাখিয়া তাহার উপরই তাঁহার স্বহস্তের প্রসাধনলীলার চাতুর্য দেখাইয়াছেন।

গান্ধারীর আবেদন

(রচিত ১৩০৫)

'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস' ও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'—এই চারিখানি কাব্য-নাট্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন দুইটি বিভিন্নমুখী ধর্মবোধের মধ্যে। এই দুইপ্রকার ধর্মের মধ্যে একটির নাম দেওয়া যাইতে পারে ক্ষুদ্রধর্ম বা লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম, আর একটির নিত্য-সত্য মানবধর্ম। এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধর্মের আদর্শের সংঘাত এই সব কাব্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীর চিন্তায় ও কার্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই দুইপ্রকার ধর্ম রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার আলোচনা সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে সেই সেই ক্ষেত্রের উপযোগী কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব একপ্রকার ধর্ম এবং ঐগুলি সম্পাদন করাই ধর্মপালন করা। এইভাবে শাস্ত্রধর্ম, সমাজধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পত্নীধর্ম বা সতীধর্ম, বীরধর্ম বা ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে,—ইহাদের অর্থ ধর্ম-শাস্ত্রাবলম্বী ব্যক্তির, সমাজের, রাজার, পিতার, মাতার, সাধ্বী পত্নীর, বীরের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই সব কর্তব্যের মূল হইতেছে—যুক্তি ও বিচার দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণ, একটা অপরিবর্তনীয় ন্যায়নিষ্ঠা, মহৎ কল্যাণের আদর্শ, মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদা-দান, মহত্তর ও বৃহত্তর হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাকে স্বীকার, নিখিল অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার

অনুভূতি ও মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তি। এই মূলনীতিগুলি যখন ব্যক্তির দ্বারা, সমাজের দ্বারা, পিতা, মাতা, পত্নী, বীর বা ক্ষত্রিয় প্রভৃতির দ্বারা তাহাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং স্ব স্ব জীবনের কর্তব্যের মধ্যে গৃহীত ও প্রতিপালিত হয়, তখনই সেই সব কর্তব্য যথার্থ ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তব্য এই চিরন্তন বৃহৎ নীতিগুলিকে মানিয়া লইলে তাহা শাশ্বত ধর্ম বা নিত্যধর্ম বা মানবধর্মে পরিণত হয়। তখন শাস্ত্রধর্ম, সমাজধর্ম, রাজধর্ম প্রভৃতি নিত্যধর্মের অঙ্গীভূত হয়। নিত্যধর্ম বা মানবধর্ম মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের নানাক্ষেত্রের কর্তব্য বা ধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনে, একটা সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার সৃষ্টি করে। নিত্যধর্ম একটা পরিপূর্ণ সর্বজনীন আদর্শ,—তাহার গুণ বা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়াই বিভিন্নক্ষেত্রে খণ্ড ধর্মগুলি সার্থক ও ধর্মপদবাচ্য হয়। যখন এই সব ধর্ম মূল উচ্চনীতি হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন উহারা যুক্তিহীন শুষ্ক আচারপালন, চিরাচরিত সংস্কার বা প্রথা-অনুসরণ, অন্যায়, অত্যাচার, স্বার্থসিদ্ধির কৌশল প্রভৃতির হীন পর্যায়ে নামিয়া আসে। তখন ধর্ম একটা মুখোশ পরিয়া আত্ম-অহংকারতৃপ্তি, স্বার্থসাধন বা পরপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হয় এবং নানা আবিলতায় কলঙ্কিত হয়। এই ছদ্মবেশী, বিকৃত, তথাকথিত ধর্মই ক্ষুদ্রধর্ম বা লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম। আর পূর্বোক্ত মূলনীতিসমন্বিত ধর্মগুলিই প্রকৃত সত্যধর্ম বা মানবধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক বহু প্রবন্ধে নিত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষুদ্র ও ছদ্মবেশী ধর্মের সহিত নিত্যধর্মের এই পার্থক্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

> "দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ স্থাপন করা, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করা··· ধর্মের লক্ষ্য নয়·· সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটো-বড়ো অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি···গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শ-দ্বারা সংসারের ব্যবহারে চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।
>
> ভারতবর্ষে এ আদর্শ (সংকীর্ণ গণ্ডি-ধর্ম) সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স্ হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন-সাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে

ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহকর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে যাহা অধর্ম তাহাই অনুপযোগী ছিল; ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।"

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, পৃঃ ৬৬)

"নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা ক'রে গেঁথে শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজ যে-ব্যবস্থা ক'রে থাকে তাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ-রক্ষাই মুখ্য।···প্রায়ই বলা হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরি-পরিমাণে মূঢ়তা আছে, এইজন্যে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে মোহের দ্বারাও তাদের মন ভোলানো চাই, মিথ্যা উপায়েও তাদের ভয় দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার, যেন তারা চিরশিশু বা চির-পশু। ধর্মসম্প্রদায়ের যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতনকালে যে সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তী কালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গমহলে দেখা যায় কোনো কোনো নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্যদিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি, অন্যায় প্রণালী,—ঘরগড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ-আচারের প্রবর্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বুদ্ধিরই প্রতীক আন্দামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইল্যান্ড, ইটালির লিপারি দ্বীপ। এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি একসঙ্গে চলতে পারে না। এই বুদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাঁদের লড়াই চলে এসেচে যাঁরা সত্যকে শ্রেয়কে মনুষ্যত্বকে চরম ব'লে শ্রদ্ধা করেন।"

(মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৬৭-৬৮)

এই ক্ষুদ্রধর্ম বা ছদ্মধর্মের সহিত নিত্যধর্মের বিরোধের স্বরূপটি কবি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে। ক্ষুদ্রধর্মকে কবি ধর্মতন্ত্র বলিয়াছেন। "ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয়, সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে মা-বাপ বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়

অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"

(কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কালান্তর, পৃঃ ৬১)

পরবর্তী নাটক 'মালিনী'তেও কবি নর-নারীর চিত্তে বিভিন্ন ধর্মাদর্শের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রূপায়িত করিয়াছেন।

কপট পাশাখেলায় পাণ্ডবেরা হারিয়া গিয়াছে, দ্রৌপদী সভামধ্যে লাঞ্ছিতা হইয়াছে, রাজ্য ছাড়িয়া তাহারা বনগমনের উদ্যোগ করিতেছে, এই সময় দুর্যোধনমাতা গান্ধারী দুষ্কৃতকারী পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। গান্ধারী নিত্যধর্মের পূজারিণী, দুর্যোধন ন্যায়ধর্ম, বীরধর্ম, রাজধর্ম পরিতাগ করিয়া যে পাপ ও লাঞ্ছনা কুরুবংশের উপর টানিয়া আনিয়াছে, তাহাতে কুরু-বংশের ধ্বংস অনিবার্য্য,. মনুষ্যত্বের এই অবমাননায় সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত, তাই গান্ধারী নিত্য মানবধর্মের পক্ষ হইতে অন্যায়কারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিফল হইয়া গান্ধারী ভগবানের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, এবং তাঁহার ন্যায়বিচারের সুনিশ্চিত, কঠোর পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ইহাই 'গান্ধারীর আবেদন'-এর কথাবস্তু।

নাটকীয় উৎকর্ষের দিক হইতে ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁহার চরিত্রে একটা ট্র্যাজেডির মহিমা বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব ত্রিভুজাকৃতি-বিশিষ্ট—অন্তরের তিনটি অবস্থা বা ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রথম, প্রবল, অন্ধ পুত্রস্নেহ; দ্বিতীয়, নিত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান ও মানসিক স্বীকৃতি; তৃতীয়, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা বা আত্মকর্তৃত্বের অভাব। এই তিনটি অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁহার চরিত্রে একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই জটিলতাই ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রকে একটা বিশেষ নাটকীয় গৌরব দান করিয়াছে।

দুর্যোধনের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ধৃতরাষ্ট্র তাহার ভ্রাতৃদ্রোহ, ক্ষুদ্র ঈর্ষা এবং সত্যধর্ম ও ন্যায়কে পদদলিত করিবার জন্য ধিক্কার দিয়াছেন, কিন্তু যখনই দুর্যোধন শিশুকাল হইতে পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত বলিয়া অভিমান করিয়া পাণ্ডবের সঙ্গে রাজ্য বিনিময় করিয়া বনবাসে যাইতে চাহিল, তখনই ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল পিতৃস্নেহ অন্ধ আবেগের আবরণে সমস্ত ন্যায় ও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। এ সময় প্রবল ব্যক্তিত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব হয়তো তাঁহার সত্যধর্ম-পালনের সহায়তা করিতে পারিত, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট দুর্বল, তাই তাঁহার দুর্বল, ভীরু ব্যক্তিত্ব পিতৃস্নেহের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, সত্যধর্ম পালন না করার পরিণাম দারুণ অশুভ, কিন্তু প্রতীকারের শক্তি তাঁহার নাই, এই স্রোত ফিরাইবার দৃঢ়তা তাঁহার নাই, তাই ভবিতব্যের হাতে, নিয়তির হাতে, অনিবার্য ঘটনাস্রোতের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে ল'য়ে প্রলয়-তিমিরে
চলিয়াছি,—বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র সবে

করিতেছে অশুভ চিৎকার,—পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ,—আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর,—তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি ল'য়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—
আর সংগী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী,—...
সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে,—আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে করো না সংশয়
আলিংগন করো না শিথিল,—ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।

পিতৃস্নেহ-নাগপাশে দুর্বলহৃদয় ধৃতরাষ্ট্র আবদ্ধ, বিবেকের শত-সহস্র আঘাত সে পাশ ছিন্ন করিতে পারে না, কেবল তাঁহারই হৃদয় বিদারণ করে। স্নেহ ও বিবেকের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণহৃদয় ধৃতরাষ্ট্র উন্মত্ত হইয়া আপাতরম্য স্নেহপিচ্ছিল ধ্বংসের সোপানেই দ্রুত অগ্রসর হন। এই উন্মত্ততা ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের চরম নাটকীয় পরিণতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি র'বে,—
না র'বে বিদুর, ভীষ্ম, না র'বে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা, লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি র'বে আর.
শুধু র'বে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ।

এই পিতৃস্নেহবেষ্টিত হৃদয়দুর্গে প্রবলতম আঘাত হানিয়াছেন গান্ধারী। গান্ধারী ধর্মরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার আবেদন জানাইলে, অন্ধ রাজা তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ ও ধর্মবুদ্ধির দ্বন্দ্বের একটা চিত্র দিয়াছেন।

হায় প্রিয়ে,
ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর—"কী করিলি ওরে।
এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী 'পরে

পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ,
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি।...
পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ন সূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে,—দ্যূত-ছলনায়
বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হায়রে প্রবৃত্তিবেগ। কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের।

এই বেগবান প্রবৃত্তি ও ধর্মবুদ্ধি, এই তীব্র কামনা ও ন্যায়-ধর্ম, এই বাস্তব ও আদর্শ, এই প্রেয় ও শ্রেয়ের দ্বন্দ্ব মানুষের অন্তরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেই মানুষের অন্তর্জীবন ছিন্ন-ভিন্ন। ধৃতরাষ্ট্রের মনোজগতের এই ইতিহাস, মানবহৃদয়ের চিরন্তন ইতিহাস।

গান্ধারীর পুনঃ পুনঃ সত্য ও ন্যায়ের অগ্নিগর্ভ বাণীতে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে বেদনারই সঞ্চার হইল, কিন্তু তাঁহার মোহভঙ্গ হইল না; সে আঘাত ব্যর্থ হইল, বিবেক ও ধর্মবুদ্ধির উন্মেষে তাঁহার নিদ্রিত পৌরুষ জাগরিত হইল না। যখন এ অবস্থা ফিরাইবার তাঁহার শক্তি নাই, যখন অদূর ভবিষ্যতে একটা অমঙ্গল নিশ্চিত, তখন এই আত্মঘাতী উন্মত্ততার মধ্যে পুত্রের স্বার্থরক্ষা-প্রবৃত্তির ক্ষণিক তৃপ্তি ছাড়া আর বৃদ্ধের কি সম্বল থাকিতে পারে? তাই গান্ধারীর কাছে তাঁহার দুর্বলতার অকপট স্বীকৃতি,—

প্রিয়ে সংহরো, সংহরো
বাণী তব। ছিঁড়িতে পারিনে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব!—উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে,—অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্মতির,—
সেই তো সান্ত্বনা মোর,—এখন তো আর
বিচারের কাল নাই—নাই প্রতিকার,
নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

এই ক্ষুদ্রপরিসরের মধ্যে যে অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতা ও নাটকীয় কৌশলের সহিত রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্র-চরিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নাটকে বাস্তব চরিত্র-সৃষ্টির অসামান্য শক্তি তাঁহার ছিল। দেবযানীর চরিত্র অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু ভাব, আদর্শ ও তত্ত্ব তাঁহার চোখে এমনই মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছিল যে নগ্নদৃষ্টি তাঁহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি সামান্যের মধ্যে অসামান্য, বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ, বাস্তবের মধ্যে আদর্শের অনুসন্ধান করিয়াছে এবং তাহা না দেখিলে তাঁহার কবি-মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় নাই। তাই তাঁহার কবিসৃষ্টি ভাবলোকের অপার্থিব বর্ণচ্ছটায় মণ্ডিত হইয়া একটা উচ্চস্থান হইতেই আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, আমাদের দোসর হইয়া আমাদের সুখে-দুঃখে, অমৃত-গরলে অংশ গ্রহণ করে নাই। আদর্শকে আমরা শ্রদ্ধা করি, বাস্তবকে ভালোবাসি। গান্ধারীকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে ভালোবাসি।

গান্ধারীর চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক সরল, একটা প্রবল দ্বন্দ্ব কোনো সময়ই তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া ওঠে নাই। মাতৃস্নেহ ও ধর্মবোধের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তাঁহার অন্তরে আছে বটে, কিন্তু সে মাতৃস্নেহ ধর্মচেতনার কাছে পরাজিত, তাহার সক্রিয় প্রভাব গান্ধারীর মনে কোনো দিন অনুভূত হয় নাই। সত্য ও ন্যায়ধর্মের মর্যাদারক্ষাতেই তাঁহার সমস্ত মানসিক প্রয়াস কেন্দ্রীভূত। ইহার জন্য তিনি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত,—পুত্রের এইরূপ শাস্তিবিধান করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে ভগবানের নিশ্চিত, কঠিন বিচারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

গান্ধারীর মতে সমস্ত স্বার্থ-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা ত্যাগ করিয়া সত্য বা ন্যায়ধর্মকে সর্বদা মর্যাদা দিতে হইবে,—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,—
ধর্মই ধর্মের শেষ।···
পুত্রে তব ত্যেজো এইবার,—···
ন্যায়ধর্মে করো না বিমুখ
পৌরবপ্রাসাদ হতে···

রাজাই ন্যায়ধর্মের রক্ষক, তাই গান্ধারীর ব্যাকুল নিবেদন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে,—

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত;—ধর্মরক্ষা কাজ
তোমা 'পরে সমর্পিত।···
মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান,—ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন নিষ্ফল হইলে গান্ধারী বিধাতার অমোঘ বিধানের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন,—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।

সেই বিধি দুর্নিবার ও ভীষণ। সে পিতা, পুত্র, মাতা কাহারো দিকে তাকায় না, নির্মম কৃপাণের মতো অন্যায়কারীদের উপর পতিত হয়।

লুটাও লুটাও শির, প্রণমো রমণী,
সেই মহাকালে, তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র-ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পর যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন; তারপরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি, নমো নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি!
শ্মশানের ভস্মমাখা পরম নিষ্কৃতি।

দুর্যোধন-পত্নী ভানুমতীকেও গান্ধারী শান্ত, সুসংযত ও দেবার্চনপর হইয়া সেই ভীষণ কালের প্রতীক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

দুর্যোধন ন্যায়ধর্মভ্রষ্ট রাজা। দম্ভ ও স্বৈরশাসনের সে মূর্তিমান বিগ্রহ। তাহার রাজধর্ম বিকৃত বা ছদ্ম রাজধর্ম বা রাজতন্ত্রে পর্যবসিত। রাজ্যশাসনে, পররাজ্যঅধিকারে. ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়-বিচার তাহার কাছে অর্থহীন। ছলে-বলে-কৌশলে শত্রু জয় করিয়া, জনমতের কণ্ঠরোধ করিয়া তাহার গর্বোদ্ধত বিজয়ী শির উচ্চ রাখাকেই সে রাজধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

রাজধর্মে, ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আমি আজি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,—

ধৃতরাষ্ট্র

জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয়?
লজ্জাহীন অহংকারী।

দুর্যোধন

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখেদন্তে নাহিক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়। মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে,—জয়লাভ এক লক্ষ্য তার,—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র

আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধন

নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে।

ধৃতরাষ্ট্র

ওরে বৎস, শোন্।
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূর প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।

দুর্যোধন

অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজ-মর্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ। প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,—
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,—
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর পাণ্ডব ভ্রাতারে—
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য; আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি।

ইহাই স্বৈরাচারী রাজার শাসনের মর্মকথা—ইহাই তাহার কর্মধারার অন্তর্নিহিত চিন্তা বা দর্শন।

দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতী দুর্যোধনের যোগ্যা পত্নী। শত্রু-পরাজয়ে তাহার অসীম আনন্দ এবং পরাজিতা, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর রত্ন-অলংকার পরিয়া গর্ব অনুভব করিতে তাহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই। বরং তাহাতেই তাহার জয়োল্লাস। কোনো ন্যায় বা নীতির বিচার তাহার কাছে নাই। ক্ষত্রিয়-নারীর চঞ্চল, পরিবর্তনশীল সৌভাগ্য তাহার অবিদিত নাই, তাই যতক্ষণ সে সৌভাগ্য থাকে, তাহার পূর্ণ সুযোগ লওয়াই বিবেচনার কার্য। তাই গান্ধারীর ভর্ৎসনার উত্তরে সে বলিতেছে,—

মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী। দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমাসূর্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দিন দুর্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবি,
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

ভানুমতীও দুর্যোধনের মতো ছদ্মধর্মকে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ ক্ষত্রিয়-নারীর ধর্ম ন্যায় বা নীতিনিরপেক্ষ নয়। এই ছদ্মধর্মও যথেষ্ট যুক্তি এবং উপযোগিতার উপর স্থাপিত, তাই দুর্যোধন ও ভানুমতীর কথা অসঙ্গত বা অশোভন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এসব যুক্তির মিথ্যা ধরা পড়ে।

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ মূল মহাভারত হইতে কিছু কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু নির্মাণটি তাঁহারই রূপ ও ভাবৈশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার রচনা-শিল্পের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে।

মূল মহাভারতে আছে, দ্রৌপদীকে বরদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিয়া দিলে, পাণ্ডবেরা যখন ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তখন আবার পাশা-খেলার জন্য ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময় গান্ধারী ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া পুত্র দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতেছেন,—

জাতে দুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাষত।
নীয়তাং পরলোকায় সাধ্বয়ং কুলপাংসনঃ॥
ব্যনদজ্জাতমাত্রো হি গোমায়ুরিব বিস্বরম্।
অন্তো নূনং কুলস্যাস্য তন্নিবোধত ভারত॥
মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।
মা বালানামশিষ্টানামনুসংস্থা মতিং প্রভো॥

মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।
বন্ধং সেতুঃ কো নু ভিন্দ্যাদ্ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্‌॥
(সভাপর্ব, ৭২ অধ্যায়, শ্লোক—২।৩।৪।৫)

মহারাজ! দুর্যোধন জন্মিলে পর মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন যে, এই কুলকলঙ্ক পুত্রটাকে মারিয়া ফেলুন।

কারণ, আপনার এই পুত্রটা জন্মিবামাত্রই শৃগালের ন্যায় বিকৃতস্বরে শব্দ করিয়াছিল। সুতরাং হে ভরতনন্দন! আপনি ইহা জানিয়া রাখুন যে, নিশ্চয়ই এই পুত্র হইতে এই বংশের ধ্বংস হইবে।

ভরতনন্দন! আপনি নিজের দোষে দুঃখসমুদ্রে মগ্ন হইবেন না; প্রভু! আপনি মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রগণের মতে অনুমোদন করিবেন না।

আপনি দারুণ বংশনাশের কারণ হইবেন না। কোন্‌ ব্যক্তি বন্ধ সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়? কোন্‌ ব্যক্তিই বা নির্বাণ অগ্নিকে আবার জ্বালাইয়া তোলে?

তথা তেন কৃতং রাজন্‌! পুত্রস্নেহান্মহামতে।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ॥৯

হে মহামতি রাজা! আপনি তখন পুত্রস্নেহবশতঃ দুর্যোধনটাকে ত্যাগ করেন নাই; এবং বংশনাশের জন্য তাহার ফল উপস্থিত হইয়াছে—জানুন।

অথাব্রবীন্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিণীম্‌।
অন্তঃ কামং কুলস্যাস্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্‌॥১১
যথেচ্ছন্তি তথৈবাস্তু প্রত্যাগচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ।
পুনর্দ্যূতং প্রকুর্বন্তু মামকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ॥১২

তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র ধর্মজ্ঞা গান্ধারীকে কহিলেন—এই বংশের সম্পূর্ণ ধ্বংসই হউক, আমি বারণ করিতে পারিতেছি না।

সুতরাং পুত্রেরা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হউক, পাণ্ডবেরা ফিরিয়া আসুক এবং আমার পুত্রেরা পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করুক। (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ)

ইহাই মূল মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গান্ধারীর আবেদন। বনগমনের পূর্বে দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার সময় গান্ধারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী শেষ বনগমনের সময় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর গান্ধারীর নিকট বিদায়-গ্রহণ মূলে নাই। মূলে দ্রৌপদী কুন্তীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং বিদায়কালে বিদুর যুধিষ্ঠিরাদিকে উপদেশ ও ভরসা দিয়াছে। বিদুরের উক্তিগুলি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, তাহার কিছু কিছু তিনি গান্ধারীর মুখে আরোপ করিয়াছেন।

সোমাদাহ্লাদকত্বং ত্বমদ্ভ্যশ্চৈবোপজীবনম্‌।
ভূমেঃ ক্ষমাঞ্চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলঞ্চাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদঃ॥
(সভাপর্ব, ৭৫ অধ্যায়, শ্লোক—১৬)

তুমি চন্দ্র হইতে আহ্লাদকারিতা, জল হইতে জীবনদাতৃতা, পৃথিবী হইতে ক্ষমা, সূর্য হইতে সমগ্র তেজ, বায়ু হইতে বল এবং সমস্ত ভূত হইতে সর্বপ্রকার গুণ লাভ কর।

বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ দুঃখব্রত পুত্র মোর।

গান্ধারী-চরিত্রের বীজ মূল মহাভারতে আছে। গান্ধারী যে সত্যধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিতা, তাহার নিদর্শন গান্ধারীর এই সব ও অন্যান্য উক্তিতে পাওয়া যায়। উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ যুদ্ধবিরতির জন্য আবেদন জানাইতে যখন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন, তখন গান্ধারী মানবিক ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে দুর্যোধনকে বহু উপদেশ দিয়াছিলেন এবং পাণ্ডব-দিগকে রাজ্যের অর্ধাংশ দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছিলে। (উদ্যোগপর্ব, ১২০ অধ্যায়, শ্লোক—১৯-৫৪) এই সব উক্তিতে এবং উদ্যোগপর্বের শেষে পুত্রদের যুদ্ধযাত্রার সময় 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' এই আশীর্বাদে এই মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইটুকু অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর বিদায়কালীন সাক্ষাতের অবতারণা করিয়া কবি গান্ধারী-চরিত্রকে আরো মহান্ ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রেরও সামান্য কিছু আভাস মূলে পাওয়া যায়।

পাণ্ডোঃ সুতান্ মা দ্বিষস্বেহ রাজন্! তথৈব তে ভ্রাতৃধনং সমগ্রম্।
মিত্রদ্রোহে তাত! মহান্ধর্মঃ পিতামহ যে তব তেঽপি তেষাম্॥
(সভাপর্ব, ৫২ অধ্যায়, শ্লোক—১০)

রাজা! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ করিও না; দুঃশাসন প্রভৃতির ধনের ন্যায় পাণ্ডবদের সমস্ত ধনও তোমার ভ্রাতারই ধন। তারপর বৎস! মিত্রদ্রোহে পুত্রদ্রোহে গুরুতর অধর্ম হয়। আর এক কথা—যাঁহারা তোমার পিতামহ, পাণ্ডবদেরও তাঁহারাই পিতামহ।

ইহার সহিত

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ।
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি।

এই অংশের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

দৈবের প্রতি বিশ্বাস ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা মূল মহাভারতে লক্ষ্য করি। তাঁহার অনেক উক্তিতে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

নেহ ক্ষত্তঃ! কলহস্তপ্স্যতে মাং ন চেদ্দৈবং প্রতিলোমং ভবিষ্যৎ।
ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং সর্বং জগচ্চেষ্টতি ন স্বতন্ত্রম্।
(সভাপর্ব, ৫৪ অধ্যায়, শ্লোক—২৩)

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—বিদুর! দৈব যদি প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে সন্তপ্ত করিতে পারিবে না। দেখ—বিধাতা এই সমগ্র জগৎটাকেই দৈবের অধীন রাখিয়াছেন; সুতরাং জগৎ দৈব অনুসারেই কাজ করে, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না।

ইহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রেও পাওয়া যায়,—

এখন তো আর
বিচারের কাল নাই—নাই প্রতিকার,
নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য মৌলিক সৃষ্টি।

সতী

(২০শে কার্তিক, ১৩০৪)

'সতী' কাব্যনাট্যে অতি উচ্চাঙ্গের নাটকীয়ত্ব বর্তমান। সমস্ত ঘটনার অনিবার্য পরিণাম একটি যুদ্ধোত্তর শ্মশানদৃশ্যে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। বিপরীতমুখী ভাবের সংঘর্ষে পাত্র-পাত্রীর চিত্ত-দ্বন্দ্ব চরমে উপনীত হইয়া একটা মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। একটি দৃশ্যই যেন একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নাটক—একটা বৃহৎ নাটকের ঘনীভূত রূপ। পল্লবিত অভিভাষণ বা দীর্ঘ লিরিক উচ্ছ্বাস ইহাতে অনেকখানি সংযত ও সংহত; প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যাভিমুখী, পরিমিত সংলাপ স্বাভাবিকভাবে ঘটনার গতিকে পরিণামের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে নাটকীয় গুণে 'সতী'ই শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের আখ্যানভাগ একটি মারাঠী গাথা হইতে গৃহীত। বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাই-এর বিবাহ ঠিক হইয়াছিল জীবাজির সহিত। জীবাজি বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় পথের মধ্যে বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ্ তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করে এবং তাহারই বরপরিচ্ছদ পরিয়া ও শিবিকায় চড়িয়া. লোকজন ও মশাল লইয়া বিনায়ক রাও-এর বাড়ীতে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়। এদিকে জীবাজি আসিয়াছে বলিয়া উপস্থিত সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই মুসলমান সভাসদ্ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া বিস্ময়বিমূঢ় কন্যাপক্ষীয়দের মধ্য হইতে ঝড়ের মতো অমাবাইকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তারপর জীবাজি বন্ধনমুক্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত। তখন বিনায়ক রাও, জীবাজি প্রভৃতি সকলে বিবাহের হোমাগ্নি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, এই মুসলমান দস্যুকে বধ করিয়া তাহারা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে।

এদিকে অমাবাই তাহার অপহারককে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার পত্নীত্বের মর্যাদা লইয়া তাহার ঘরে বাস করিতেছে। তাহাদের একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছে।

তারপর বহুদিন পরে তাহাদের প্রতিজ্ঞা-পালনের সুযোগ ঘটিল। ভীষণ নৈশযুদ্ধে বিনায়ক রাও মুসলমানকে পরাজিত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে বধ করিয়াছে, জীবাজি সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। এমন সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অমাবাই-এর সঙ্গে বিনায়ক রাও-এর দেখা। বিনায়ক অমাকে মুসলমানের গৃহ ছাড়িয়া, পুত্রকেও ছাড়িয়া, গঙ্গাতীরে তীর্থে বাস করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান ও শিবনাম জপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু অমাবাই বলিল, সে কোনো পাপ করে নাই, কায়মনোবাক্যে সে পতিসেবা করিয়াছে, সে সতী। এমন সময় অমাবাই-এর মাতা রমাবাই-এর রণক্ষেত্রে প্রবেশ। সে এই কলঙ্ককালি কন্যার সতীখ্যাতি রটাইয়া ঢাকিবার ইচ্ছায় বাগ্‌দত্ত স্বামী জীবাজির চিতায় তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিবার আয়োজন করিল। তখন অসহায়া কন্যার প্রতি বিনায়কের স্নেহ ও করুণার আবির্ভাব হইল। সে তাহাকে পুত্রসঙ্গে তাহার নিকট যাইতে বলিল। কিন্তু রমাবাই-এর আদেশে জীবাজির সৈন্যগণ বৃদ্ধ বিনায়ক রাওকে বন্দী করিল এবং বাগ্‌দত্ত পতি জীবাজির চিতায় অমাবাইকে স্থাপন করিয়া উচ্চ বাদ্যধ্বনি ও সতীত্বের জয়ধ্বনির মধ্যে তাহাকে পোড়াইয়া মারিল। এই ঘটনাটিই এই কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু।

এই কাব্যনাট্যে একমাত্র বিনায়ক রাও-এর চরিত্রে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দ্বন্দ্ব ধর্মের আদর্শ ও সন্তানস্নেহের মধ্যে। এই ধর্ম সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র সমাজধর্ম—একটা

সামাজিক সংস্কারমাত্র। এই ক্ষুদ্রধর্মের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণকন্যার হরণকারী যবনকে সে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে, কন্যা যবনই তাহার প্রকৃত স্বামী এবং সে যবনের ধর্মপত্নী বলিয়া বারবার ঘোষণা করিলেও তাহাকে পুত্র ছাড়িয়া, যবন দস্যুর চিন্তা ছাড়িয়া, গঙ্গাতীরে শিবনাম জপের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিয়াছে। কিন্তু যখন রমাবাই তাহার গর্ভের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য অমাবাই-এর বাগ্‌দত্ত স্বামী জীবাজির চিতায় তাহাকে পুড়াইয়া মারিতে সংকল্প করিল, তখনই বিনায়কের হৃদয়ের নিত্যসত্যধর্ম—পিতৃধর্ম জাগরিত হইল। সন্তানের হৃদয়ভেদী পরিণাম-চিন্তায় নিরুদ্ধ স্নেহের উৎসমুখ খুলিয়া গেল. আচার বা সংস্কারের বন্ধন আর তাহাকে রোধ করিতে পারিল না। সন্তানস্নেহ তখন নিত্যসত্য পিতৃধর্মে রূপান্তরিত হইল এবং সর্বসংস্কারধর্মমুক্ত বিনায়ক তখন শাশ্বত পিতৃধর্ম—হৃদয়ধর্মের চরম জয়ঘোষণা করিল।

প্রথমে সমাজ-সংস্কার ও পিতৃস্নেহের সহিত তাহার একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তবে তখনও সংস্কার প্রবল, কেবল কন্যার দুঃখগ্লানিদগ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটা সহানুভূতি উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। তাই তাহার নিজের সংস্কার-অনুযায়ী যবনের স্মৃতি ও পুত্র ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আবার নির্মল হইয়া পিতার কোলে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে।

অতীত নির্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত ক'রে দিক তোরে। সদ্য শিশুসম
আরবার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি-মাতার গর্ভ হতে। নব দেশে,
নব তরঙ্গিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ করে।

তারপর রমাবাই যখন জীবাজির চিতায় অমাকে পোড়াইয়া সতী নাম প্রচার করিবার সংকল্প প্রকাশ করিল, তখন সেই সন্তানস্নেহ প্রবল হইয়া সংস্কারকে পরাজিত করিল। বিনায়ক অমাকে তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিল, সেই সংসারই তাহার পক্ষে তীর্থক্ষেত্র—ধর্মক্ষেত্র। পূর্বে যে কন্যাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিত্য গঙ্গাস্নান ও জপতপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং নিষ্পাপ হইয়া সমাজের বাহিরে দূরদেশে নবশিশুর মত পিতার কাছে থাকিতে বলিয়াছিল, এখন সেই মত পরিবর্তন করিয়া সে নিজে তাহাকে স্বামীর গৃহে ফিরিতে বলিল এবং স্বীয় পত্নীকে অমার পক্ষে স্বামি-গৃহে ফিরিবার যৌক্তিকতা দেখাইল,—

যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।...
যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তর ছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুষ্কায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে; সে যে ফলেফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে

নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন
ধর্মে বাঁধিছে না তা'রে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।—যাও বৎসে চলে,
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে—যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে—অভিনব
ধর্মক্ষেত্র মাঝে।

শেষে যখন অবিচলিত-হৃদয় রমাবাই কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিল না, এবং জীবাজির সৈন্যগণকে অমাবাইকে বন্দী করিতে আদেশ দিল, তখন ক্ষুদ্র সংস্কারধর্ম বিনায়কের হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন পিতৃস্নেহ নিত্য হৃদয়ধর্মে—চিরন্তন মানবধর্মে পরিণত হইল। তখন রুদ্ধ চোখ তাহার খুলিয়া গিয়াছে—সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে সে কন্যাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল।

আয় বৎসে। বৃথা আচার বিচার।
পুত্র লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়।

কিন্তু শেষমুহূর্তে সে নিজেই বন্দী হইয়া কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র সমাজধর্ম জয়ী হইল—সত্য ধর্ম উপেক্ষিত হইল।

অমাবাই-এর জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। সে যবনকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে; প্রেমে জাতিকুল-বিচার নাই, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই, হৃদয়ের স্বতউৎসারিত এই আবেগ। পত্নীভাবে সে স্বামীকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, তাহার ভালোবাসা পাইয়াছে, তাহার সন্তান গর্ভে ধরিয়াছে। সতীধর্ম তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যবনকে বিবাহ করায় তাহার জাতি গিয়াছে, ধর্ম গিয়াছে—একথা সে বিশ্বাস করে না। এই সামাজিক সংস্কারের কোনো প্রভাব তাহার উপরে নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এ-কথা সে পিতাকে বুঝাইয়াছে, মাতাকে বুঝাইয়াছে, আচার-ধর্মমোহগ্রস্ত মাতাকে ধিক্কার দিয়াছে, অন্যায়ভাবে পরপুরুষের চিতায় তাহাকে পুড়াইবার সিদ্ধান্তে বিধাতার ন্যায়দণ্ড মাতার শিরে বজ্রাঘাত হানুক বলিয়া সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে।

সে পিতাকে বলিয়াছে,—

তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।

বরমাল্যে বরেছিন্ তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিন্ পতির সন্তান
গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান।...
হৃদয় অর্পণ
করেছিন্ বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ। ধর্মের সে নয়।
অন্তরে অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।

মাতা ম্লেচ্ছ মুসলমানকে পতি বলায় বিদ্রূপ করিলে সে গর্বোন্নত শিরে বলিয়াছে,—

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যমনে
পূজিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে। নহি আমি হীনা
জননী, তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

মাতার নির্মম সংকল্পে সে বলিয়াছে,—

ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,—
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধো যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য ক'বে—
কিন্তু মাতঃ নিত্যকাল অপরাধী র'বে
শ্মশানের অধীশ্বর পদে।

মাতার সংকল্প অচল, অটল, নিদারুণ দেখিয়া শেষমুহূর্তে সে ভগবানের কাছে ন্যায়-বিচার চাহিয়াছে,—

জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু,—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

অমাবাই সত্যধর্মের তুলাদণ্ডে তাহার নিজের সমস্ত আচরণ মাপ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ সে দেখে নাই। তাই তাহার কার্যে সে লজ্জিত নয়, অনুতপ্ত নয়, পিতা-মাতার ক্ষুদ্র সমাজধর্মের ব্যাখ্যায়, তাহাদের দুঃখ-লজ্জায় সে বিচলিত হয় নাই। অপরি-বর্তনীয়, অনমনীয় ন্যায়বুদ্ধি ও নিষ্পাপ বিবেক-চেতনা তাহার চরিত্রে আগাগোড়া একটা অসাধারণ দীপ্তি দান করিয়াছে।

রমাবাই বিচার-বিবেকহীন, অবিচলিত সংস্কারধর্মের প্রতীক। সংস্কার তাহার জীবনে এমন বদ্ধমূল যে, উহার প্রভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিচার-বুদ্ধি সব মৃত। সংস্কার, প্রথা ও লোকমতই তাহার জীবনে সত্য। তাহার রক্ষার জন্য সে যে-কোনো উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নয়। লোকে কন্যার বিধর্মী-বিবাহে মাতার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারে মনে করিয়া সে বাগ্‌দত্ত পতির সহিত তাহাকে একচিতায় পুড়াইয়া সতীখ্যাতি রটাইয়া দিবে। সন্তান-স্নেহ ও হৃদয়ের উপরে তাহার লোকনিন্দার ভয় ও লোকখ্যাতির আগ্রহ। সমাজবিধি ও লোকমতই তাহার ভালোমন্দের মাপকাঠি,—বিচারহীন, বিবেকহীন-ভাবে উহাই পালন করা তাহার ধর্মের আদর্শ। তাই সে বলিয়াছে,—

কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে,
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশান ধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

কন্যা অমাবাই যেমন সত্যধর্মে স্থির-বিশ্বাসী, মাতা রমাবাই তেমনি ক্ষুদ্র সমাজধর্মে অবিচল-বিশ্বাসী। দুইটি নারীচরিত্রের মধ্যেই কোনো দ্বন্দ্ব নাই। উভয়েই নিজ নিজ বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীরে সুরক্ষিত।

গান্ধারীর মতো অমাবাই সত্য ও ন্যায়ধর্মের প্রতীক। গান্ধারী যেমন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, অমাবাই তেমনি পিতামাতার কাছে ক্রমাগত দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠে সত্য ও ন্যায়ধর্মের আবেদন জানাইয়াছে।

রমাবাই সামাজিক ও লৌকিক সংস্কার বা সমাজধর্মকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কোনো প্রতিকূল শক্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে তাহার সমাজ-ধর্মপালনে স্থিরসংকল্প এবং কঠিন ও নির্মম কার্যসাধনেও পরাঙ্মুখ নয়। এদিক দিয়া তাহার চরিত্রে গান্ধারী বা অমাবাই-এর মতো একটা দৃঢ়তা আছে। বরং তাহার দৃঢ়তা একেবারে পাথরের মতো নিরেট ও অচল। সংস্কার বা প্রথা যুক্তিবিচারের ধার ধারে না, তাই তাহার প্রতি নিষ্ঠা হয় অন্ধ, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর ও আবেগময়। রমাবাই-এর চরিত্রের এই অন্ধনিষ্ঠা একটা উৎকট, হৃদয়হীন রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল সত্যধর্ম ও পুত্রস্নেহের মধ্যে। তাহাতে পুত্রস্নেহই জয়লাভ করিয়াছিল—সত্যধর্মের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। বিনায়কের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব আসিয়াছিল সামাজিক প্রথা বা ক্ষুদ্রসমাজধর্ম ও সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে। এই ধর্ম মিথ্যা বা ছদ্ম ধর্ম। সন্তান-বাৎসল্য এই ক্ষুদ্র ধর্মকে ধ্বংস করিয়া বৃহৎ সত্যধর্মের দ্বারে তাহাকে পোঁছাইয়া ছিল। বরং সন্তান-বাৎসল্যই রূপান্তরিত হইয়া গেল সত্য পিতৃধর্মে, হৃদয়ধর্মে—নিত্য সত্যধর্মে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এই সন্তানবাৎসল্য সত্য ও ন্যায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ অন্ধ পিতৃধর্মে পরিণত হইয়া রহিল। বিনায়ককে এই সন্তানবাৎসল্য সংস্কারধর্মের ঊর্ধ্বে উঠাইয়া নিত্যধর্মের মন্দিরে লইয়া গেল, আর ধৃতরাষ্ট্রকে এই সন্তানবাৎসল্য সত্য ও ন্যায়ধর্মকে পদদলিত করিয়া সংকীর্ণ স্বার্থপরতার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল। এক সন্তানবাৎসল্যই উভয়ের জীবনে বিপরীতভাবে ক্রিয়া করিল।

নরকবাস

(৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৪)

'নরকবাস' কাব্যনাট্যটি মহাভারতের একটি উপাখ্যানের উপর গড়িয়া তোলা হইয়াছে। মূল মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে একশত-পাঁচ অধ্যায়ে সোমক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। কাহিনীটি এইরূপ,—

"লোমশ বলিলেন—'রাজা যুধিষ্ঠির! 'সোমক'-নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য একশত ভার্যা ছিল।

কিন্তু সেই রাজা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বহুকালেও সেই ভার্যাদের গর্ভে কোন পুত্র লাভ করেন নাই।

ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যত্নপূর্বক চেষ্টা করিতে লাগিলে, সেই একশত স্ত্রীর মধ্যে 'জন্তু'-নামে একটী পুত্র জন্মিল।

নরনাথ! মাতারা সকলেই কামভোগ পিছনে রাখিয়া সর্বদাই সেই বালকটীকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

তাহার পর কোন সময়ে একটা পিপীলিকা সেই জন্তুর নিতম্বদেশ দংশন করিল; তখন সেই যাতনায় সেই বালক আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

তদনন্তর সেই মাতারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, জন্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া, সম্মিলিতভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন; তাহাতে সেই শব্দ তুমুল হইয়া পড়িল।

সুতরাং মন্ত্রিসভার মধ্যে যাজকের সহিত উপবিষ্ট সেই রাজা তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন।

তাহার পর 'এটা কি' ইহা জানিবার জন্য রাজা একজন দৌবারিককে পাঠাইয়া দিলেন; সেই দৌবারিক জানিয়া আসিয়া রাজার নিকট পুত্রের বিষয় যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিল।

তখন অরিন্দম সোমক রাজা সত্বর উঠিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে আশ্বস্ত করিলেন।

যুধিষ্ঠির! তাহার পর সোমক রাজা সেই পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া ঋত্বিক্ ও মন্ত্রিবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন।

সোমক বলিলেন—'পুত্র না হওয়া বরং ভাল; কিন্তু একটীমাত্র পুত্র হওয়াকে আমি ধিক্কার দি। কারণ, প্রাণিগণের সর্বদাই পীড়া হওয়া সম্ভব বলিয়া একটীমাত্র পুত্র কেবল উদ্বেগেরই বিষয়।

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ! আমি পুত্রার্থী হইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া নিজের যোগ্য এই একশত ভার্যা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহাদের সন্তানই হইল না!

তা'র পর সকল ভার্যাই পুত্রের জন্য যত্নপরায়ণ হইলে, 'জন্তু'-নামে আমার এই একটীমাত্র পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে?

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার ও আমার ভার্যাগণের যৌবনবয়স অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার ও তাহাদের প্রাণগুলি সমানভাবে এই একটী পুত্রেরই অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এবং সুকর বা দুষ্কর যে কর্মদ্বারা আমার একশত পুত্র হইতে পারে, তেমন কর্ম করা সম্ভব হয় কি?'

যাজক বলিলেন—'মহারাজ! এরূপ কর্ম আছে, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে, আপনি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন, তবে বলিব।'

সোমক বলিলেন—'কর্তব্যই হউক বা অকর্তব্যই হউক, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে, তাহা আমি করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আপনি মনে করুন; আপনি আমার নিকট তাহা বলুন।'

যাজক বলিলেন—'রাজা! আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, আপনি তাহাতে আপনার পুত্র জন্তুদ্বারা হোম করিবেন; তাহা হইলেই অচিরকালমধ্যে আপনার সুন্দর একশত পুত্র হইবে।

জন্তুর বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, সেই ধূম আঘ্রাণ করিয়াই সেই মাতৃগণ আপনার অতিবলবান্ শতপুত্র উৎপাদন করিবেন।

এবং আপনার পুত্র জন্তু সেই ভার্যার গর্ভেই আবার উৎপন্ন হইবে; (তবে একটুকু বিশেষ হইবে যে,) উহার বামপার্শ্বে একটী স্বর্ণচিহ্ন হইবে।'

সোমক বলিলেন—'ব্রহ্মণ্! যে যে কার্য যে যে ভাবে করিতে হয়, সেই সেই কার্য সেই সেই ভাবেই করুন; আমি শতপুত্র কামনাবশতঃ আপনার বাক্যানুসারে সমস্তই করিব।'

লোমশ বলিলেন—'তাহার পর যাজক জন্তুনামক সেই পুত্রদ্বারা সোমকরাজাকে যজ্ঞ করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন 'হায় আমরা হত হইলাম' এইরূপ আর্তনাদ করিতে থাকিয়া, তীব্রশোকে আকুল হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে থাকিয়া, সেই বালকটীর দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত মাতারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যাজকও বালকটীর বামহস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলেন। তাহার পর যাজক, কুররীপক্ষিণীগণের ন্যায় আর্তনাদকারিণী জননীগণের হস্ত হইতে সেই পুত্রটিকে নিয়া ছেদন করিয়া, তাহার বসাদ্বারা যথাবিধানে হোম করিতে লাগিলেন। কুরুনন্দন! বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া জননীরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলেই গর্ভ ধারণ করিলেন।

নরনাথ ভরতনন্দন! তাহার পর দশম মাসে একশত ভার্যা হইতে সোমকরাজার পূর্ণ একশত পুত্র জন্মিল।

রাজা! তাহাদের মধ্যে জন্তু তাহার ভূতপূর্ব জননীর গর্ভেই জ্যেষ্ঠ হইয়া জন্মিল এবং সেই অপর রাজমহিষীদের প্রিয় হইল; কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রেরাও তেমন প্রিয় হইল না।

এবং জন্তুর বামপার্শ্বে সেই স্বর্ণচিহ্নও ছিল, আর সে, সেই একশত পুত্রের মধ্যে গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

তাহার পর সোমক-রাজার সেই যাজক পরলোকে গমন করিলেন; তৎপরে কিছু কাল অতীত হইলে সোমকও লোকান্তরে গেলেন।

তদনন্তর সোমক-রাজা সেই যাজককে ঘোর নরক ভোগ করিতে দেখিলেন; তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'ব্রাহ্মণ! আপনি নরকভোগ করিতেছেন কেন?'

তাহার পর নরকভোগকারী সেই যাজক রাজাকে বলিলেন—'রাজা! আমি আপনাকে যে যজ্ঞ করাইয়াছিলাম, তাহারই এই ফল ভোগ করিতেছি।'

ইহা শুনিয়া রাজর্ষি সোমক ধর্মরাজকে (যমকে) বলিলেন—'আমি উহার প্রতিনিধি-রূপে নরকে প্রবেশ করিব; আপনি আমার যাজককে মুক্ত করুন। কারণ, ঐ মহাত্মা আমার জন্যই নরক ভোগ করিতেছেন।'

ধর্মরাজ বলিলেন—'রাজা! অন্য লোক কখনও অন্যের পাপের ফল ভোগ করে না। আপনার এই সকল (স্বর্গলাভ) ফল দেখা যাইতেছে।'

সোমক বলিলেন—'ধর্মরাজ! এই বেদবক্তা যাজক ব্যতীত আমি পুণ্যলোক কামনা করি না। সুতরাং আমি উঁহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আমি কর্মদ্বারা উঁহার সহিত তুল্য। অতএব দেব! এই পুণ্য-পাপের ফলও আমাদের উভয়েরই সমান হউক।'

ধর্মরাজ বলিলেন—'রাজা! আপনার যদি এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এক সময়েই এই পাপের ফল ভোগ করুন, পরে আবার ইঁহার সহিতই সদ্গতি লাভ করিবেন।'

লোমশ কহিলেন—'পদ্মনয়ন সোমক-রাজা সেইভাবেই সমস্ত করিলেন; তাহাতে পাপক্ষয় হওয়ায় ঋত্বিকের সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন।'

রাজা! তাহার পর গুরুপ্রিয় সোমক-রাজা সেই যাজক ব্রাহ্মণের সহিতই আপন কর্মনির্জিত সমস্ত শুভলোক লাভ করিলেন।"

(হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ, শ্লোক ১—৪০)

এই কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় প্রয়োজনে ও ধর্মের আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য একটু রূপান্তরিত করিয়াছেন। মূলে রাজা সোমকের চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, জটিলতা নাই। শতপুত্রলাভের জন্য বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ধীরচিত্তে তিনি ছেলেকে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন, তারপর শতপুত্র লাভ করিয়াছেন এবং আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত ছেলেটিকেও ফিরিয়া পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে চিত্তের অন্তর্বিরোধ নাই বা বিভিন্নমুখী অনুভূতি নাই। রবীন্দ্রনাথের সোমকচরিত্রে দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা-পালন ও পিতার কর্তব্য বা পিতৃস্নেহের মধ্যে। প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া তিনি নিরপরাধ শিশুপুত্রকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সারাজীবন ধরিয়া এই অসহায় শিশুর জন্য বেদনার তুষানলে তিনি দগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার সমস্ত মর্তজীবনটাই যেন একটা নীরব ট্র্যাজেডি। জীবিতকালে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এই রাজা মৃত্যুর পর নিজেকে পাপী মনে করিয়া স্বেচ্ছাপ্রার্থিত নরক ভোগ করিয়াছেন। ধর্মাদর্শের দিক দিয়া বলিতে গেলে রাজা ক্ষত্রিয়-ধর্মের যূপকাষ্ঠে মানুষের হৃদয়ধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্ম বলি দিয়াছেন। এক অসহায় শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার বীভৎসতা মানুষের চিরন্তন চিত্তধর্মের বিরোধী, রাজার ধর্ম তাহার উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রজার উপর ন্যায়বিচার করা ও তাহাদের রক্ষা করা, পিতার ধর্ম তাহার শিশুসন্তানকে রক্ষা করা। যে ক্ষত্রিয়-ধর্মকে রক্ষা করিতে তিনি এই সব ধর্মকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতো নিত্য সত্যধর্ম নয়, তাহা ছদ্ম বা ক্ষুদ্র, খণ্ড ক্ষত্রিয়ধর্ম, নিত্য সত্যধর্মের মূলনীতির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ, প্রকৃত ধর্ম সকল ধর্মের সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষত্রিয়ধর্ম একটা অহংকারতৃপ্তি ও

কর্তব্যের ত্রুটি-ক্ষালনের উপায়স্বরূপ। ইহাতে মানুষের সকল ক্ষেত্রে কর্তব্যের বা ধর্ম-রক্ষার সামঞ্জস্যের ভিত্তি নাই, ইহা অপূর্ণ ক্ষত্রিয়-দম্ভের নামান্তরমাত্র। মূলে এই ক্ষুদ্র ধর্মের সহিত নিত্য সত্যধর্মের বিরোধই সোমকের চরিত্রে প্রতিফলিত। এই পরিপূর্ণ, সর্বাঙ্গীণ শাশ্বত ধর্মকে উপেক্ষা করাতেই তাঁহার অন্তরের এই বেদনা—ইহাতেই তাঁহার পাপসৃষ্টি—ইহাতেই জীবনে-মরণে নরক যন্ত্রণা-ভোগ।

কবি শিশুপুত্রের উপর সোমকের আসক্তির অপূর্ব কাব্যসমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়াছেন,—

সমস্ত সংসার-সিন্ধু-মথিত অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদয়
ছিল তার মুখ-'পরে—সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেই মতো রেখেছিনু তারে। সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম স্নেহ-পানে মোর
চাহিত সরোষচক্ষে; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হোত লজ্জামুখী।

বৃহৎ সত্যধর্ম উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র, খণ্ড ধর্ম-পালনের জন্য এহেন শিশুপুত্রকে রাজা হত্যা করিয়াছেন,—

মত্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম।

সারা জীবন অনুতাপের অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ হইয়াও এ পাপ যায় নাই, মৃত্যুর পরে নরকের আগুনেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

সে পাপ-জ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ,—এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।

সুতরাং তাঁহার জন্য স্বর্গের ব্যবস্থা ন্যায়বিচারহীন, অর্থহীন.—

আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার—
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান। দগ্ধ হব আমি
নরক-অনলমাঝে নিত্য দিনযামী,

তবু বৎস, সেই নিমিষের ব্যথা,
আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃ-মুখপানে চেয়ে,—পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস
তার নাহি হবে পরিশোধ।

তাই তাঁহার পাপের সহকর্মী ঋত্বিকের সহিত তিনি নরকভোগ করিতে প্রস্তুত।

সোমকের চরিত্র উচ্চ ন্যায়বোধ, অপরিসীম মহত্ত্ব ও দুঃখের তপস্যায় আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রেতগণ পর্যন্ত তাঁহাকে এই মহত্ত্ব ও ত্যাগে অভিনন্দন করিয়াছে,—

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী,
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহা বৈরাগি,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।

ঋত্বিক্‌ অনড় শাস্ত্রধর্মের মূর্তিমান প্রকাশ। শাস্ত্রের বিধি বা অনুষ্ঠানই তাহার জীবনে একমাত্র সত্য—উহাই তাহার জীবনের নিয়ামক শক্তি। বিচার-বিতর্ক জিজ্ঞাসা-সন্দেহের কোনো স্থান তাহার মনে নাই—সুকুমার চিত্তবৃত্তির প্রেরণা বা বিবেকের দংশন সে অনুভব করে না। ঋত্বিকের ধর্ম ক্ষুদ্র, খণ্ড, ছদ্ম শাস্ত্রধর্ম, ইহা হৃদয়ধর্ম, ন্যায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত, ইহা সর্বাঙ্গীণ, পরিপূর্ণ ধর্ম নয়। ইহা শাস্ত্র-তন্ত্র। জীবনে সে অনুশোচনা করে নাই—রাজার নৃশংস শিশুহত্যায় সে সাগ্রহে ঘাতকের কাজ করিয়াছে। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির মত সে শাস্ত্রধর্মের পূজারী বটে, কিন্তু রঘুপতির মতো তাহার ব্যক্তিগত দম্ভ নাই, সে নির্ব্যক্তিকভাবে, নির্বিকারভাবে, অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত শাস্ত্রের বিধান পালন করিয়াছে। অনুশোচনার কোনো আগুন তাহার অন্তরে জ্বলে নাই। সে তো যজমানের জন্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক্রিয়া করিয়াছে, ফল তো যজমানই ভোগ করিয়াছে, তাহার নরক ও রাজার স্বর্গবাসের ব্যবস্থা দেখিয়া রাজার প্রতি তাহার প্রবল ঈর্ষা হইয়াছে। তাই যখন ধর্মরাজ বলিল,—

যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধন হতে ছিঁড়ি করেছি বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

তখন ঋত্বিক্‌ সোমককে বলিতেছে,—

যেয়ো না, যেয়ো না তুমি চলে,
মহারাজ। সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো
মহারাজ, রহো হেথা।

এই দ্বিতীয় নরক ঈর্ষার নরক। ঋত্বিক্ তো অস্ত্রস্বরূপ—যে সেই অস্ত্র লইয়া বধকার্য সম্পাদন করিল, তাহার পক্ষে স্বর্গবাসের বিধান, আর যে কেবল উপায়মাত্র, সে গেল নরকে?

রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন রাজার প্রতি যমের উক্তিতে,—

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে।

ঋত্বিকের অনুতাপ হয় নাই বলিয়া পাপক্ষয় হয় নাই। তাই তাহার নরকবাস। অনুতাপ মানুষের হৃদয়ধর্মের একটা অভিব্যক্তি, ইহার স্ফুরণে বিকৃত শাস্ত্রধর্মপালনের দোষক্ষালন হয়, কারণ অনুতাপ তো প্রায়শ্চিত্তই বটে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত।

মূল মহাভারতের উপাখ্যানে ঋত্বিকের নরকবাস কিন্তু একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বেদ-পুরাণ প্রভৃতিতে নানা যজ্ঞের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঘৃত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবজন্তু মানুষ প্রভৃতিকে আহুতি প্রদানের কথা আছে। যজ্ঞে এই সব আহুতিদান তৎকালীন প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। মহাভারতকার সেকালের শাস্ত্রবিহিত কর্মকে কেন পাপকার্য আখ্যা দিলেন তাহা সহজবোধ্য নয়। টীকাকারগণের নিকটও এই বিষয়টি একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

" 'স বরুণং রাজানমুপসসার পুত্রো মে জায়তাং তেন ত্বা যজে' ইতি বহ্বৃচ-ব্রাহ্মণেন যজ্ঞে পুত্রবধবিধানাৎ কথমত্র পাপম্, পাপাভাবে চ কথং নরকভোগঃ—"

বহ্বৃচব্রাহ্মণের (ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ) ঐ বচন অনুসারে যজ্ঞে পুত্রবধে কোনো পাপ নাই, পাপ না থাকিলে আবার নরকভোগ কিসের?

তারপর "মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি" এই শ্রুতিবচনের দ্বারা হিংসামাত্রই পাপ বলিয়া বোধহয় পাপ হইয়াছে, এইরূপ তাঁহারা অনুমান করেন। তবুও তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য—শাস্ত্রানুসারে বৈধহিংসায় তো পাপ নাই, তবে এটা কেন পাপ?

"বৈধহিংসায়াং যৎ পাপাভাবো দর্শিতস্তচ্চিন্ত্যম্"—ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয় বটে। নীলকণ্ঠ এই পুত্রহত্যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় বলিয়াছেন, আবার এই বৈদিক প্রথাকে তান্ত্রিক 'অভিচার'-কর্মের সমশ্রেণী ধরিয়া পাপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। আর এইরূপ পাপ কেবল যাজকেরই হয়, তিনি খারাপ পথটা দেখাইয়া দেন বলিয়া,—'অভিচার-পাপং কুমার্গোপদেষ্টৃষু যাজকেষ্বেব।' মোটের উপর, এই পাপভোগপ্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই।

ধর্মের সহিত হিংসার সম্বন্ধ নাই, এই সর্বজনীন নীতি রবীন্দ্র-মানসের বদ্ধমূল ধারণা। হিংসা হৃদয়ধর্মকে উপেক্ষা করে, ধর্মপালনের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তির স্ফুরণে বাধা দেয়, প্রেম ও প্রীতি ধ্বংস করে। ইহা ধর্মের একটা হৃদয়হীন বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র। প্রকৃত ধর্মের ইহা বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের সংঘাতের ইহাই বীজ।

নরকের পরিকল্পনাতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বর্গের পথের ধারে ইহা এক অন্ধকারময় বিষাদলোক। আমাদের পুরাণাদিতে নরকের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত ইহার মিল নাই।

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকার লোক,—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল।...
স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়,—স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষা-জর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

মিল্টনের নরকের কল্পনা ইহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ ও যন্ত্রণাদায়ক,—

A dungeon horrible, on all sides round,
As one great furnace flamed ; yet from those flames
No light, but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe.
Regions of sorrow, doleful shades, where peace
And rest can never dwell, hope never comes
That comes to all ; but torture without end
Still urges, and a fiery deluge, fed
With ever-burning sulphur unconsumed.

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

(রচিত ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬)

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' ও 'গান্ধারীর আবেদন' রবীন্দ্রনাথের বহু-পঠিত ও বহু-প্রশংসিত কাব্যনাট্য। বাংলা-সাহিত্যে এই দুইটি কাব্যনাট্য ক্লাসিক-পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। চরিত্রবিশ্লেষণে, কাব্যসৃষ্টিতে, উচ্চ ধর্মাদর্শ ও বৃহৎ নীতির রূপদানে ইহারা বাঙালী-পাঠক-চিত্ত জয় করিয়াছে। জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতের আখ্যানবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণের চিত্তে ইহার আবেদন হইয়াছে ব্যাপক ও গভীর; এই চিরন্তন চরিত্রগুলি

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া নূতন রূপ ধরিয়া আমাদের কল্পনার নূতন গৌরবে বিরাজ করিতেছে।

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর বিষয়বস্তু স্থূলভাবে মহাভারতের ঘটনা হইতে গৃহীত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নিজের ভাব-কল্পনানুসারে সজ্জিত করিয়া সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অবতারণায় অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে আছে, কর্ণ কুন্তীকে তাহার গর্ভধারিণী মাতা বলিয়া জানিত না, কুন্তীই প্রথমে তাহার পরিচয় দিল। কিন্তু মূল মহাভারতে আছে, কর্ণ পূর্ব হইতেই একথা জানিত;—কৃষ্ণ কর্ণকে পূর্বেই একথা জানাইয়া পাণ্ডবপক্ষে আসিবার জন্য বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের এই দৌত্য নিষ্ফল হইলে কুন্তী কর্ণের দ্বারা পাণ্ডবদিগের গুরুতর অনর্থ হইবে ভাবিয়া নিজেই কর্ণের নিকট যাইয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিল। মূলের কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদ কর্ণের চরিত্রে অনেকখানি আলোকসম্পাত করিয়াছে। কর্ণের ন্যায়বুদ্ধি, ধর্মবুদ্ধি, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস, জীবনকে ঘটনার অনিবার্য পরিণামের উপর ছাড়িয়া দেওয়া ও জীবন সম্বন্ধে একটা আগ্রহ-হীনতা ও বিষাদের ভাব কর্ণের ভাষণে লক্ষ্য করা যায়। মূলের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ কর্ণের চরিত্র-গৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। কর্ণ কুন্তীকে প্রথমে সন্তানত্যাগের জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছে, তারপর তাহার কৌরবপক্ষ ত্যাগ অসম্ভব বলিয়া শেষে কেবল অর্জুনের সঙ্গেই যুদ্ধ করিবে এই আশ্বাস দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণচরিত্র কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদের কর্ণ-চরিত্রের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বহন করে।

মূলের কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদের কিছু কিছু অংশের অনুবাদ নীচে দেওয়া গেলঃ

> "'কানীন ও 'সহোঢ়'-নামে কন্যার গর্ভে যে দুইপ্রকার পুত্র জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা সেই কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদের পিতা বলিয়া থাকেন। কর্ণ! আপনি সেই অবস্থায় জন্মিয়াছেন বলিয়া কানীনপুত্রই বটেন। সুতরাং আপনি ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম ও ধর্ম অনুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব চলুন, আপনিই রাজা হইবেন।
>
> পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃপক্ষে পাণ্ডবেরা এবং মাতৃপক্ষে বৃষ্ণিবংশীয়েরা, এই দুই পক্ষকেই আপনি আপনার সহায় বলিয়া মনে করুন।
>
> মাননীয় কর্ণ! আপনি আজ এস্থান হইতে উপপ্লব্যনগরে উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা আপনাকে কুন্তীর পুত্র এবং যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া অবগত হউন। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্যু ইঁহারা আপনার চরণযুগল ধারণ করিবেন।
>
> পাণ্ডবগণের সাহায্যের জন্য সমাগত রাজগণ, রাজপুত্রগণ এবং সমস্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় লোক আপনার পদযুগল গ্রহণ করিবেন।
>
> রাজারা ও রাজকন্যারা আপনার রাজ্যাভিষেকের জন্য স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং ওষধি, সমস্ত বীজ, সকল রত্ন ও লতা আনয়ন করুন। আর দ্রৌপদী দেবী ষষ্ঠ সময়ে (প্রথম সময়ে) আপনার সহিত মিলিত হইবেন।
>
> প্রশস্তচিত্ত ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ধৌম্য অগ্নিতে হোম করুন এবং চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণরা আজ আপনাকে অভিষিক্ত করুন।"

(উদ্যোগপর্ব, ১৩১ অধ্যায়, শ্লোক ৮-১৬
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ)

কর্ণ কৃষ্ণের প্রস্তাবের উত্তরে বলিতেছে,—

"কৃষ্ণ! আপনি যাহা জানেন, আমিও সে সমস্ত জানি; ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ধর্মতঃ আমি পাণ্ডুরই পুত্র বটি।

জনার্দন! কুন্তীদেবী কন্যা অবস্থায় সূর্য হইতে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবের পরে সেই সূর্যের কথা অনুসারেই তিনি আমাকে ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণ! আমি সেই সন্তানই বটি এবং সেই অবস্থায় জন্ম হওয়ায় ধর্মতঃ আমি পাণ্ডুর পুত্রই বটি। কিন্তু যাহাতে আমার মঙ্গল হইতে পারে না, কুন্তীদেবী আমাকে সেইভাবেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মধুসূদন! তাহার পর সারথি অধিরথ দেখিয়াই আমাকে গৃহে আনয়ন করেন এবং স্নেহবশতঃ আপন ভার্যা রাধার হস্তে আমাকে সমর্পণ করেন।

মাধব! আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে দুগ্ধ আসিয়াছিল এবং তদবধি রাধা আমার মলমূত্র ধারণ করিয়াছেন।

অতএব ধর্মজ্ঞ ও ধর্মশাস্ত্রশ্রবণে নিরত আমার মত লোক কি করিয়া সেই রাধার পিণ্ডলোপ করিতে পারে?

আর সূত অধিরথ স্নেহবশতঃ সর্বদাই আমাকে পুত্র বলিয়া জানেন এবং আমিও ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে পিতা বলিয়াই জানি।

মাধব! জনার্দন! সেই অধিরথই পুত্রপ্রীতিনিবন্ধন শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে আমার জাতকর্মপ্রভৃতি সংস্কারকার্য করাইয়াছেন।

আবার তিনিই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আমার 'বসুষেণ'-নাম করাইয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, অনেক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

জনার্দন! কৃষ্ণ! সেই মহিলাদের গর্ভে আমার অনেক পুত্র ও পৌত্র জন্মিয়াছে এবং সেই মহিলাদের উপর আমার মন কামসংসৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

অতএব গোবিন্দ! সমগ্র পৃথিবী, স্বর্ণরাশি, আনন্দ কিংবা ভয় দ্বারা সেই সম্পর্ক আমি মিথ্যা করিতে পারি না।

তারপর কৃষ্ণ! আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে দুর্যোধনকে অবলম্বন করিয়া আজ ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতেছি।

আর সূতগণের সহিত মিলিত হইয়া আমি বহুবার বহুতর যজ্ঞ করিয়াছি এবং সূতগণের সহিত মিলিত হইয়াই আমি কৌলিকধর্মপালন ও বিবাহ করিয়াছি।

বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! দুর্যোধন আমার উপরে ভরসা করিয়াই অস্ত্রসংগ্রহ এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিয়াছেন।

এবং অচ্যুত! কৃষ্ণ! সেইজন্যই তিনি দ্বৈরথযুদ্ধে অর্জুনের প্রতিমুখগামী ও পরম প্রতিকূলরূপে আমাকে বরণ করিয়াছেন।

সুতরাং জনার্দন! বধ বা বন্ধনের আশঙ্কা, কিংবা ভয়, অথবা লোভবশতঃ আমি দুর্যোধনের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারি না।

যদুনন্দন কৃষ্ণ! আপনি এখন এই গুপ্ত আলোচনা গোপনই করিবেন; ইহাই আমি সর্বপ্রকার হিত বলিয়া মনে করি।

(না হইলে) ধর্মাত্মা ও সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠির যদি আমাকে কুন্তীদেবীর প্রথম পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, তবে আর তিনি রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।

অরিন্দম মধুসূদন! আমি সেই বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্য পাইয়াও (পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে) তাহা দুর্যোধনকেই সমর্পণ করিব।"

(উদ্যোগপর্ব, ১৩২ অধ্যায়, শ্লোক ২-২২;
অনুবাদ ঐ)

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধেও কর্ণের মনে একটা দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—

"বৃষ্ণিনন্দন জনার্দন কৃষ্ণ! দুর্যোধনের একটি অস্ত্রযজ্ঞ হইবে; এই যজ্ঞে আপনি উপদেষ্টা হইবেন এবং এই যজ্ঞে আপনাকে অধ্বর্যুর (যজুর্বেদীয় ঋত্বিকের) কার্যও করিতে হইবে।

সুসজ্জিত কপিধ্বজ অর্জুন এই যজ্ঞে হোতা (ঋগ্‌বেদীয় কর্মকর্তা) হইবেন, তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হইবে স্রুক্ (হোম করার পাত্র) এবং বিপক্ষ বীরগণের বীর্য হইবে ঘৃত।

মাধব! অর্জুনপ্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রহ্ম ও স্থূলাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রের মন্ত্রই সেই যজ্ঞের মন্ত্র হইবে।

পিতার (অর্জুনের) অনুকারী অথবা পরাক্রমে পিতা অপেক্ষা অধিক অভিমন্যু হইবেন সেই যজ্ঞে স্তোত্রপাঠক।

অতিমহাবল, হস্তিসৈন্যহন্তা ও নরশ্রেষ্ঠ সেই ভীমসেন গর্জন করিতে থাকিয়া ও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া উদ্‌গাতার (সামবেদীয় কর্মকর্তার) কার্য করিবেন।

সর্বদা জপ-হোমযুক্ত ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞের ব্রহ্মার কার্য করিবেন।

মধুসূদন! শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও ভেরীর শব্দ এবং উৎকৃষ্ট সিংহনাদ হইবে সেই যজ্ঞের বেদধ্বনি।

কৃষ্ণ! আমি দ্যূতসভায় দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে কটুবাক্য বলিয়াছিলাম, সেই গুরুতর অকার্যের জন্য অনুতপ্ত হইতেছি।

কৃষ্ণ! আপনি যখন আমাকে অর্জুন কর্তৃক নিহত দেখিবেন, তখন আবার এই যজ্ঞের বৃদ্ধি হইবে।

দুঃশাসন গর্বের সহিত গর্জন করিতে লাগিলে, ভীমসেন যখন তাহার রক্তপান করিবেন, তখন এই যজ্ঞের পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি হইবে।

জনার্দন! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী যখন দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, তখন এই যজ্ঞের অবসান হইয়া আসিবে।

মাধব! মহাবল ভীমসেন যখন দুর্যোধনকে বধ করিবেন, তখন দুর্যোধনের এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে।"

(উদ্যোগপর্ব, ১৩২ অধ্যায়, শ্লোক ২৯-৩৫,
৪৫-৪৯, অনুবাদ ঐ)

মূলের কর্ণ-কুন্তী-সমাগম হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলে কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদ ও রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝা যাইবে।

"কর্ণ তখন পূর্বমুখ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া জপ করিতেছিলেন; সেই সময়ে কুন্তীদেবী আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হইয়া কর্ণের জপ-সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার পিছনে দীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে কর্ণ, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জপ করিয়া পিছন ফিরিয়া কুন্তীকে দেখিয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ণ কহিলেন—রাধার গর্ভজাত অধিরথের পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনি কি জন্য আসিয়াছেন? বলুন, আমি আপনার কি করিব?

কুন্তী বলিলেন—তুমি কুন্তীর গর্ভজাত, রাধার গর্ভজাত নহ, কিংবা অধিরথও তোমার পিতা নহেন; এবং তুমি সারথির বংশেও জন্মগ্রহণ কর নাই। কর্ণ! তুমি সে বৃত্তান্ত আমার নিকট অবগত হও।

পুত্র! তুমি কুন্তিরাজার গৃহে আমার কন্যাবস্থায় জন্মিয়াছিলে, আমি তোমাকে প্রথম গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। সুতরাং তুমিও পার্থই বট।

যিনি এই জগৎপ্রকাশ করেন ও তাপ দান করেন, এই সূর্যদেবই তোমাকে আমার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এখন তুমি অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ হইয়াছ।

পুত্র! সেই তুমি ভ্রাতৃগণকে না চিনিয়া মোহবশতঃ ধার্তরাষ্ট্রগণের যে সেবা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে কোন প্রকারেই সংগত হইতেছে না।

পুত্র! পিতৃলোক ও স্নেহময়ী মাতা যে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই মানুষের পক্ষে ধর্ম; উহা ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে।

বৎস! পূর্বে অর্জুন অর্জন করিয়াছিলেন, পরে অসাধু ধার্তরাষ্ট্রেরা লোভবশতঃ হরণ করিয়াছে, এখন তুমি আবার বলপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে আনয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরগামিনী রাজ্যসমৃদ্ধি ভোগ কর।

আজ কৌরবেরা দেখুক যে, ভ্রাতৃসৌহার্দ্যবশতঃ কর্ণ ও অর্জুন মিলিত হইয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া দুর্জনেরা অবনত হইয়া পড়ুক।

রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় আজ কর্ণ ও অর্জুন মিলিত হউন। বৎস! তোমরা দুইজনে মিলিত হইলে, জগতে তোমাদের কি অসাধ্য থাকিতে পারে?

কর্ণ! তুমি পঞ্চ ভ্রাতৃকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাযজ্ঞবেদিতে দেবগণবেষ্টিত ব্রহ্মার ন্যায় নিশ্চয় শোভা পাইবে।

কর্ণ বলিলেন—ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যের আদর করি না এবং আপনার আদেশ পালন করাও যে আমার ধর্মের কারণ হইবে, তাহা স্বীকার করি না;

যে হেতু আপনি আমার উপরে অত্যন্ত কষ্টজনক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। জননি! আপনি যে আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট করিয়াছে।

আমি যদিও ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়া থাকি, তথাপি আপনার জন্যই ক্ষত্রিয়ের যোগ্য সংস্কার লাভ করি নাই। অতএব শত্রু ইহা অপেক্ষা অধিক অহিত আমার কি করিবে? আপনি দয়া করিবার সময়ে এ দয়া না করিয়া—এখন সংস্কারের কাল অতীত হইয়াছে, এখন (দয়া করিয়া) আমাকে ধর্মে প্রেরণ করিতে আসিয়াছেন!

এবং আপনি পূর্বে মাতার ন্যায় আমার হিতসাধনের চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু আজ সেই আপনিই কেবল নিজের হিতের জনাই আমাকে হিতের উপদেশ দিতেছেন।

কোন্ লোক কৃষ্ণের সহিত মিলিত অর্জুনকে ভয় না করে? অতএব আমি পাণ্ডবদের সভায় গেলে, কোন্ লোক আমাকে ভীত বলিয়া মনে না করিবে?
আমি পূর্বে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত ছিলাম না, এখন যুদ্ধকালে ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া যদি পাণ্ডবগণের পক্ষে যাই, তবে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন?
ধার্তরাষ্ট্রেরা আমার সুখ অনুসারে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু বিভাগ করিয়া আমাকে দিয়াছেন এবং আমার সম্মান করিয়াছেন, এখন আমি তাঁহাদের সেই কার্যগুলিকে কি করিয়া নিষ্ফল করিতে পারি?
যাঁহারা পরের শত্রুতা ঘটাইয়া সর্বদা আমার আনুগত্য করেন এবং বসুগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট অবনত থাকেন, সেইরূপ যাঁহারা সর্বদা আমার নিকট অনুগত থাকেন, আর যাঁহারা আমার শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শত্রুদের সমক্ষে অবস্থান করিবেন বলিয়া আশা করেন, আমি আজ সেই ধার্তরাষ্ট্রগণের সেই সকল আশা কি করিয়া ছিন্ন করি?
যাঁহারা অকাল যুদ্ধসাগরের কূলে যাইবার ইচ্ছা করিয়া অমা-রূপ ভেলা দ্বারাই সে দুস্তর যুদ্ধসাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছেন, আমি কি করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করি?
সে যাহা হউক, ধার্তরাষ্ট্রোপজীবিগণের ইহাই প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াও আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব।
কারণ, অনবস্থিতচিত্ত ও পাপিষ্ঠ যে সকল লোক রাজার অনুগ্রহে পরিপুষ্ট ও কৃতার্থ হইয়া কার্যকাল উপস্থিত হইলে সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বিকৃত হইয়া যায়, সেই ভর্তৃপিণ্ডাপহারী (নেমক-হারাম), রাজার বিষয়ে অন্যায়কারী ও কৃতঘ্ন-দিগের ইহলোকও থাকে না, পরলোকও থাকে না।
অতএব আমি সমগ্র শক্তি ও শিক্ষানৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া এবং সৎপুরুষোচিত দয়া ও চরিত্র রক্ষা করিতে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্য আপনার পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিব; ইহা আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলিলাম না। সুতরাং আপনার এই সকল বাক্য আমার হিতকারী হইলেও এখন আমি এগুলি রক্ষা করিতে পারিব না। তবে, আপনার এই উদ্যম আমার নিকটে ব্যর্থ হইবে না। কারণ, আপনার পুত্রদের মধ্যে অর্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব যুদ্ধে আমার নিকটে বধ্য হইলেও কিংবা তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলেও তাহা আমি করিব না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সৈন্যের মধ্যে অর্জুনের সহিত আমি (প্রাণপণে) যুদ্ধ করিব।
কারণ, আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করিয়া যুদ্ধশিক্ষার ফল লাভ করিব, কিংবা অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়া যশস্বী হইব।
যশস্বিনি! জননি! মোটের উপর আপনার পঞ্চপুত্র কখনও নষ্ট হইবে না (পাঁচ পুত্র থাকিবেই)। কারণ, অর্জুন নিহত হইলে আমাকে লইয়া পাঁচ পুত্র থাকিবে, কিংবা আমি নিহত হইলে অর্জুনকে লইয়া পাঁচ পুত্র থাকিবে।

(উদ্যোগপর্ব, ১৩৬ অধ্যায়, শ্লোক, ৪-২৩;
অনুবাদ ঐ)

মহাভারতের কবি কর্ণের চরিত্র যে ভাবে অংকিত করিয়াছেন, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্রের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে বলিয়া বিস্তৃত-ভাবে কর্ণ-কুন্তী-সাক্ষাৎ বিষয়ে মূলের কর্ণ-চরিত্রসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশগুলি সন্নিবেশিত করা হইল।

মহাভারতের কর্ণ একটি বিরাট ট্র্যাজিক চরিত্র। এক ক্রূর নিয়তির শৃংখলে সে সারাজীবন শৃংখলিত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের প্রতিপদে তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, ভাগ্যের পাষাণপ্রাচীর ভাঙিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কেবল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার রক্ত-ঝরা মাথায় পৌরুষের মুকুটই শোভা পাইয়াছে, কিন্তু কৃতকার্যতার মূল্য তাহার হাতে আসে নাই, প্রাচীর সে ভাঙিতে পারে নাই। যোগ্যতার উপযুক্ত সাফল্যপ্রাপ্তি তাহার জীবনে ঘটে নাই। অবশ্য তাহার জন্ম-রহস্য ইঁহার জন্য অনেকটা দায়ী, কিন্তু ইহাও তো তাহার নিষ্ঠুর নিয়তিরই নিয়ন্ত্রণ। রাজপুত্র হইয়াও সে সূতপুত্র হইয়াছে, কুন্তীর ছেলে হইয়াও সে রাধার ছেলে হইয়াছে। যে-সামাজিক মর্যাদা তাহার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। জীবনের কোনো কাজেই তাহার একটা আনন্দময় চরম সাফল্য আসে নাই। যোগ্যতার দাবী প্রায় সবক্ষেত্রেই উপক্ষিত হইয়াছে।

কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জীবনপথে তাহার অগ্রগমন। এক বিরাট পৌরুষ ও শক্তির প্রতীক সে। 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তম্ হি পৌরুষম্'—এই বাণীই নিরন্তর তাহার জীবনবীণায় ঝংকৃত। এই অবহেলিত, অভিশপ্ত জীবনকে যে বিস্মৃতির অন্ধকূপ হইতে রক্ষা করিয়াছে, এই ভস্মাবৃত বহ্নিকে যে মর্যাদা দান করিয়াছে, সে-ই সংসারে একটি মাত্র লোক দুর্যোধন। তাই দুর্যোধনের প্রতি কর্ণের কৃতজ্ঞতা অসীম। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের বহু ঊর্ধ্বে। তবুও সাধ্যমত কর্ণ জীবনমরণে সে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে।

কর্ণের রজতশুভ্র চরিত্র-পটে একটিমাত্র কালো দাগ হইতেছে পাশাখেলার সভায় অন্যায়ভাবে দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন ও দ্রৌপদীকে কটূক্তি করা। রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের পক্ষে তাহার নব-জন্মদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণশোধের এই প্রচেষ্টাটুকু অস্বাভাবিক নয় এবং ক্ষমার অযোগ্য নয়। ন্যায়ধর্মে অসীম অনুরক্ত কর্ণ পরক্ষণেই তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, তাই কৃষ্ণের কাছে তাহার অকপট দোষ স্বীকার ও অপরিসীম অনুতাপ।

কর্ণ বেশ বুঝিয়াছে, দুর্যোধনের পথ অন্যায় ও পাপের পথ, সেই পথ তাহাকে ও তাহার অনুবর্তিগণকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সে পথ হইতে ফিরিবার কাহারো উপায় নাই। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য সে অপেক্ষা করিয়া আছে। জীবনে তাহার একমাত্র বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ সে জীবন দিয়া শোধ করিতে প্রস্তুত। এই শোচনীয় ভবিষ্যতের জ্ঞান ও দুর্যোধনের পক্ষ-ত্যাগের অক্ষমতা তাহাকে নৈরাশ্যবাদী করিয়াছে। তাহার কোনো কর্মেরই সফলতা আসিবে না, তাহার বন্ধুর পক্ষে যুদ্ধ করিলেও তাহার জয় নাই, তাহার ও তাহার বন্ধুর জন্য নিশ্চিন্ত মৃত্যু অপেক্ষা করিয়া আছে। এ কথা সে কৃষ্ণকে বলিয়াছে। তবু তাহাকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জন করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে জীবনসম্বন্ধে একটা হতাশা বা বিষাদের ভাব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই নৈরাশ্য মূল-কর্ণ চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্রে মূলদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে মাতৃস্নেহাকাঙ্ক্ষা ও কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে। অতি শৈশবেই সে জননী-পরিত্যক্ত একথা লোকমুখে শুনিয়াছে। সেই

অজ্ঞাত-পরিচয়, রহস্য-যবনিকার অন্তরালবর্তিনী নারীর প্রতি অজানিতে তাহার মন উন্মুখ হইয়া আছে, স্বপ্নে কতো রাত্রে তাহার ছায়াময়ী মূর্তি সে দেখিয়াছে, আজ কুন্তীই যে সেই অজানা মা, তাহাই জানিয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রী অপূর্বসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে; সংসার ভুলিয়া, জীবনের শত-সহস্র কঠোর কর্মপ্রচেষ্টা হইতে নিজেকে কাড়িয়া লইয়া সেই মাতৃস্নেহলোকের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনির্বচনীয় মাধুর্য আস্বাদন করিবার জন্য সে আজ ব্যাকুল।

তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে—নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি জয়পরাজয়!
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কিন্তু অন্তর্জীবনের এই বিপ্লব, এই আত্মবিস্মৃতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই। কর্তব্যের নানা জটিল দুরূহ দাবী তাহাকে আত্মসচেতন করিয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্বের অটল শিলাসনে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কর্তব্যবুদ্ধি শীঘ্রই এই মাতৃস্নেহ-পিপাসার উপর জয়লাভ করিয়াছে। সৌভ্রাত্রের আবেদন, সিংহাসনের আশা তাহার কাছে কোনো অর্থই বহন করে নাই, আবার পূর্বজীবনে—স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রীতি, রাজ্যসম্পদের মধ্যে তাহার ফিরিবার কোনোই উপায় নাই, তাহার জন্য বেদনা ও ক্ষোভ হৃদয়ের গূঢ়তলে চাপিয়া বর্তমান পরিস্থিতিকে দৃঢ়চিত্তে সে গ্রহণ করিয়াছে।

মাতঃ সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।···

মূলের চরম ভুল সংশোধন করিবার আর সুযোগ নাই, একমুখী স্রোতোধারাকে ভিন্নমুখে ফিরাইবার আর উপায় নাই। তাই কর্ণের নৈরাশ্য ও বেদনাময় উক্তি,—

সিংহাসন! যে ফিরাল মাতৃ-স্নেহ-পাশ—
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস;
একদিন যে-সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে।

জীবনের অদ্ভুত রহস্যচিন্তায়, নিয়মিত এই মর্মান্তিক বিদ্রূপে, জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে একটা স্থিরবিশ্বাসে, জীবনের প্রতি কর্ণের একটা আগ্রহহীনতা, বিতৃষ্ণা বা বিষাদের ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সে প্রত্যক্ষ করিতেছে, যুদ্ধের পরিণাম সে জানে, কোনো কর্মের চরম সাফল্য তাহার নাই, তবুও তাহাকে নির্দিষ্ট, শুষ্ক কর্তব্য সম্পাদন করিতে

হইবে, অনিবার্য ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ মানিতে হইবে। তাই পঞ্চ-পাণ্ডবের অনিষ্ট-আশঙ্কা-বিহ্বল কুন্তীকে কর্ণ আশ্বাস দিয়াছে,—

মাতঃ করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সংগীত,—আশাহীন
কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক রাজা হোক পাণ্ডব-সন্তান—
আমি রবো নিষ্ফলের, হতাশের দলে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণচরিত্র নাটকীয়ত্ব ও চরিত্রগৌরবে মূল অপেক্ষা অনেক উন্নত। কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে আসন্ন সন্ধ্যায়। কুন্তী তাহার লজ্জাজনক কাহিনী বলিবার জন্য যেন রাত্রির আবরণ ও গোপনীয়তার সাহায্য লইতেছে। আর সে মায়ের আবেদন ও আহ্বান আনিয়াছে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে শিবিরের মধ্যে। জীবনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের সহিত আগামী দিনের যুদ্ধের চিন্তায় কর্ণের মন যখন পূর্ণ, সেই সংকটময় মুহূর্তে কুন্তীর আত্মপরিচয় ও আহ্বান একটা প্রবল বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে কর্ণের চিত্তে যে-বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নাটকীয় রসের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। মূলের ক্রুদ্ধ, কটূভাষী কর্ণকে রবীন্দ্রনাথ মাতৃস্নেহপিপাসু, ধীর, সংযত ও উদার-হৃদয় করিয়াছেন। কর্ণের সন্তানত্যাগের অনুযোগটি অপূর্ব শালীনতামণ্ডিত একটি ব্যথাতুর জিজ্ঞাসামাত্র—তাহাতে ক্রোধের বাষ্প নাই, মাতার প্রতি সন্তানের ন্যায্য অভিমানের একটা সূক্ষ্ম মধুর সুর আছে। নিয়তির এই অত্যাশ্চর্য পরিহাসকে সে শান্ত অশ্রুসজল চক্ষে গ্রহণ করিয়াছে। কর্ণ-চরিত্রে যে-হতাশা ও বিষাদের ভাব লক্ষ্য করা যায়, মূলের কর্ণ-চরিত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ইঙ্গিতকেই কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করিয়া কর্ণ চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যরূপে রূপায়িত করিয়াছে।

মূলের কুন্তীচরিত্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কুন্তীচরিত্র বহুগুণে সমৃদ্ধ। মূলে কর্ণের প্রতি কুন্তীর স্নেহ অপেক্ষা পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করার আগ্রহই বেশি পরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী পরিত্যক্ত সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য বেশি আগ্রহশীলা। তাহার মাতৃ-হৃদয়ের ঐশ্বর্য-গরিমা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই,—

পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে,
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান।

এতদিন সে আত্মপরিচয় দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত সন্তানের জন্য অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনীর জ্বালাময় দংশন নিরন্তর অনুভব করিয়াছে, অলক্ষ্য হইতে এই হতভাগ্য সন্তানের নম্র ললাট নীরব স্নেহাশিসে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে।

ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন,—তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি

ধর্মাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত এই কাব্যনাট্যটিতেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্ণের ধর্ম তাহার পৌরুষধর্ম বা বীরধর্ম। উপকারীর ও আশ্রয়দাতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ও তাহার প্রত্যুপকার-সাধন প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের কর্তব্য—তাহাই তাহার প্রকৃত ধর্ম। অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা বীরের ধর্ম নয়—উহা কাপুরুষ, মনুষ্যত্বহীনের কাজ। পরমবন্ধু দুর্যোধনের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না, তাহার পালক পিতামাতার ঋণ অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না, তাই কুন্তীর আহ্বান তাহার কাছে আকর্ষণীয় হইলেও তাহাতে সাড়া দিতে পারে নাই। নানা স্বার্থের প্রলোভনেও সে তাহার কর্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই, তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়াছে।

কুন্তী তাহার মাতৃধর্ম পালন করে নাই। সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে সে সদ্যোজাত, অসহায় শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মিথ্যা সমাজধর্ম বা সামাজিক আচারের কাছে সে মাতৃধর্মকে বলি দিয়াছে। তাই বিধাতার বিচারে তাহার বিদীর্ণ মাতৃবক্ষে আর তাহার পরিত্যক্ত পুত্রকে ফিরিয়া পায় নাই, ক্ষুদ্র শিশুই আজ মহাবীররূপে তাহার গর্ভের অন্যান্য পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। কুন্তীর ধর্মভ্রষ্টতার জন্য তাহার প্রতি বিধাতার এই নিদারুণ অভিসম্পাত।

হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেই দিন কে জানিত হায়
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

(রচিত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৪)

এটি একটি হাস্যরসাত্মক কাহিনী। ইহার স্থান অন্তঃপুর, চরিত্রগুলি সবই নারীর। তাহাদের মুখের কথাকে একটা সাবলীল, হালকা ছড়ার ছন্দে গাঁথিয়া চমকপ্রদ মিলের সমাবেশে কবি একটা নূতন কাব্যরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। মাঝে মাঝে গভীর ভাবের কথা প্রবাদবাক্যের সরসতা ও সৌন্দর্য লইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

এই কাব্যনাট্যটির আখ্যানবস্তু এইরূপ ঃ—

রানী কল্যাণী অত্যন্ত দানশীলা ও করুণাময়ী। দানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও সহৃদয়তার জন্য তিনি প্রজাবৃন্দ ও দাসদাসীগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র।

কিন্তু রানীর এক দাসী ক্ষীরো রানীর এই দানের স্বভাব ও তাঁহার যশের জন্য মনে পীড়া বোধ করে। রানীর ঐশ্বর্য ও অকৃত্রিম মুক্তদান তাহার সংকীর্ণ, কৃপণ, লোভী মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ক্ষীরো রানীর দানশীল স্বভাবের নিন্দা করে ও গোপনে রানীর অর্থ চুরি বা প্রতারণা করিয়া লইয়া নিজে ধনী হইতে চেষ্টা করে। রানী কোনো নূতন ভৃত্য রাখিলে সে অন্যায় কলহ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সে জানে এই নূতন লোকটি রানীর মুক্তহস্তের দানে তৃপ্ত হইবে। এই ভৃত্য না থাকিলে ঐ অর্থ তাহার প্রাপ্য হইবে। নিজের নানা আত্মীয়ের দ্বারা সে রানীর গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, যেন কোনো প্রকারে রানীর দান বাহিরে না যায় এবং তাহারই আপনার পরিজনবর্গ যাহাতে পায়, সর্বদা তাহারই নানা ফন্দি খোঁজে।

রানী ক্ষীরোর এই সকল সযত্ন প্রতারণা বুঝিতে পারিয়াও বিমুখ হন না, তাঁহার দানশীল স্বভাব হাসিমুখেই দান করিয়া চলে। ক্ষীরোর মনের ধারণা ও বিশ্বাস যে, লক্ষ্মীর কৃপায় ধনী অর্থ পায় এবং সেই প্রচুর ধনের সামান্য অংশ বিনা দ্বিধায় দান করিয়া সে দাতা ও যশস্বী হয়—ইহাতে দাতার মহত্ত্ব ও হৃদয়ের কোনো উচ্চ পরিচয় নাই। সে নিজে বিধিবিড়ম্বিত, লক্ষ্মীর একচোখা পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার তাহার অনুকূলে হয় নাই। যদি সে লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিত, তাহা হইলে রানী কল্যাণী অপেক্ষাও মুক্তহস্তে দান করিয়া প্রজা ও জনসাধারণের সকল দুঃখ নিমেষে দূর করিয়া দিত।

তাহার মনোভাব লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে, ধনী হইলেও সে পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, রুক্ষভাষী ও কৃপণস্বভাব; তাহার দুর্বলতা সে ত্যাগ করিতে পারিবে না; প্রজা বা জনসাধারণ কেহই তাহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র উপকৃত হইবে না এবং তাহার অন্তরের কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও নির্দয়তার জন্য লক্ষ্মী অপমানিত হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।

স্বপ্নে লক্ষ্মী ক্ষীরোকে বরদান করিলেন। ঐশ্বর্যময়ী রানী হইয়াও ক্ষীরো তাহার কৃপণ স্বভাব ভুলিল না, বুকের পাঁজরার কয়েকখানি হাড়ের মতো সে ঐশ্বর্যকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে লাগিল; দুঃখে বিপদে পড়িয়া কেহ তাহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইল না; রুক্ষভাষণে সকলেই ভর্ৎসিত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু ঐশ্বর্যের দম্ভ ও জাঁকজমকে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা গেল না। রানীর পদমর্যাদা ও গর্ব রক্ষা করিতে শত শত দাস-দাসী বিনা পারিশ্রমিকে গলদ্ঘর্ম হইতে লাগিল। তাহার পূর্ব আশ্রয়দাত্রী রানী

কল্যাণীও হৃতসর্বস্ব হইয়া তাহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিদায় লইলেন। অবশেষে লক্ষ্মী নিজে ছদ্মবেশে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভর্ৎসিত হইয়া বিদায় হইলেন এবং জানাইয়া গেলেন যে, লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিবার মতো উদার হৃদয় ও মহৎ আত্মা তাহার নাই।

স্বপ্ন ভাঙিলে নিজের চরিত্র-ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া ক্ষীরো রানী কল্যাণীর মহত্ত্বের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাহার এক পার্শ্বে নিজের সামান্য আশ্রয় ভিক্ষা করিল।

(৩)

রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি

'রাজা ও রানী,' 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের লক্ষণাক্রান্ত ও বস্তুধর্মিতার কিঞ্চিৎ সম্পর্কযুক্ত। যদিও ইহাদের মধ্যে লিরিক-অংশের প্রাধান্য বেশি এবং একটা ভাব বা তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার অপ্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বর্তমান, তবুও এই লিরিক ও তাত্ত্বিক ভাব-কল্পনা নাট্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া সুন্দর নাটকীয় রসের সৃষ্টি করিয়াছে। আঙ্গিকের দিক দিয়াও ইহাদের অভিনয়োপযোগী বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতা আছে। 'বিসর্জন' বহুবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া নাটকীয় আবেদন ও চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই তিনখানি নাটককে রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি বলিয়া অভিহিত করা গিয়াছে। সাধারণ জীবনযাত্রার বাহিরে বিশিষ্ট শ্রেণীর বিখ্যাত লোকদের কীর্তিকাহিনী এই সব নাটকের বিষয়বস্তু;—প্রধান পাত্র-পাত্রী—রাজা, রানী, রাজকন্যা, মন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত, সেনাপতি প্রভৃতি; নায়ক-নায়িকারা ঘটনা-প্রবাহের গতিতে সাধারণ লোকদের সহিতও মিশিতেছে, কিন্তু সেই মিলন অভিজাতদের চরিত্র-অঙ্কনের সহায়রূপেই নাট্যকার ব্যবহার করিয়াছেন। সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিত্বময় উচ্ছ্বাস, কোনো কোনো স্থানে কথ্যভাষার সহিত মিশ্রিত; মূল কথাবস্তুর সহিত ক্ষুদ্র আখ্যান-অংশও নাটক-বিশেষে জড়িত করা হইয়াছে। আদর্শ প্রেম বা ধর্মবোধ বা চিরন্তন প্রবৃত্তি বা নীতির সংঘাতেই ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়, তবে বাস্তবের একটা কঙ্কালকে ইহাদের পিছনে রাখিয়া বাস্তব ও আদর্শের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। বাস্তবের ঊর্ধ্বে আদর্শজগতে অভিজাত-সম্প্রদায়ের এক অভিনব জীবন-কাহিনী নাট্যকারের কাব্য-ময় রোমাণ্টিক দৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। ইংলণ্ডে শেক্সপীয়র ও অন্যান্য এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ, জার্মানীর লেসিং, গ্যেটে, শিলার প্রভৃতি এবং ফ্রান্সের ডুমা, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি রোমাণ্টিক নাটকের পরিপূর্ণ সার্থক রূপ প্রকটিত করিয়াছেন। ইঁহাদের নাটকের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি নাটকের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতিস্বরূপ করুণ, বিয়োগান্ত ঘটনায় ইহাদের পরিসমাপ্তি হওয়ায়, ইহাদিগকে রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি বলিয়া একটি শ্রেণীভুক্ত করিলে, ইহাদের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবে বলিয়া মনে করি। অবশ্য পরিপূর্ণ রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে ইহাদের বিচার নিশ্চয়ই হইবে না, তবে অল্পবিস্তর এই পথে অগ্রসর হইলে ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা সহজ হইবে। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ইংরেজী নাটকের প্রভাব বাংলা নাটকের উপর অত্যন্ত প্রবল। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রভাব আসিয়াছে ইংরেজী রোমাণ্টিক নাটক হইতে। নাটক-দৈন্য-পীড়িত বাংলাসাহিত্যে যে-কয়খানি উল্লেখ-যোগ্য নাটক আছে, তাহাদের ঘটনা-সন্নিবেশ ও প্লট-গঠনেও ইংরেজী নাটকের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ক্রিয়াশীল।

রাজা ও রানী

(২৫শে শ্রাবণ, ১২৯৬)

'রাজা ও রানী' নাটকের বিষয়বস্তু একটি কাল্পনিক উপাখ্যান, তবে স্থান ও পাত্রের অবস্থান ও নামের মধ্যে একটু ঐতিহাসিক গন্ধ ও আভাস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস আছে।

বিক্রমদেব জালন্ধরের রাজা, তাঁহার রানী কাশ্মীররাজকন্যা সুমিত্রা। সুমিত্রার পিতার মৃত্যুর পর খুল্লতাত চন্দ্রসেন এখন কাশ্মীর রাজ্যের রাজা। সুমিত্রার ভাই কুমারসেন কাশ্মীর রাজ্যের যুবরাজ।

রানী সুমিত্রার কুটুম্ব-স্বজন বিদেশী কাশ্মীরী-কর্মচারীরা জলান্ধররাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, নির্মমভাবে তাহাদের শোষণ করিতেছে, রাজ্যের মধ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, অসহায় ক্ষুধার্ত প্রজাগণের নিষ্ফল বিলাপধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ।

রাজা বিক্রমদেব এদিকে দৃষ্টি দেন না, প্রতীকার করিবার আগ্রহ তাঁহার নাই,—তিনি রানী সুমিত্রার রূপ-যৌবনের কারাগারে স্বেচ্ছা-বন্দী হইয়াছেন। দুর্বার ভোগাকাঙ্ক্ষাময় প্রেমের অন্ধ আবেগে তিনি রানীকে একান্তভাবে সর্বক্ষণ পাইবার জন্য রাজকর্ম ছাড়িয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব ভুলিয়াছেন—কেবল নিরবচ্ছিন্ন প্রেমরসলীলার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজিতেছেন।

কিন্তু সুমিত্রা রাজার এই সর্বগ্রাসী প্রেমকে একটা অশুভ মোহমাত্র জানিয়া ব্যথিতচিত্ত। কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য রাজার নিকট তিনি আবেদন করেন, এই আত্মবিস্মৃত, কর্তব্যবিমুখ প্রেম প্রকৃত প্রেম নয় বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সুমিত্রা বলেন,—অন্তরে তিনি রাজার প্রেয়সী, কিন্তু বাহিরে মহিষী, রাজা হিসাবে রাজার কর্তব্য আছে, রানী হিসাবে তাঁহারও কর্তব্য আছে, এই সর্ব-বিস্মরণী অন্ধপ্রেমকে রাজা-রানীর কর্তব্যে বাধা দিয়া অকল্যাণের সৃষ্টি করিতে দেওয়া উচিত নয়। রাজা বলেন,

রাজা রানী। কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা

শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালোবাসা। এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই; আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে।

সুমিত্রা রাজার এই মোহ-আবরণ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াও, প্রজাপীড়ক, দুর্বৃত্ত কাশ্মীরী-অমাত্যগণকে রাজ্য হইতে অবিলম্বে বিতাড়িত করিয়া আর্ত, ক্ষুধাতুর প্রজাগণকে রক্ষা করিতে বলিয়াও যখন রাজার নিদ্রিত পৌরুষ ও কর্তব্যজ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি দারুণ সংকল্প করিলেন। নিজেই কাশ্মীরে যাইয়া ভ্রাতা কুমার-সেনের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী, অত্যাচারী কাশ্মীরী-অমাত্যগণকে বন্দী করিয়া দন্ড দিবেন।

পিতৃসত্যপালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্যপালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে, কভু তাহা
সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে জালন্ধর ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন।

রানীর এই পলায়নে রাজা বিক্রমদেবের অন্তর্জীবনে একটা দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হইল। রাজার প্রেম কর্তব্য ছাড়িয়া, সংসার ভুলিয়া, একটিমাত্র নারীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল সেই প্রেম আশ্রয়চ্যুত হওয়ায় একটা রূঢ় আঘাতে তাঁহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, মোহের নাগপাশ ছিন্ন হইল। প্রেমের অন্ধ-আবেগ রূপান্তরিত হইল যুদ্ধের নেশায়, প্রতিহিংসা-গ্রহণের ইচ্ছায়। রাজার জীবনের নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইল।

অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল।
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর;
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষহৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র। কোথা জনস্রোত। কোথা
জীবনমরণ। কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখদুঃখ, বিপদসম্পদ,
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।···
স্বপ্ন টুটে গেছে···
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব
নাশিব বিদ্রোহ।

রাজা বিদ্রোহী কাশ্মীরী-অমাত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, শিলাদিত্য, উদয়-ভাস্কর বন্দী হইয়াছে, যুধাজিৎ আর জয়সেন পলাতক। রাজা আবার তাঁহার ক্ষত্রিয়সত্তায়, রাজসত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ কী মুক্তি। এ কী পরিত্রাণ। কী আনন্দ
হৃদয়মাঝারে। অবলার ক্ষীণ বাহু

কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবরমাঝে।···
মুক্তি। মুক্তি আজি। শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এত দিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্তি, কত রঙ্গ, কত কী চলিতেছিল
কর্মের প্রবাহ—আমি ছিনু অন্তঃপুরে
প'ড়ে; রুদ্ধদল চম্পককোরকমাঝে
সুপ্ত কীট-সম।···
এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দে!
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির
সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

এদিকে সুমিত্রা কাশ্মীরে গিয়া ভ্রাতা কুমারসেনের নিকট কাশ্মীরী-অমাত্যদের প্রজা-পীড়ন ও বিদ্রোহ এবং রাজার নিশ্চেষ্টতার কথা বলেন। ভগিনীর অনুরোধে কুমারসেন কাকা রাজা চন্দ্রসেনের অনুমতি লইয়া 'দুর্বিনীত দস্যুদের দমন' করিতে ও 'কাশ্মীরের কলঙ্ক' দূর করিবার জন্য সুমিত্রার সঙ্গে সসৈন্যে জালন্ধরে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে তাহারা পলাতক জয়সেন ও যুধাজিৎকে বন্দী করিয়া লইয়া বিক্রমদেবের যুদ্ধশিবিরে উপস্থিত হইল। এই সংবাদে রাজার সদ্যোজাগ্রত পৌরুষ আহত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাঁহার অক্ষমতা ও কাপুরুষতা-প্রমাণের জন্যই কি নারী শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছে!

মহারানী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ-জয়সেনে! এ কি স্বপ্ন না কি!
এ কি রণক্ষেত্র নয়! এ কি অন্তঃপুর!
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন। সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে।

রানী সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলে রাজার উত্তর,—

সাক্ষাৎ? কাহার সাথে। রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়।···
রুদ্ধ করো দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ।

বন্দী বিদ্রোহীরা রাজার এই মানসিক অবস্থার সুযোগ লইয়া বুঝাইল যে, তাহারা রাজারই প্রজা, তাহারা যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকে, তবে রাজাই তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, বিদেশী ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, রাজার অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়, রাজাকেই অপমান

করা হয়। লুপ্ত-বিচার-বুদ্ধি রাজার সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইল সুমিত্রা ও কুমারসেনের উপর। তিনি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন।

কুমারসেন ও সুমিত্রা রাজার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে মর্মাহত ও অপমানিত হইল। স্নেহময়ী ভগিনী সুমিত্রার একান্ত অনুরোধে ও আপন হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতায় কুমারসেন যুদ্ধ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ না লইয়াই কাশ্মীরে ফিরিতে মনস্থ করিল। বৃদ্ধ ভৃত্য শংকর শান্তির প্রস্তাব লইয়া গিয়া অপমানিত হইয়া ফিরিল, সে কাশ্মীরের মানরক্ষার জন্য ও বীরের স্বধর্মরক্ষার জন্য বারবার কুমারসেনকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিল। কিন্তু সুমিত্রা 'পিতা-মাতা-বিধাতার আশীর্বাদ-ঘেরা পুণ্য স্নেহতীর্থ', 'কল্যাণভূমি' কাশ্মীরকে 'বাহির হইতে হিংসানলশিখা আনিয়া' 'অঙ্গারমলিন' করিতে নিষেধ করিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনী 'ভীরু', 'পলাতক' 'অখ্যাতি' গ্রহণ করিয়াই কাশ্মীরের পথে ফিরিল।

বিক্রমদেব কুমারসেনের পিছনে পিছনে কাশ্মীর-আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছেন। কুমারসেন স্বদেশরক্ষার জন্য চন্দ্রসেনের কাছে সৈন্যসাহায্য চাহিল, কিন্তু স্ত্রীর কুপরামর্শে চন্দ্রসেন সে-সাহায্য দিল না। উপায়হীন যুবরাজ কাশ্মীররক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়া সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। বিক্রমদেব কাশ্মীর অধিকার করিলেন এবং বহুসম্মানিত অতিথিভাবে চন্দ্রসেন কর্তৃক গৃহীত হইলেন।

কুমারসেনের সহিত ত্রিচূড়রাজকন্যা ইলার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে ভালোবাসে। আগামী পূর্ণিমারাত্রিতে তাহাদের বিবাহের দিন। পলাতক কুমারসেন ইলার সহিত একবার দেখা করিবার জন্য ত্রিচূড়রাজ্যে উপস্থিত হইল। কিন্তু কাশ্মীর-বিজয়ী বিক্রমদেবের ভয়ে ভীত ইলার পিতা কুমারসেনকে ইলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না এবং শীঘ্র তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। ব্যর্থকাম, হতভাগ্য যুবরাজ সুমিত্রার সহিত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এদিকে বিক্রমদেব কুমারসেনকে ধরিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রসেনের মহিষী রেবতী কুমারকে রাজদ্রোহী বলিয়া শাস্তি দিতে অনুরোধ করিলেন এবং প্রজারা তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইবার পরামর্শ দিলেন। গুপ্তচরের মুখে ত্রিচূড়রাজ্যে কুমারের গোপন আশ্রয়ের সংবাদ পাইয়া বিক্রমদেব মৃগয়ার ছলে ত্রিচূড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

বিক্রম ত্রিচূড়রাজ্যে উপস্থিত হইলে অমরুরাজ তাঁহার 'যাহা আছে', সমস্তই বিক্রমকে 'সমর্পণ' করিতে অগ্রসর হন। সেই সঙ্গে কন্যা ইলাকেও তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হন।

প্রবল প্রতিহিংসার স্রোতোবেগে সুমিত্রার স্মৃতি বিক্রমের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সে স্মৃতিকে একেবারে লুপ্ত করিয়া নূতন প্রেমের সার্থকতা-লাভের জন্য এখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা।

যাও তবে—একেবারে চলে যাও দূরে।
জীবনে থেকো না জেগে অনুতাপরূপে,
দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের
নির্জন নেপথ্যদেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর।

'অপরূপ-মূর্তি' ইলা বিক্রমকে বলিল,—

মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ
আছে তব; ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু নাই।

বিক্রমদেব

আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়। কোথা সেথা ধনরত্ন।
কোথা সসাগরা ধরা। সব শূন্যময়।
রাজ্যধন না থাকিত যদি—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা

লহ তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও বুকে তার তীক্ষ্ন তীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও।

বিক্রমদেব

কেন, দেবী, মোর 'পরে এত
অবহেলা। আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি। এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়.
প্রার্থনা করেও আমি পাব না কি তবু
হৃদয় তোমার।

ইলা

সে কি আর আছে মোর।
সমস্ত সঁপেছি যারে বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কত দিন হল; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি···
মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে। রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

বিক্রমদেব

না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান।···
বসে আছ যার তরে কি নাম তাহার।

ইলা

কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম।

বিক্রমদেব

কুমার? কাশ্মীরের যুবরাজ?···
তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড়ো তার আশা। শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে!

ইলা

সত্য বলো মহারাজ, ছলনা কোরো না।
জেনো, এই অতি ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার। আমি যাব,
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাই নি,
কোথা যেতে হবে। কোন্ দিকে কোন্ পথে।···
প্রিয়তম প্রিয়তম,
আমি তো জানি নে, নাথ, সংকটে পড়েছ—
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা। বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে? তবে, পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী।

বিক্রমদেব

কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো, ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।

শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব।
আমারে বিশ্বাস করো—আমি বন্ধু তব।
চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী।

বিক্রমদেবের অন্তর-প্রবাহ একটা প্রবল ধাক্কায় এখান হইতে মোড় ফিরিল। তাঁহার হিংস্র, ক্ষিপ্ত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা এই আবেগময়, একনিষ্ঠ, সর্বস্ব-ত্যাগোন্মুখ প্রেমের বিদ্যুৎ-দীপ্তির সম্মুখে নতশির হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। নূতন আলোকে রাজা আবার নিজেকে যেন ফিরিয়া পাইলেন।

যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ!
গৃহহীন, পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ স্বর্ণময়
সম্পদেব মতো। আমি কোন সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল।
ধুয়ে দাও প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

এদিকে কুমারের নিভৃত অরণ্যবাস অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রতিদিন নানা সংবাদ আসিতে লাগিল, প্রজারা কুমারকে লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাকে জীবিত কি মৃত ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। চির-বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য শংকর ছদ্মবেশে রাজ্যের সংবাদ লইতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে, শত্রু তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতেছে। জীবন তাহার দুর্বিষহ, জ্বালাময়,—

আর তো সহে না।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রার প্রস্তাব, তাহারা ভাই-বোনে একবার রাজসভায় গিয়া নির্দোষীর উপর অত্যাচার-নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু কুমারসেন বন্দী-ভাবে রাজসভায় যাইতে অনিচ্ছুক।

পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—এ কি সহ্য হবে।
অনেক সহেছি বোন, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে।

এ-জীবন বহন করার চেয়ে মৃত্যুই ভাল! মৃত্যু এই অভিশপ্ত জীবন হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে। সুমিত্রারও ইহাই মত।

আমি রাজপুত্র—
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা, কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী,
তবু আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে?

সুমিত্রা

তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন

বলো, তাই বলো।
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে।
জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা!

সুমিত্রা

এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন

বাঁচিলাম শুনে।
কোনোমতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।

কুমার প্রাণবিসর্জন করিতে স্থির সংকল্প করিল। তাহার ছিন্নমুণ্ড কাশ্মীরের অতিথিকে উপহার পাঠাইবে সে সুমিত্রার হাত দিয়া। একথা শুনিয়া সুমিত্রা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কুমার তাহার প্রাণে বল সঞ্চার করিল, ক্ষুদ্র নারীর ঊর্ধ্বে উঠিয়া মহীয়সী নারীর মতো কঠিন কর্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিল। তারপর অভাগিনী ইলার কথা। ইলার সম্বন্ধে কুমারের ধারণা,—

হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত। সে আমার ধ্রুবতারা,
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চিরমিলনের বেশ করিব ধারণ।

তারপর শেষ দৃশ্য। কাশ্মীরের রাজসভা। সংবাদ আসিয়াছে, কুমারসেন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে আসিতেছে। পরিবর্তিত-হৃদয় বিক্রমদেব আগ্রহে তাহার অপেক্ষায়

আছেন; সে আসিলেই মহাসমারোহে তাহাকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন এবং সেই পূর্ণিমা রাত্রিতেই ইলার সহিত তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিবেন। কেবল বৃদ্ধ ভৃত্য শংকরের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। যুবরাজ নিজে শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ তাহার হৃদয়ে শেলসম আঘাত দিয়াছে,—'সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্,' 'আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন' সে। প্রহরী সংবাদ জানাইল, কুমার শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। শিবিকা সভামধ্যে প্রবেশ করিতেই বিক্রম 'এস এস বন্ধু' বলিয়া অগ্রসর হইলেন। শিবিকার দ্বার খুলিয়া সুমিত্রা বাহির হইলেন—হাতে তাঁহার স্বর্ণথালে কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড! সুমিত্রা বিস্ময়-বিমূঢ় বিক্রমদেবকে বলিলেন,—

ফিরেছে সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে—রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহো মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি!

এই বলিয়াই সুমিত্রা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইলা ছুটিয়া আসিয়া কুমারেব ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মৃত্যুতে কুমার বন্দী-দশার সকল অপমান উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া শংকর আনন্দ-বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—

প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধেব জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছ তব ভাল। এত দিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে! গেছ তুমি
পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমেব
আমিও যাইব সাথে।

চন্দ্রসেন মাথা হইতে মুকুট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া রেবতীকে রাক্ষসী, পিশাচী বলিয়া সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। আর বিক্রমদেব সুমিত্রার মৃতদেহের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চূর্ণ-বিচূর্ণ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে চরম বেদনা ও হতাশার এই কয়টি কথা বাহির হইয়া আসিল—

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে

গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

ইহাই মোটামুটি নাটকের কথাবস্তু।

এখন ইহার নাটকীয় কলা-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

এই নাটকে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে রানীর গৃহত্যাগে। ভোগলোলুপ প্রেমের মোহে আচ্ছন্ন রাজা রানীর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ কামনা করিয়া অন্তঃপুরমধ্যেই এই প্রেমের মহামহোৎসবে মত্ত লইয়া থাকিতে কামনা করিয়াছিলেন। রাজার কর্তব্য ভুলিয়াছিলেন, মনুষ্যত্বের আবেদন হইয়াছিল তাঁহার কাছে অর্থহীন। রানীর প্রেমের ইন্দ্রজালময় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সেই প্রেমের রসবিলাসের মধ্যেই জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিতেছিলেন। রানী রাজার সর্বগ্রাসী আকর্ষণের বস্তু হইলেও এই একান্ত প্রেমনিবেদনে রানী তৃপ্তি পান নাই। তিনি তো কেবলমাত্র প্রণয়িনী নন, তিনি রাজমহিষী, রাজকর্তব্যের অংশভাগিনী, প্রজাদের মাতা, এই সর্ববিস্মরণী প্রেমচর্চার মধ্যে তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তাই রাজার মোহভঙ্গের জন্য, কর্তব্যচেতনার জন্য তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা। কিন্তু রাজার চেতনা নাই, 'সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর', যোগাসনে লীন যোগিবরের মতো' তিনি প্রেম-সাধনায় রত, 'বিশ্বের প্রলয়' তাঁহার কাছে মূল্যহীন। রাজার প্রেমের এই ধ্যান ভাঙিয়া গেল রানীর পলায়নে।

যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সাধনা, তাহার আকস্মিক অন্তর্ধানের প্রচণ্ড আঘাতে রাজার অন্তরে জাগিল দারুণ বিক্ষোভ। ব্যক্তিত্বের তীব্র অপমানে সুপ্ত পৌরুষ তাঁহার জাগিয়া উঠিল। তিনি রাজা, রাজকর্তব্য বোঝেন, 'অপদার্থ দীন কাপুরুষ', 'কর্তব্যবিমুখ', 'অন্তঃপুরচারী' তিনি নন, তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে জানেন, যুদ্ধ করিতে জানেন—রানীকে ইহা তিনি ভাল করিয়া দেখাইবেন, সকলকে ইহা জানাইবেন। যে-অন্ধ-আবেগ, যে-দুর্জয় শক্তি প্রসারিত ছিল প্রেমের মধ্যে, তাহাই পরিবর্তিত হইল এখন যুদ্ধের নেশায়, রাজধর্ম-ক্ষত্রিয়ধর্মপালনে, হিংসাবৃত্তি-চরিতার্থতায়,—চলিল উন্মত্ত জয়ের অভিযান, আত্ম মহিমাপ্রদর্শনের অভিযান, রক্তস্রোতে অপযশ-ক্ষালনের অভিযান। এখন হইতে এই বিরোধ ক্রমাগত বর্ধিত হইয়া চলিল। এই বিরোধ পরিপুষ্টি-লাভ করিল—পলাতক যুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দী করিয়া সুমিত্রা ও কুমারসেনের আগমন-সংবাদে। যে-নারীকে পরোক্ষভাবে রাজার পৌরুষশক্তি দেখাইবার জন্য এই উন্মত্ত জয়যাত্রা, সেই নারীই পথের মাঝে তাঁহার জয়ের অংশ কাড়িয়া লইয়া পরিপূর্ণ জয়োল্লাসকে ম্লান করিয়া দিল! অসহ্য! তাঁহার সমস্ত আক্রোশ ও ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইল রানী ও কুমারসেনের উপর! তিনি দেখাইতে পারেন—ইহা অপেক্ষা অনেক বড়ো বিজয়ের শক্তি তাঁহার আছে, কুমারসেনকে পরাজিত করিয়া কাশ্মীর জয় করার শক্তিও তাঁহার আছে। রাজার প্রেম, তাঁহার প্রণয়ীসত্তা ক্রুদ্ধ, হিংস্র, জয়-বিলাসী রাজসত্তার আড়ালে অস্তমিত হইয়া গেল, তাই 'শিবিরে শিবিকার প্রবেশ নিষেধ'। ভয়ও আছে যদি রানীকে দেখিয়া বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির চাপে নির্যাতিত, মৃতপ্রায় প্রেম আবার জাগিয়া ওঠে, তাই, 'সেনাপতি, পালাও, পালাও'। এখন 'রমণী' নয়, 'পুষ্পশয্যা' নয়, 'ফুলবন' নয়,—এখন ধ্বংসসিন্ধুমথিত জয়রস। এই বিরোধ আরো অগ্রসর

হইল জয়সেন ও যুধাজিৎ-এর আত্মসমর্পণ ও পরামর্শে। তাহারা রাজার শাস্তি মাথা পাতিয়া লইবে, কিন্তু বিদেশীর হস্তক্ষেপ কেন? আর কাশ্মীর জয় করিয়া 'কাশ্মীর-সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ না দিলে' রাজার শক্তির স্মরণীয় নিদর্শন তো কিছু দেখানো যাইবে না, রাজার 'মান' প্রতিষ্ঠিত হইবে না। রাজ-বয়স্য দেবদত্তের আবির্ভাবে এই বিরোধ কতকটা শান্ত বা প্রতিহত হইবার আশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, তাহাকে শত্রুভাবে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই বিরোধের অগ্রগতি অপ্রতিহতই রহিল।

এই বিরোধ চরম অবস্থায় উন্নীত হইল, যখন বিক্রমদেব কাশ্মীর অবরোধ করিয়া পলাতক কুমারসেনকে জীবিত কি মৃত অবস্থায় ধরিবার জন্য দিকে দিকে লোক পাঠাইলেন, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইতে লাগিলেন। সমস্ত কাশ্মীরে হাহাকার ও কান্নার রোল উঠিল। শেষে নিজেই কুমারের অন্বেষণে মৃগয়ার ছলে ত্রিচূড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এইখানেই বিরোধের পূর্ণ পরিণতি।

তারপর এই বিরোধের অভ্রভেদী প্রাচীর অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে বজ্র আসিল কুমারসেনের প্রণয়িনী ইলার হাত হইতে। ইলার জীবন-মরণ-তুচ্ছকারী, সুখে-দুঃখে-অবিচল, ত্যাগ-তপস্যা-মণ্ডিত প্রেম সেই বজ্রের রূপ। হিংসার উন্মত্ততা, প্রতিশোধের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল। শুধু বিরোধই যে লুপ্ত হইল তাহা নয়, রাজার মানসিক পুনর্জন্ম হইল। প্রেম কেবল যুগল-জীবনের নিরবচ্ছিন্ন রসলীলা নয়, প্রেম প্রিয়তমের দুঃখ-বিপদে দেবতার অনিমেষ দৃষ্টি; প্রেম প্রিয়তমকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্তপ্রকার সংকট হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে-কোনো স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত; প্রেম খণ্ড বা ক্ষণিক উপভোগের বস্তু নয়, প্রেম সারাজীবনব্যাপী কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এই সত্যকার প্রেমের স্বরূপ 'প্রেম-স্বর্গচ্যুত' হতভাগ্য রাজা জীবনে প্রথম দেখিলেন। এই পরিবর্তিত মনে সেই 'শিশিরশীতল শুভ্রপ্রেম'-এর আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তখনই সুমিত্রার প্রেমকে রাজার যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি আসিল। যুদ্ধান্ধ, জয়, হিংসা হইল অর্থহীন, অনুতপ্ত মন উন্মুক্ত হইয়া রহিল সুমিত্রা জন্য।

বিরোধের এই অতি-দ্রুত পতনের মুখে দেবদত্তের আবির্ভাব। এবার তাহার একান্ত প্রয়োজন রাজার পক্ষে। সে যে সুমিত্রার পক্ষের লোক। এবার আর সে 'শত্রু' নয়, কারাগারে 'বন্দী' হইবার যোগ্য নয়, সে একেবারে 'বন্ধুরত্ন', মূর্তিমান 'অনুকূল দৈব'। এবার সে রাজার সত্যকার বন্ধু, তাহাকেই রাজার বন্ধুকৃত্য করিতে হইবে। লুক্কায়িত কুমারসেনকে সন্ধান করিবার ভার তাহার উপর, কারণ তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইলার সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওয়া রাজার এখন সর্বপ্রধান কর্তব্য। তারপর কুমারের কাছে 'আর-কেহ যদি থাকে', 'যদি দেখা পাওয়া যায় আর-কারো' তাহার কাছে রাজার বর্তমান মনের অবস্থাটা জানানোও কম প্রয়োজনীয় কর্তব্য নয়। রাজা এখন সুখের দিনের—পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর সুখের দিনের জন্য ব্যাকুল। শীতের কুহেলী-ঢাকা দিনের অবসান হইয়াছে, বসন্তের দূত মলয়-পবন দেবদত্তের মূর্তি ধরিয়া আজ সমাগত, বসন্তের নব-আনন্দ-বিহ্বলতার সম্ভাবনায় রাজা আজ বিগলিত-চিত্ত।

ইহার পরেই নাটকের শেষ পরিণাম। বিরোধের কারণ অপসারিত হইলেই মিলন সম্ভব হয়, ইহাই সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। নাটক মিলনান্ত না হইয়া বিয়োগান্ত হইল। রানীর সঙ্গে বা কুমারের সঙ্গে রাজার মিলন হইল না। রাজার

বন্ধু দেবদত্ত রাজার এই পরিবর্তিত মনোভাবের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া কুমার ও রানীর সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না—কুমারের অনুচর তাহাকে কৌশলে ফিরাইয়া দিল। তারপর কুমারসেনের নিদারুণ সংকল্প, কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার দৌত্য, তাহার মৃত্যু—সবই একেবারে রাজার পক্ষে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। রাজার তৎকালীন মনোভাব বা কর্মের ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পরিণাম অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনার অনিবার্য ফলরূপে উৎপন্ন নয়।

নাটকে সাধারণত দেখা যায়, বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতের দ্বারা যে জটিলতার উদ্ভব হয়, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটা চরম অবস্থায় পেঁছায়, যখন বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে একটির জয় এবং অন্যটির পরাজয় সুস্পষ্ট হয়; তাহার পরে ঘটনার গতি অনিবার্যরূপে সেই সম্ভাব্য জয়ের অনুকূলে প্রবাহিত হইয়া নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে ভালো মন্দের দ্বারা বা মন্দ ভালোর দ্বারা কিংবা পুণ্য পাপের দ্বারা বা পাপ পুণ্যের দ্বারা পরাজিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে Hudson-এর নাটকের কথাবস্তু-সংগঠনের অতি-পরিচিত মূলনীতিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

"We have, to begin with, some Initial Incident or Incidents in which the conflict originates; secondly, the Rising Action, Growth, or Complication, comprising that part of the play in which the conflict continues to increase in intensity, while the outcome remains uncertain; thirdly, the Climax, Crisis or Turning Point, at which one of the contending forces obtains such controlling power that henceforth its ultimate success is assured; fourthly, the Falling Action, Resolution, or Dénouncement, comprising that part of the play in which the stages in the movement of events towards this success are marked out; and fifthly, the Conclusion or Catastrophe, in which the conflict is brought to a close." ইহার সহিত Hudson, Introduction বা Exposition নামে প্রারম্ভিক স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই নীতিগুলি কমবেশি সকল নাটকের আখ্যান-ভাগ-সংস্থাপনের মূলেই ক্রিয়াশীল।

বিরোধ যেখানে চরম পরিণতি লাভ করিল, তাহার পরে সেই বিরোধের অনুকূলে আনুষঙ্গিক ঘটনাই পরবর্তী স্তরে প্রত্যাশিত। ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিতে আমরা এই নাটকে হয়তো দেখিতাম, বিক্রমদেব কুমারসেনকে বন্দী করিয়া ধরিয়া আনিয়াছেন, বা বন্দী-দশা এড়াইবার জন্য সে আত্মহত্যা করিয়াছে, বা তাহার ছিন্নমুণ্ড পাঠায়াছে, কি রানী আসিয়া তাঁহার মোহভঙ্গের জন্য আত্মদান করিয়াছেন, কিন্তু বিক্রমের প্রতিকূল মনোভাব পূর্ণভাবেই বজায় আছে, তাহারই ফলস্বরূপ আমরা ঐ ঘটনাগুলি আশা করিতে পারিতাম। তাহার পর এই ভীষণ আঘাতে রাজা তাঁহার পূর্ব-সত্তা ফিরিয়া পাইতেন, তাঁহার কৃতকর্মের ফল দেখিয়া অনুতপ্ত ও মোহমুক্ত হইতেন, এবং তাঁহার মর্মান্তিক ভুলের জন্য সারাজীবন অন্তর্দাহের তুষানল বুকে জ্বালাইয়া রাখিতেন। এইভাবে রাজার জীবনের চরম ট্র্যাজেডিতে এই নাটকের শেষ হইত। ইহাই একমুখী বিরোধের কার্য-কারণ-ঘটিত পরিণতি। কিন্তু এই নাটকের পরিণতি বিরোধের কার্য-কারণ ঘটিত স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত পরিণতি নয়, ইহা আকস্মিক। সুমিত্রার মৃত্যু এবং যে-ভাবেই হোক কুমারের পরাজয় বা মৃত্যুতেই এই

বিরোধের অবসান হওয়া সংগত ও স্বাভাবিক ছিল, তাহার পূর্বে নয়। এই ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই 'তপতী'তে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

'রাজা ও রানী' নাটকের শেষে নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। রাজার মোহমুক্তি হইয়া গিয়াছে, বিরোধের অবসান হইয়াছে, তবুও রাজাকে শাস্তি পাইতে হইল, নিয়তির 'নিশ্চল', 'নিষ্ঠুর' 'অমোঘ দন্ড'ই সুমিত্রার হাত দিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল।

এখন বিচার্য 'রাজা ও রানী'র এইপ্রকার পরিণতিতে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে কিনা? সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে সত্যই রচনা দোষ'দুষ্ট হইয়াছে কিনা? আমাদের মতে ইহাতে রসসৃষ্টি ব্যাহত হয় নাই এবং নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আদর্শচ্যুতিও ঘটে নাই। একান্ত ভোগলোলুপ প্রেমের মোহগ্রস্ত, বাস্তবপরিবেশ চেতনাহীন রাজার নিকট সত্যকার প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও এই মোহের শোচনীয় পরিণাম-প্রদর্শনই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইলার প্রেমেই রাজা সত্যকার প্রেমের স্বরূপ দেখিয়াছেন, সুমিত্রার প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছেন, সুমিত্রার 'সত্য উপলব্ধি' করিয়াছেন; তখনই সমস্ত হিংসা-দ্বেষ-বিরোধ ত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত রাজা নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া সুমিত্রার সন্ধান করিয়াছেন। সুমিত্রার মৃত্যুর পূর্বেই যদি অন্যপ্রকার আঘাতের দ্বারা আসক্তির অবসান হয়, মোহ দূর হইয়া চিত্তের সেই শান্ত অবস্থা আসে, যাহাতে সুমিত্রার 'সত্য-উপলব্ধি' 'সম্ভব হয়', তাহাতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোনোই হানি হয় না। অন্যায়ভাবে এই সত্যকার প্রেমিকা, আদর্শ সহধর্মিণীর বিরুদ্ধাচরণ করা, তাহাকে অপমানিত করা, তাহার ভ্রাতাকে লাঞ্ছনা করা, তাহার পিতৃরাজ্য ধ্বংস করা প্রভৃতি দুষ্কার্যের জন্য তাঁহাকে তো চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতেই হইবে, তাহাতেই তাঁহার চরিত্রে একটা ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা রহিয়াছে, মৃত্যু না হইয়া মিলন হইলেও এ-ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা যাইত না,—"ইহজন্ম নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি ক্ষমা তব।" এই মিলনের মধ্যেও অনুতাপের চিরন্তন বেদনা বুকে বাসা বাঁধিত। সুমিত্রার মৃত্যুতে রাজার জীবনের ট্র্যাজেডি নিদারুণ-ভাবে ঘনীভূত হইয়াছে। তাঁহাকে দ্বিগুণভাবে আঘাত পাইতে হইয়াছে। নিয়তির ইহা নিষ্ঠুর আঘাত—ক্ষমাহীন চিরন্তন শাস্তি। দোষী তাহার দোষ বুঝিয়া অনুতপ্ত হইলেও শাস্তি এড়াইতে পারিল না; কেবল অনুতাপে এ পাপক্ষালন হয় নাই, সারাজীবনব্যাপী সান্ত্বনাহীন দুঃখ রাজাকে ভোগ করিতে হইল। তাই সুমিত্রার সম্বন্ধে রাজার শেষকথা,—"দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর, অমোঘ তোমার দন্ড, কঠিন বিধান।" এই দন্ডে, ভাগ্যের এই নিদারুণ পরিহাসে, এই নাটকের ট্র্যাজিক মূল্য অনেকগুণে বর্ধিত হইয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকের এইপ্রকার পরিণতিতে একটা চমৎকার রসসৃষ্টি হইয়াছে; সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও ইহার নাটকীয় আবেদন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে এই নাটকে 'কুমার-ইলার প্রেমকাহিনী শোচনীয় রূপে অসংগত' বা 'অপ্রাসঙ্গিক' বলিয়াছেন, তাহা এই 'রাজা ও রানী' নাটকে যে-ভাবে লেখা হইয়াছে, তাহার পটভূমিকায় বিচার করিলে যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ঘটনার একমুখী পরিণতি যদি তিনি অঙ্কিত করিতেন, যেমন 'তপতী'তে করিয়াছেন, তাহা হইলে অন্যকথা। কিন্তু 'রাজা ও রানী'কে যদি আমরা একটা স্বতন্ত্র নাটক ধরিয়া বিচার করি, এবং তাহাই করা উচিত, তবে কুমার-ইলার প্রেমকাহিনী একান্ত সংগত ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য নাটক ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত নাটকের সমালোচনা-গ্রন্থগুলিই যে আমাদের নাটক-বিচারবুদ্ধির ভিত্তি একথা অস্বীকার করিলে মিথ্যাকথা বলা হইবে। এইসব নাটকে

অনেক সময় আমরা প্রধান আখ্যানবস্তুর সহিত আর একটি ক্ষুদ্র আখ্যানবস্তু জড়িত দেখি, এই সব sub-plot বা side-plot বিশেষ নাটকীয় উদ্দেশ্য সার্থকতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। এইপ্রকার আনুষঙ্গিক উপ-আখ্যানভাগ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের দ্বারা নাটকের মূল-উদ্দেশ্যের পরিপুষ্টিসাধন করে। কুমার-ইলার প্রেম বৈসাদৃশ্যের দ্বারা এইরূপ উদ্দেশ্য-সাধন করিয়াছে। বিক্রম-সুমিত্রার প্রেম কুমার-ইলার প্রেম অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতির। একটি কর্তব্যভ্রষ্ট-ভোগসর্বস্ব প্রেম, অপরটি দুঃখ-বেদনায় পরীক্ষিত, জীবন-মরণ-ব্যাপী-অবিচল প্রেম। প্রথমটি 'পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে' রচিত 'বাসররাত্রি'র প্রেম, অপরটি সম্বন্ধে বলা যায়,—

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি। (মহুয়া)

কুমার-ইলার প্রেমের দ্বারাই বিক্রমদেবের চোখ ফুটিল—সুমিত্রাকে চিনিবার তাঁহার সুযোগ মিলিল। তাই এই প্রেম রাজার পরিবর্তনের পক্ষে একান্ত কার্যকারী এবং নাটকের মূল-উদ্দেশ্যের সাহায্যকারী। সুতরাং মূলনাটকের মধ্যে এই কাহিনীর সংযোজন অসংগত হয় নাই। সংশোধিত নাটক 'তপতী'তেও নরেশ-বিপাশার প্রেমকাহিনী বৈপরীত্যের দ্বারা মূলকাহিনীর নাটকীয় রসের পরিপুষ্টি করিয়াছে।

'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি আপত্তি এই যে, "নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে, তাতে নাটকের বিষয়টি হয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত।" এই অসংগত প্রাধান্যলাভের কারণ কুমার-ইলার কাহিনীর অবতারণা নয়, রানীর চরিত্র-চিত্রণের অসম্পূর্ণতা বা দুর্বলতা। যে-রানী রাজাকে কর্তব্য-সচেতন করিবার জন্য কঠোর আত্মত্যাগ করিল, রমণীহৃদয় বলি দিয়া 'পতিসত্যপালনে'র জন্য গৃহত্যাগ করিল, ভ্রাতার সাহায্যে কাশ্মীরী-অমাত্যদের বন্দী করিল, সেই ত্যাগ-তপস্যানিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা রানীকে নাটকের শেষের দিকে আমরা দেখিতে পাই না। রানীর সমস্ত চিন্তা ও কর্ম মূল উদ্দেশ্যের অভিমুখে ধাবিত না হইয়া—বিক্রমের মোহভঙ্গের দিকে অগ্রসর না হইয়া ভ্রাতার অসম্মান, তাহার হৃদয়বেদনা দূর করিবার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইল। রানীর প্রণয়িনী-সত্তা ও রাজমহিষী-সত্তা যেন ভগিনী-সত্তার অন্তরালে আত্মগোপন করিল। বিক্রমকৃত অপমান যখন কুমারসেন যুদ্ধ না করিয়া ক্ষমা করিল এবং ক্ষমার দ্বারাই অধিক বীরত্ব দেখাইল,—('জানিস তো বোন, যুদ্ধ বীরধর্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা কে পারে করিতে মানী ছাড়া') তখনই সুমিত্রা তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—

ধন্য ভাই,
ধন্য তুমি। সঁপিলাম এ জীবন মোর

তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ।
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজমাঝে···

এই স্নেহঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই যেন সুমিত্রা আপন সত্তা ভ্রাতার সত্তার সহিত মিশাইয়া দিলেন। তারপর ভাই-বোন শৈশব-লীলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে উভয়কে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইল। গৃহের আকর্ষণ ও উভয়ের পরস্পর সাহচর্যই তখন বড়ো হইল। প্রেমিকার সত্তা, রানীর সত্তা একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। ভ্রাতারই ছায়ামাত্র তখন সুমিত্রা। পূর্বের তেজ ও বল আর তাঁহার নাই,—

আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি···
তুমি সব জান ভাই।
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি।

শেষে ভ্রাতার সম্মানরক্ষার জন্য, কাশ্মীর-যুবরাজের কঠোর কর্তব্যপালনের জন্য, 'মৃত্যু ভালো' বলিয়া পরামর্শ দিয়া নিজেই তাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া বিক্রমের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরবর্তী সময়ে ভ্রাতার চিন্তাই তাঁহার চিন্তা ও কর্মকে গ্রাস করিয়াছে। বিক্রমের মোহভঙ্গের জন্য তাঁহার যে মৃত্যু তাহাও একটা আকস্মিক ঘটনা। ইহা কোন স্থির-সংকল্প-প্রণোদিত মৃত্যু নয়, নাট্যকার তাহার কোনো সংকেত বা ইঙ্গিত পূর্বে দেন নাই; তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া বিষ খাইয়া মরিলেন, কি হঠাৎ হার্ট-ফেল করিয়া মরিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং যাঁহাকে লইয়া বিরোধের উৎপত্তি, শেষের দিকে তিনি ভ্রাতা কুমার-সেনের পিছনে আত্মগোপন করিলেন, তাই কুমারসেনই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

'তপতী'তে কবি অবশ্য এ-ত্রুটি-সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 'রাজা ও রানী'র মধ্যে রক্ত-মাংসের যে উষ্ণতাটুকু আছে, তপতীতে তাহা নাই। তপতীর পাত্র-পাত্রী একেবারে তত্ত্ব বা ভাবের প্রতীক-মূর্তি। রানী একেবারে যেন সত্যসত্যই সূর্যদেবতার দেবীকন্যা—'সংসার তাঁহাকে অশুচি করেছে', তাই 'পরম তেজের সঙ্গে তিনি তেজ মিশাবেন'। রবীন্দ্র-নাথের 'মহুয়া'-কাব্যগ্রন্থ ও 'তপতী' সমসাময়িক রচনা। কবি 'মহুয়া'তে প্রেমের যে-নূতন তত্ত্ব ও দর্শন রূপায়িত করিয়াছেন, 'তপতী'তেও সেই প্রেমের মাহাত্ম্যই কীর্তন করিয়াছেন। 'মহুয়া'র প্রথম কবিতা 'উজ্জীবন' দিয়াই বিক্রম 'পুষ্প-ধনু'কে উজ্জীবন করিয়াছেন। এ-প্রেমের সাধনা পরম ত্যাগের সাধনা। রানী তাঁহারই জীবন দিয়া এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

'রাজা ও রানী'র অন্যান্য ক্ষুদ্র ত্রুটিরও সংশোধন নাট্যকার 'তপতী'তে করিয়াছেন। 'রাজা ও রানী'তে কাশ্মীরী-অমাত্যদের রাজ্য হইতে অবিলম্বে বিতাড়ন ও তাহাদের দ্রুত বিদ্রোহদমনের অনিচ্ছার পিছনে খুব যুক্তিসংগত কারণ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহে রানীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমচর্চার বিঘ্ন হইবে বলিয়াই যে এই কর্তব্য-শৈথিল্য, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু 'তপতী'তে কাশ্মীর-জয়ে উহারা বিক্রমকে সাহায্য করিয়াছিল

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহাতে তাহাদের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতাই যে দ্রুত শাস্তিদানের অন্তরায়, এটি সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে রাজার চরিত্রের দুর্বলতা ও তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে।

তারপর, বিক্রমদেবের কাশ্মীর-আক্রমণও উপযুক্ত কারণের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই; অবশ্য রানীর ও কুমারসেনের নিকট তাঁহার শক্তি-প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা, হিতাহিত-জ্ঞানহীন জয়লিপ্সা ও বিদ্রোহীদের কুপরামর্শের প্রভাব প্রভৃতিকে আমরা সংগতভাবে কারণরূপে অনুমান করিতে পারি, কিন্তু অনিবার্য প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া ধরা যায় না। 'তপতী'তে এই অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ খুব স্পষ্টভাবে দেওয়া হইয়াছে,—"কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন—জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধূলি-শায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আস্‌ব তাঁকে বন্দিনী ক'রে, যেমন ক'রে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ ক'রে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত ক'রে তবে আমি শান্তি পাব।··· সুমিত্রার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।"

তবুও কবির এই 'অল্প বয়সের রচনা' 'রাজা ও রানী' পরিণত বয়সের রচনা অপেক্ষা আমাদের বেশি ভালো লাগে, কারণ, যে-'Illusion of reality' নাটকের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের অঙ্গ, 'রাজা ও রানী'র মধ্যে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 'রাজা ও রানী'র সুমিত্রা অনেকটা সংসারের নারীর অংশ দিয়ে গড়া, শক্তিশালী দৃঢ় তরুর গায়ে লতার মতো আশ্রয়প্রত্যাশী, অন্তরের তেজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও বাহিরে স্নিগ্ধ-মাধুর্যমণ্ডিত, নারীর হৃদয়-গৌরবের অধিকারিণী, স্নেহময়ী ভগিনী; 'তপতী'র সুমিত্রা একটা আদর্শরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ; সুকঠিন ব্যক্তিত্বের আবরণ ভেদ করিয়া মানবিক চিত্তস্ফুরণের বিদ্যুৎ-দীপ্তির অবকাশই তাঁহার চরিত্রে নাই, শেষের দিকে একেবারে তিনি সমস্ত আসক্তিহীন, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন দেবকন্যা। একটা ভাবকে মূর্তি দিবার জন্যই যে তাঁহার সৃষ্টি, ইহা বেশ বুঝা যায়। 'রাজা ও রানী'র বিক্রম প্রেমিক, কবি, উদার-হৃদয়; 'তপতী'র বিক্রম-এর প্রেমের সংগে জড়িত আছে একটা আড়ম্বর ও দম্ভ, বর্বরযুগের রাজাদের মতো তিনি পররাজ্য জয় করিয়া সুন্দরী নারী হরণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, আবার পলাতকা নারীকে ধরিবার জন্য রাজ্য আক্রমণ করেন। একটা হৃদয়হীন শক্তির প্রকাশেই তাঁহার উল্লাস; মহত্ত্ব ও ঔদার্যের কোনো চিহ্ন তাঁহার কার্যকলাপে সুপ্রকাশ নয়।

'তপতী'তে নাটকীয় রীতির উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও, বর্তমান কালে নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেই অতি সুসংবদ্ধ, সুনির্দিষ্ট, প্রত্যক্ষ শিল্পরূপের দাবী রবীন্দ্র-নাথের কোনো নাটকই মিটাইতে পারে নাই। নাটকে এমন কোনো কথা বা ঘটনার প্রবেশ নিষেধ, যাহার সংগে নাটকের উদ্দেশ্যের কোনো-না-কোনো রূপে সম্বন্ধ নাই। সমস্তই হইবে অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। অথচ বিক্রমদেবের 'তপতী'র প্রারম্ভে যে তপঃসিদ্ধ অমর প্রেমের মহিমা-শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার সংগে তাঁহার পরবর্তী জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য নাট্য-সমালোচকগণ আরম্ভ বা Exposition-অংশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। এই অংশ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে মূল-আখ্যানভাগের কোনো সংকেত বা প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনো ইংগিত বর্তমান থাকে, যাহাতে দর্শক কি ঘটিতে যাইতেছে প্রারম্ভেই তাহার একটা ক্ষীণ আভাস পায়। সেদিক দিয়া বিবেচনা করিলে 'তপতী'র আরম্ভ যেন একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে।

বিক্রমদেব মদনকে 'ভস্ম-অপমান-শয্যা' ত্যাগ করিয়া 'বীরের তনুতে' নবজন্ম লাভ করিবার জন্য নূতন ভাবে উদ্বোধন করিলেন। বলিলেন, "মীনকেতুর পথ সহজ নয়, সে নয় পুষ্প-বিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি।" ইহাতে স্বাভাবিক ভাবে মনে করা যায়, বিক্রম সেই প্রেমেরই উপাসক, যে-প্রেম কোনো ভোগেই সীমাবদ্ধ নয়, যে-প্রেম ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, ভোগসুখাকাঙ্ক্ষা, নিজস্বার্থলিপ্সাকে আহুতি দিয়া ত্যাগ-তপস্যার অগ্নিতে পরিশুদ্ধ, নির্মল, শুভ্রজ্যোতির্ময়, যে-প্রেম জীবনের সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া, বাস্তব সংসারের দাবী মিটাইয়া তাহাদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্থির-জ্যোতিষ্কের মত দীপ্যমান, যে-প্রেমকে লাভ করিতে হইলে নানা ত্যাগ, ক্ষতি, নৈরাশ্য, বেদনা, দুঃখবিপদ, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করা প্রয়োজন হয়। বিক্রমই সেই 'বীর'-প্রেমিক। কিন্তু পরক্ষণেই সুমিত্রাকে 'সুসংবাদ' দিতেছেন,—"লোকনিন্দার পরমগৌরবে আমি ধন্য হয়েছি"—"লোকে বল্‌ছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকে তুচ্ছ করতে পেরেছি।" "অক্ষয় হোক এই সত্য, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক্, রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হোক্, ইতর লোকের নিন্দা-প্রশংসার অতীত হোক্।" বিক্রমের চরিত্রের বা প্রারম্ভিক মনোভাবের ইহা কি একেবারে বিপরীত নয়? কেবল প্রথমেই নয়, সমস্ত নাটকের মধ্যে বিক্রম সেই বীর-প্রেমিকের কোনো পরিচয় দেন নাই—বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিচয় দিয়াছেন। তবে বিক্রমের মুখে সেই প্রেমের আবাহনের সার্থকতা কি? তাঁহার উপর এমন কোনো ঘটনা বা চিত্ত-দ্বন্দ্বের প্রভাব দেখানো হয় নাই, যাহাতে তাঁহার সংস্কার, মত বা এই মানসিক অবস্থা অতো শীঘ্র পরিবর্তিত হইতে পারে।

'রাজা ও রানী'র মধ্যেও এই আরম্ভটুকু উদ্দেশ্যহীন ভাবে সূচিত হইয়াছে। ত্রিবেদীকে ত্যাগ করা ও দেবদত্তকে পুরোহিত-পদে বরণ করার সঙ্গে মূলঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না, আবার এখানেও বিক্রমদেব রমণী সম্বন্ধে বলিতেছেন, "প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, শিরে লয় তুলি; তাই বলে কোন্ মূর্খ চাহে তাহাদের বশ করিবারে।" কিন্তু রানীর গৃহত্যাগে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া কান্ডাকান্ড-জ্ঞানহীন হইয়াছেন এবং তাহাকে বশ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়াছেন। ইহাও অপ্রত্যাশিত। আসল কথা, প্রেমের একটা ভাব বা তত্ত্ব বা দর্শনের রূপদানই কবির প্রকৃত উদ্দেশ্য। কবি 'মহুয়া'য় যে ভোগরস-লোলুপতার ঊর্ধ্বে, ত্যাগ-তপস্যা-সিদ্ধ প্রেমের কথা বলিয়াছেন, 'তপতী'তে তাহারই রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার 'রাজা ও রানী'তে 'মানসী'-যুগের কামনা-বাসনা-বর্জিত আদর্শ প্রেমের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হইয়াছে। পাত্র-পাত্রী ও নাটকীয় ঘটনা ভাবপ্রকাশের একটা মাধ্যম। কবির আসল উদ্দেশ্য ভাব বা তত্ত্বের অভিব্যক্তি। একটা আখ্যানবস্তু বা কাহিনীর অন্তরালে তিনি সেই ভাব বা তত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন মাত্র। এযুগে অবশ্য বাহ্যত আখ্যানভাগের প্রাধান্য আছে, কিন্তু পরবর্তী যুগে দেখিব, ভাব বা তত্ত্বই প্রধান হইয়াছে, আখ্যাভাগ পিছনে পড়িয়াছে। 'রাজা ও রানী'তে আখ্যানভাগের—পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাপুঞ্জের—একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, 'তপতী'তে তাহার অনেকখানি লোপ পাইয়াছে।

এইবার এই নাটকের ভাববস্তুর বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতে পারে।

পূর্বে একথা বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ কবি-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবচক্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। এক পর্যায়ে যে ভাব, কল্পনা ও অনুভূতি প্রধানভাবে তাঁহার কবি-মানসকে অধিকার করিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে সেই যুগের কাব্যে, নাটকে, গানে। সেই ভাবানুভূতির গন্ডী হইতে বাহির

হইয়া কবি আবার এক ভাবানুভূতির গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তারপর আবার সেখান হইতে অন্য ভাবচক্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এইভাবে জীবনের শেষ পর্যন্ত এক ভাবচক্র হইতে অন্য ভাবচক্রে নিরন্তর প্রসারিত হইয়াছে তাঁহার মানস-গতি। বিভিন্ন ভাবচক্রের অভিব্যক্তি হইয়াছে বিভিন্ন রকমের কাব্যে, নাটকে, গানে। ইহাই রবীন্দ্র-কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য।

'রাজা ও রানী'-রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র ভাবচক্রের মধ্যে ছিলেন। তখন প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রধানত তাঁহার ভাব ও চিন্তা কেন্দ্রীভূত। সেই ভাব ও চিন্তা মানসীর অনেক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে এবং 'রাজা ও রানী' নাটকে সেই ভাব-চিন্তাই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রেমকে সংকীর্ণ ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নিজের লালসা-পরিতৃপ্তির উপায়স্বরূপ মনে করিলে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সে-প্রেম হয় জ্বালাময়, অতৃপ্তিকর ও নানা অনিষ্টের মূল। প্রেম নিরবচ্ছিন্ন দেহভোগের মধ্যে নাই; প্রেমপাত্রীকে একান্তভাবে কামনা করিলে তাহা মেলে না; প্রেম এক অপার্থিব বস্তু, 'আত্মার' চিরন্তন সম্পত্তি—এই প্রেম দেহ-মিলনের মধ্য দিয়া, প্রবল আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থতার দ্বারা লাভ করা যায় না।—

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে, দিবসে,
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ন বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?

এই প্রেম দেহাতীত এক অলৌকিক আনন্দরস, এবং এইরূপে উপলব্ধির মধ্যেই ইহার সার্থকতা।—

লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

এই প্রেম আত্মার জ্যোতি, অনন্তের অংশ, দেহের মধ্যে ইহাকে পাওয়া যাইবে না—"হৃদয়ের ধন কভু ধরা দেয় দেহে?" প্রকৃতপক্ষে এই ভাবধর্মী, শান্ত, সংযত, দেহাতীত,

বিশুদ্ধ-আনন্দরস-সম্ভোগমূলক প্রেমই রবীন্দ্রনাথের প্রেম। 'মানসী'র যুগে এই প্রেমই নানা অনবদ্য লিরিক-এ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

একান্ত ভোগসর্বস্ব প্রেম নানা বিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। রাজার প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়াছে, প্রেমের পরিণাম এক নিষ্ঠুর বীভৎসতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাই রাজার জীবনে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি টানিয়া আনিয়াছে। ইহা আমরা নাটকের মধ্যে দেখিয়াছি।

বিসর্জন

(১২৯৭)

সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের মধ্যে 'বিসর্জন' আখ্যানবস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস-কৌশলে, ঘটনার দ্রুত প্রবাহে, নাটকীয় চমৎকারিত্বে, পাত্রপাত্রীর অন্তরস্থিত ভাব ও বাহিরের কর্মের সম্মিলিত দ্বন্দ্বসংঘাতময়, বেগবান রূপের প্রকাশে, মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতায়, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা তাঁহার বহু-পঠিত ও বহু-প্রশংসিত নাটক। রূপক-সাংকেতিক-গণ্ডীর বাহিরে যে-সমস্ত নাটক আছে, তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই 'বিসর্জন' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন আছে। অপর্ণা ও গুণবতীর চরিত্র নাটকের নূতন সৃষ্টি।

'বিসর্জন'-এর কথা-বস্তু সকলেরই সুবিদিত, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার নাটকীয় কলাকৌশল ও চরিত্র-সৃষ্টিই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

এই নাটকের মূলদ্বন্দ্বটি হইতেছে—ধর্মের অর্থহীন অন্ধসংস্কার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে নিত্য-সত্য মানবধর্ম বা হৃদয়ধর্মের; মিথ্যা ধর্মবোধের সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের; মানুষের রচিত আচার-বিধির সঙ্গে হৃদয়ের পরম-সত্য প্রেমের; হিংসার সঙ্গে অহিংসার। রঘুপতির মধ্যে এই মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধসংস্কার তাহার প্রচণ্ড শক্তি লইয়া রূপায়িত রানী গুণবতীর স্বার্থ-বিজড়িত সংস্কার ও প্রথামূলক ধর্মবোধ তাহার সাহায্যকারী, ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে নক্ষত্র রায়ের রাজ্যলোভ; এই দলের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম রঘুপতির মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত। অন্য পক্ষে রাজা গোবিন্দমাণিক্য উদার সত্যধর্ম, চিরন্তন হৃদয়ধর্ম বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অচল, অটল পর্বতের মতো দণ্ডায়মান, তাঁহার পাশে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ধর্মপ্রথার জীবন্ত প্রতিবাদ-স্বরূপিণী, প্রেম ও হৃদয়বত্তার মূর্তিমতী প্রতীক অপর্ণা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যপথে আছে জয়সিংহ। গুরুর উপদিষ্ট সংস্কার-ধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রথায় সে বিশ্বাসী, গুরুর উপর তাহার অচলা ভক্তি, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও হৃদয়ধর্মের প্রেরণা তাহাকে বিচলিত করিয়াছে। এই আচারনিষ্ঠা ও বিবেকের দ্বন্দ্বে তাহার চিত্ত একবার এপক্ষের, আর একবার ওপক্ষের মধ্যে দোলায়িত হইয়াছে।

কোনো পক্ষকেই সে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। ফলে আত্মবিসর্জনেই তাহার দ্বন্দ্বের শেষ হইয়াছে।

নাটকের আরম্ভ হইয়াছে নিঃসন্তান রানী গুণবতীর সন্তান-কামনার দ্বারা, একটি ক্ষুদ্র প্রাণকে বুকে চাপিবার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা,—

আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাসদাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড় শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে।

এই আরম্ভের মধ্যে নাটকের মূলদ্বন্দ্বের এক পক্ষের যৌক্তিকতার অসারত্ব কৌশলে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। রানী একটি ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য ব্যাকুল, তাহাকে স্নেহ করিয়া, ভালোবাসিয়া তিনি জীবন সার্থক করিতে চান, কিন্তু এই প্রাণলাভের জন্য তিনি শত শত প্রাণ ধ্বংস করিতে উদ্যত। প্রাণের প্রতি স্নেহ-প্রেম মানুষের স্বভাবজ হৃদয়-ধর্ম, নিত্য-সত্যধর্ম, কিন্তু বলিরূপ অন্ধধর্মসংস্কার উহাকে রুদ্ধ করিয়াছে। প্রাণ-কামনার দ্বারা রানী প্রকৃতপক্ষে প্রেমেরই জয়ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষের সত্যধর্মের পরিচয় দিয়াছেন।

রানী অজ্ঞাতসারে যে সত্যের আভাস দিলেন, তাহাই পূর্ণ ও প্রবল প্রতিবাদরূপে আবির্ভূত হইল অপর্ণার মধ্যে। অপর্ণার ছাগশিশু ধরিয়া আনিয়া মায়ের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, ব্যথিত, রোরুদ্যমানা অপর্ণা রাজার কাছে তাহার বিচার চাহিতেছে। রাজা জয়-সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলে, জয়সিংহ বলিল যে, 'বিশ্বমাতা' তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অপর্ণা বলিতেছে,—

কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে!···
আমি তার মাতা।···মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে।

অপর্ণার ছাগশিশুর বলিই নাটকের বিরোধের বীজ। এই বীজ অঙ্কুরিত হইল রাজার মনে,—

এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে।

তারপর বর্ধিত, পল্লবিত হইল রাজার আদেশে,—

মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ···

বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

আর এই ভাবের বীজ জয়সিংহের প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ মনে প্রথম তরঙ্গ তুলিল। আচার-অনুষ্ঠাননিষ্ঠ জয়সিংহের কুয়াশাচ্ছন্ন মানস-গগনে অপ্রত্যাশিতভাবে এক নূতন বৈদ্যুতিক আলো চমকিয়া গেল। এই প্রথম তাহার মনে এক সমস্যার উদয় হইল,—

আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর!

এই সমস্যাই তাহার জীবনের সমস্যা, ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান সত্য, না মানুষের হৃদয়ধর্ম সত্য,—রঘুপতি সত্য না অপর্ণা সত্য? এই দুই বিপরীতমুখী সত্যের সমন্বয় করিতে না পারিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিল।

আবার অপর্ণার দ্বারা রোপিত এই বীজেরই পরিণামস্বরূপে রঘুপতির মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অপর্ণাই প্রকারান্তরে 'বিসর্জন' নাটকের মূল-দ্বন্দ্বের কারণ। তাহা হইলে, যে ভাবসত্য রানী গুণবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে বিকশিত এবং যাহার পূর্ণপ্রকাশ অপর্ণার মধ্যে, সেই প্রাণের প্রতি ভালোবাসাই কবি মূলনাটকের বিরোধের হেতুস্বরূপে প্রথমেই কৌশলে উপস্থাপন করিয়াছেন। কবি নিজেই এই কথাটি সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রানী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয়নি বলে সন্তানলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন, 'আমাকে দয়া ক'রে সন্তান দাও। আমার সব আছে, দাস-দাসী-প্রজা কিছুর অভাব নেই, কিন্তু আমার তপ্তবক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আর-একটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি হবে।' শিশু তো এতটুকু প্রাণের কণিকা, কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ করবে।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিযে আরম্ভ হয়েছে কেন।

তার কারণ হচ্ছে, প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটুখানি যে প্রাণ প্রেমের কাছে তার মূল্য কতো বেশি। একদিকে রানী মানত করছেন যে, বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলি দেবেন; অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ; অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কতো বড়ো জিনিস তা বুঝেছেন। সুতরাং, রানীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে; তিনি জানছেন, ভালবাসা এতো প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে; আবার অপরপক্ষে অসহায় প্রাণী-দের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

তারপর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে, 'তুমি যদি

একদিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালনপালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও। বিশ্ব-মাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণী-হত্যায় খুশি হন। যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ।' মায়েব ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কী করে বিশ্বে প্রকাশ পায়, অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটাই বলে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্যে একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজী আছেন—অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্য দল তা বোঝে নি—তাই দুই দলে বিরোধ বাধল।" (পরিশিষ্ট, বিসর্জন)

তারপর উভয় পক্ষের বিরোধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। রঘুপতি এই আদেশকে ধর্মের ব্যাপারে রাজার অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিয়া স্পর্ধাভরে রাজাকে বলিল,—

তুমি কি ভেবেছ মনে, ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা। প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
মায়ের সেবক।

রঘুপতির বিশ্বাস, কলিকালে ব্রাহ্মণের উপরেই ধর্মরক্ষার ভার। রাজা যদি বিরূপ হয়, ব্রাহ্মণই সে-ভার বহন করিবে—ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। ক্ষাত্রশক্তির সহিত ব্রহ্মতেজের যুদ্ধ হইবে,—

ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী 'পরে।···
বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ। গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ডসিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

রাজার আদেশে রানীর পূজার বলি মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিল। ব্রাহ্মণের তেজ, গর্ব ও দম্ভের প্রতিমূর্তি রঘুপতির কাছে এ এক প্রচণ্ড আঘাত।—

এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম

পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

সংগে সংগে ব্রাহ্মণত্বের উপর ক্ষিপ্ত রঘুপতির প্রচণ্ড ধিক্কার!

ধিক্, ধিক্, শতবার। ধিক্ লক্ষবার।
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিকসম আপনি দংশিছে।
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর।

(পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)

রাজ-আদেশ অমান্য করিয়া বলির দ্বারা পূজা করিবার আয়োজন করিলে গোবিন্দ-মাণিক্য মন্দিরে সৈন্যপাহারা বসাইলেন। ব্যর্থকাম, ক্রোধজর্জর, দাম্ভিক রঘুপতি রাজাকে শাসাইতেছে,—

অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা,
কলিযুগে বহ্মতেজ গেছে—তাই এত দুঃসাহস?
যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে, মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-একদিন।

ইহার পর হইতেই রঘুপতি তাহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গোপনপথ অনুসরণ করিয়া রাজ-হত্যার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। প্রথমে, রাজ্যের লোভ দেখাইয়া নক্ষত্ররায়কে দিয়া হত্যার চেষ্টা করিল; তারপর দুর্বলহৃদয়, গুরুর উপর গভীর বিশ্বাসী জয়সিংহকে হত্যার সপক্ষে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া তাহার মন তৈয়ারী করিল; তারপর প্রতিমার পিছন হইতে 'রাজরক্ত চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া জয়সিংহকে জানাইল যে, দেবীই নিজে রাজরক্ত চাহিতেছেন। মন্দিরে সমাগত রাজা রঘুপতির এই ছলনা ধরিয়া দিলে জয়সিংহের হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। রাজাকে হত্যা করা হইল না; তারপর রঘুপতি দেবীর চরণ স্পর্শ করাইয়া জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করাইল যে, 'শ্রাবণের শেষরাত্রে এনে দিবে রাজরক্ত দেবীর চরণে'। অন্ধ-ধর্মবোধের সংগে তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোপের জন্য আক্রোশ, দম্ভ ও প্রতিহিংসার বাসনা একত্রে মিলিয়া তাহাকে একটা বিরাট দৈত্যশক্তিতে পরিণত করিয়াছে।

রঘুপতির পক্ষের রানী গুণবতী রাজাকে বলি-বন্ধের আদেশ উঠাইয়া লইবার সনির্বন্ধ অনুরোধেও যখন সফলকাম হইলেন না, তখন তিনি প্রতিহিংসার পথ গ্রহণ করিলেন। এই সংস্কারধর্মের সংগে তাঁহার স্বার্থবোধ জড়িত ছিল। তাঁহার অন্ধবিশ্বাস ছিল, বলির দ্বারা মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি সন্তানলাভ করিবেন। এই অসত্য

ধর্মবোধ ও স্বার্থবোধ একত্রে জড়িত হইয়া তাঁহার প্রেমকে, পত্নীত্বকে, অস্বীকার করাইয়া তাঁহাকে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইল। একটি প্রাণ পাইবার জন্য তিনি অন্য একটি প্রাণ বলি দিতে উদ্যত হইলেন। রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র শিশু ধ্রুবকে তিনি মায়ের কাছে বলি দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। রঘুপতি এই বলি দিতেও বিফলমনোরথ হইয়া বন্দী হইল ও নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা পাইল। কূট-কৌশলী রঘুপতি জয়সিংহের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া শ্রাবণের শেষ দিনে রাজরক্তের আশায় কয়েকদিনের জন্য সময় প্রার্থনা করিল। এইখানেই রঘুপতিপক্ষের বিরোধ চূড়ান্ত অবস্থায় পেঁৗছিল।

অন্যদিকে রাজা প্রথম ইহতেই নির্বিকার, অটল অচলভাবে তাঁহার সংকল্পসাধনে রত। সত্যের উপর, আদর্শের উপর তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা। রানীর সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার!
অসহায় জীবরক্তে নহে জননীর
পূজা।

সহস্র শত্রুর সঙ্গে তিনি একা যুদ্ধ করিতেছেন,—

নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ-অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা—
সহস্র শত্রুর সঙ্গে একা যুদ্ধ করি।

বলি-বন্ধে বিস্মিত, রঘুপতি কর্তৃক উত্তেজিত প্রজাদিগকে তিনি বুঝাইতেছেন,—

তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে
গেলি ভুলে! বুঝিতে পার না, মাতা দয়াময়ী!
বুঝিতে পার না, জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে!
বুঝিতে পার না, ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মার সেথা অশ্রুজল।...
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মার সিংহাসন হতে—সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?

এই আদর্শেই অটল থাকিয়া তিনি একই দোষে দোষী রঘুপতি ও নক্ষত্রকে নির্বাসন দিয়াছেন। ইহাই রাজার পক্ষের বিরোধের চরম অবস্থা।

ইহার পর হইতে উভয় পক্ষেরই বিরোধের অবসান হইল। জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের প্রচণ্ড আঘাতে রঘুপতির সমস্ত বিরুদ্ধতা ধূলিসাৎ হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর

দৃঢ়নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্যের গর্ব, আত্মাভিমান ও ক্ষমতার দম্ভ, এবং বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিরাট শক্তির আড়ালে লুকানো ছিল একটি দুর্বল স্থান। সে স্থানটি জয়সিংহের প্রতি অকৃত্রিম পুত্র-স্নেহ। সেই স্থানে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তাহার শক্তির ও ব্যক্তিত্বের অভ্রভেদী প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, আত্মাভিমান-তৃপ্তির উপকরণ-স্বরূপ যে নিঃসংকোচে অন্যের প্রাণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার নিজের প্রাণস্বরূপ জয়সিংহের প্রাণ-বিসর্জনে সে বুঝিতে পারিয়াছে, প্রাণের কী মূল্য! নিজের অপূরণীয় ক্ষতির মূর্তি সে দেখিতে পাইয়াছে—অন্যের ক্ষতিও বুঝিতে পারিয়াছে। একটা বিরাট মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারই পিছনে সে এতদিন ছুটিয়াছিল, আজ সেটার মিথ্যারূপ সে দেখিতে পাইল। তাই পাষাণ-প্রতিমাকে 'পিশাচী', 'মহারাক্ষসী' বলিয়া গালি দিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল, এবং অমৃতময়ী জননী অপর্ণার সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধ দূর হইল অন্য কারণে। ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অশোভনতায় ও প্রজাদের রক্তপাতের আশঙ্কায় রাজা স্বেচ্ছায় রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কারণের বিভিন্নতার জন্য একমুখী বিরোধের স্বাভাবিক পরিণাম আসে নাই। রঘুপতির মোহমুক্তির পূর্বেই রাজা রাজ্য ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রঘুপতির পরাজয় ও মোহ-মুক্তির মধ্যে রাজার আদর্শের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবার পূর্বেই তিনি স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন গ্রহণ করিতেছেন। নক্ষত্র রায় যে তাঁহাকে 'দেবদ্বেষী', 'অবিচারী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাঁহার নির্বাসন কামনা করিয়াছে, তাহারি জন্য ক্ষুব্ধ অভিমানে যেন তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া যাইতেছেন। যে-সত্য ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 'সহস্র শত্রু'র সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও অটল আছেন এবং রঘুপতির সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছেন, তাহার পরিণাম একটা রূপ ধারণ করিবার পূর্বেই কি তিনি একটা বিরক্তি ও হতাশায় রাজ্য ছাড়িতেছেন না? অবশ্য ভাবের দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি যে, গোবিন্দমাণিক্যের সত্যধর্ম ও বৃহত্তর আদর্শেরই জয় হইয়াছে, রঘুপতি তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, এবং মহত্তর আদর্শ ও নীতির জন্য রাজা স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়াছেন। পূর্ব হইতেই রাজার চরিত্র একটা মহৎ ধর্ম ও আদর্শের বাহনরূপেই কল্পিত হইয়াছে, তাই তাঁহার চিত্তে কোনো তরঙ্গোদ্বেলতা নাই, কর্মের মধ্যে চাঞ্চল্য নাই, দ্বন্দ্ব নাই। প্রত্যক্ষ নাটকের ক্ষেত্রে এই পরিণতিতে দুর্ধর্ষ রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে রাজাকে যেন কতকটা দুর্বল দেখায় এবং নাটকীয় রসও খানিকটা চমৎকারিত্ব হারায়। অন্ততপক্ষে রঘুপতির পরিবর্তনের পর রাজার বৈরাগ্য ঘটাইলেও অনেকটা ভালো হইত।

এখন ইহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই জয়সিংহের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন সার্থক চরিত্রসৃষ্টি খুব কম দেখা যায়। অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকীয় চরিত্রের প্রাণ। ইহাই চরিত্রকে জীবন্ত করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে নিপীড়িত জয়সিংহের চিত্তের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার করুণ সৌন্দর্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

যে-মূলধাতুতে জয়সিংহ গড়া, তাহা কোমল, মালিন্যবর্জিত ও শুভ্র। বিশুদ্ধ মানবতার অংশ তাহাতে অনেক বেশি। সে হৃদয়বান, কবি, দার্শনিক, প্রেমিক। সেই জন্য সে সহজ-বিশ্বাসী, অকপট ও দুর্বল। আশৈশব শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে, কালীকে ভক্তি করে, তাঁহার পূজার মধ্যে সার্থকতা দেখে;

রঘুপতির উপর তাহার দৃঢ় ভক্তি, সে তাহার পালক-পিতা, গুরু! সে তাহার ধর্মবিশ্বাস লইয়া রঘুপতির বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গণে দিন কাটাইতেছিল।

এমন সময় অপর্ণার আবির্ভাব। ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার কান্না জয়সিংহের সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে মুক্ত করিয়া তাহার নিজস্ব স্বরূপ অনেকখানি ব্যক্ত করিল। জয়সিংহের জীবনে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। একটা অনাবিষ্কৃত দেশ যেন সে আজ আবিষ্কার করিল। স্নেহ-প্রেম-দয়ার যে অনির্বচনীয় মাধুর্য, জয়সিংহ তাহা আজ আস্বাদন করিল। অপর্ণার আহ্বানে তাহার অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়া প্রেমের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সার্থকতা খুঁজিতে লাগিল। তাই জয়সিংহ বলিতেছে,—

তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে। ভক্তিহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।—

তাহার নবজাগ্রত হৃদয়ে এক নূতন সমস্যার উদয় হইল। মন্দিরের দেবী বিশ্বমাতা সত্যই কি প্রাণবলি চান, তবে প্রাণের জন্য মানুষের এত স্নেহ-প্রেম-দয়া, এত দরদ কেন? এই আনুষ্ঠানিক পূজা সত্য, না স্নেহ-প্রেম সত্য? মন্দিরের দেবী সত্য, না হৃদয়ের এই স্বভাবজ অনুভূতি সত্য? কঠিন পাষাণ-প্রতিমার পূজায় তো হৃদয় ভরে না, সে যে জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, মানবের স্নেহ-প্রেমের মধ্যে ছুটিয়া যাইতে চায়। এ কী কঠিন সমস্যা! অথচ শাস্ত্র বলে, গুরু বলেন, এই নিরন্তর অনুষ্ঠানবহুল পূজার মধ্যেই সার্থকতা, কিন্তু সে সার্থকতায় তো চিত্ত ভরে না, শান্তি পাওয়া যায় না, সুখ পাওয়া যায় না, মুক্তি পাওয়া যায় না, তাই জয়সিংহের জীবন তাহার কাছে শূন্য, অনাবশ্যক মনে হয়,—

কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে উঠে যদি
দশটি সন্দেহসম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ। জান কি, একেলা কারে
বলে।···
সৃজনের আগে
দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয়, এ জীবন বড়ো
বেশি আছে—যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

এই ব্যর্থ, নিরানন্দ জীবনের উপর তাহার প্রবল বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে।

রঘুপতি রাজহত্যার আয়োজন করিতেছে, দোদুল্যমানচিত্ত জয়সিংহের কানে হত্যার সপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছে, কিন্তু জয়সিংহ এ-প্রস্তাব অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, তাই জয়সিংহ দেবীর উদ্দেশ্যে বলে,—

মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই

মার ছদ্মবেশ ধরে রক্তপান লোভে?···
প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা?···

রঘুপতিকে বলে,—

ছি, ছি, ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল
রক্তপিপাসিনী!

তারপর রঘুপতি যখন গর্জন করিয়া ওঠে,—

বন্ধ হোক বলিদান তবে।

তখনই জয়সিংহের ভাবনার মোড় ঘুরিযা যায়,—

না, না, গুরুদেব, তুমি
জান ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো, প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী।

রঘুপতি।

হায় বৎস, হায়, অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়সিংহ।

অবিশ্বাস? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়। বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মত শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া—
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

ইহাই জয়সিংহের মনের অস্থির, কম্পমান চিত্র।

তাহাকে হৃদয়ের ধর্ম ও স্নেহ-প্রেম টানিতেছে একদিকে; শাস্ত্রবিধি ও গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস টানিতেছে অপরদিকে; ঘড়ির দোলকের মতো এইভাবে তাহার মন একবার এদিকে আরবার ওদিকে যাতায়াত করিতেছে। বন্ধন ও আকর্ষণ উভয়েই সমান শক্তিশালী। প্রতিমা ও রঘুপতির বন্ধন যেমন কঠিন, অপর্ণার আকর্ষণও তেমনি প্রবল।

এই নিরন্তর 'সংশয়' ও চিন্তা-জর্জরিত জয়সিংহের কাছে জগৎ ও জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য মায়ামাত্র, জীবন ক্ষণিক, অর্থহীন।

সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা—
তাই হাসিতেছি, তাই গাহিতেছি গান।···
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে ব'সে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসাব্যাঘ্রিনীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতি দিবসের কর্মকাজ।
সত্য হলে এমন কি হত। হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও।···
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার-বিচার-তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;

দিশেহারা, উদার হৃদয়ের ইহা মর্মান্তিক বৈরাগ্য!

গুরুর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া রাজহত্যার জন্য প্রস্তুত হইলে, যখন জয়সিংহ জানিতে পারিল যে, রঘুপতিই দেবীর পিছন দিক হইতে "রাজরক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়াছে, তখনই ছুরিকা ফেলিয়া দিল। মাতা বিমুখ হইয়াছেন রব উঠিলে, যখন জানিল যে, রঘুপতিই প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে, দেবী সত্যই মুখ ফেরান নাই, তখন জয়সিংহের সংশয়ের ভার একটু কমিয়াছে।—

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই।
দেবী নাই। ধন্য, ধন্য, ধন্য মিথ্যা তুমি।

তবে কি তাহার আজন্মের পূজা, শাস্ত্রবিধি-পালন, মায়ের প্রতি তাহার অবিচলিত ভক্তি অর্থহীন, নিষ্ফল? এই মিথ্যা কি সত্য হয় না?

তাই তাহার চরম কাতরোক্তি,—

দেবী, আছ, আছ তুমি! দেবী থাকো তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস আছি'।—নাই! নাই! দেবী নাই।
নাই? দয়া করে থাকো। অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?

এত মিথ্যা তুই?—এ জীবন কারে দিলি,
জয়সিংহ। সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য
দয়াশূন্য মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে।

জয়সিংহ দেবীর প্রতি ভক্তি অপেক্ষা মানবের প্রেমকেই নিকটতর করিয়া পাইতে চায়,—

দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে।
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে। পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে; আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে, সে কি তার কোনো কাজে লাগে।
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায়।

অপর্ণা তাহাকে মন্দির ছাড়িয়া যাইতে বলে। এখন আর মন্দিরে থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেও তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু গুরুর নিকট তাহার প্রতিজ্ঞা পালিত হয় নাই। তাহা ছাড়া পিতৃতুল্য গুরুর স্নেহ-বন্ধন আছে, কর্তব্যের বন্ধন আছে; আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রঘুপতির ব্যক্তিগত বন্ধন আছে। তাহা তো জয়সিংহের পক্ষে অচ্ছেদ্য। জীবন শেষ না করিলে সে বন্ধন ছিন্ন করা যাইবে না, তাই তাহার সংকল্প,—

যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব।

ইহার পরেই জয়সিংহের আত্মবিসর্জন।

কবি সুনিপুণভাবে জয়সিংহের চিত্তের দ্বন্দ্বটি ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত করিয়া অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

কোনো নাট্য-চরিত্রের ট্র্যাজেডির কারণ-নির্ণয়ে পাশ্চাত্য নাট্যসমালোচকগণ যে 'inherent weakness of character' অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, জয়-সিংহের চরিত্রের সেই অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণামের জন্য দায়ী। সেই দুর্বলতা আসিয়াছে তাহার মনুষ্যত্ব হইতে, তাহার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হৃদয় হইতে। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে-ধাতুতে সে গড়া, সে-ধাতু উদার প্রেমিকের ধাতু, কবি ও দার্শনিকের ধাতু। তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, স্বার্থবুদ্ধি নাই। আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কারের বশে, মা মন্দিরে আছেন এবং রক্তবলি কামনা করেন, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে: এই তাহার অন্তরতম উদার ও প্রেমিক-সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অপর্ণার চোখের জলে সে সেই প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাইল। প্রেমের স্পর্শে যখন সে জীবনের আনন্দময়

স্বরূপের সন্ধান পাইল, তখন পূর্বের সংস্কার মিথ্যা বলিয়া মনে হইল; কিন্তু লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা সে চালিত নয়, তাই সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুবিধামত আপোষ করিতে পারিল না, পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে সংকোচ বোধ করিল এবং শেষে মৃত্যুতেই মুক্তিকামনা করিল। নির্মল, নিষ্পাপ, অকপট আদর্শবাদী লোকেদের জীবনে এইভাবেই দুঃখ নামিয়া আসে।

তারপর, রঘুপতি।

আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও সেই ধর্মকে রক্ষা করিবার দায়িত্ববোধ ও তাহার প্রতিনিধিত্বের গর্বই রঘুপতি-চরিত্রের মূলভিত্তি। এই ধর্মকে রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগে জড়িত তাহার সমস্ত মর্যাদা ও আত্মসম্মান, তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও মান-প্রতিপত্তি। তাই সে ইহার উপর কাহারো হস্তক্ষেপ সহ্য করে না, মনে করে—এই ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান, যে-শক্তি এই ধর্মের ধারক, সেই ব্রাহ্মণ্য-শক্তির অমর্যাদা, রাজার বলি-বন্ধের আদেশ রঘুপতির ধর্মপ্রতিনিধিত্বেরই অস্বীকৃতি। তাই রাজার সহিত রঘুপতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। রাজার হিংসাবর্জিত হৃদয়-ধর্মের সহিত রঘুপতির হিংসাত্মক আনুষ্ঠানিক ধর্মের যুদ্ধ ততখানি নয়, যতখানি মনুষ্যত্বের সাধক রাজার সংগে রঘুপতির ব্যক্তিত্বের যুদ্ধ—তাহার আত্মাভিমানের দ্বন্দ্ব।

রঘুপতি এক বিরাট শক্তির মূর্তিমান প্রকাশ। অসাধারণ তাহার বুদ্ধি ও সাহস, অদ্ভুত তাহার উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়চিত্ততা ও কর্মকৌশল। কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধন-জন-বলহীন এই ব্রাহ্মণ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তাহার অধিকার, তাহার একচ্ছত্রাধিপত্য হইতে বিচ্যুত করিবার সমস্ত প্রচেষ্টা সে ব্যর্থ করিবেই। ইহাতে তাহার সত্যমিথ্যা নাই, পাপপুণ্যজ্ঞান নাই, বিবেকের দংশন নাই। সে নক্ষত্র রায়কে বিদ্রোহী হইতে প্ররোচিত করিয়াছে, প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া সরল, বিশ্বাসপরায়ণ প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে, প্রতিমার আড়ালে লুকাইয়া "রক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া দুর্বল-চিত্ত জয়সিংহকে রাজহত্যায় নিয়োগ করিয়াছে, এবং শেষে নির্বাসনদণ্ড পাইয়াও চরম প্রতি-শোধের আশায় কয়েকদিনের জন্য সময় ভিক্ষা করিয়াছে। প্রবল রাশক্তির সহিত সে নানা ছলে ও বুদ্ধির কৌশলে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছে। ন্যায়-অন্যায়-বিচারহীন, বিবেক-বর্জিত, দাম্ভিক আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান চলিয়াছে অক্লান্তভাবে।

তাহার মৃত্যুবাণ কিন্তু তাহার নিজের মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। সে-বাণ তাহার আবাল্যপালিত জয়সিংহের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ। তাহার জীবনের প্রবল বিরুদ্ধশক্তি তাহার অন্তরেই গোপন ছিল। যে-স্নেহপ্রেমকে বহির্জীবনে সে দলিত মথিত করিতেছে, সর্বপ্রকারে রুদ্ধ করিতেছে, সেই স্নেহ-প্রেম তাহার অন্তরের এককোণে অবরুদ্ধ, আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, হঠাৎ তাহা অতি প্রচণ্ড বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার সমস্ত সংস্কার, আত্মাভিমান, বুদ্ধির দম্ভ, কর্মপ্রচেষ্টা এক মুহূর্তে চূর্ণ করিয়া ছিল। জয়-সিংহের মৃত্যু সেই অবরুদ্ধ আচ্ছন্ন স্রোতোধারাকে হঠাৎ কূলপ্লাবিনী মহানদীতে পরিণত করিয়া রঘুপতিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ধর্মের সংস্কার ও বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ-নিষ্ঠা অন্তরের পশুশক্তিকেই উদ্দীপিত করে,—হৃদয়হীনতাতেই তাহার প্রকাশ; অপর দিকে স্নেহ-প্রেম দেবশক্তিকে উদ্বোধিত করে, সকলকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরার মধ্যেই তাহার অভিব্যক্তি। রঘুপতির পশু-অংশ বাহিরে রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, কিন্তু সে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল নিজেরই দেব-অংশের হাতে—বৃহত্তর অংশের

হাতে। নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়া সে স্নেহ-প্রেমের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিল, তাহার নবজন্ম হইল। 'অহংকার, অভিমান, দেবতা, ব্রাহ্মণ' সব গেল, তবুও জয়সিংহকে ফিরিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু মৃত জয়সিংহের আত্মিক শক্তিতে তাহার পুনর্জন্ম হইল। শিষ্য জয়সিংহ মরিয়া গুরু রঘুপতির অন্তরাত্মাকে বাঁচাইল।

রঘুপতির দৃঢ় বিশ্বাস, তেজ, দম্ভ, অহংকার এক নিমিষেই যে ধূলিসাৎ হইয়া গেল এবং যাহাকে সে চরম সত্য বলিয়া ধরিয়াছিল, সেটা পরম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল—ইহার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নাই। এইরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী একমুখী হৃদয়াবেগের ইহাই রহস্য। ইহাই রঘুপতির জীবনের সম্ভাব্য পরিণতি। প্রথম হইতেই দেখা যায়, রঘুপতির চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, সন্দেহ-সংশয়, বিচার-বিতর্ক বা বিবেকের দংশন নাই। একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রচণ্ড আত্মাভিমানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম আবর্তিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে কোনো ফাঁক বা শিথিলতা ছিল না; সেই মূলকেন্দ্রটিই যখন চূর্ণ হইয়া গেল, তখন তাহার চিন্তা ও কর্ম একেবারেই বিপরীত মুখে ঘুরিয়া গেল। জীবনের এই আকস্মিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত দস্যু রত্নাকর হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু দেখা যায়।

কিন্তু এই ধর্মমত ও জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন রঘুপতির জীবনের ঘনীভূত ট্র্যাজেডিকে অনেকখানি হাল্‌কা করিয়া দিয়াছে। তাহার প্রাণাধিক প্রিয় জয়সিংহ যে তাহার প্রচণ্ড অহংকারের বলি, এই মর্মান্তিক চেতনার মধ্যেই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি নিহিত; আমরণ এই বেদনার তুষানল তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকিবে, এইরূপ কল্পনার সুযোগ দিলে নাটকীয়ত্বের দিক দিয়া রঘুপতি-চরিত্র অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করিত। কিন্তু জয়সিংহের মৃত্যু যেন তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছে, তাহার হৃদয় হইতে কুসংস্কার ও হিংসা দূর করিয়া জীবনের প্রকৃতরূপে সন্ধান দিয়াছে; 'মূক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, জড় পাষাণের' মধ্যে যে সত্যকার দেবী নাই, সেই সত্য জানিয়া রঘুপতি দেবীকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছে, অপর্ণাকে অমৃতময়ী প্রত্যক্ষ দেবী বলিয়া তাহার সহিত মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জয়সিংহের মৃত্যু তাহাকে মোহমুক্ত করিয়া পরম উপকার করিয়াছে, এইরূপ কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে। মনে হয়, শেষের দিকে কবি রঘুপতি-চরিত্রের মধ্যে তাঁহার মনোগত একটা ভাবের রূপ প্রকাশ করিতেই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, সেই জন্য মানবিক বাস্তব রসের দিকে বেশি লক্ষ্য দেন নাই। তাহার ফলে এমন অপূর্ব নাটকীয় চরিত্রটি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ধর্মের অন্ধকুসংস্কার ভীষণ, প্রচণ্ড ও আত্মঘাতী হয়, কিন্তু শেষে প্রেমের হাতে তাহার চরম পরাজয় হয়—এই ভাবটি প্রকাশের উপরই কবি বেশি জোর দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রঘুপতি যখনই পাষাণপ্রতিমার মধ্যে দেবী নাই বলিয়াছে, অমনি তাহার সপক্ষ গুণবতীরও রূপান্তর হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস দূর হইয়াছে এবং তিনি প্রকৃত প্রেমের মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন,—

আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্যও এক নূতন প্রেমের রাজ্যের কথা বলিতেছেন,—

গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

পরিণামে দেখা যায়—সংস্কার-ধর্মের উপরে প্রেম-ধর্মের জয় ঘোষণা করাই যেন এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রও একেবারে দ্বন্দ্বহীন এবং একমুখী গতিবিশিষ্ট। তাঁহার মনে সন্দেহ-সংশয় নাই, বিচার-বিতর্ক নাই; একটা উচ্চ আদর্শ ও মহৎ নীতিকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও, পারিপার্শ্বিকের দারুণ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অচঞ্চল ও নির্বিকার থাকিয়া মনুষ্যত্বের আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছেন। রঘুপতি-চরিত্রের এক-মুখিতা বিচিত্র ঘটনার সংস্পর্শে নব নব রসে ও চমৎকারিত্বে আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের একই অভিব্যক্তি কোনো নূতনত্বের আস্বাদ দেয় না। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া গোবিন্দমাণিক্য-চরিত্রকে নিষ্প্রভ মনে হইলেও একটা ভাব বা তত্ত্বের বাহন হিসাবে ইহার সার্থকতা আছে। সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে আদর্শচরিত্র, কবি তাহাই রূপায়িত করিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্যে। তিনি কেবল রাজা নহেন, তিনি রাজর্ষি।

আর একটি চরিত্র অপর্ণা। এই রহস্যময়ীর স্থান রূপক-সাংকেতিক নাটকের আসরে হইলেই অধিকতর শোভন হইত। যে-শক্তি নাটকে জয়ী হইল, সেই স্নেহ-প্রেমের ভাবমূর্তি অপর্ণা। সে-শক্তি নাটকের মধ্যে প্রলয়ংকরী শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। এই শক্তি নাটকের ঘটনা-প্রবাহের সহিত জড়িত নয়, ঘটনার বাহিরে দাঁড়াইয়া অদৃশ্য লোক হইতে যেন নাটকের মধ্যে তাহার অমোঘ প্রভাব নিক্ষেপ করিতেছে। নাটকের মধ্যে অপর্ণার স্থান নগণ্য, কিন্তু তাহার প্রভাব নাটকের সর্বত্র। সে জয়সিংহকে বিগলিত করিয়াছে, রাজাকে স্বপ্ন হইতে জাগরিত করিয়াছে,—

এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতিকেও সে পরোক্ষভাবে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া শেষে তাহার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নাটক পরোক্ষভাবে তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছে।

অপর্ণা-চরিত্রের মানবিক অংশ অপরিস্ফুট ও ক্ষীণ। সে একটা ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হয়। সে যেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর রঘু-দুহিতারই আর একটা রূপ। জয়সিংহের প্রতি তাহার প্রেমের পূর্ব-পর উদ্ভব ও পরিণতি নাই, আবেগের স্পন্দন নাই, চিত্তদ্বন্দ্ব নাই। তাহার সমস্ত কার্য অন্তরের মধ্যে একটা ভাবের উদ্বোধনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। একটা অশরীরিণী বাণীর মতো সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তের দ্বারে সে কেবলই ধ্বনিত করিয়াছে,—'এই অন্ধ সংস্কার ও হিংসা ছাড়িয়া প্রেম ও মানবতার মধ্যে চলিয়া আইস'। জয়সিংহকে সে পুনঃ পুনঃ মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বলিয়াছে, শেষদৃশ্যে সে শোকোন্মত্ত রঘু-পতিকে বলিয়াছে,—'পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা, পিতা, চলে এস'। প্রেম ও মানবতার মধ্যেই যে জীবনের সার্থকতা, তাহার ইঙ্গিত দিবার জন্যই যেন তাহার সৃষ্টি।

মালিনী

(১৩০৩)

'মালিনী', 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর মতো নানা ঘটনাসংকুল, দীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক নাটক নয়। ইহা পাঁচটি দৃশ্যসমন্বিত ক্ষুদ্র একটি একাঙ্ক নাটিকা। ঘটনার দ্রুতগতি ও নাটকীয়ত্বে ইহাকে রোমান্টিক ট্র্যাজেডির পর্যায়ে ফেলা যায়, আবার ভাববস্তু ও ভাষার সাদৃশ্যে এবং কাব্যসম্পদের উৎকর্ষে ইহাকে কাব্যনাট্যের অন্তর্গতও করা যায়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal -এর 'মহাবস্ত্ববদান'-এর একটি উপাখ্যানের ক্ষীণ ভিত্তির উপর ইহা রচিত। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়-চরিত্র, তাহাদের বন্ধুত্ব ও শেষপরিণাম একান্তভাবে কবি-কল্পনার সৃষ্টি।

এই নাটক-রচনার প্রেরণা কবি কি ভাবে পাইয়াছিলেন, তাহা কবির ভাষাতেই বলা যাক,—

"মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালীদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলমালে রাত হয়ে গেল।......পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রি-যাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে।

এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।...

অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।"

(সূচনা, মালিনী)

এই স্বপ্নলব্ধ কাহিনীকে মূলকাহিনীর সহিত মিশাইয়া তাহার বিভিন্ন ধর্মাদর্শের ছাঁচে ফেলিয়া কবি এই অনবদ্য নাটিকাটি নির্মাণ করিয়াছেন।

মালিনীর আখ্যানবস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইঃ—মালিনী কাশীরাজকন্যা। সে কাশ্যপের নিকট হইতে নূতন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে নগরের ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া রাজার নিকট মালিনীর নির্বাসন চাহিল। প্রজারা নির্বাসন চাহে শুনিয়া মালিনী নিজেই রাজগৃহ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণসভায় উপস্থিত হইল। তাহার শান্ত-স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ময় মূর্তি, স্নেহ ও করুণামাখা চোখ এবং অনাড়ম্বর বেশবাস দেখিয়া বিদ্রোহিগণ বিস্মিত ও শান্ত হইয়া গেল। মালিনী জানাইল, সে সর্বজীবের সেবা এবং সংসারে করুণা ও মৈত্রী বিতরণ করিতেই রাজগৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছে। তখন অনুতপ্ত প্রজারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া 'জয়-জয়-রবে' মালিনীকে রাজগৃহে ফিরাইয়া আনিল।

এই বিদ্রোহী প্রজাদের নেতা ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষেমংকর। সে বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বুঝিলেও চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুপ্রিয়ও তাহারি দলে ছিল, কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—'যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস'ই কেবল ধর্ম, আর 'সর্বজীবে প্রেম' ও 'দয়া-ধর্ম' কি সত্যধর্ম নয়? ক্ষেমংকর 'চির-আচরিত', 'চির-পরিচিত', 'প্রাণপ্রিয়' 'পিতৃধর্ম' ত্যাগ করিতে তাহাকে নিষেধ করে। ক্ষেমংকরের বুদ্ধি ও জ্ঞানে সুপ্রিয়ের বিশেষ আস্থা, বন্ধুত্বও গভীর, তবুও বলে শাস্ত্রের ধর্ম অপেক্ষা হৃদয়ের ধর্মই তাহার কাছে বড়ো। মালিনীর মধ্যেই সে তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধর্মের মূর্তি দেখিতে পাইয়াছে। ক্ষেমংকর যখন দেখিল, তাহারা দুই বন্ধু ব্যতীত সকল ব্রাহ্মণই মালিনীর নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং সুপ্রিয়েরও পুরাতন ধর্মে আস্থা নাই, তখন এই পুরাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য সে অগ্রসর হইল। সে স্থির করিল, বিদেশ হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আনিয়া কাশী হইতে বৌদ্ধধর্ম উৎপাটন করিবে ও পুনরায় হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। সেই উদ্দেশ্যে সে কাশী ত্যাগ করিল। একথা সে কেবল তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুপ্রিয়কেই বলিল এবং তাহাকেই রাজধানীতে রাখিয়া সৈন্যসংগ্রহের জন্য বিদেশে যাত্রা করিল। সুপ্রিয়ও বন্ধুর সহযাত্রী হইতে চাহিল, কিন্তু ক্ষেমংকর তাহার অনুপস্থিতিতে রাজধানীর সমস্ত সংবাদ চিঠির সাহায্যে জানিবার জন্য সুপ্রিয়কে সঙ্গে লইল না, আর সাবধান করিয়া দিয়া গেল, যেন সে নূতন ধর্মের কুহকে না পড়ে।

ক্ষেমংকর চলিয়া যাওয়ার পর সুপ্রিয় রাজ-উপবনে মালিনীর সঙ্গে প্রায়ই ধর্মালোচনা করে। মালিনীর নবধর্মকে সে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মালিনীও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞাতসারেই উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। এমন সময় সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের পত্র পাইল। ক্ষেমংকর লিখিয়াছে, বিদেশী রাজ্য হইতে সৈন্য লইয়া সে কাশীতে আসিতেছে, বাহুবলে সে নবধর্ম বিলোপ করিয়া আবার সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবে ও নবধর্মের আশ্রয়স্থল মালিনীর প্রাণদণ্ড দিবে। মালিনীর প্রাণনাশের আশংকা সুপ্রিয়কে বিহ্বল করিল। সে রাজাকে সেই পত্র দেখাইল। রাজা মৃগয়ার ছলে গোপনে সসৈন্যে বাহির হইয়া অতর্কিতভাবে ক্ষেমংকরকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া আনিলেন।

রাজা সুপ্রিয়ের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইলেন এবং কৃতজ্ঞতার পুরস্কার-স্বরূপ কন্যা মালিনীকে সুপ্রিয়ের হাতে দান করিবেন স্থির করিলেন।

রাজা ক্ষেমংকরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন, কিন্তু মালিনীর অনুরোধে শেষে সে আদেশ প্রত্যাহার করিবেন স্থির করিলেন। ক্ষেমংকর আসিলে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—'যদি প্রাণ ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি' তবে সে কি করিবে। নির্ভীকভাবে ক্ষেমংকর উত্তর করিল,—'পুনর্বার তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার।' রাজা তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পূর্বে যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, তাহা করিতে বলিলেন। ক্ষেমংকর বলিল, 'বন্ধু সুপ্রিয়েরে শুধু দেখিবারে চাই।' সুপ্রিয় আসিলে ক্ষেমংকর জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে। সুপ্রিয় বলিল, তাহার নবধর্মের প্রতি বিশ্বাসের জন্য এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই নবধর্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার জন্যই সে এতদিনের বন্ধুত্ব ও প্রণয় ভঙ্গ করিয়াছে। ক্ষেমংকর মৃত্যুর পূর্বে সুপ্রিয়কে একবার আলিঙ্গন করিয়া যাইবার জন্য নিকটে আহ্বান করিল, এবং সুপ্রিয় নিকটে গেলে, হাতের শিকল দিয়া তাহার মাথায় এমন আঘাত

করিল, যে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তারপর সে ঘাতককে আহ্বান করিল। রাজাও শীঘ্র খড়্গ আনিতে বলিলেন। মালিনী তখন 'ক্ষমা করো ক্ষেমংকরে' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

'মালিনী' পূর্বে আলোচিত 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস' প্রভৃতি কাব্যনাট্যগুলির বৎসরকাল পূর্বে রচিত। আমরা দেখিয়াছি যে, এই কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে কবি ধর্মের বিভিন্ন আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন। 'মালিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসর পরে রচিত 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' পর্যন্ত কবির মনে ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে একটা বিচার-বিতর্ক চলিতেছিল। 'বিসর্জন' হইতে ইহার একপ্রকার সূত্রপাত বলা যায়। সত্যধর্ম বা মানবধর্মই তাঁহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহা সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ধর্ম। অখণ্ড, শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মই মানবের সত্যধর্ম। লোকধর্ম, রাজধর্ম, সমাজধর্ম, শাস্ত্রধর্ম, পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পতিধর্ম, পত্নীধর্ম ইত্যাদি সমস্ত ধর্মই সত্যধর্ম হইতে পারে যদি তাহা শাশ্বত সত্যের উপর, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা না হইলে সেগুলি খণ্ড, ক্ষুদ্র ধর্ম। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্মবোধের এই বিভিন্ন আদর্শই এই সব নাটক ও কাব্য-নাট্যের নাটকীয় দ্বন্দ্বের ভিত্তি। মালিনীর মধ্যেও ধর্মের এই বিভিন্ন আদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মত-বিরোধের দ্বন্দ্ব রূপায়িত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মালিনীর 'সূচনা'য় বলিতেছেন,—

> "আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না। সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"

এই নাটকের মধ্যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ ও আদর্শ বিভিন্ন পাত্রপাত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, প্রত্যেকে তাহার জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যা, পারিপার্শ্বিক, মানসিক প্রবণতা অনুসারে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছে। এই ধর্মের আদর্শ তাহাদের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে কি বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করিতেছে এবং তাহারা কিভাবে তাহার সামঞ্জস্যবিধান করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই অন্তর্দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু।

নূতন সত্যধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে রাজকন্যা মালিনীর মধ্যে। এই সত্যধর্ম কি? বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মের পরিবর্তে করুণা, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেম-মূলক বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের ঐ মূলনীতিগুলির তীব্র অনুভূতির প্রকাশ হইয়াছে মালিনীর চিত্তে। মালিনীর কাব্যময় অনুভূতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার অন্তরে একটা দিব্য প্রেরণা আসিয়াছে, দুঃখপীড়িত বিশ্বজগৎকে সে 'সান্ত্বনার সুধা' দান করিবার জন্য উৎসুক, নিজেকে পরের জন্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত।—

মহাক্ষণ আসিয়াছে। অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল

পদ্মদলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে
কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মুরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো; বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারংবার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।

* * *

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা.
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে। দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

কিন্তু এই যে মালিনীর 'অন্তঃকরণে' 'অপরিমেয় করুণা'র অনুভূতি, ইহা যেন সত্যরূপে তাহার প্রকৃতির মূলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, একটা সাময়িক প্রবল প্রেরণারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা যেন একটা আকস্মিক আবির্ভাব—স্বল্পকালস্থায়ী Revelation-এর মতো। এই আকস্মিক করুণার উন্মাদনায় সে বাহির হইয়াছিল, তারপর ঘরে ফিরিয়া সে যেন স্বাভাবিক সত্তা ফিরিয়া পাইল। নগরবাসীদের 'সহস্র হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছ্বসিত জয়জয়কার ধ্বনি'র সহিত সে গৃহে ফিরিয়া সর্বাগ্রে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে,—

মাগো, শান্ত এবে আমি। কাঁপিতেছে দেহ।
কোথা গিয়েছিনু চলে ছাড়ি মার স্নেহ
প্রকাণ্ড পৃথিবী মাঝে। মাগো নিদ্রা আন্
চক্ষে মোর। ধীরে ধীরে কর্ তুই গান
শিশুকালে শুনিতাম যাহা।

তারপর গৃহে ফিরিবার পর মালিনীর চরিত্রের আরো পরিবর্তন হইল। সে দেবী হইতে মানবীতে নামিয়া আসিল। আবেশের মেয়াদ কাটিয়া গিয়াছে, সে-জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি আর তাহার নাই, এখন সে শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সংসার-অনভিজ্ঞা, সাধারণ বালিকামাত্র। সুপ্রিয়কে সে অকপটে বলিতেছে,—

হায় বিপ্রবর,
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মতো।
যে দেবতা মর্মে মোর বজ্রালোক হানি
বলেছিল একদিন বিদ্যুন্ময়ী বাণী
সে আজি কোথা গেল। সেদিন, ব্রাহ্মণ,
কেন তুমি আসিলে না—কেন এতক্ষণ
সন্দেহে রহিলে দূরে। বিশ্বে বাহিরিয়া
আজি মোর লাগে ভয়—কেঁপে ওঠে হিয়া,
কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি—
মহাধর্ম-তরণীর বালিকা কান্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কী সহায় মোর।

কেবল তাহাই নয়, সুপ্রিয়ের প্রতি মানব-কুমারীর মতোই তাহার প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। মুগ্ধা প্রণয়িনীর মতোই সে বলে,—

হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা।
বড়োই বিস্ময় লাগে মনে।

সাহায্যকারিভাবে, বন্ধুভাবে সুপ্রিয়কে সে তাহার জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিতে চায়,—

মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ
রুদ্ধ করে দেয় যেন প্রাণের প্রবাহ,
পীড়ন করিতে থাকে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে,
থেকে থেকে অকারণ অশ্রুজলে ভাসে
দু-নয়ন, কোন্ বেদনায়। অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে, সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ?

প্রজাগণ দেবীর দর্শন কামনা করিলে দেবী আর তাহার পূর্বেকার দেবীর ভূমিকা-অভিনয়ের অক্ষমতা জানাইতেছে—

আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার, আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা।

সে এখন কেবল সুপ্রিয়ের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তাহার 'সুখ-দুঃখ কথা', 'গৃহের বারতা সব আত্মীয়ের মতো' শুনিতে ইচ্ছা করে। তারপর রাজার মালিনীকে সুপ্রিয়ের হাতে দান করিবার ইচ্ছায় সুপ্রিয় যখন বলিল যে, বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া সে 'সপ্ত স্বর্গলোক' চায় না, সে দীনহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন মালিনীর আশাভঙ্গজনিত দীর্ঘশ্বাস,—

ওরে রমণীর মন
কোথা বক্ষমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায়।

তারপর 'ভাল লজ্জার আভায় রাঙা'! একেবারে দেবী হইতে সাধারণ প্রণয়িনীতে রূপান্তরিত।

মালিনীর ক্ষুদ্র জীবন-পরিচয়ে তাহার চরিত্রের এই পরিবর্তন বেশ লক্ষ্য করা যায়।

এখন প্রশ্ন এই, মালিনীর মধ্য দিয়া কবি কোন্ ধর্মাদর্শকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন? এই নিত্য-সত্য মানব-ধর্মের আদর্শ আমরা গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে দেখিয়াছি। কী অবিচলিত বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় সঙ্গে অচল, অটলভাবে তিনি এই আদর্শকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্তরের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যক্তিগত নানা বাধা-বিঘ্নের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনি তাঁহার আদর্শের পতাকা উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছেন। শেষে এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাতেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এই ধর্ম ছিল জীবন-মরণব্যাপী এক অপরাজেয় শক্তি। কিন্তু মালিনীর মধ্যে দেখি ক্ষণস্থায়ী একটা ধর্মের আবেশমাত্র, একটা প্রেরণার হাউই মাত্র। এই নবধর্মের বাহন করিতে হইলে কবি তাহাকে এমন দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? পক্ষান্তরে দেখি তাহার নবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেমংকরের চরিত্রের বজ্র-কঠোর দৃঢ়তা, স্থির, অকম্পিত বিশ্বাসের তেজ। এই অসম বিরোধ-উপস্থাপনের কারণ কি? মনে হয়, প্রত্যক্ষভাবে ধর্মাদর্শের বিরোধ দেখানো এ-নাটকে কবির মূল-অভিপ্রায় নয়, ধর্মের বিভিন্ন আদর্শের প্রভাব বিভিন্ন নরনারীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে, বাস্তব অনুভূতির সঙ্গে কি বিরোধ সৃষ্টি করে এবং কি তাহার পরিণতি হয়, তাহারই একটা চিত্র-প্রদর্শনই কবির মূল-অভিপ্রায়। ধর্মাদর্শের পটভূমিকায় নরনারীর জীবনে আদর্শ ও বাস্তব অনুভূতির দ্বন্দ্ব বা সামঞ্জস্যসাধনই ইহার মূল বিষয়বস্তু।

এই নাটকে বিরোধের একপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে মালিনী নয়, দেবী মালিনীর ধর্মাদর্শের ক্ষীণ প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও মানবী মালিনীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ও তাহার প্রতি প্রেমে অভিভূত সুপ্রিয়। মালিনীকে হারাইবার আশঙ্কায় তাহার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাতেই এই বিরোধের চরম প্রকাশ, একের মৃত্যু ও অপরের অনুমেয় মৃত্যুতে তাহার পরিণতি। সেইজন্য মালিনীর দেবী ও মানবী সত্তার মধ্যে একটা সীমারেখা লক্ষ্য করা যায়, দেবীর ভাব ও মানবীর ব্যক্তিগত প্রভাবই এই নাটকে পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল।

মালিনীর এই দ্বৈতসত্তার প্রভাবই নাটকের সর্বত্র পরিস্ফুট। প্রত্যেকেই এই প্রভাবকে নিজ নিজ মানসিক গঠন অনুযায়ী জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে চাহিয়াছে, হয় বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, নয় বিদ্রোহীই রহিয়াছে। রাজা ও রানী তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞানের অনুপাতে মালিনীকে জীবনের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, সুপ্রিয়ও মালিনীকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়াই ধর্মের আদর্শকে সমস্ত হৃদয় দিয়া জীবনের মধ্যে সফল করিয়া পাইয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই কেবল ক্ষেমংকর। সে-ই বিদ্রোহী। সে মালিনীকে নূতন ধর্মের প্রভাব, তাহার ব্যক্তিগত আকর্ষণের প্রভাব কাটাইয়া তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার-অনুযায়ী তাহার নিজের পথেই চলিয়াছে এবং শেষে ট্র্যাজিক পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে।

কাশীরাজের নবধর্মের প্রতি আগ্রহ নাই। কন্যা যখন ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহাতে আপত্তিও তাঁহার নাই। কিন্তু ইহার প্রকাশ্য প্রচারের তিনি বিরোধী, কারণ রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে তিনি দেখিতেছেন যে, অধিকাংশ প্রজাই প্রাচীন ধর্মাবলম্বী, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আনিতে পারে। তাই কন্যাকে বলিতেছেন,—

হায় রে অবোধ মেয়ে, নব ধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জাত্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস
রাখ মনে মনে।

যখন প্রজাবৃন্দ ও সৈন্যদল সকলেই বিদ্রোহী হইয়াছে শুনিলেন, তখন রাজা মালিনীকে নির্বাসন দিতেও প্রস্তুত,—

ধীরে, বৎস ধীরে।
দিব তারে নির্বাসন,—পুরাব প্রার্থনা—
সাধিব কর্তব্য মোর। মনে করিয়ো না
বৃদ্ধ আমি মোহমুগ্ধ, অন্তর দুর্বল,
রাজধর্ম তুচ্ছ করি ফেলি অশ্রুজল।

তারপর যখন শুনিলেন মালিনীর রাজপ্রসাদ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন কন্যাহারা পিতা রাজাকেও ছাড়াইয়া গেল,—

গেছে চলে?
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
কোলের কন্যারে মোর! রাজ্যে ধিক থাক্।
ধিক ধর্মহীন রাজনীতি।

কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মালিনী প্রজাবৃন্দের কাছে নবধর্মের দেবী-বিগ্রহ-রূপে সম্মানিতা হইয়াছে, তখন তাঁহার অপার আনন্দ,—

কী সৌন্দর্যময়
আজিকার ছবি। সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন—তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে উর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার-
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

মালিনীর নবধর্মের ধার রাজা ধারেন না, রাজনীতির মানদণ্ডে তিনি ইহাকে বিচার করিয়াছেন। প্রজারা মালিনীর ধর্ম চায় না ভাবিয়া তিনি মালিনীকে নির্বাসিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন, আবার যখন প্রজারা তাহার জয়জয়কার-ধ্বনি দিল, তখন মালিনীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে ধর্ম রাজনীতির অনুকূল হওয়া চাই, ধর্ম ধর্মের জন্য নহে, রাজনীতির জন্য। কিন্তু ধর্মের উপরে, রাজনীতির উপরে তাঁহার পিতৃস্নেহ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে দেখা যায়। কন্যাকে হারাইয়া তিনি রাজ্যকে ধিক্কার দিয়াছেন, রাজনীতিকে ধিক্কার দিয়াছেন। মানবী মালিনীই তাঁহার উপর বেশি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, দেবী মালিনী নয়—পিতৃধর্ম নবধর্মের উপর জয়লাভ করিয়াছে।

রানীর মধ্যেও দেখি মাতৃধর্মই তাঁহার উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মানবী মালিনীই তাঁহার চোখে বড়। নারীর ধর্ম যে সংসারধর্ম—তাহার উপরেই তিনি বেশি জোর দিয়াছেন। নবধর্মের উপর তাঁহার কোনো আস্থা নাই, শাস্ত্রসর্বস্ব পুরাতন ধর্মও তিনি অনুমোদন করেন না, পতিপুত্র লইয়া যে সংসারধর্ম, তাহাই কন্যার পক্ষে একমাত্র ধর্ম তিনি মনে করেন।—

এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন?
আমার পিতার ধর্ম সে তো পুরাতন
অনাদি কালের। কিন্তু মাগো, এ যে তব
সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে
বিষয় সন্ন্যাসী? দেখে আমি মরি ত্রাসে।

আবার পুঁথিগত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকেও তিনি ভালো বলেন না,—

শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরা মরুক ভাবিয়া
সত্যাসত্য ধর্মাধর্ম কর্তাকর্মক্রিয়া
অনুস্বার চন্দ্রবিন্দু লয়ে। পুরুষের
দেশভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের
স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম; সদা হা হা করে
ফিরে তারা শান্তি গালি সন্দেহ-সাগরে।
শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি।

যে-ধর্ম তাঁহার অনুমোদিত সে-সম্বন্ধে কন্যাকে উপদেশ দিতেছেন,—

ধর্ম কি খুঁজিতে হয়।
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়
চিরকাল আছে। ধরো তুমি সেই ধর্ম,

সরল সে পথ। লহ ব্রতক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা করো দিনযামী,
বর মাগি লহ বাছা তাঁরি মতো স্বামী;
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ-কথা।...
রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

তাঁহার অনুমোদিত ধর্ম নারীর চিরন্তন ধর্ম। সে-ধর্ম-প্রতিপালনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধতা থাকিতে পারে না, আপত্তি থাকিতে পারে না, তাহা লুকাইবারও কোনো প্রয়োজন নাই। তাহাতে শাস্ত্রের তর্ক ও বাদানুবাদ নাই, নবধর্মের উন্মত্ততাও নাই, কেবল আছে সহজ সরল ঈশ্বরভক্তির পথে স্বামী-পুত্র লইয়া সংসারধর্ম-পালন। তাই রাজা যখন প্রথমে মালিনীকে তাহার ধর্ম বাহিরে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন রানী বলিয়াছেন,—

কী শিক্ষা শিখাতে এলে আজ
পাপ রাষ্ট্রনীতি? লুকায়ে করিবে কাজ,
ধর্মে দিবে চাপা! সে মেয়ে আমার নয়।
সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা,
আমি তো বুঝিনে তাহে দোষ দিবে কেবা,
ভয় বা কাহারে।

আবার রাজা যখন দেখিলেন, নবধর্মের গুণে মালিনী প্রজাবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে, তখন এই ধর্ম তাঁহার রাজনীতির সহায়ক জানিয়া মালিনীকে প্রশংসা করিতেছেন, উৎসাহ দিতেছেন, কিন্তু রানী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন,—

নব ধর্ম, নব ধর্ম কারে বল তুমি,
কে আনিল নবধর্ম কোথা তার ভূমি
আকাশকুসুম? কোন্ মত্ততার স্রোতে
ভেসে এল—কন্যারে মায়েব কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়—ধর্ম বলে তায়?
তুমিও দিয়ো না যোগ কন্যার খেলায়
মহারাজ।...
স্বয়ংবর সভা আনো ডেকে
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক্ বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা।

রানীর নিকট গতানুগতিক ধর্ম বা নবধর্ম কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি চাহেন মালিনীকে গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে। মালিনী তাঁহার কাছে একেবারে দেবী নয়, নবধর্মের বিগ্রহ-স্বরূপিণীও নয়, আবার অতি-সাধারণ একটি মানবকন্যাও নয়, মালিনীর

যে-চিত্র তাঁহার মনে বিরাজিত, তাহা সরল ভক্তিমতী, উন্নত হৃদয়সম্পদে দেবী-স্বরূপিণী পতি-পুত্র-শোভিতা এক রাজকুমারী।

সুপ্রিয়ের চরিত্র সর্বাপেক্ষা জটিল। আনুষ্ঠানিক প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতা, ধর্মকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসারকে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধনে বাঁধিবার একটা আনন্দময় প্রেরণা ও মালিনীর মধ্যে সেই প্রাণময় প্রেমধর্মের জীবন্ত মূর্তি দেখিয়া তাহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ; গভীর বন্ধু-প্রীতি ও নির্ভরশীলতা এবং মানবী মালিনীর প্রতি সৌন্দর্য ও প্রেমের অতি নিগূঢ় আসক্তি—ইহাদের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বই তাহার চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত।

প্রথমেই দেখি রাজকুমারীর নির্বাসনপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাহার মতদ্বৈধ। প্রেম ও দয়াধর্মকে সে দোষ দিতে পারে না,—

যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়ে নির্বাসন
এই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার,—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার,
তার বেশি যাহা আছে, প্রমাণ কী তার।

কিন্তু যখনই তাহার বন্ধু ক্ষেমংকর তাহাকে 'পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি', 'প্রাণপ্রিয় পিতৃধর্ম' ও 'চির-আচরিত কর্ম' ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখনই আবার সে ঘুরিয়া গিয়া বলিয়াছে.—

তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে ধরি। যুক্তি-সূচি 'পরে
সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে।

আবার যখন সে সেই দয়া ও প্রেমধর্মের বিগ্রহ-স্বরূপিণী মালিনীকে দেখিল, তখন তাহার অভূতপূর্ব ভাবান্তর,—

মিথ্যা তব স্বর্গধাম
মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর—ভ্রমিলাম
বৃথা এ-সংসারে এতকাল। পাই নাই,
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা,
আমার অন্তর মাঝে কই কহে কথা,
কী প্রশ্নের দেয় সে উত্তর—কী ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা। আজি তুমি কে আমার

জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
এ কী গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

তারপর ক্ষেমংকর যখন বুঝাইল যে, 'আর্যধর্ম-মহাদুর্গ তীর্থ-নগরী এ পুণ্য কাশীর' উপর অন্ধকার রাত্রি নামিয়া আসিবে, সেই বিশ্বব্যাপী দুর্যোগে প্রলয়ের রাত্রে সুপ্রিয় তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, তখনই সুপ্রিয় উত্তর দিতেছে,—

কভু নহে, কভু নহে! নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

এমন কি সৈন্যসংগ্রহের জন্য প্রবাস-যাত্রায় সে-ও ক্ষেমংকরের সহযাত্রী হইতে চাহিল।

সুপ্রিয়ের মধ্যে এই যে চলৎ-চিত্ততা, দোদুল্যমান মানস-ক্রিয়া, ইহার প্রধান কারণ তাহার মূলচরিত্রগত দৌর্বল্য। সে একান্তভাবে হৃদয়াবেগের অধীন। যাহা তাহার হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে না, তাহার বিশেষ কোনো আবেদন তাহার কাছে নাই। আবেগের চরম মুহূর্তে অনুভূতির মধ্যে যাহা ধরা দেয়, তাহাকেই সে একান্ত সত্য বলয়া মনে করে। তাহার ধর্ম হৃদয়-ধর্ম, তাহার অন্তর-প্রকৃতির ধাতু কবির ধাতু, আর্টিস্টের ধাতু। ক্ষেমংকরের সহিত বন্ধুত্বও তাহার একটা হৃদয়াবেগের সামগ্রী, একটা অনুভূতির সত্য, তাই সে তাহার হৃদয়ের উপর অত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ধর্মের, আধ্যাত্মিকতার বা আনুষ্ঠানিক সাধনার দিকে তাহার চিত্তের কোনো প্রবণতা নাই, সে হৃদয় দিয়া একটা আদর্শকে অনুভব করিতে চায়, হৃদয়াবেগের ইন্ধন জোগাইতে পারে এমন একটা অনুপ্রেরণা চায়।

ক্ষেমংকরের দেশত্যাগের পর সুপ্রিয় মালিনীর নিকট-সান্নিধ্য লাভ করিল। নবধর্মের মহান্ আদর্শের অনুপ্রেরণার মূর্তিমতী প্রকাশরূপে সে মালিনীকে দেখিয়াছিল, কিন্তু যেন ব্যক্তি-মালিনীই সে-অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হইল। একটা বৃহত্তর ভাবময় উদ্দীপনা মানবীয় প্রেমের রহস্যে মন্ডিত হইতে চলিল। ভাবময়ী, সৌন্দর্যময়ী, প্রেমময়ী মালিনীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করিল,—

সভায় পন্ডিত আমি তোমার চরণে
বালকেব মতো। দেবী, লহ মোর ভার।
যে-পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে, সব তর্ক করি পরিহার,
নীরব ছায়ার মতো দীপবর্তিকার।

তারপর,

পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

তারপর,

প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত
সবল নির্মল করি, বুদ্ধি করি শান্ত
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

তারপর,

লভিলাম যেন আমি নবজন্মভূমি
যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি
সুধাবৃষ্টি।

আর একটি হৃদয়ের বস্তু ছিল সুপ্রিয়ের। সে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি। এই বন্ধুপ্রীতি ও মালিনীর প্রতি প্রেম, উভয়ের দ্বন্দ্বে অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল। বন্দী ক্ষেমংকরের নিকট সে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধর্মের রূপ সে মালিনীর মধ্যেই দেখিয়াছে।—

মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে-আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে, সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম মোর।

মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াও তাহার দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ও তাহারি জয়গান।

হে দেবী, তোমার জয়। নিজ পদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে

জ্বালায়েছ—আজি হল পরীক্ষা তাহার—
তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠুরাঘাত করিনু গ্রহণ।
রক্ত উচ্ছ্বসিয়া ওঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হৃদয় হতে,—তবু সমুজ্জ্বল
অম্লান অচল দীপ্তি করিছে বিরাজ
সর্বোপরি। ভক্তের পরীক্ষা হল আজ,
জয় দেবী।

এই ধর্মরূপিণী দেবীর জন্য সে প্রাণের অধিক বন্ধু-প্রণয় বিসর্জন দিয়াছে—

ক্ষেমংকর, তুমি দিবে প্রাণ,—
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার।

শেষ-নিঃশ্বাস ছাড়িবার পূর্বেও সে বলিয়াছে, 'দেবী তব জয়'।

ক্ষেমংকর-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিসর্জনের জয়সিংহ ও মালিনীর ক্ষেমংকরের চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি বিভিন্নমুখী চরিত্র সমগ্র রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের মধ্যে অনেকটা সত্যকার নাটকীয় বর্ণ-গন্ধ স্বাদযুক্ত ও সার্থক ট্র্যাজিক চরিত্র।

বুদ্ধি ও মনস্বিতার প্রখর দীপ্তি, স্বীয় জ্ঞান, বিশ্বাস ও মতবাদের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অসাধারণ চরিত্রবল ক্ষেমংকরের বৈশিষ্ট্য। এইরূপ আর একটি সৃষ্টি রঘুপতি। তাহারো এইরূপ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও যুক্তি-কৌশল দেখি, মতের উপর অচলা নিষ্ঠা দেখি, কিন্তু যে-চরিত্রের আধারে এগুলিকে সে ধারণ করিয়াছিল, ক্ষেমংকরের চরিত্রের মতো তাহার বজ্রকঠিন ভিত্তি ছিল না। তাই রঘুপতির মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা ও গৌরব নাই। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একাধিকবার সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 'গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব' জানিয়াও 'রাজদ্বারে নতজানু হয়ে' 'দুটো দিন ভিক্ষা মাগি' লইয়াছে; পরিণামে ধর্মমত ত্যাগ করিয়াছে। চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি তাহার নাই, চরিত্র-গৌরবে গরীয়ান্ এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাহাকে মনে হয় না। সে ছলে-বলে-কৌশলে কার্যসিদ্ধি করিবার একজন সুকৌশলী চতুর লোক। যতই সে শক্তিশালী হউক, তাহার চরিত্রে যেন একটা villain-এর ছাপ আছে।

কিন্তু যে-ধাতুতে ক্ষেমংকর গড়া, তাহা একেবারে অবিমিশ্র,—তাহার মধ্যে অসত্য নাই, মালিন্য নাই, ফাঁকি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। জীবন ও ধর্ম তাহাতে একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। উভয়েই সমান অচলপ্রতিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ। আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াও সে স্থির, নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তাহার অন্তরের আলোককে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি তাহাকে ক্ষমা করেন, তবে সে কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিঃসংকোচে ও অকপটভাবে বলিয়াছে,—

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার,—
যে-পথে চলিতেছিনু আবার সে-পথে
যেতে হবে।

তাহার বন্ধু-প্রণয়েও কোনো ফাঁকি নাই। তাহার জীবন, ধর্ম ও বন্ধু-প্রণয় একত্রে একই সত্যে বাঁধা। সুপ্রিয় যখন বলিল যে,—

আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার।—

তখন ক্ষেমংকর বলিয়াছে—মৃত্যুর কষ্টিপাথরেই ধর্মের সত্যাসত্য নির্ণীত হয়, পরমত্যাগই ধর্মের সত্যাসত্যকে প্রমাণ করে। যে-ধর্ম আজন্ম-বন্ধুত্বকে অস্বীকার করিয়াছে, সে-ধর্ম প্রকৃতই জীবনের সকল দাবীর ঊর্ধ্বে কিনা, সত্য কিনা, তাহার প্রমাণ হইবে মৃত্যুর পাদপীঠে দাঁড়াইয়া। তাই সে বন্ধুকে তাহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য মৃত্যুবরণ করিতে আহ্বান করিয়াছে, মৃত্যুই প্রমাণ করিবে কাহার ধর্ম সত্য,—

মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্মরাজ জানি,—
ধর্মের পরীক্ষা তাঁরি কাছে। বন্ধুবর,
এসো তবে, কাছে এসো, ধরো মোর কর,
চলো মোরা যাই সেথা দোঁহে এক সনে,—
যেমন সে বাল্যকালে—সে কি পড়ে মনে,
কতদিন সারারাত্রি তর্ক করি শেষে
প্রভাতে যেতেম দোঁহে গুরুর উদ্দেশে
কে সত্য কে মিথ্যা তাহা করিতে নির্ণয়।
তেমনি প্রভাত হোক। সকল সংশয়
আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে.
দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
দুই সখা, লয়ে দু-জনের প্রশ্ন যত।
সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল জাগ্রত;—
মুহূর্তে পর্বতপ্রায় বিচার-বিরোধ
বাষ্পসম-কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে।
সব চেয়ে বড় আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখো মৃত্যুর সম্মুখে।

এ-কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছলনা নাই, ইহা তাহার গভীর বিশ্বাস, তাহার অকপট উক্তি।

ক্ষেমংকরের আদর্শ উচ্চ, তাহাতে স্বার্থবুদ্ধির কোনো সংস্রব নাই, ব্যক্তিগত আত্মাভিমান, তৃপ্তির বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। নবধর্মের অভ্যুদয়ে ভারতের শিরে মহাদুর্ভাগ্য নামিয়া আসিতেছে, পিতৃকুল উদ্বেগ-অধীর, আজ দুর্যোগের রাত্রিতে সে সতর্ক প্রহরী। এই পিতৃধর্মরক্ষার মহৎ অভিযানে সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, সেইজন্যই

সে দুঃখ-বিপদ-মৃত্যু অক্লেশে সহ্য করিতে প্রস্তুত, নিজের ব্যক্তিগত ভোগসুখের প্রশ্ন এখানে বহু নীচে পড়িয়া আছে।

সে কঠোরস্বভাব, দুঃখবিলাসী তপস্বী নয়—ভাবাবেগবর্জিত, হৃদয়হীন, যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানমার্গী নয়। জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেদনে সে সচেতন, মালিনীকে দেখিয়া সেও একদিন বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে সে এই ভাবাবেগকে দমন করিয়াছে।—

আমি কি দেখিনি ওরে।
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষ-মন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
জন্মেনি কি স্বপ্নাবেশ। অপূর্ব সংগীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো,—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমিষের মাঝে। তবু কি সবলে
ছিঁড়িনি মায়ার বন্ধ, যাইনি কি চলে
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের মতো
লইনি কি শিরে ধরি অপমান শত
হীন হস্ত হতে। সহিনি কি অহরহ
আজন্মের বন্ধু তুমি তোমার বিরহ।

এই সুকঠোর সংযমের দ্বারাই তাহার চরিত্রের শক্তি ও সৌন্দর্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত আদর্শবাদী বীর বিপ্লবীদের সে সমগোত্রীয়—সমান মর্যাদা-লাভের যোগ্য।

'মালিনী'-নাটকে একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে উদিত হওয়া সম্ভব। সেটি এই—ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর কি ভালোবাসার সঞ্চার হইয়াছিল? সুপ্রিয়ের মুখে প্রথম ক্ষেমংকরের কথা শুনিয়া এবং তাহার পরিকল্পিত অভিযান ও তাহার পরিণামের সংবাদ পাইয়া মালিনী বলিয়াছে,—

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ-ঘরে সে প্রবেশিতে আসি
পূজ্য অতিথির মতো—সুচিরপ্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

বন্দীর প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়া একাধিকবার তাহার প্রাণরক্ষার জন্য পিতাকে সে অনুরোধ করিয়াছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষেমংকরকে চাক্ষুষ দেখিয়া বলিয়াছে,—

লোহার শৃঙ্খল
ধিক্‌কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল

ওই অঙ্গ 'পরে। মহত্ত্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরাণ,
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

তারপর সুপ্রিয়ের মৃত্যুর পরেও বলিয়াছে—'মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে।'

এই সব উক্তি প্রেমের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ইহাদের পশ্চাতে আছে মালিনীর মনের তিনটি ধারা—প্রথম, নিজের কল্যাণধর্ম বা সর্বজীবে দয়া ও প্রেমধর্মের প্রভাবের উপর বিশ্বাস; দ্বিতীয়, সুপ্রিয়ের মনের দ্বিধা ও অনুতাপ ঘুচাইয়া তাহাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করার বাসনা; তৃতীয়, মহত্ত্বের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। এই তিনটি ধারার মূলে কিন্তু সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় মালিনীর নিকট ক্ষেমংকরকে তাহার 'বন্ধু, ভাই, প্রভু, সূর্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, ক্ষেমংকর ছাড়া তাহার জীবন অর্থহীন এরূপ আভাস দিয়াছে,—

বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটলচিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে; চন্দ্রমা যেমন স্নেহে
সহাস্যে বহন করে কলঙ্ক অক্ষয়
অনন্ত ভ্রমণপথে।

এইরূপ পরিচয়দানে ক্ষেমংকরকে মালিনীর কল্পনায় অতি উচ্চ আসনে বসানো হইয়াছে এবং ক্ষেমংকর ব্যতীত যে সুপ্রিয়ের জীবন অসম্ভব, এরূপ আভাসও দেওয়া হইয়াছে। সর্বোপরি ক্ষেমংকরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে 'ডুবাইবার' যে মর্মান্তিক অনুতাপ সুপ্রিয় ভোগ করিতেছে, তাহাও তাহার কথায় ব্যক্ত হইয়াছে—'আপনার মর্মে ফুটাতেছি দন্ত আপনার।' এক্ষেত্রে সুপ্রিয়ের জন্যই ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। মালিনী জানে, তাহার 'সর্বজীবে দয়া'-ধর্ম, তাহার কল্যাণ ও মৈত্রীধর্ম সমস্ত হিংসা-দ্বেষের উপরে জয়ী হইবে, তাই সে বলিতেছে যে, সসৈন্যে ক্ষেমংকর রাজভবনে উপস্থিত হইলেও তাহাকে সম্মানিত অতিথিভাবে গ্রহণ করা হইত, কারণ অহিংসা ও মৈত্রী দ্বারা তাহার হিংসাকে সে জয় করিতে পারিত এবং যেমন সে সুপ্রিয়ের উপর তাহার ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেইরূপ ক্ষেমংকরের উপরও তাহার ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। তারপর, রাজা মালিনীকে সুপ্রিয়ের হাতে দান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সুপ্রিয় বলিল, 'বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্গলোক'ও সে লাভ করিতে চায় না, সে দীনহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া তাহার অভিশপ্ত জীবন কাটাইবে। তখন সুপ্রিয়কে হারাইবার আশঙ্কায় 'প্রিয়বিরহিতা কপোতীর প্রায়' মালিনীর মন কাঁদিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কী করেছ বলো পিতা, বন্দীর বিচার?' ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া সে বার বার ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়াছে। ইহা নিতান্তই সুপ্রিয়ের জন্য। ক্ষেমংকর বাঁচিলে সুপ্রিয়ের

জীবন ব্যর্থ হইবে না। তাহার জীবনও সার্থক হইবে। তারপর, যখন মালিনী শৃংখলাবদ্ধ ক্ষেমংকরকে প্রথম চোখে দেখিল, তখন ক্ষেমংকরের বহু-কথিত মহত্ত্বের ধারণাতেই তাহার হৃদয় পূর্ণ। সে দেখিল, তাহার মহত্ত্বের উপযোগী আকৃতিও সুন্দর, এই 'মহত্ত্বের অপমানে' শৃংখলই লজ্জিত হইতেছে। ইহা তাহার মনের একটা সাময়িক বিস্ময়প্রকাশ মাত্র। সুপ্রিয়ই ইহার ভূমিকা রচনা করিয়াছে। সুপ্রিয়ের মৃত্যুর পরেও যে মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়াছে, তাহা তাহার অহিংস ধর্মের প্রেরণা, মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও নারীসুলভ কারুণ্য মাত্র। ক্ষেমংকর তাহার মনে কোনো ভাবদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নাই। সে সুপ্রিয়কেই ভালবাসিত এবং সুপ্রিয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সে ক্ষেমংকরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছে।

(৪)

রূপক-সাংকেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলি বাংলা-সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে এই শ্রেণীর নাটক বাংলা-সাহিত্যে ছিল না, সমসাময়িক যুগেও ছিল না, পরবর্তী যুগেও এই শিল্পরীতি কেহ অনুসরণ করেন নাই। হয়তো নাটকে বস্তুনিষ্ঠ রসের দাবী প্রাধান্য লাভ করায় মানুষের রুচি বাস্তবের পক্ষপাতী হইয়াছে, হয়তো বিজ্ঞান-সম্মোহিত, কঠোর-বাস্তব-জর্জরিত আধুনিক মানুষের নিকট অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক জগতের, কোনো স্বপ্নলোকের আবেদন অর্থহীন, হয়তো এমন কোনো কবি-নাট্যকার জন্মান নাই, যিনি এই দুরায়ত্ত শিল্পরীতিতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন, হয়তো বা উভয় কারণেই এই শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত সাহিত্যে আমরা দেখি, এই শ্রেণীর নাটক ও উহার শিল্পরীতি বাস্তবের উপাসক দর্শকদিগেরও রসপিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে এবং এইসব নাটক দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। শিল্পীর কাজই ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ। সেই প্রকাশ একটা রূপে লীলায়িত হয়। সেই রূপ সুন্দর ও সার্থক হইলেই রসসঞ্চারের দ্বারা প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। সাহিত্য-শিল্পে ভাব সাধারণত ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সূক্ষ্ম, অনির্দিষ্ট, কেবল মাত্র অনুভবগম্য ভাব আছে, যাহা কেবল ভাষার মাধ্যমে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করা যায় না, তাহার জন্য শিল্পী সংকেতের সৃষ্টি করেন। এই সংকেত আমাদের কল্পনার এক নূতন দ্বার খুলিয়া দেয়, শিল্পীর ভাবানুভূতি আমাদের নবজাগ্রত কল্পনার আলোকে এমন বর্ণচ্ছটায় মণ্ডিত হয় যে, এক অনির্বচনীয় সূক্ষ্মতম চেতনায় আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধি চমৎকৃত হয়। শিল্পীর যথার্থ প্রকাশ সার্থকতা লাভ করে সংকেত-প্রয়োগে। সংকেতই অনির্দেশনীয়কে নির্দিষ্ট করে, অব্যক্তকে কৌশলে ব্যক্ত করে, অরূপকে রূপময় আভাসের মধ্যে বন্দী করে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বাস্তবরীতির সহিত সংকেতরীতির প্রয়োগও সমানভাবে প্রচলিত ও রসিকজনসমাদৃত। কতকগুলি ভাব কেবল সংকেতের সাহায্যেই অব্যর্থভাবে অন্যচিত্তে সংক্রামিত করা যায়। তাই পাশ্চাত্ত্যের নাট্যশিল্পীরা সংকেতকে পরিত্যাগ করেন নাই—বরং প্রয়োজনবোধে ব্যবহারই করিয়াছেন। জার্মান-নাট্যকার হাউপট্‌ম্যান প্রথমে ছিলেন বাস্তব-রীতির নাট্যকার, শেষে তিনি রূপক-সাংকেতিক রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুশ-নাট্যকার আন্দ্রিভের 'The Life of Man' যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয়, বিস্ময়বিমূঢ় দর্শকেরা তখন তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কেন তিনি এই নূতনভাবে নাটক লিখিলেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আন্দ্রিভ বলিয়াছিলেন,—প্রত্যেক সাহিত্য-শিল্পীই তাঁহার বক্তব্য যাহাতে সুন্দর কলাসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহার চেষ্টা করেন। তিনিও তাঁহার বক্তব্য এই রীতিতে ভালোভাবে প্রকাশ করা যাইবে মনে করিয়া এই রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতি ছাড়া তাঁহার বক্তব্য আর কোনো রীতিতে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া তিনি মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য নাট্যসমালোচক Elizabeth Drew বলেন,—

"There are always two ways in which human experience can be represented in art : the way of realism and the way of symbolism. In drama this means that it can be represented directly in actual figures of flesh and blood, or it can be suggested obliquely by way of creation of significant images."

অনেক বাস্তবনিষ্ঠ নাট্যকার এই সংকেত-রীতি কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। ইবসেন-এর কতকগুলি নাটকে ইহার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অতি-সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবকে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা ইহাদের অসাধারণ। সুপরিচিত 'A Doll's House' নাটকে ইবসেন যে Tarantella নামক ঘূর্ণি-নৃত্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার সংকেত বা প্রতীক। ইহাতে নোরার অন্তর্জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে একটা চমৎকার আভাস পাওয়া যায়। ভয়, সংশয়, নানা চিন্তা, আত্মাভিমান, স্বামীর ভালবাসার উপর নির্ভরহীনতা প্রভৃতি একসময়ে তাহার মনে উপস্থিত হইয়া যে-অস্থিরতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহার গৃহত্যাগের সংকল্প, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে নিরুদ্দেশ অভিযান। সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে একটা ঘূর্ণি-নৃত্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেও এই নৃত্যের দ্রুত তালের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া অজানা নিয়তির রহস্যময় হাতে আত্মসমর্পণ করিবে—ইহাই এই সংকেতের তাৎপর্য।

'Hedda Gabler'-নাটকের নায়িকা Hedda যতোবার Eilert Lovborg-এর কথা চিন্তা করিয়াছে, ততোবার তাহার যে-মূর্তি Hedda-র মানসপটে উদিত হইয়াছে, তাহার শিরোদেশ vine-leaves-এর দ্বারা সুশোভিত। Vine-leaves গ্রীসের সুরা-দেবতা Bacchus-এর সংগে ভাবানুষংগতায় জড়িত। পান-ভোজন-উৎসবের মধ্যে যে উল্লাস ও উন্মত্ততা আছে, তাহার একটা সুন্দর, কলাসংগত আনন্দোজ্জ্বল রূপের প্রতীক vine-leaves। অসাধারণ প্রতিভাশালী Eilert একদিন Hedda র অন্তরংগ বন্ধু ছিল; Eilert তাহার জীবনের অনেক সুরা ও নারীঘটিত গোপন কাহিনী অকপটে তাহাকে বলিয়াছে। কিন্তু Hedda র এইপ্রকার জীবনের উপর বিতৃষ্ণা ও ভয় ছিল, তাই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হইবার সংগে সংগেই সে Eilertকে বিদায় করিয়াছে। কিন্তু Hedda, Eilertকে ভালোবাসিত এবং বিবাহিত জীবনেও সে তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। সেও আনন্দ, প্রেম, বিশ্বাস চায়, Eilert তাহার কাম্য, কিন্তু যদি Eilert এই ইন্দ্রিয়জ ভোগকে, এই অসংগত ও অসংযত আনন্দকে সংযত, সুন্দর ও শোভন করিত! অবচেতন মনের এই কামনায় সে vine-leaves-শোভিত Eilert-এর স্বপ্ন দেখিত; তাহার মনে আত্মসচেতন, উদার, প্রেমিক, সংযত, আনন্দোচ্ছল Eilert vine-leaves- সুশোভিত-মস্তকে উদিত হইত। যখন গায়িকা Diana-র বাড়ীতে Eilert Lovborg-এর চরম কেলেঙ্কারির কথা শুনিল, তখন Hedda বিস্মিত Judge Brack কে নিতান্ত অপ্রাসংগিকভাবে বলিতেছে,— 'Then he had no vine-leaves in his hair'.

'Rosmersholm' নাটকের foot-bridge একটা প্রতীক। ইহা অপরিহার্য, রহস্যময় নিয়তির মতো সমস্ত নাটকের উপর ইহার অদৃশ্য ছায়াপাত করিয়া আছে। 'The Wild Duck' নাটকে Old Ekdal-র জীবনের অস্বাভাবিক, নিঃসংগ, করুণ, অসহায় রূপটি Werle দ্বারা আহত wild duck-এর প্রতীকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। Ibsen-এর শেষ-পর্যায়ের নাটক 'The Master Builder'-এর মধ্যে সংকেতের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য

লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত নাটকটিই একটা রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিয়া মনে হয়। Master Builder Halvard Solness-এর Hilda Wangle কে দশ বছর পরে রাজ্যদান করা ও রাজকুমারী বানাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, Mrs. Solness- এর নয়টি সুন্দর পুতুল দীর্ঘদিন রক্ষা করা, গির্জার চূড়া, মানুষের বাসগৃহ, আকাশে প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতির কথা নিঃসন্দেহে গভীর সাংকেতিক অর্থ জ্ঞাপন করে।

অতি-আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার Eugene O'neillও তাঁহার কোনো কোনো নাটকের স্থানে স্থানে সংকেত ব্যবহার করিয়াছেন। 'The Hairy Ape' নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে Fifth Avenueতে নাট্যকার কতকগুলি পুতুলের মত নরনারীর আবির্ভাব করাইয়াছেন। ইহারা যেন রক্ত-মাংসের জীবন্ত প্রাণী নয়, আবেগহীন, উচ্ছ্বাসহীন যন্ত্র-চালিতের মতো। ইহারা যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি, এক-ছাঁচে-ঢালা, ফ্যাশন-সর্বস্ব, কৃত্রিমতায় ভরা, প্রাণচাঞ্চল্যহীন, আধুনিক নরনারীর প্রতীক। তাই দেখা যায়, আধুনিক নাটকে ইহা একটা পদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত। ইহাতে যথেষ্ট বাক্-সংক্ষেপ হয় এবং বক্তব্যটি মনোরম ও অব্যর্থভাবে প্রকাশ করা যায়। তাই Drew বলেন,—

> The function of Symbolism in the technique of a play is really to economise space. The dramatist may use it with great artistry to create effects of contrast, and to enlarge the emotional significance of his speech, but its great value is its power to take the place of words.

কিন্তু বাংলার নাট্যসাহিত্য আশানুরূপ উন্নত ও পরিপুষ্ট না হওয়ায় এক রবীন্দ্র-নাথের কয়খানি নাটক ছাড়া এইপ্রকার শিল্পরীতির ব্যবহার আর কোনো নাটকে দেখা যায় না। আবার রবীন্দ্রনাথের এইপ্রকার নাটকগুলিও বাঙালী জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহাদের অভিনয় হয় নাই। এক-আধবার চেষ্টা হইলেও তাহার ফল নিতান্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের রুচি যথেষ্ট মার্জিত এবং রসবোধ সূক্ষ্ম ও উন্নত হয় নাই, তাই আমাদের স্থূল, অকর্ষিত চিত্তে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের গূঢ় আবেদন নিষ্ফল হয়। যদি অবাস্তবতা ও ভাবসর্বস্বতাই ইহার কারণ ধরা যায়, তবে বাস্তবতাই যাহাদের জীবনের সাধনা, সেই ইয়োরোপের লোকেরা কেন এই-সব নাটকের সমাদর করিয়াছে? ইয়োরোপের নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথের এই-সব নাটক অভিনীত হইয়াছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহুসংখ্যক জার্মান এরোপ্লেন হইতে প্যারী নগরীর উপর যেদিন প্রথম বোমাবর্ষণ হয়, সেদিন প্যারীর রেডিয়োতে 'ডাকঘর'-এর অভিনয় হইতেছিল, এ-সংবাদ আমরা খবরের কাগজে পড়িয়াছি। আসল কথা, আমাদের রসবোধের দৈন্যই এই-প্রকার শিল্পরীতি-উপলব্ধির পথে বাধা। সাধারণ বাঙালী-পাঠকের কাছে এই নাটকগুলি যে-বিচারই পাক না কেন, ইহা একান্ত সত্য যে, এক অভিনব শিল্পরীতি-প্রবর্তনের জন্য এবং ভাবের সূক্ষ্ম ও রসঘন অভিব্যক্তির গুণে এই নাটকগুলি বাংলা-সাহিত্যের চিরন্তন সম্পত্তি। গানের সংযোগে ইহাদের সাংকেতিক ও রাহস্যিক মূল্য অভিনবভাবে বর্ধিত ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। বিচিত্র রূপস্রষ্টা কবির গদ্য-কবিতা-সৃষ্টির মতো ইহাও একপ্রকার অপরূপ সৃষ্টি।

এই প্রকারের নাটকগুলিকে আমি রূপক-সাংকেতিক-নাট্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। নামটি ব্যাখ্যামূলক হইলেও নাটকগুলির স্বরূপ হইতে তাহাই প্রকাশ পায়। সাংকেতিকতার

সহিত রূপকের মিশ্রণ হইয়াছে ইহাদের মধ্যে। কোনো কোনো নাটকে সাংকেতিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি, রূপক অতি সামান্য, আবার কোনো কোনো নাটকে সাংকেতিকতার সহিত রূপকের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটককে মোটামুটি সাংকেতিক নাম দেওয়া যায়, কারণ যে-তত্ত্ব বা ভাব-সত্য জগদতীত, যাহা অসীম, অনন্ত ও অনির্বচনীয়, যাহাকে বুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে ধরা যায় না, কেবল দিব্যানুভূতির গোধূলি-আলোকে ছায়া-রেখায় উপলব্ধি করা যায়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে এই-সব নাটকে নানা আভাসে, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়। নাট্যকারের মূল-উদ্দেশ্যই এক অপার্থিব, অদৃশ্য, অজ্ঞেয় জগৎ ও তাহার বিচিত্র অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে রূপদানের চেষ্টা। মূলত ইহাই সাংকেতিক শিল্পের কাজ। কিন্তু স্থানে স্থানে এই তত্ত্ব বা ভাবকে একটা নির্দিষ্ট, স্থির রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিবার বুদ্ধি-প্রণোদিত, সজ্ঞান প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ইহা রূপকের সীমানার মধ্যে পড়ে। এই দ্বৈত-রূপের মিলনাঙ্কিত রূপই রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকের রূপ। এগুলিকে রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিলে ইহার স্বরূপকে প্রকাশ করা যায় বলিয়া মনে হয়। পূর্বে সূচনায় যে-নাট্যকারদের এই জাতীয় কতকগুলি নাটকের আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মেটারলিংক ও ইয়েটস্ অপেক্ষা হাউপট্‌ম্যান ও আন্দ্রিভ-এর সহিত রবীন্দ্রনাথের বেশি সাদৃশ্য আছে। ইঁহাদের নাটকে এই মিলিত রূপেরই প্রকাশ হইয়াছে। মেটারলিংক ও ইয়েট্‌স্-এর নাটকে অপ্রাকৃত স্বপ্নলোকের ও অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব অত্যন্ত বেশি, হাউপট্‌ম্যান ও আন্দ্রিভ-এর মধ্যে একটা সজ্ঞান রূপক-শিল্পরীতির অনুসরণের সংগে সংগে সেই কল্পলোকের, সেই অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস প্রতিবিম্বিত করিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহাকে রূপক-সাংকেতিক রীতি বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে যদি কেবল রূপক-নাট্য বলা হয়, তবে একটা সংকীর্ণ, নির্দিষ্ট শিল্পরূপ বুঝায়, আবার কেবল সাংকেতিক নাটক বলিলেও রূপকের অংশটুকু যেন ধারণার বাহিরে বিসর্জন করা হয়। আবার যদি তত্ত্ব-নাট্য বলা যায়, তবে তত্ত্ব-বিষয়টাই মুখ্য হইয়া মনকে অধিকার করে, যে অত্যাশ্চর্য শিল্পরীতির দ্বারা এই তত্ত্বকে রসরূপে রূপায়িত করা হইয়াছে, তাহা পিছনে পড়িয়া থাকে। ইহাতে নগ্ন উদ্দেশ্যকেই ইঙ্গিত করিয়া প্রাধান্য দেওয়া হয়, যে-শিল্প-কৌশলের দ্বারা উদ্দেশ্যকে অলক্ষ্যে রাখিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই সৃষ্টিনৈপুণ্য বা আর্টকে যেন অবহেলা করা হয়।

এই নাটকগুলিকে 'রূপক-সাংকেতিক-নাট্য' নামে নির্দেশ করিলে ইহার আর্টঅংশের সংগে সংগে তত্ত্বের কথা স্বতই মনে উদিত হয়, কারণ রূপক বা সংকেত-প্রয়োগের উদ্দেশ্যই কোনো ভাব বা তত্ত্বকে রূপায়িত করা, বাচ্যার্থ অপেক্ষা মর্মার্থের উপর জোর দেওয়া। সুতরাং এই নাম শিল্পরীতি ও তত্ত্ববস্তু দুই-ই বুঝায়। তাই এই নামটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

এখন রূপক ও সংকেতের প্রভেদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

(১) রূপক-রচনার উদ্দেশ্য কোনো নীতিকথা, ভাব বা তত্ত্বকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশ করা। রূপকে দৃশ্যত একটি আখ্যানভাগ থাকে কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে আর একটি প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যানভাগ বর্তমান থাকে। প্রথমটির ছদ্ম-আবরণে দ্বিতীয়টি গুপ্ত থাকে। প্রথম আখ্যানভাগে যাহা বর্ণিত হয়, তাহাই তাহার আসল অর্থ নয়, দ্বিতীয় প্রচ্ছন্ন আখ্যানভাগের যাহা বর্ণনা তাহাই তাহার আসল অর্থ। এই দুইটি আখ্যানভাগই—

বহিঃস্থ ও অন্তরালবর্তী—রূপকে সমান প্রধান। কেহই কাহারো অধীন নয়, বাহিরের আখ্যান-অংশের ঘটনা বা স্থান, কাল, পাত্রের সহিত ভিতরের আখ্যান-অংশের ঘটনা বা স্থান, কাল, পাত্রের কোনো সম্বন্ধ নাই। দুইটি আখ্যানভাগই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া সমান্তরাল রেখার মতো পাশাপাশি চলিয়াছে, কেহ কাহারো সহিত মিশিয়া যায় নাই।

সংকেতের উদ্দেশ্য—যে-সত্য অতীন্দ্রিয়, জগদতীত, যে-সৌন্দর্য চিরন্তন, তাহাকে ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়, আভাসে অনুভবগম্য করা। তাই সংকেতে রূপকের মতো আগাগোড়া দুইটি আখ্যানভাগের সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। একটির সহিত আর একটি যুক্ত হইয়া যায়, কোনো সমান্তর অর্থ-বৈশিষ্ট্য থাকে না। একটি আখ্যান-রূপের মধ্যেই আখ্যান-রূপের বাহিরের একটা তাৎপর্য জ্ঞাপন করা হয়।

(২) রূপকের আবেদন বুদ্ধির কাছে: বাচ্যার্থ কোন্ মর্মার্থকে নির্দেশ করিতেছে, এইটুকু বুঝাইতে পারিলেই রূপকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহার কার্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে। আর বুদ্ধির বিচারে অর্থেরও তারতম্য হইতে পারে, তাই রূপকের অর্থ একাধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সংকেতের আবেদন আমাদের গভীর অনুভূতির কাছে, কল্পনার নিকটে। যে-ভাবসত্য এই বস্তুজগতের বাহিরে বিরাজ করিতেছে, এই বস্তুজগতের আবরণ ভেদ করিয়া, সেই সত্যকে রূপের মধ্যে ধরিবার প্রয়াসই ইহার কাজ। নাটকে আখ্যানবস্তু, সংলাপ, চরিত্র, ঘটনা নানা ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় সেই বাস্তবাতীত জগতের, সেই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের আভাস আমাদের চিত্তে মুদ্রিত করে। সেই অরূপ ভাব বা সত্য প্রতীকের দ্বারা উত্তেজিত কল্পনার বিচিত্র লীলাপথ ধরিয়া চিত্তের গভীরে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে। সেই দিব্যানুভূতির মধ্যে উহার যথার্থ তাৎপর্য বা স্বরূপ-মূর্তি ফুটিয়া ওঠে। এই সত্যের যে-তাৎপর্য বা স্বরূপ, তাহা এক এবং চিরন্তন। তাহার পরিবর্তন নাই। কোনো বুদ্ধির শক্তিই তাহাকে অন্যরূপ করিতে পারে না।

(৩) রূপক জ্ঞানের জগতে আমাদের আবদ্ধ করে, সংকেত ভাবের জগতে আমাদের মুক্তি দেয়। রূপক সীমার মধ্যে একটা পরিপূর্ণ রূপ গড়ে, সংকেত সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান দেয়।

বিখ্যাত সংকেত-শিল্পী কবি-নাট্যকার W. B. Yeats—রূপক ও সংকেতের প্রভেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "A Symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame ; while Allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy, and not to imagination ; the one is a revelation, the other an amusement......Symbolism said things which could not be said so perfectly in any other way, and needed but a *right instinct* for its understanding, while Allegory said things which could be said as well, or better, in another way, and needed a *right knowledge* for its understanding. The one gave dumb things voices, and bodiless things bodies ; while the other read a meaning heard or seen, and loved less for the meaning than for its own sake." (*Ideas of Good and Evil*).

(৪) নাট্যশিল্পে রূপক ও সংকেত-ব্যবহারের প্রভেদ দুই ভাবে লক্ষ্যগোচর হয়-প্রথম, চরিত্রচিত্রণে ও দ্বিতীয়, আবহাওয়া-সৃষ্টিতে। রূপক-চরিত্র তাহার ভাষণে, কর্ম প্রণালীতে কার্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত, পূর্ব-পর-সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সচেতন, বুদ্ধিচালিত রূপ প্রদর্শন করে। সে যে একটা তত্ত্ব বা আইডিয়ার নির্দিষ্ট মূর্তি, তাহা তাহার চরিত্রে সুসংবদ্ধ অভিব্যক্তির দ্বারা, তাহার সজ্ঞান বাক্য ও কার্যের দ্বারা বেশ বুঝা যায়। আর সংকেত-চরিত্রের অভিব্যক্তি কিছুটা বুদ্ধিচালিত, বাকিটা অবচেতন বা অর্ধচেতন মনের প্রেরণায়। সংকেত-চরিত্র যে-কথা বলে, যে-কাজ করে, তাহার কতক অংশ জ্ঞানবুদ্ধি প্রণোদিত—স্বাভাবিক এবং সুস্পষ্ট, আর অধিক অংশই হৃদয়ের গূঢ়, দুর্জ্ঞেয় অনুভূতির তাড়নায়—অস্বাভাবিক ও রহস্যময়।

তাহার দেহটা এই জড়জগতে আছে, কিন্তু মনটা কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নজগতে বিহার করিতেছে। সেই স্বপ্নজগতের রহস্য-চেতনা, বিস্ময়কর তথ্য ও সত্যের অনুভূতি তাহার ভাষণে ও কার্যে বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়। তাহার কথা ও কাজ এইভাবে অতি-প্রাকৃত জগতের সংকেত বহন করে। যে-সত্য আমরা সংসারের বস্তুজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না, বুদ্ধির অনুশীলনে যাহার নাগাল পাই না, সংকেত-চরিত্র মানবজীবনের সেই পরমরহস্যময় গভীরতম সত্যের দূত—তাহার পতাকা-বাহক।

(৫) রূপকে কোনো রহস্যময় আবহাওয়া বা অস্বাভাবিক পরিবেশ-সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না, কারণ নির্দিষ্ট একটা জ্ঞান পরিবেশন করিতে পারিলেই তাহার কাজ শেষ হইল কিন্তু সংকেতের সাফল্য নির্ভর করে এই আবহাওয়া-সৃষ্টির উপরে। আবহাওয়া যাহা উদ্দীপিত করে, তাহা কল্পনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি। সেই কল্পনা ও অনুভূতির বিচিত্র লীলার মধ্যেই শিল্পীর অভিপ্রেত ভাবের ইঙ্গিত অনেকটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। তাই সংকেত-নাট্যশিল্পীরা নাট্য-ঘটনার স্থান-নির্দেশে অন্ধকার ঘর, পর্বতচূড়া, নদীতীর, রাজপথ, নির্জন গুহা, ঝরনার ধার প্রভৃতি বেশি পছন্দ করেন, কাল-নির্ণয়ে তাঁহারা প্রভাত, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি প্রভৃতি সময়গুলির প্রাধান্য দেন। স্থান ও কাল-নির্দেশের মধ্যে ভাবের অনেকখানি অভিব্যক্তি নিহিত থাকে। পাত্র-পাত্রীর বেশভূষাও অনেক সময় তাঁহাদের অভিপ্রেত ভাবের ইঙ্গিত দেয়। কাহারো হাতে একটা পদ্মফুল, কাহারো মাথায় রক্তকরবীর মালা, কাহারো পতাকায় কিংশুক, কাহারো পতাকায় পদ্মের মধ্যে বজ্র ইত্যাদি—এ সবই সংকেত-মূল্য বহন করে। সব মিলাইয়া তাঁহারা এমন একটা আবহাওয়া বা পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যাহাতে হৃদয়ে অপূর্ব আবেগ সঞ্চারিত হয় এবং একটা গূঢ় ভাব ও রহস্যের আভাস চারিদিকে ফুটিয়া ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিতে কিভাবে রূপক ও সংকেতের সংমিশ্রণ হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

পূর্বে সূচনায় এবং বর্তমান আলোচনায় সাংকেতিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এখন সাংকেতিকতার বিশেষ মূল্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বাস্তব জগতে ও জীবনে আমরা যে-সৌন্দর্য দেখি তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, পরিবর্তন আছে, এবং সাহিত্যেও যখন তাহাকে প্রকাশ করা হয়, তখন সে বাহিরের ইন্দ্রিয় এবং জড় হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু এই সৌন্দর্যের অন্তরালে যে-অসীম ও চিরন্তন সৌন্দর্য আছে, ইন্দ্রিয়চেতনা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল মানুষের

অন্তরতম আত্মাই সৌন্দর্যানুভূতির অধিকারী। সংকেত-সাহিত্যের আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে নয়—সেই অন্তরতম সত্তার কাছে। সংকেতের দ্বারা আমাদের কল্পনা ও আবেগকে উত্তেজিত করিলে আমাদের অন্তরতম সত্তা বা আত্মা সেই চিরন্তন সৌন্দর্য দেখিতে পায়। বাহিরের সৌন্দর্যের দ্বার দিয়া আমাদিগকে চিরন্তন সৌন্দর্যে পেঁাছাইয়া দেয়। এই জগৎ ও জীবন ব্যাপ্ত করিয়া যে-অসীম, অদৃশ্য সত্য-সুন্দর বিরাজ করিতেছে, আমাদের অন্তরতম সত্তা তাহারই স্পর্শ পায় সংকেতের মাধ্যমে। সংকেতের সীমাবদ্ধ মাধ্যমেই অসীম ও অনন্ত যেন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সহজলভ্য হয়। তাই Carlyle বলিয়াছেন,—

> "In the Symbol proper, what we call a symbol there is ever, more or less, distinctly and directly, some embodiment and revelation of the Infinite; the Infinite is made to blend itself with the Finite to stand visible and as it were, attainable there."
> (*Sartor Resartus*, Bk. III, Chap. III)

সংকেত-রীতি সাহিত্যকে কৃত্রিমতা ও বাহ্য চাকচিক্যের গুরুভার হইতে মুক্তি দেয়। কলাকৌশলপূর্ণ ভাষার ব্যবহার দ্বারা জগৎ ও জীবনের যে-গূঢ় সত্য ও রহস্য প্রকাশ করা যায় না, সংকেত-রীতির ব্যবহারে তাহা সম্ভব হয়। সুবিখ্যাত সাংকেতিক-কবি-নাট্যকার W. B. Yeats-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু সংকেত-রসজ্ঞ Arthur Symons বলেন,—

> "Symbolism—in which art returns to the one pathway, leading through beautiful things to the eternal beauty. . . . . It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of exteriority. Description is banished, that beautiful things may be evoked magically; the regular beat of verse is broken in order that words may fly upon subtler wings. . . . . Here, then, in this revolt against exteriority, against rhetoric, against materialistic tradition, in this endeavour to disengage the ultimate essence, the soul of whatever exists can be realised by the consciousness; in this dutiful waiting upon every symbol by which the soul of things can be made visible, literature bowed down by so many burdens, may at last attain liberty, and its authentic speech."
> (*The Symbolist Movement in Literature*).

সাহিত্য ভাষার মারফতে যে-অর্থ ব্যক্ত হয়, সংকেত সেই অর্থকে বিপুল আবেগ এবং গভীর ও অব্যর্থ জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের মনে সংক্রামিত করে। সেই সংকেত-মাধ্যমে উপস্থাপিত অর্থকে আমরা নূতন আলোকে, নূতন চেতনায় লাভ করি। সংগীতে আমরা সংকেতের প্রভাব বুঝিতে পারি। গানের কথাকে যখন আমরা সুরের মধ্য দিয়া পাই, তখন তাহার নূতন এক অর্থ, এক অনির্বচনীয় তাৎপর্য হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে। এই সুর একটা সংকেত। এই সংকেতই আমাদের মনে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং অসীমের অন্দর-মহলে আমাদের লইয়া যায়। বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক A. N. Whitehead সংকেতের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটু অংশ উদ্ধৃত করা গেল.—

"Symbolism is no mere idle fancy or corrupt degeneration; it is inherent in the very texture of human life. Language itself is a symbolism. Mankind, it seems, has to find a symbol in order to express itself. Indeed 'expression' is 'symbolism' . . . . . The function of the sybolic elements in life, is to be definite, manageable, reproducible, and also to be charged with their own emotional efficacity : symbolic transference invests their correlative meanings with some or all these attributes of the symbols, and thereby lifts the meanings into an intensity of definite effectiveness—as elements in knowledge, emotion, and purpose. . . In every effective symbolism there are certain aesthetic features shared in common. The meaning acquires emotion and feeling directly excited by the symbol. This is the whole basis of the art of literature, namely, that emotions and feelings excited by the words should fitly intensify our emotions and feelings arising from contemplation of the meaning. . . . . The same principle holds for all the more artificial sorts of human symbolism :- for example, its religious art. Music is particularly adapted for this symbolic transfer of emotions. . . . . This whole question of the symbolic transfer of emotion lies at the base of any theory of the aesthetics of art. . . . . Thus mankind by means of its elaborate system of symbolic transference can achieve miracles of sensitiveness to a distant environment, and to a problematic future."

ইহাই সংকেতের মূল্য এবং কার্যকরী শক্তি। তাই অতিসূক্ষ্ম, জটিল ও অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির রূপায়ণে সাহিত্যিক-শিল্পীরা এই রীতি ব্যবহার করেন।

একটি প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সংকেত-রীতি রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম বাংলা-সাহিত্যে প্রবর্তন করিলেন, তাহা কি পাশ্চাত্ত্য সাংকেতিক রীতির অনুকরণে বা তাহার প্রভাবে? আমাদের কোনো কাব্যে বা নাটকে এ-প্রকার রীতির নমুনা নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে একটা রূপক নাটক দেখা যায়। তাহাতে মহামোহ, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি abstract-গুণকে নাটকীয় চরিত্র করিয়া বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা মোহ, দম্ভ প্রভৃতির পরাজয় দেখানো হইয়াছে। বাংলায় ইংরেজী এলেগরির অনুকরণে হেমচন্দ্র তাঁহার 'আশাকানন' কাব্য লিখিয়াছেন। হেমচন্দ্র ইহাকে 'সাংগরূপক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকল প্রত্যক্ষীভূত করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে যাহাকে সাংগরূপক বলে, ইহা তাহা নয়। প্রথমেই 'আশা' নামটির দ্বারা ইহার রূপকত্ব ভঙ্গ করা হইয়াছে।

আশা কহে, বৎস অপূর্ব এ পুরী
আমার কানন ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের স্পৃহা।

'আশা' কথাটির স্থলে 'মায়াবিনী' বা 'মোহিনী' প্রভৃতি কথা প্রয়োগ করিয়া আশাকে ব্যঞ্জিত করিলে রূপক বজায় থাকিত। যাহা হউক, তারপর অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন-বিদ্যাবিষয়ক', 'স্বপ্নদর্শন-কীর্তিবিষয়ক' নামক গদ্যপ্রবন্ধে আমরা অনেকটা রূপকের নমুনা দেখিতে পাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'ও একখানি রূপক কাব্য। কিন্তু কোনো নাটকে আমরা এই রূপক-সাংকেতিক পদ্ধতির নমুনা পাই না। বাংলা-সাহিত্যে ইহা রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের এইপ্রকার নাটকে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব-বিচারে একটা মূলকথা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। আমাদের ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পে সংকেতের আবহাওয়া ঘনীভূত। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর নানা মূর্তি-কল্পনার মূলে আছে সংকেত-প্রয়োগের প্রচেষ্টা। অদ্বিতীয়, নিরাকার, অসীম ভগবানের নানা শক্তি, ঐশ্বর্য, বা গুণের প্রতীক বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে সংকেতিত। ভারতীয় ধর্মের ভিত্তি নিঃসন্দেহে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল উপাসনার অধিকারী-ভেদের জন্য মূর্তি-প্রতীক সৃষ্ট হইয়াছে,—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্'। আমরা পৌত্তলিক নই, আমরা মূর্তিকে পূজা করি না, আমরা মূর্তিতে পূজা করি। অদ্বিতীয়, নিরাকার ব্রহ্মকেই আমরা মূর্তি-প্রতীকে পূজা করি। শিল্পে পদ্ম, শঙ্খ-পদ্ম, শ্রী-পদ্ম, স্বস্তিক, বসুধারা, কলস, কুম্ভ প্রভৃতি চিহ্নের পশ্চাতে গভীর সাংকেতিক অর্থ আছে। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে পদ্ম, ঘণ্টাকৃতি ফল, কলস, কুম্ভ প্রভৃতি প্রতীক হিসাবে বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। E. B. Havell তাঁহার 'Indian Architecture' গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

> "The shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals opening as the sun's rays touched them at break of day, and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath, seemed perfect symbols of creation, of divine purity and beauty, of the cosmos evolved from the dark void of chaos and sustained in equilibrium by the cosmic ether, 'akasha'. . . . . The bell-shaped fruit was the mystic Hiranyagarbha, the womb of the Universe. . . . . It was the symbol for all Hindus. Closely connected with the symbolism of the lotus was that of the waterpot—the Kalasha or Kumbha—which held the creative element or the nectar of immortality churned by gods and demons from the cosmic ocean. . . . The combination of the lotus flower, the bell-shaped fruit and the water-pot forms the basis of the design of most Hindu temple pillars."

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল-উৎস উপনিষদের রস-পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের মানসজীবন। সুতরাং সংকেতের মর্মগ্রহণ ও তাহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহার পক্ষে অতি স্বাভাবিক। যে-তত্ত্ব তাঁহার কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র—'সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধন'—সে তো উপ-নিষদের মধ্য হইতেই তাঁহার অত্যাশ্চর্য অনুভূতিপ্রবণ ও অদ্বিতীয় শিল্পী-মনে সংক্রামিত

হইয়াছে। তাঁহার পরমপ্রিয় ঈশোপনিষদের মধ্যেই ইহার বীজ রহিয়াছে, কবি নিজেই একথা বলিয়াছেন,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥

"যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।"

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১॥

"অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সে-ই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।" (রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ, সঞ্চয়)

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীম-তত্ত্বের মূলপ্রেরণা। অসীমের সীমারূপধারণের মধ্যেই তো সংকেতের মূলসূত্র। সমগ্র সৃষ্টিই তো অসীম স্রষ্টার সংকেত। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যের প্রতীক, মানবের প্রেম তাই অনন্ত প্রেমের প্রতীক।

সংকেতের তাৎপর্য-গ্রহণে অভ্যস্ত রবীন্দ্র-মানসের নিকট সাংকেতিক-রীতি নূতন নয়; এ-বিষয়ে বাহিরের বিশেষ কোনো প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে হয়তো পাশ্চাত্ত্য সাংকেতিক নাটক তিনি কিছু পড়িতে পারেন এবং উহার টেকনিকের সঙ্গেও তাঁহার কিছু পরিচয় থাকিতে পারে এবং ঐরূপ নাটক লিখিবার জন্য তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধও হইতে পারেন, কিন্তু তাহা গৌণ। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, একান্তভাবে তাঁহারই নিজস্ব সৃষ্টি; তবে টেকনিকের ধারণাটা হয়তো পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে কিছুটা পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু মোটের উপর, তাঁহার নাটকের টেকনিক তাঁহারই নিজস্ব টেকনিক। বলা বাহুল্য, এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অনুকরণ নয়, অনুসরণও নয়, একেবারে স্ব-করণ।

ভগবদনুভূতির বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ, মানবাত্মার সহিত ভগবানের বিচিত্র সম্বন্ধের রহস্য, মানবাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তি, আত্মোপলব্ধির পথে নানা বাধার প্রকৃতি এইসব নাটকের মূল-ভাববস্তু। শেষের কয়েকখানি নাটকে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার স্বরূপ ও সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সমাজ-চেতনা পটভূমিকা রচনা করিয়াছে বটে, কিন্তু নাট্যকারের মূল-উদ্দেশ্য হইতেছে, সর্ববন্ধনমুক্ত, নিত্যানন্দময়, চিরনবীন মানবাত্মা যন্ত্রের নির্মম বন্ধনে কি ভাবে নিপীড়িত হইতেছে তাহারই রূপটি প্রদর্শন করা। 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ "The human soul has its inner drama." তাঁহার সমস্ত রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায় যে এই শ্রেণীর সমস্ত নাটকই একপ্রকার inner drama of the human soul. ইহাই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

(১২৯১)

কাব্য হিসাবে বা নাটক হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর শিল্প-মূল্য অতি সামান্য। ইহা একটি অপরিণত, অপরিস্ফুট রচনা, ইহার ভাষা ও ছন্দ দুর্বল, ভাব এখনো রূপমূর্তি লাভ করে নাই, নাটকীয় কলা-কৌশল ও আবেগের অভিব্যক্তি প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে; যে-জীবন-সত্য বা জীবন-দর্শন তাঁহার সমগ্র কবি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার প্রথম অংকুর এই অকিঞ্চিৎকর রচনাটির মধ্যে দেখিতে পাই। নাটক হিসাবেও ইহার এইটুকু মূল্য যে, রূপক-সাংকেতিক নাটকের যে-শিল্পরীতি কবির পরবর্তী ঐ শ্রেণীর পরিণত নাটকের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রথম ক্ষীণ রেখামূর্তি আমাদের চোখে পড়ে এই নাটকেরি মধ্যে। আরো একটু মূল্য এই যে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য-রচনা, যাহাতে গানের রূপ ও রসই নাট্য-বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া নাই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর আলোচনায় এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া যায়,—

(ক) যে-জীবন-সত্য রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার মূলসূত্র, কবির জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ইহার মধ্যে তাহার প্রথম অস্পষ্ট উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়।

(খ) সাংকেতিক শিল্পের প্রথম অপরিণত প্রকাশ দেখা যায় ইহার মধ্যে।

(গ) ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকৃত নাট্য-প্রয়াস।

(ক) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

(ক) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

'কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ-ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সবকিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান্ হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়া অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই।.....বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিত-ভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া?

এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার

মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায়-অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা সব দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও সেই ইতিহাসটি একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটিকে আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—
'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'...
তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতি-শোধের স্থান কি তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।" (জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ)

'জীবনস্মৃতি'তে কবি আরো বলিয়াছেন,—"তখন 'আলোচনা' নাম দিয়া ছোট ছোট গদ্য-প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম, তাহার গোড়ার দিকেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবন্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ-গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম।"

এই 'আলোচনা' কবি তাঁহার গদ্যগ্রন্থসংগ্রহে স্থান দেন নাই, বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে এই প্রবন্ধগুলি স্থান পাইয়াছে। এগুলি প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯১) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার 'ডুব দেওয়া' প্রবন্ধের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-প্রবন্ধে কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর তত্ত্বটি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহারি একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতাশক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গেলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত' আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটী বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটী পর্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল। একটী পর্বতও যা, পর্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে, সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম, তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও

তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটী বালুকা অসীম দেশ, অসীম কাল, অসীম শক্তি, সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়তো ছোট-বড়র উপর অসীমতা কিছুমাত্র নির্ভর করে না। হয়তো ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে, বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়তো অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল, সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

যাহাকিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি, কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার, বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ॥
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ— (ভারতী, ১২৯১, বৈশাখ, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড)

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে আত্মজীবনীতেও কবি বলিয়াছেন,—

"আমি বালকবয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম,—তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কিনা জানি না,—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে-জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।"

এই ক্ষুদ্র, নগণ্য নাটকে সীমা-অসীম-তত্ত্বের যে-প্রাথমিক কাব্যরূপ দেখা যায়, কবির দীর্ঘজীবনের নানা কবিতা, গান, নাটকে তাহার পরিপূর্ণ, পরিণত রসরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্বটিই তাঁহার কবি-দৃষ্টিভঙ্গীর মূলভিত্তি। এই 'আইডিয়া'টি যে তাঁহার সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কবির কাছে ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতির মূলরহস্যই এই আইডিয়ার মধ্যে নিহিত আছে। পরিণত বয়সের অনেক গদ্যরচনার মধ্যেও কবি এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা যেন তাঁহার নিঃশ্বাস-বায়ু—তাঁহার দিক্‌নির্ণয়ের কম্পাস-যন্ত্র—এই তত্ত্বানুভূতিই তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনের সাধনা।

"সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয়, সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইয়া থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা। বিধাতা আনন্দ বিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলই স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে।...

অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে, সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে-গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে, সে-গান কেবলমাত্র সুর-সমষ্টিকে প্রকাশ করে না—সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতির রাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ কিন্তু ভাব-রাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে একদিকে বাঁধিয়াছে, আর একদিকে ছাড়িয়াছে।...

কবি কীট্‌স বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য। সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে; এই সত্যের, অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন, তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।...

যে-সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা ও সীমা, ইনি এবং এই. একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।...

মানুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া এবং সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে, সীমা জিনিসটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস. অতএব তাহার মুখে চুনকালি মাখাইলে সেটা আর-কাহারও গায়ে লাগে না। কিন্তু, মানুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল। এই সীমার অসীম রহস্য সে কীই বা জানে। তাহার সাধ্য কি সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে।

মানুষ যখন জানিত পারে সীমাতেই অসীম, তখন মানুষ বুঝিতে পারে—এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" (পথের সঞ্চয়, সীমা ও অসীমতা, পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৬)

এই তত্ত্বের প্রভাব দীর্ঘ কবি-জীবনে কতো বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে নানাভাবে তাহার আলোচনা আমি গ্রন্থান্তরে করিয়াছি ('রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা'য়)। এখানে এ-বিষয়ে দু'একটি কথা মাত্র বলিব।

সীমা-অসীমের মিলন-তত্ত্ব বিশ্বসৃষ্টির মূলে: অসীম ও অনন্ত—সৃষ্টিতে সসীম ও সান্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতিজগৎ ও প্রাণিজগৎ উভয়ের মধ্যেই অসীমের অভিব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অসীম ঈশ্বর সসীম রূপ লইয়াছে। ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। তত্ত্বজ্ঞানী ইহা জ্ঞানে, বিচারে জানেন, সাধক ইহা সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করেন। তরুণ বয়সেই এই তত্ত্বের একটা অস্পষ্ট বোধ বা অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উদ্ভূত হয়। ক্রমে ক্রমে এই অনুভূতি বিকশিত হইয়া তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূল-উৎসরূপে

পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতি ও মানবের সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকৃতি, মানব ও ভগবান মূলত একতত্ত্ব—অসীমের সীমারূপ ধারণ। প্রকৃতি ও তাঁহার নিজ সত্তার মধ্যে তিনি সমপ্রাণতা অনুভব করিয়াছেন; প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি পাইয়াছেন অসীমের স্পর্শ; সকল দেশের মানুষের সহিত তাঁহার বন্ধন, একই প্রাণের অসীমতা ও রহস্যেই সেই বন্ধন; মানুষের প্রেমে তিনি অনন্তকে অনুভব করিয়াছেন। এই তত্ত্বানুভূতিই তাঁহার প্রকৃতির প্রতি, মানবের প্রতি, এবং সংশ্লিষ্টভাবে ভগবানের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী-নিয়ন্ত্রিত কবিমানসের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাঁহার কাব্যে, গানে, নাটকে নানাভাবে, নানা রসসৃষ্টির মাধুর্যে; ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-তত্ত্ব ও জীবন-তত্ত্ব।

(খ) প্রতীকের দ্বারা উত্তেজিত কল্পনা ও আবেগের সাহায্যে যে-সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যক্তি সংকেত-শিল্পের প্রাণ, তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায় এই নাটকের মধ্যে।

প্রথমেই গুহা। গুহা অন্ধকারময়, সংকীর্ণ, বাসস্থানের প্রতীক। জ্ঞানসাধক, মায়াবাদী সন্ন্যাসীর ইহাই বাসস্থল নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে সংসারের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া মায়াব বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ যাহার নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য হইয়াছে, জগতের সমস্তই যাহার ধারণায় অসার, তাহার বাহ্য সম্বন্ধশূন্য, আত্মকেন্দ্রিক, নিভৃত জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত স্থান গুহা। এই গুহা সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতীক। সন্ন্যাসীর জীবনও বাস্তব-সংসারচ্যুত হইয়া একান্ত আত্মভাব-সাধনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল। উহাও একপ্রকার গুহা।

গুহাদ্বার, গুহা ও জগতের মিলনস্থল। একদিকে গুহা জগৎবর্জিত, নিরালম্ব অসীমের ধ্যানের স্থিতি, অন্যদিকে জগতের ও জীবনের স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর্ষণ, এই উভয়ের সংগমস্থলে গুহাদ্বারে অবস্থিতি। সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের উভয় পক্ষ সীমা ও অসীম এই দ্বারে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। তাই সন্ন্যাসী ও বালিকার স্থান গুহাদ্বারে।

পথ সংসারের উদ্বেলিত কর্মস্রোতমুখর জীবনযাত্রার প্রতীক—ইহার আনন্দ, কৌতুক, সংগীত, স্নেহ, প্রেম, কলহ, সবকিছুর সম্মিলিত রূপের প্রতীক। এইখানে সীমার স্বরূপ ও তাহার মায়াময় আকর্ষণীশক্তির প্রকাশক্ষেত্র। তাই সন্ন্যাসীর জীবনের দ্বন্দ্বের একদিকে গুহা, অপরদিকে গুহামুখ ও পথ; মানবিক স্নেহ বালিকার মূর্তিতে গুহার মধ্য হইতে তাহাকে বাহির করিয়াছে, শেষে পথের নানা আকর্ষণে সংসারকে সে ভালোবাসিতে শিখিয়াছে, এই প্রেমেই সে আত্মকেন্দ্রিক গুহাজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই গুহা, গুহামুখ ও পথ সন্ন্যাসীর ভাবজীবনের তিনটি প্রতীক—এই তিনটি স্থানের মধ্যে তাহার চিত্তধারা তরঙ্গায়িত হইয়া পরিণামে পৌঁছিয়াছে।

দশম দৃশ্যে গুহার বাহির হইয়া সন্ন্যাসী দেখিল এক অপরূপ প্রভাত। প্রভাতের সৌন্দর্য তাহার হৃদয় এই প্রথম আকর্ষণ করিল,—'আহা একি চারিদিকে প্রভাতবিকাশ।' ইহা তাহার পরিবর্তিত জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা—নবজীবনের প্রভাত। 'এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে, মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে। অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।' 'আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!' চতুর্দশ দৃশ্যের প্রভাতের সংকেতে সন্ন্যাসীর নব-চেতনার পূর্ণ পরিণতি—তাহার সর্বাঙ্গীণ মোহমুক্তি দ্যোতিত হইতেছে। 'দূর কর, ভেঙ্গে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু! আজ হ'তে আমি

আর নহি রে সন্ন্যাসী!' এই প্রভাত সন্ন্যাসীর পূর্ণ নবজীবনের প্রভাত—নব চেতনার সূর্যোদয়। তাহা হইলে, সংসারবিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক, অন্ধকারময়, বিকৃত গুহা-জীবন হইতে বিশ্বের অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস-পূর্ণ ও সৌন্দর্য-মাধুর্যময় সংসার-জীবনে সন্ন্যাসীর প্রবেশ—এই ভাবটা অনেকটা সংকেতের কৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে।

কবির জীবনেও এইরকম সন্ন্যাসীর মতো একটা অস্বাভাবিক পর্ব আসিয়াছিল। সেটা 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগে। কবি তখন 'বস্তুহীন, ভিত্তিহীন, কল্পনালোকে' বাস করিতেছিলেন, 'অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন, পথহীন, অন্তহীন, অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।' এই 'অবরুদ্ধ অবস্থা'র কবিতাগুলি মোহিত সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে 'হৃদয়-অরণ্য' বিভাগে স্থান পাইয়াছে। কবির তখন 'বাহিরের সঙ্গে যোগ ছিল না', 'নিজের হৃদয়ের মধ্যেই আবিষ্ট' হইয়া ছিলেন। সেইটাই তাঁহার জীবনের অন্ধকার গুহা। তারপর 'প্রভাতসংগীত'-এর যুগে সেই গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রভাত-সংগীতের সেই কবিতাগুলিকে ঐ গ্রন্থাবলীতে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। "কারণ তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে সুখ-দুঃখ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—।" সন্ন্যাসী গুহারূপ হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া বিশ্বের দরবারে হাজির হইল। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর গুহার মধ্যে আবদ্ধ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইল 'প্রভাতে'র 'রবির কর' সে-গুহায় প্রবেশ করিল, তারপর 'প্রভাত-উৎসব'—'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। কবির আত্মজীবন সন্ন্যাসীর জীবনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সে-কথা কবি নিজেই তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন।

(পূর্বে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য)

(গ) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর পূর্বে কবি নাট্যাকারে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা 'সুরে নাটিকা'—'গানের সূত্রে নাট্যের মালা'। কিন্তু এইটিতে গানের প্রাধান্য নাই, নাট্যই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন,—

> "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্ব হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যাইতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"

(রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, কবির মন্তব্য)

এখন এই তত্ত্ব কিভাবে আখ্যানবস্তুর মধ্যে রসরূপ লাভ করিয়াছে, তাহাই দেখা যাক্।

নিভৃত গুহায় সাধনা করিয়া সন্ন্যাসী 'জ্ঞান-চিতানলে বিশ্ব ভস্ম' করিয়াছে, তাহার বিশ্বাস—জগতের 'মায়ার কুহক' সে ভাঙিয়াছে। জগতের সৌন্দর্য-মাধুর্য আর তাহাকে

আকৃষ্ট করিতে পারিবে না; স্নেহ প্রেম, দয়ার সে এখন বহু ঊর্ধ্বে। দিবস-রজনী সংগ্রাম করিয়া সে সংসারের আকর্ষণের উপর জয়লাভ করিয়াছে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সে আজ মহাদেবের মত প্রলয়ানন্দে উচ্ছ্বসিত। এখন সিদ্ধমনোরথ সন্ন্যাসী গুহা হইতে বাহির হইয়া 'রাক্ষসী প্রকৃতির' উপর তাহার বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিবেঃ—

তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

সেই সাধনার গর্বে ও আনন্দে রাজপথে বাহির হইয়া সন্ন্যাসী পৃথিবীকে করুণার চোখে দেখিতেছে—সব ক্ষুদ্র, অর্থহীন।

এই কি নগর! এই মহারাজধানী!
চারিদিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

সন্ন্যাসীর এই আত্মপ্রত্যয় ও সিদ্ধির আনন্দের প্রতিকূল শক্তির বীজ রোপিত হইল এক পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়, অস্পৃশ্য 'হরিজন'-বালিকার দ্বারা। সংসারের পথে বাহির হইয়া ধর্মভ্রষ্ট, অনাচারী, অনার্য রঘুর কন্যার সঙ্গে তাহার দেখা। সকলেই এই ম্লেচ্ছ কন্যাকে দূরে দূরে করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, উহার সংস্পর্শে জাতি-ধর্ম যাইবে, দেহ-মন অশুচি হইবে। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্রয় দিল। সন্ন্যাসী স্নেহের বশে তাহাকে আশ্রয় দিল না,—দিল তাহার জগৎ-ধ্বংসী সাধনার সিদ্ধির শক্তি দেখাইবার জন্য। সংসারের জাতি, ধর্ম, আচার-বিচার সাধনাসিদ্ধ সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করে না, সংসারের লোকের মতো সে সংস্কারাবদ্ধ জীব নয়, সংসারের ঘৃণা বা অনুরাগের সে বহু ঊর্ধ্বে—এই অহংকারেই সে বালিকাকে আশ্রয় দিল।

মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইক কাহারো 'পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক কাছে, যায় যাক্ দূরে
জেনো বৎসে, মোর কাছে সকলি সমান।

কিন্তু বালিকার সান্নিধ্য স্নেহ-প্রেমজয়ী সন্ন্যাসীর হৃদয়ে ঈষৎ তরঙ্গ তুলিতেছে। ক্রমে হৃদয়ের আলোড়ন বাড়িতেছে এবং বালিকার প্রতি স্নেহ ও তাহার সাধন সিদ্ধির অহংকারের সহিত দ্বন্দ্ব চলিতেছে।—

বালিকা—পিতা!
সন্ন্যাসী—আহা পিতা ব'লে কে ডাকিলি ওরে!
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।…
সন্ন্যাসী—আহা শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে প'ড়েছে!
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর জ্বালা।

যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা!
ঘুমিয়েছে, এই বেলা ওঠ রে সন্ন্যাসী!

আবার দম্ভ আসিয়া তাহার হৃদয়ের দুর্বলতাকে সরাইয়া দিতেছে,—

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে
বালিকা দেখিয়া শেষে পালাইতে হবে!
কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি।
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ যত!
এ ঊর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

কিন্তু প্রকৃতির মায়াফাঁদ সন্ন্যাসী এড়াইতে পারে না।—

তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।

আবার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়,—

একি মায়া? একি স্বপ্ন? একি মোহ মোর,—
জগৎ কি মায়া ক'রে ছায়া হ'য়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান?

চলে আত্মসমালোচনা,—

একি স্নেহ? আমি কিরে স্নেহ করি এরে?
না না! স্নেহ কোথা মোর! কোথা দ্বেষ ঘৃণা!
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

মনকে সে প্রবোধ দেয় যে, সে স্নেহ-মায়া-মোহের অতীত,—

বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে?
হায় হায় এ কী ভ্রম! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহ-রেখাহীন!
তাই মনে করে যদি সুখে থাকে, থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

কিন্তু আত্মপ্রবোধ সত্ত্বেও তাহার সন্দেহ হইতেছে, সে রাক্ষসী প্রকৃতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে এই মোহের আবরণে যে তাহার দেহমন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে,—

একি রে মদিরা আমি করিতেছি পান!
একি মধু-অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!

একি রে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরাণে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ আববণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।

ক্রমে বালিকার প্রতি স্নেহের মধ্য দিয়া সন্ন্যাসী জগতের সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে—প্রকৃতির মায়া তাহার কাছে মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

সহসা পড়িল চোখে একি মায়াঘোর,
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি।

পরক্ষণেই তাহার লুপ্ত সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিয়া সে মনে দৃঢ় বিশ্বাস আনিতেছে যে, সে সংসারের অসার সৌন্দর্যের আকর্ষণের বহু ঊর্ধ্বে। সে রাজার মতো শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব লইয়া সিংহাসনে বসিয়া কৌতুক দেখিতেছে, আর তাহার দাসী, নটী প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে।—

হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই, দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্র সূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোরে পূজা।

কিন্তু মনকে নানা প্রবোধ দিয়া এবং নিজের দুর্বলতাকে জয় করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও প্রকৃতির হাতে সে ধীরে ধীরে পরাজয় স্বীকার করিতেছে। বালিকাই সংসার-সৌন্দর্যের বার্তাবাহিকা, বালিকাই তাহাকে জগতের সৌন্দর্য-মাধুর্যের উৎসব-ক্ষেত্রে লইয়া পৌঁছাইয়া দিতেছে। তাই সন্ন্যাসী বালিকাকে বলিতেছে,—

সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ-সমীরণ!
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর।
মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা।
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।
তুই কিরে মিথ্যা মায়া দুদণ্ডের ভ্রম!
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস্ ফুল,
জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে!
চল্ বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এপারে রয়েছে জগৎ,

সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে'

এখনো সন্ন্যাসী মনে করিতেছে, প্রকৃতির হাতে একেবারে সে আত্মসমর্পণ করে নাই। এখনো সে নির্লিপ্তই থাকিবে, তবে মাঝে মাঝে জগতের সৌন্দর্য-মাধুর্য আস্বাদন করিবে কেবল বালিকার সাহায্যে, বালিকার সোনার তরীতে উঠিয়া মাঝে মাঝে সে সংসারের তীরে নামিয়া মায়াবিনী প্রকৃতির বিচিত্র রূপসজ্জা দেখিবে। সংসারের উপর সন্ন্যাসীর যে-আসক্তি তাহা বালিকার মাধ্যমে, বালিকার নিমিত্ত, প্রত্যক্ষভাবে কোনো আসক্তি তাহার নাই।

কিন্তু বালিকাকে ভালোবাসিয়াই সে জগৎকে ভালোবাসিয়া ফেলিল—জগতের স্বরূপ বুঝিতে পারিল। বালিকার সোনার তরণী তাহাকে সংসারের ঘাটে নামাইয়া দিল। আর সে যেন ফিরিতে পারিবে না। অসীমের ধ্যানপীঠ গুহার বাহিরে আসিতেই সংসারের সত্য-স্বরূপটি তাহার চোখে পড়িল,—

এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে?
বড়ো ছোটো কিছু নাই সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ভ্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।

তবুও সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটে নাই, প্রকৃতির মায়া কাটাইবার জন্য সে নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। বালিকার প্রীতি, স্নেহ তাঁহাকে সবলে সংসারের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাই সন্ন্যাসী গুহা ছাড়িয়া পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।—

কে ও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্য গুহা মাঝে,
কে ওরে পশ্চাতে ডাকে পিতা পিতা ব'লে।—
ছিঁড়ে ফেল্—ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল ছুটে আর দেরি নয়।

কিন্তু বালিকা তাহাকে ছাড়ে নাই, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে—

বালিকা—পিতা, পিতা, কোথা তুমি, পিতা।
সন্ন্যাসী—(চমকিয়া) কে রে তুই
চিনিনে চিনিনে তোরে, কোথা হতে এলি।

বালিকা—আমি পিতা, চাও পিতা, দেখ পিতা, আমি!
সন্ন্যাসী—চিনিনে চিনিনে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা।
আমি কারো কেহ নই আমি যে স্বাধীন।
বালিকা—(পায়ে পড়িয়া) আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়—
শুধায়ে শুধায়ে সবে, তোমারে খুঁজিয়া
বহুদূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি;
সন্ন্যাসী—(সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া)
আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল অশ্রুধারা,
ভেঙে যাক্ এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে,
আর তোরে ফেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে।
পদাঘাতে ভেঙেছিনু জগৎ আমার—
ছোট এ বালিকা এর ছোট দুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।

বালিকাকে সংগে লইয়া আসিয়া আবার সন্ন্যাসীর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া,—

রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে তুই মায়াবিনী—
দূর হ, এখনি তুই যারে দূর হ'য়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু মাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস ক'রে দিলি।
ওরে তোরে চিনিয়াছি—আজ চিনিয়াছি
প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃংখল।

আবার মূর্ছিতা বালিকাকে ফেলিয়া গুহামুখ হইতে সন্ন্যাসীর অরণ্যে পলায়ন। কিন্তু অরণ্যে ঝড়বৃষ্টির গর্জনের মধ্যে বালিকার ক্ষীণ কাতর কণ্ঠধ্বনি তাহার কানে আসিতে লাগিল। এইবার তাহার অন্তর্জীবনে চরম পরিবর্তন—সন্ন্যাসব্রত ত্যাগ।—

যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত।
(ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) দূর কর, ভেঙে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু।
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী।
পাষাণ সংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।

এখনই সংসারের প্রকৃত তাৎপর্য, সীমা-অসীমের সম্বন্ধের সত্যকার স্বরূপ তাহার কাছে প্রতিভাত হইল।—

হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে—...
জগৎ তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে

মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।···
কী করেছি, কী বলেছি. সব গেছি ভুলে,—
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু পড়িতেছে মনে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।

বালিকাকে ভালবাসা যখনই সন্ন্যাসীর পরিপূর্ণ ও যথার্থ হইল, তখনই জগতের আনন্দময় মূর্তি তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল,—

জগতের মুখে আজি একি হাস্য হেরি!
আনন্দ-তরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দ-হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—এখন 'প্রেমের সেতুতে' দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, 'গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর' মিলন হইল, 'সীমার তুচ্ছতা ও অসীমের শূন্যতা' মিলাইয়া গেল। তারপর বিগতমোহ সন্ন্যাসী একেবারে তাহার স্নেহপাত্রীর উদ্দেশে ছুটিল। কিন্তু বালিকার মৃতদেহ গুহামুখে পড়িয়া আছে।—

বাছা—বাছা—কোথা গেলি। কী করিলি রে—
হায় হায়—একি নিদারুণ প্রতিশোধ।

সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ লইয়াছিল, এবার তাহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিয়া প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। সত্য কঠোর মূর্তিতেই আমাদিগকে জাগ্রত করে। প্রচণ্ড আঘাতের মধ্য দিয়াই জীবনের চরম সত্য-উপলব্ধি হয়। তাই ভালো-বাসার ধনকে হারাইয়াই সন্ন্যাসী স্নেহ-প্রেমকে উপেক্ষা করিবার কঠোর শাস্তি পাইল এবং সারাজীবন অনুতাপের আগুনে তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল।

জ্ঞানযোগী-সুলভ তুরীয় অবস্থা হইতে বালিকার সংস্পর্শে চিত্তের নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী অবশেষে সীমা-অসীম-তত্ত্বের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে,—এদিক দিয়া তত্ত্বটি মোটামুটি হৃদয় ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য হইয়াছে। সন্ন্যাসী-চরিত্রটি তত্ত্বের বাহন হিসাবে ভালই ফুটিয়াছে; মনস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাতও বেশ সূক্ষ্মভাবে দেখানো হইয়াছে। প্রথম যুগের অপরিণত রচনা হিসাবে বিচার করিলে সন্ন্যাসী-চরিত্রকে অসার্থক বলা যায় না। সন্ন্যাসীর দ্বন্দ্বের প্রতিপক্ষ রঘু-দুহিতা অত্যন্ত ক্ষীণ ছায়া-রেখামাত্র। পথের লোকজন—যাহাদিগকে রবীন্দ্রনাথ "আপনার ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে" বলিয়াছেন, তাহাদের রেখাচিত্র অধিকাংশ স্থলেই সার্থক হইয়াছে। সন্ন্যাসীর মনে প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির উপযোগী করিয়াই তাহাদের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

শারদোৎসব

(১৩১৫)

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-রচনার চব্বিশ বৎসর পরে কবি 'শারদোৎসব' রচনা করেন। যে তত্ত্ববীজের অংকুর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সংকীর্ণ, অকর্ষিত ক্ষেত্রে গজাইয়াছিল, তাহা ইতিমধ্যে বহুশাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যে অসীমের সীমা রচনা করিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার মানসী প্রতিমাগুলি নানা রূপ ধরিয়া তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। অসীম—প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে সীমারূপ ধরিয়াছে, আর স্বয়ং কবির চিত্তে নিজেকে প্রতিফলিত করিয়াছে। তাই কবির কাব্যসাধনা চলিয়াছে ত্রিধারায়—প্রকৃতির সহিত, মানুষের সহিত, আর ভগবানের সহিত। অসীমের আনন্দ-রূপই এই সৃষ্টি। অসীমের এই আনন্দরূপের—এই সৃষ্টির সৌন্দর্য কবি ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার কাব্যে নানাভাবে। পরমসত্যের আনন্দময় প্রকাশই তাঁহার কাব্যের মূল-ভিত্তি। মানব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যের রূপদানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে 'ক্ষণিকা'তে। তারপর কবির ব্যক্তিজীবনের সহিত অসীমের লীলারসের বৈচিত্র্যও 'খেয়া'য় রূপলাভ করিয়াছে। 'শারদোৎসব'-এর পূর্বে আসিয়া কবির কাব্যসাধনা একটা স্থির, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। মন হইয়াছে পরিণত, রচনা-শৈলী পরিপক্ক। তাই 'শারদোৎসব'-এর মধ্যে যে কবি-মানসের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে পরিণত রবীন্দ্র-কবি-মানসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। যে-ভাবসত্য তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে সক্রিয়, যে তত্ত্বোপলব্ধির রূপ তাঁহার বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রকটিত, তাহাদেরি একটা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ইহার মধ্যে।

প্রথমে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ ও মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্ঃ

(১) প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং উভয়ে একই সত্যে বিধৃত। উভয়েই এক অখণ্ড, চিরন্তন সত্তার প্রকাশরূপ। এক বিরাট প্রাণের লীলায় উভয়েই তরঙ্গিত। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। মানুষের মতো প্রকৃতিরও একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—প্রাণ আছে।

(২) প্রকৃতির প্রাণের সহিত মানবপ্রাণের একাত্মতা বুঝিলে এক বিশ্বব্যাপী প্রাণের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সহজেই অনুভূত হয়। মানুষ আপনাকে বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের স্রোত অনাবিল, মুক্ত, স্বচ্ছ; মানুষের মধ্যে সেই স্রোত নানাসংস্কার, স্বার্থ-লোভ, অভ্যাসের জড়তায় শৈবাল-সমাচ্ছন্ন; প্রকৃতির প্রাণের সহিত মানুষের প্রাণ যুক্ত করিতে পারিলে সে সংসারের আবর্জনা-মলিন, শৈবাল-রুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া নিজে স্বচ্ছ, সরল, নির্মল প্রাণধারাকে উপলব্ধি করিতে পারে। তাই প্রকৃতির সহিত যোগ মানুষের স্বরূপ-উপলব্ধির প্রধান সহায়। প্রকৃতি প্রত্যহের জীর্ণ আবরণ ঘুচাইয়া মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দেয়, সৃষ্টির মূলে যে-আনন্দ, তাহার আস্বাদ দান করে।

(৩) ভারতীয় সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয়েরা প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতেন। তপোবনই ছিল এই সম্বন্ধের প্রতীক।

অরণ্যভূমিতে প্রকৃতির যে-প্রাণের লীলা ঋতুতে ঋতুতে এবং নানা সময়ে বর্ণ, গন্ধ ও গানের অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তাহার মধ্যে বসিয়া তপোবনবাসীরা ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রাণের সঙ্গে নিজেদের প্রাণের যোগ ও একটা আনন্দঘন, রহস্যময় ঐক্য উপলব্ধি করিতেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—

"এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশ-সমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য ব'লে, নির্জীব ব'লে, পৃথক ব'লে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময়, অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ—এইটি তাঁরা একটি অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন; সেইজন্যেই নিশ্বাস, আলো, অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।......বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।......ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ, আশ্চর্য, পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গে জড়িত।......মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।"

(তপোবন, শিক্ষা)

পরবর্তী যুগে ভারতে নগর-নগরী স্থাপিত হইলেও এই তপোবন-আদর্শের প্রভাব হ্রাস পায় নাই। রাজা-মহারাজারা তপস্বীদের আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহাদের মহত্ত্বে গৌরব বোধ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন সাহিত্যে এই তপোবন-আদর্শ, মানুষের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির এই সম্মিলন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কালিদাসের কালে তপোবন-যুগ চলিয়া গেলেও তপোবন ভারতীয়দের 'হৃদয় জুড়িয়া আছে'। কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', প্রভৃতি কাব্যে এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে এই তপোবন-প্রভাব—প্রকৃতির সহিত—তরুলতাপশুপক্ষীর সহিত মানুষের মিলনের পূর্ণতার চিত্র বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। 'উত্তররামচরিত', 'কাদম্বরী'তেও ইহার প্রভাব আছে।—

"মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট।...এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে, সেই সুরটি আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।" (তপোবন, শিক্ষা)

(৪) এই তপোবন-আদর্শই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শের ভিত্তি।—

"কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-

কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।...বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়।... এইজন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক—ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুদ্র এবং বিচার-বুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয়, তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।...আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি, তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত, তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে। ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি, তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ ক'রে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারিনে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ ব'লে পূজা করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈবং সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা।" (ঐ)

এই আদর্শই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং এই আদর্শ ও ভাব-সত্যই বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার মূলে।

"যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে...সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবে নিত্য-ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানা দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন।"

তপোবনে যেমন মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলন অনুভব করিয়াছে, তেমনি বিশ্বমানবের সঙ্গেও তাহার যোগ অনুভব করাতে তাহার আত্মোপলব্ধির চরম পূর্ণতা হইয়াছে। তাই শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পূর্ণ পরিণতি।—

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"

(চিঠিপত্র, ২য়, পৃঃ ৫৫-৫৬)

(৫) বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন না হইলে বিশ্বপ্রাণের সহিত মানবের গভীর সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায় না। নব নব ঋতুর আবির্ভাবে প্রকৃতির যে রূপবৈচিত্র্য ঘটে, যে-নানা রসের উৎস খুলিয়া যায়, মানুষ সেই ঋতু-উৎসবগুলিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া সেই রূপ ও রসে নিমজ্জিত হইবে। তাহার পরিপূর্ণতা-উপলব্ধির পক্ষে ইহা অপরিহার্য। এই মিলনে মানুষের দেহ-মন অপূর্ব শক্তি লাভ করে এবং নূতন চেতনায় জাগ্রত হইয়া বিরাটের সহিত মিলন অনুভব করে। প্রকৃতির সহিত একাত্মতায় কবি 'মহামুক্তি' অনুভব করিয়াছেন। এই একাত্মতার সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা'হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি" দেখি ফুলে ফুলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

...গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর...বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন,—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেকঃ।" শুনেছিলেন "যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।" তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ"—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?"

(ভূমিকা, বনবাণী)

ইহাই মোটামুটি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ, ও মানবের উপর প্রকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। অবশ্য ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক দিয়া তিনি আরো অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে বিশ্বপ্রকৃতির জল-স্থল-আকাশ-বাতাসের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে একাত্ম হইয়াছিলেন, এই মানবপর্যায়ে উন্নীত হইয়াও সেই স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চিত্তে উদিত হয়—এই ভাব তাঁহার কাব্যে বহু স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমের মূলে এই সহজাত অনুভূতিও ক্রিয়াশীল। ইহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

প্রকৃতির সহিত মিলনের একটি উপায় বিভিন্ন ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান ও সেই উৎসবে প্রকৃতির রূপ, রস ও গানের সহিত মানুষের হৃদয় একতারে বাঁধিয়া লওয়া, একসুরে ঝঙ্কৃত করা। এই প্রকৃতি-চর্চা রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার একটি অঙ্গ। তাই তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে 'ঋতু-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই 'শারদোৎসব' ঋতু-উৎসবের জন্য লিখিত একখানি

নাটক। শরতের শুভ্র, অম্লান সৌন্দর্য ও আনন্দ শিক্ষার্থীর অন্তরে সংক্রামিত করা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিন্তু ইহা কেবলমাত্র ঋতুনাট্য নয়, শরৎ-ঋতুর রূপ ও রস মানবচিত্তে সঞ্চারিত করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ইহার মধ্যে একটি আইডিয়া বা তত্ত্বের সংকেত কবি দিয়াছেন। নাটকের বিশিষ্ট পাত্রগণ এই উৎসবের মধ্যে সেই তত্ত্বের উপরই অনেকটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। নাটকের গানে ও ভাষণে শরতের যে-আনন্দমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মূলত একটা তত্ত্বের অভিব্যক্তি হিসাবেই যেন কবি নির্দেশ করিতে চান। 'ঋণশোধ'-তত্ত্বই যেন কবির মূল-বক্তব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে. শরতের এই উচ্ছল আনন্দধারা এক মূল-আনন্দের অভিব্যক্তি এবং মানুষও তাহার অন্তর্নিহিত আনন্দ-অমৃতের ঋণ শোধ করিবে, কবি ইহারই সংকেত দিতেছেন। তাই ইহাকে রূপক-সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। প্রকৃতিকেই কবি এখানে সংকেতরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

'শারদোৎসব' নাটকের 'ভিতরের কথাটি'তে কবি প্রকৃতি ও মানুষের মিলনের সার্থকতা, এই নাটকের রসবৈশিষ্ট্য এবং তত্ত্ব সমস্তই অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

> "সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে, সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে-হাওয়ায়-আলোকে-আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে, তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ্য আছে। মিলন ঠিকমতো ঘটিলেই, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে, সেই মিলন নিজেকে কোনো না কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ করে। মিলন যেখানেই ঘটে, অর্থাৎ বহুর ভিতরকার মূল ঐক্যটি যেখানেই ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেখানেই উপলব্ধ হয়, সেখানেই সৃষ্টির অহেতুক অনির্বচনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বহুর বিচিত্র ঐক্য সম্বন্ধই সৃষ্টি। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থই এই, মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ জগৎ; এই জগতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বিধিব্যবস্থা, ধর্মকর্ম, শিল্প-সাহিত্য, আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট সৃষ্টি, এই সৃজনের মূলশক্তি মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করে চলে, আপন জ্ঞান-প্রাণ-প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই সৃজনের শক্তি।
>
> মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।
>
> বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে, কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে

আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই, সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'Three Years She Grew' নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে 'লুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি লিখিতেছেন, 'প্রকৃতির নির্বাক্‌ ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত হইবে। ভাসমান মেঘ-সকলের মহিমা তাহারই জন্য, এবং তাহারই জন্য উইলো-বৃক্ষের অবনম্রতা। ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটি শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত, তাহারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গীতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালবাসার ধন। আর, যে-সকল নিভৃত-নিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে, সেইখানে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্যটি তাহার মুখশ্রীর উপরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল-ফল-ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র একমহলা; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি, বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরও অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশুপাখী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার করা কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন না থাকারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে; সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। 'শারদোৎসব' সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে। লক্ষেশ্বর—সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া, সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া

বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে। সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া, সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।"

ঋতুনাট্য হিসাবে 'শারদোৎসব' চমৎকার সৃষ্টি। শরতের ধরণী-গগনে যে এক অপূর্ব আনন্দরসের প্লাবন, সেই প্লাবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবার জন্য ছেলের দল, ঠাকুরদাদা, সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছে। সংসারের ক্ষতি-লাভ-গণনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সব পিছনে পড়িয়া আছে—ছুটির আনন্দে, মুক্তির তৃপ্তিতে সকলে আজ ভরপুর। গলিত কাঁচাসোনার মতো রৌদ্রে, নীল আকাশে লঘু মেঘের সন্তরণে, শিশিরভেজা শিউলীফুলের রাশিতে, নদী-তীরের শুভ্র কাশগুচ্ছে, কাঁচা ধানের ক্ষেতে, শরৎ-সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর অপরূপ নয়নভুলানো বিলাস! সমস্ত নাটকখানির মধ্যে একটা খেলার অহেতুকী উল্লাস, ছুটির মুক্ত-আনন্দের ঘন আবহাওয়া!

"ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী)

একটা খুশির হালকা হাওয়া, একটা অকারণ আনন্দের হিল্লোল বাঁশীর সুর-মূর্ছনার মতো এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিকে ঘিরিয়া বাজিতেছে। কবিও ইহাকে একটা ভারহীন সংগীতোচ্ছ্বাসের মতো প্রতীয়মান করিতে চাহিয়াছেন।—

মন্ত্রী—সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস... শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্কা রকমের ব্যাপার।...কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।... কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।...কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলার মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।...কবি বলেন, শরতের কাঁচা ধানের যে খেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েছে।...তাই কবি বলেন, শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকম হাল্কা, ওইরকম নিরর্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা—বাঃ, এতো মন্দ শোনাচ্ছে না! ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী—একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা—বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী—আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা—ছেলের দল? তাদের নিয়ে কি হবে?

মন্ত্রী—কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচাধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে ছুটির ভিতরেই,

ফসলের আয়োজন করছে।" (১৩২৯ সালে কলিকাতায় 'শারদোৎসব'-এর অভিনয়ের সময় কবিলিখিত ভূমিকা)

শরৎ-ঋতুর সৌন্দর্য ও তাহার অন্তরের সংগীতকে কবি সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন এই নাটকে। এই রূপায়ণে গানগুলিই সাহায্য করিয়াছে বিশেষভাবে। আকাশে, বাতাসে, ধরণীতে সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিতেছে। শারদলক্ষ্মী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না! দূরে দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে...সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী

ঐ যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, হাঁ, ভেসে আসছে!

সন্ন্যাসী

ঐ যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক

কিসে।

সন্ন্যাসী

এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের স্পর্শ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী

তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ঠাকুরদাদার গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

এই আকাশ, বাতাস, আলোর সঙ্গে অন্তরের যোগসাধনই তো প্রকৃত উৎসব। প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপ, রস ও গানের সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগের মধ্যে, এই বাহির ও

অন্তরের মিলনের মধ্যে ঋতু-উৎসবের সার্থকতা—প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যের যোগসাধন।

ইংরেজ-কবি Wordsworth মানুষের উপর প্রকৃতির অসীম প্রভাবের কথা বলিয়াছেন; প্রকৃতি মানুষকে যে নীরব শিখা দেয়, 'Education of Nature' কবিতায় Lucy-র দেহমনের বিকাশ সম্বন্ধে কবি তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যাখ্যায় ইহা উদ্ধৃতও করিয়াছেন। দেহ, মন ও অন্তরাত্মার উপর প্রভাব-বিস্তারের দ্বারা তাহাদের নবভাবে গঠনকার্যে প্রকৃতি যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে, Wordsworth তাহা অন্যান্য কবিতায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন,—

I have owed to them,
In hours of weariness, sensations sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart;
And passing even into my purer mind,
With tranquil restoration. (*Tintern Abbey*).

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতির সহিত একাত্ম হওয়া ও তাহার প্রভাবকে গ্রহণ করার মধ্যে গভীরতর ও ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত আছে। ইহাই 'শারদোৎসব'-এর তত্ত্বাংশ। কবি ইহাকে ঋণ-শোধ বলিয়াছেন।

"শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরের নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয়, সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য। দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই। সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অক্লান্ত ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর, তাহা উজ্জ্বল হয় না। বাধা কোথায় কাটে না। যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায়, সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুকিয়া দিতে চায়; তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে সে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য; আনন্দরূপমমৃতম্।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়,—কর্মকে এড়াইয়া, তপস্যায় ফাঁকি দিয়া পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।'

এই লইয়া সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নিচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন?...আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে।...সেই জন্যই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে।...সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, সেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী সমস্তই অব্যবস্থ।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে একপক্ষে কম পড়ে যায়, অন্যপক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্ত্যলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে-মানুষ বা যে-জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে, ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানব উভয়েই ঋণশোধের পালা অভিনয় করিতেছে। তাহাতেই তাহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং অপূর্ব শ্রী ও প্রাচুর্য ফুটিয়া ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে নিত্যানন্দের বিকাশ, সেই আনন্দ, সেই অমৃত প্রকৃতি নানা ঋতুর রূপ-রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই ভাবেই সে আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে। এই ঋণশোধের দ্বারাই তাহার সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া সকলের দৃষ্টি মুগ্ধ করিতেছে। মানুষের মধ্যেও এই নিত্যানন্দের অস্তিত্ব আছে, মানুষকেও এই আনন্দের, অমৃতের, এই দেবত্বের ঋণ শোধ করিতে হইবে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে তাহাকে অমৃতের অধিকারিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে,

তাহার দেবত্বের ঋণ শোধ করিতে হইবে, জীবনের বিকাশের মধ্য দিয়া তাহার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ করিতে হইবে। এই সার্থক প্রকাশেই তাহার সৌন্দর্য। যেখানে মানবের অন্তর্নিহিত এই দেবত্বের প্রকাশ স্বার্থচিন্তা, ভোগলালসা, জড়তা, ঔদাসীন্যের দ্বারা আচ্ছন্ন ও ব্যাহত হয়, সেখানে তাহার ঋণ শোধ করা হয় না, দেবতার দান তাহার মধ্যে নিষ্ফল হয়, জীবন কুশ্রীতা ও গ্লানিতে ভরিয়া যায়। এই প্রকারের বাধা কাটাইয়া উঠিয়া অমৃত-সত্তার পরিচয় দিতে হইলে, দেবত্ব-ঋণ শোধ করিতে হইলে, কর্মের মধ্যে ত্যাগ-তপস্যার প্রয়োজন, দুঃখ-সাধনার দ্বারা এই ঋণ শোধ করিতে হয়; এই দুঃখবরণেই মানবজীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য। যতই নিজেকে অমৃতের অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করা যায়, দেবঋণ-শোধ হয়, ততই তাহার বন্ধন ছিন্ন হয়, জীবনে যথার্থ মুক্তি আসে, ততই সে ছুটি উপভোগ করে। উপনন্দ তাহার প্রভুর প্রেম-ঋণ দুঃখস্বীকারের দ্বারা শোধ করিতেছে, তাই সে সুন্দর, সে মুক্ত; সে যথার্থ ছুটি উপভোগ করিতেছে। শরতের ঋণশোধের সহিত মানুষের ঋণশোধ উপলব্ধি হইলে, ভিতরে ও বাহিরে মিলন করিলেই প্রকৃত শারদোৎসবের রস উপভোগ করা যাইবে।

এই তত্ত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য কবি 'শারদোৎসব'-এর নবতম রূপ 'ঋণ-শোধ' রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতি যেমন সৌন্দর্যের, উচ্ছলতার প্রকাশ দ্বারা ঋণশোধ করিতেছে, মানবও সেইরূপ পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের দ্বারা ঋণশোধ করিতেছে। জ্ঞানী ঋণশোধ করিতেছে জ্ঞানপ্রকাশের দ্বারা, শিল্পী শিল্পসৃষ্টির দ্বারা, কবি কাব্যসৃষ্টির দ্বারা, প্রেমিক প্রেম-বিতরণের দ্বারা, কর্মী কর্মের স্বার্থহীন, নিরলস সাধনার দ্বারা--প্রত্যেকেই আপন আপন অন্তরস্থিত অমৃতকে প্রকাশ করিয়া ঋণশোধ করিতেছে। এই ঋণশোধের মধ্যে আছে ত্যাগ, আছে দুঃখ, ইহার মধ্য দিয়াই ঋণশোধ সার্থকতা লাভ করে।

বিজয়াদিত্য

মন্ত্রীর মনে এই বড় ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্য আমার মনে নেই।

শেখর

বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে, তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য

অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণশোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা আছে বল? আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর

প্রেম ত সে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালে সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝঙ্কারের মত ঝল্‌মল ক'রে উঠল, তখন সেই সুরের জবাবটি ভালো-বাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতেই নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপচে পড়ছে।

সন্ন্যাসী

ওকে সবাই ভালবাসে, ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর

ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে, সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। ঐ যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে, সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে। (ঋণশোধ)

'শারদোৎসব' নাটকের মধ্যে কেবল উপনন্দই গুরু-ঋণ শোধ করিতেছে না, বিজয়াদিত্য প্রেম, প্রীতি ও প্রজাবাৎসল্য দ্বারা রাজ-ঋণ শোধ করিতেছে, শেখর কবিত্বের দ্বারা কবি-ঋণ শোধ করিতেছে, ঠাকুরদাদা সমস্ত সংসারাসক্তিবর্জিত হইয়া নিজেকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া, উচ্চনীচ সকলকে ভালোবাসিয়া, আত্মসত্তার ঋণ শোধ করিতেছে, কেবল লক্ষেশ্বর স্বার্থবুদ্ধি ও লোভের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় তাহার অন্তরস্থ আনন্দের ঋণ শোধ করিতে পারিতেছে না, রাজা সোমপাল ঈর্ষায় রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া রাজঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইয়াছে। তাই তাহারা উৎসবে যোগ দিতে পারিতেছে না, আর রাজসন্ন্যাসী, ঠাকুরদাদার দল সব উৎসবকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। তাহাদের কাছে প্রকৃতির অমৃতের সহিত মানবের অমৃতের মিলন হইয়াছে, তাই তাহাদের প্রকৃত মুক্তির আনন্দ, ছুটির আনন্দ, শরৎ-প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিবার শক্তিলাভ হইয়াছে। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তার সত্যকার সাথী মিলেছে, কেননা ওই ছেলেটির সঙ্গেই শরৎ-প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।" (আমার ধর্ম, আত্মপরিচয়)

রূপক-সাংকেতিক নাট্যশিল্প এখনও রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, 'শারদোৎসব'-এর মধ্যে কতকটা ঋতুনাট্য এবং রূপক-সাংকেতিক নাট্যের মিশ্রণ হইয়াছে। লক্ষেশ্বর-চরিত্রটিকে বৃহত্তর ভাবজীবনের আবেদনে সাড়াহীন, একটি অর্থপিশাচ, স্বার্থপর, হৃদয়হীন, সাংসারিক লোকের টাইপ-সিম্বল বলিয়া ধরিতে পারি। ইহাও রূপকের সীমানার মধ্যে পড়ে। প্রকৃত সংকেতের আভাস পাওয়া যায় রাজসন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার চরিত্রে। তাহারা শারদোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছে, প্রকৃতির অনুরূপ মানবজীবনের মধ্যেও একটা সত্যের লীলা অনুভব করিতেছে। উপনন্দ-চরিত্র ঋণশোধের আনন্দ, দুঃখ ও মুক্তির প্রতীক।

মানবজীবনের সার্থকতার পথ দুঃখ ও ত্যাগের মধ্য দিয়াই। দুঃখই তাহার আত্মোপলব্ধির উপায়—ইহা রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ আইডিয়া। এই দুঃখই আমাদিগকে আমাদের অন্তরতমের নিকটবর্তী করে। দুঃখের এই রস ও দার্শনিকত্ব তিনি নিষ্কাশন করিয়াছেন তাঁহার এই যুগের বহু কবিতায়, বহু রচনায়। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত রাজার আদর্শ সন্ন্যাসীর আদর্শ—ঐশ্বর্যের অন্তরালে বৈরাগ্য। 'রাজা হতে হলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।' ইহা 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই ত্যাগ-বিদ্ধ ভোগের আদর্শের একটা রূপ। ঋতুরাজ বসন্ত তাই বাহিরের ঐশ্বর্য-সমারোহের মধ্যে অন্তরে সন্ন্যাসী। 'বাহিরে তাহার উজ্জ্বল সাজ, ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়, তাইরে নাইরে নাইরে না।' 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে! দেখিসনে কি শুকনো পাতা-ঝরা ফুলের খেলা রে?'

এই নাটকেই প্রথম আমরা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা-চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এই চরিত্র রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের টেকনিকের একটা বিশেষ অঙ্গ। সরল, রহস্যপ্রিয়, সদানন্দময়, জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী অতীন্দ্রিয়, ঐশীশক্তির মর্মজ্ঞ, বৃদ্ধ-যুবক ঠাকুরদাদা নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবের দিগ্‌দর্শনযন্ত্র,—তাহার আচরণে ও মন্তব্যের মধ্যেই ভাবের সূক্ষ্মগতি নির্ণয় করা যায়। এই ঠাকুরদাদা গ্রীক-কোরাসের মতো ঘটনার বাহিরে থাকিয়া কেবল দ্রষ্টা হিসাবে মন্তব্য করে না, বা প্রাচীন যাত্রার বিবেক, সন্ন্যাসী বা পাগল-জাতীয় একপ্রকার চরিত্রের মতো কেবল গানের দ্বারাই ঘটনার পরিণামের আভাস দেয় না। এই ঠাকুরদাদা নাটকের অন্যতম চরিত্রহিসাবেই ঘটনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া তত্ত্বের রূপায়ণে সাহায্য করে।

রাজা

(পৌষ, ১৩১৭)

এবার আমরা পূর্ণাঙ্গ রূপক-সাংকেতিক নাট্যের পর্যায়ে আসিয়া পড়িলাম। শারদোৎসবে ঋতুনাট্যের সহিত সাংকেতিকতা অপরিস্ফুটভাবে মিশ্রিত হইয়া ছিল, 'রাজা' নাটকে আমরা প্রকৃত সাংকেতিক নাট্যের রূপ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাজা' এক অপরূপ সৃষ্টি। বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বে ও গৌরবে, অন্-

ভূতির তীব্রতায়, সংকেতের অব্যর্থ প্রয়োগে, এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় আবহাওয়া-সৃষ্টিতে, বিশ্বের সাংকেতিক নাট্যসাহিত্যে 'রাজা' একটি শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে।

কবির সাহিত্য-রচনায় কতকগুলি ভাবচক্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; কিছুদিন ধরিয়া কবির মন একটা নির্দিষ্ট ভাবগণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করে; তারপর কবি ইহার সমস্ত রস বিচিত্ররূপে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করেন। একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 'রাজা'-রচনার যুগ 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র যুগ। 'ক্ষণিকা'র পর হইতে কবির কাব্যজীবনে একটা মোড় ফিরিয়াছে, কবি এতদিন সৃষ্টির সংকেতে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, অসীম ও অনন্তকে প্রকৃতির ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; 'খেয়া' হইতে সেই অসীম ও অনন্তকে তাঁহার নিজস্ব রসে উপলব্ধি করিবার জন্য চলিয়াছে প্রয়াস। অসীমের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বহু-বিচিত্র রস-প্লাবন উৎসারিত ও এই অনুভূতির বিচিত্র রূপ ও সমস্যা নানাভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে এই যুগের কাব্যে, নাটকে, ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে। 'রাজা' নাটকে ভগবদনুভূতির এক অভিনব রূপ ও তাহার সমস্যা প্রকটিত হইয়াছে। এই অনুভূতির বিভিন্ন ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ও তাহাদের বিচিত্র সমস্যার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস এই নাটকের বিষয়বস্তু।

'রাজা' নাটকের আখ্যানভাগ বৌদ্ধজাতকের কুশজাতক হইতে গৃহীত।

মল্লরাজ্যের রাজা ইক্ষ্বাকুর প্রধানা মহিষী শীলবতী ইন্দ্রের বরে দুইটি পুত্রলাভ করেন। জ্যেষ্ঠ কুশ বলশালী, গুণী, বুদ্ধিমান এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, আর কনিষ্ঠ জয়স্পতি অত্যন্ত রূপবান্, কিন্তু গুণী ও বুদ্ধিমান নয়। কুশের যৌবনোদ্গমে রাজা কুশকে বিবাহ দিয়া রাজ্যভার দিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু কুশ বুদ্ধিমান, সে বুঝিল, সে অত্যন্ত কুরূপ, কোনো রূপবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিলে, সে তাহার কদাকৃতি দেখিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। সে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু রাজা ও রানীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে এক কৌশলের দ্বারা তাহাদের হাত এড়াইতে মনস্থ করিল। সর্ববিদ্যাবিশারদ কুশ সোনা দিয়া পরমাসুন্দরী এক নারীমূর্তি নির্মাণ করিয়া বলিল যে, ঐরূপ সুন্দরী মেয়ে হইলে সে বিবাহ করিবে, অন্যথায় করিবে না।

রাজা ও রানী তখন দেশে দেশে ঐরূপ সুন্দরী মেয়ের খোঁজে অমাত্যদের পাঠাইলেন। তাহারা মদ্রদেশে যাইয়া মদ্ররাজ-কন্যা প্রভাবতীতে ঐরূপ সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পাইল। সেই সংবাদ পাইয়া রানী নিজে যাইয়া প্রভাবতীকে পুত্রবধূ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। মদ্ররাজ সন্তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন। তখন রানী বলিলেন, তাঁহাদের বংশে একটি কুলপ্রথা আছে যে, এক সন্তানের মা না হওয়া পর্যন্ত বধূকে দিবালোকে স্বামীর মুখ দেখিতে নাই। মদ্ররাজ ও প্রভাবতী তাহাতে স্বীকৃত হইল ও বিবাহ হইয়া গেল।

কুশ রাজ্যভার গ্রহণ করিল। দিনমানে প্রভাবতী তাহাকে বা সে প্রভাবতীকে দেখিতে পাইত না। কেবল রাত্রিকালেই পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইত। প্রভাবতী পুনঃ পুনঃ স্বামীকে দেখিবার জন্য শাশুড়ীকে অনুরোধ জানাইতে লাগিল। অগত্যা রানী বলিলেন, "আগামী কল্য আমার পুত্র হাতীতে চড়িয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তুমি জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবে।" রানী কৌশলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজবেশ পরাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রভাবতীকে দেখাইলেন। কিন্তু রাজার উদ্যানে একদিন কুশের সহিত প্রভাবতীর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কুশের মুখ দেখিয়া প্রভাবতী চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপর ক্রোধ ও বিরক্তিতে কদাকার পতিকে ত্যাগ করিয়া সে পিতার রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।

প্রভাবতীর বিচ্ছেদে কুশ অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হইল। সে ছদ্মবেশে মদ্ররাজের রাজধানীতে গমন করিল। তারপর রাজার হস্তিশালায় যাইয়া বীণা বাজাইতে লাগিল। সেই বীণার মধুর ঝংকার শুনিয়া প্রভাবতী বুঝিল, কুশরাজ সেখানে আসিয়াছে। তারপর কুম্ভকার, রাজমালাকার প্রভৃতির বাড়ীতে শিক্ষার্থী হইয়া থাকিয়া সে নূতন নূতন খেলনা ও মালা তৈয়ারী করিয়া প্রভাবতীর জন্য পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু প্রভাবতী তেমনি বিরূপ। শেষে প্রভাবতীকে দেখিবার আশায় কুশ রাজ-অন্তঃপুরে পাচকের কাজ গ্রহণ করিল। প্রভাবতী ব্যতীত কেহই তাহার পরিচয় জানিল না। কিন্তু কিছুতেই প্রভাবতীর মন টলিল না। সে কুশরাজের সম্মুখে বাহির হইল না বা বাক্যালাপও করিল না।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটিল। প্রভাবতীর স্বামিত্যাগ-সংবাদ পাইয়া সাতজন রাজা তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া নগর অবরোধ করিয়া মদ্ররাজকে সংবাদ পাঠাইল—'হয় প্রভাবতীকে দান কর, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' এক কন্যা সাতজনকে কি করিয়া দান করিবেন ভাবিয়া রাজা দুঃখে ও ক্রোধে প্রভাবতীকে সাতটুকরা করিয়া কাটিয়া সাত জন রাজার নিকট পাঠাইবেন ঠিক করিলেন। তখন অন্তঃপুরে আর্তনাদ উঠিল। প্রভাবতী ও তাহার মাতা কাঁদিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, 'জম্বুদ্বীপের রাজগণের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই কুশরাজকে ত্যাগ করার ইহাই প্রতিফল।' রানী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আজ কুশরাজ যদি এখানে থাকিত, তবে অনায়াসে সে এই রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া আমার মেয়েকে বাঁচাইতে পারিত।' এই বিপদে প্রভাবতী তখন প্রকাশ করিল যে, কুশরাজ পাচকের ছদ্মবেশে এখানে গত সাতমাস-কাল যবেৎ অবস্থান করিতেছে। রাজা ও রানী এবং বিশেষ করিয়া প্রভাবতী কুশরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কুশরাজ তখন পাচকের বেশ ছাড়িয়া রাজোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিল। শেষে ইহাদের প্রাণবধ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া মদ্ররাজের অনুমতি অনুসারে তাঁহার সাতটি মেয়েকে ইহাদের সাত জনের হাতে সমর্পণ করিল। এই মূলগল্পটিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করিয়া কবি তাঁহার 'রাজা' নাটকের আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন।

আগে নাটকের কথাবস্তুর বিবরণ দেওয়া যাক, পরে তত্ত্বস্তু, সাংকেতিক রীতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাইবে।

রাজার সহিত রানী সুদর্শনার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু রানী রাজাকে কোনো দিন চোখে দেখিতে পায় নাই। এক অন্ধকার ঘরে প্রত্যহ রাজার সহিত রানীর মিলন হয়। রানীর বড় ইচ্ছা, আলোতে রাজার রূপ দেখে। রাজার সুরঙ্গমা নামে এক দাসী ছিল। রাজার উপর তাহার অসীম ভক্তি। যৌবনে সে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, রাজা তাহার বাপের নিকট হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া আশ্রয় দেন। শেষে তাহাকে অন্ধকার ঘরের দাসী করিয়া দেন। রানী সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করে, রাজা দেখিতে কেমন, কিন্তু দাসী যাহা বলে, রানী তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, তাহার সন্দেহ হয় রাজা কুরূপ। শেষে রানী রাজাকে ধরিয়া বসিলেন, 'আমাকে দেখা দিতেই হবে,' 'যেখানে আমি গাছপালা পশু-পাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি, সেইখানেই তোমাকে দেখব।' রাজা বলিলেন, 'আজ বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো। বার বার সকল দিক থেকে দেখা দেব, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না।'

রাজ্যের লোক রাজাকে কোনোদিন চোখে দেখেনি; রাজা যেমন রানীকে দেখা দেন না, প্রজাদেরও তেমনি দেখা দেন না। তাই অনেকের সংশয়, রাজা আদৌ নাই। বসন্ত-উৎসবে নানা দেশের রাজারা সব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু রাজ্যের রাজাকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাদেরও মনে সেই সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। কেবল একজন রাজা—কাঞ্চীর রাজা তিনি—এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, রাজা নাই—সকলে মিছামিছি রাজার আস্তিত্ব কল্পনা করিতেছে।

রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সুবর্ণ নামে এক অত্যন্ত সুপুরুষ জুয়াড়ী রাজার ছদ্মবেশে আসিয়া নিজেকে এই দেশের রাজা বলিয়া প্রচার করিল। রাজার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কাঞ্চীরাজের কাছে সুবর্ণের ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল। মনে-মনে কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিত, তাই তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে সুবর্ণকে হাতে রাখিয়া দিল।

বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে সেই অপূর্বসুন্দরমূর্তি সুবর্ণকে দেখিয়া রানী সুদর্শনা তাহাকে রাজা বলিয়া ভুল করিল। রাজা সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, সেই সুরংগমা রানীর কাছে ছিল না। সে আগেই উৎসব করিতে বাহির হইয়াছিল। রানী পদ্মপাতায় ফুলের অর্ঘ্য রচনা করিয়া দাসী রোহিণীর হাত দিয়া সুবর্ণকে পাঠাইয়া দিল। সুবর্ণ ইহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া রহিল। কাছে ছিল কাঞ্চীর রাজা, সে বুঝিতে পারিয়া সুবর্ণের গলা হইতে মুক্তার মালা স্বহস্তে খুলিয়া লইয়া রোহিণীর হাতে দিয়া মহারাজের মালা বলিয়া রানীকে পাঠাইয়া দিল। কাঞ্চীরাজকে বুঝাইয়া দিতে হইল শুনিয়া সুদর্শনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, আঘাত পাইয়াও এই অগৌরবের মালা সে ত্যাগ করিতে পারিল না।

কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভ করিবার আশায় প্রাসাদসংলগ্ন করভোদ্যানে আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কাঞ্চীরাজ নিজেই পলাইবার পথ পায় না। সুবর্ণ তো ভয়ে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। প্রাসাদের চারিদিকে আগুন ধরিয়া গেল। রানী ছুটিয়া আসিয়া রাজবেশী সুবর্ণকে বলিল, 'রক্ষা করো, রাজা, রক্ষা করো, চারিদিকে আগুন'। সুবর্ণ বলিল, 'আমি রাজা নই, আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।' এই বলিয়া সে মুকুট ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে রাজা রানীকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই, তোমার ভয় নেই. এ-ঘরে আগুন এসে পৌঁছবে না।' অপরিসীম লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে রানী মর্মাহত। রানীর কলঙ্কিত মন তখনও রূপের তীব্র নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত। সেই আগুনের মধ্যে রানী রাজার রূপ দেখিয়াছে। 'ভয়ানক, সে ভয়ানক। কালো, কালো, তুমি কালো। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে, সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তখনই চোখ বুঁজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো—।' রাজা বলিলেন, 'এই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।' রানী বলিল, 'তোমার ভালোবাসায় আমার কি হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন শুদ্ধ ঝলমল করছে। কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর। তুমি যে কালো, তোমাকে আমার কখনও ভাল লাগবে না। আমি যা দেখেছি—তা ননীর

মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর। তোমার সঙ্গে আমার মিলন একেবারে অসম্ভব।...তোমাকে ছেড়ে আমি যাবই।'

রানী সুদর্শনা রাজাকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসিল। রাজা তাহাকে কোনো বাধা দিলেন না। তাহাতে তাহার মনে তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। দাসী সুরঙ্গমা রানীর সঙ্গ ছাড়িল না, সেও রানীর সহিত আসিল। সে রানীর 'সমস্ত ভালোমন্দ নিজের গায়ে মেখে নিয়েছে,' সে কিছুতেই রানীর সঙ্গ ছাড়িবে না।

বাপের বাড়ী আসিয়া সুদর্শনা কোনো গৌরব ও সম্মান পাইল না। পিতা কান্যকুব্জ-রাজ বলিলেন, 'ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।' তাহার আত্মসম্মানবোধ ও রূপলালসার মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। সুবর্ণের প্রতি আসক্তি তাহার প্রবলভাবেই আছে; কিন্তু যাহার জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, কৈ সে তো তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না।

সুদর্শনার আক্ষেপ—'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি?' আবার আত্মসম্মানচেতনায় সে সুরঙ্গমাকে বলে, 'তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনও ফেরাবার জন্য আসে?'

এদিকে কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পাইবার আশায় সুবর্ণকে শিখণ্ডী করিয়া সুদর্শনার নিকট পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইল। কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে সুদর্শনার স্বামী বলিয়া দূতের নিকট পরিচয় দিল, কিন্তু দূতের সংশয়ে বলপূর্বক সুদর্শনাকে কাড়িয়া লইয়া যাইতে সংকল্প করিল। ইতিমধ্যে সুদর্শনার গৃহত্যাগের সংবাদ চারিদিকে রটিয়া যাওয়ায় কোশল-রাজ, অবন্তীরাজ, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি রাজারা সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত। সকলেরই ইচ্ছা—সুদর্শনাকে কাড়িয়া লইয়া যায়। সাত রাজার সহিত সুদর্শনার পিতার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ বন্দী হইলেন। সাত রাজাই যখন সুদর্শনার প্রার্থী, তখন স্থির হইল যে, স্বয়ংবর-সভায় সুদর্শনা যাহার গলায় মালা দিবে, সে-ই সুদর্শনাকে লাভ করিবে। স্বয়ংবর-সভা প্রস্তুত। কাঞ্চীরাজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সুবর্ণকে তাহার ছত্রধর করিয়া সভায় বসিয়াছে, যাহাতে সুদর্শনার দৃষ্টি সহজেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। দূরে হইতে সুদর্শনা সুবর্ণকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। সুদর্শনা বলিল, 'ওই সুবর্ণ! ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না, সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর একটা কী দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়। ওই সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ-পাপচোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে।' লজ্জা দুঃখ ও অনুতাপে সে স্থির করিল, স্বয়ংবর-সভায় বুকে ছুরি বসাইয়া কলুষিত দেহটাকে শেষ করিবে।

ইতিমধ্যে স্বয়ংবর-সভায় যোদ্ধৃবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ। ঠাকুরদা বলিল, রাজা আসিতেছেন, তিনি তাঁহার সেনাপতি। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। কাঞ্চীরাজ ঠাকুরদাকে চিনিত। বসন্ত-উৎসবে তাহাকে ছেলের দল লইয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে, উদ্যানে আগুন লাগাইবার পরামর্শের কথা জানিয়াছে বলিয়া তাহাকে শিবিরে বন্দী করিয়াও রাখিয়াছিল। অন্যান্য রাজা এ-কথায় বিশ্বাস করিলেও, কাঞ্চীরাজ বিশ্বাস করিল না। সে বলিল, 'রণক্ষেত্রে রাজার আহ্বানের উত্তর দেওয়া যাইবে।' ঠাকুরদা বলিল, 'রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান'।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত রাজা পরাজিত হইয়া বন্দী হইল। সকল রাজার দণ্ড হইল। কেবল কাঞ্চীরাজাকে বিচারক নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে তাহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। যুদ্ধ শেষ হইল, কিন্তু রাজা সুদর্শনার সহিত দেখা করিলেন না। সুদর্শনা ঠাকুরদার নিকট শুনিল যে, রাজা যুদ্ধ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুদর্শনার বিশ্বাস ছিল, রাজা তাহাকে কেবল উদ্ধার করিয়াই চলিয়া যাইবেন না, নিজে আসিয়া ডাকিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। রানীর মন পরিবর্তিত হইয়াছে, চোখের সর্বনাশা নেশায় দেহে যে-পাপের কলঙ্ক-দাগ লাগিয়াছিল, বেদনা ও অনুতাপের অশ্রুতে তাহা ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে, রাজাকে যে সে দারুণ আঘাত হানিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা হইয়াছে, তবুও রানীর গর্ব ও অভিমান তাহার ঘুচে নাই, রাজার নিকট হইতে রানীর প্রাপ্য সম্মান ও আদর সে চায়। তাহার আকাঙ্ক্ষা, রাজা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইবেন। তাই 'বিশ্বশুদ্ধ লোকের সামনে তাকে ফেলে রেখে চলে যেতে' দেখে সে বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

এইবার সুদর্শনার কঠিন অহংকার গলিল। অশ্রুর প্লাবনের মধ্য দিয়া সে রাজার বীণার মিনতির সুর যেন শুনিতে পাইল। সকল অহংকার বিলুপ্ত করিয়া সুরঙ্গমার সঙ্গে সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে ঠাকুরদা ও পরাজিত কাঞ্চীরাজও পথে বাহির হইয়াছে। পথেই তাহাদের সঙ্গে রানী ও সুরঙ্গমার দেখা। অবিশ্বাসী কাঞ্চীরাজের আজ বিরাট পরিবর্তন। সে 'রাজমুকুট থালায় সাজিয়ে রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে।' কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে বলিল, 'মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ, এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তবে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।' সুদর্শনা বলিল, 'যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব, তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। যখন রানী ছিলুম, কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ সুখের খবর কে জানত।' ঠাকুরদা বলিল, 'এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে রানীর বেশটা নিয়ে আসি।' সুদর্শনা উত্তর দিল, 'না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি, বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নিচে।'

তারপর, সেই অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে রানীর দেখা। রানী বলিল, 'আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।' রাজা বলিলেন, 'আমাকে সইতে পারবে?' রানী বলিল, 'পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও, প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।' রাজা বলিলেন, 'তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।' সুদর্শনা বলিল, 'যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।' তখন রাজা বলিলেন, 'আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এবার আমার সঙ্গে এসো,

বাইরে চলে এসো—আলোয়।' রানীর শেষ কথা—'যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।' এইখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

এখন এই আখ্যানভাগের মধ্যে কি ভাবে তত্ত্বস্তু সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে দেখা যাক্।

প্রথমে, ভগবান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা, মানবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ ও তাঁহার ভগবদুপলব্ধির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-চেতনা বা ধর্মবোধ কোনো বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মতবাদ হইতে উদ্ভূত নয়। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক হইলেও ব্রাহ্মসমাজের সুনির্দিষ্ট ধর্মমত, অনুশাসন, উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। "আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই" (জীবনস্মৃতি)। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ বা ঈশ্বরানুভূতি তাঁহার জীবনের মধ্য হইতেই একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার পরিচয় নানা উপকরণ লইয়া তাঁহার সুবিপুল সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। এই ঈশ্বরানুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, উহার মূলভিত্তি উপনিষদের মধ্যে। উপনিষদের কতকগুলি শ্লোকের যে-মর্ম কবির সমুন্নত কল্পনায় ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, রস-চেতন, সৃষ্টিকুশলী মনে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনার রূপ। তাহার সহিত বৈষ্ণবধর্মের মূর্তি-নিরপেক্ষ লীলাবাদ আসিয়া মিশিয়াছে, বৈষ্ণব-প্রেমতত্ত্বেরও প্রভাব পড়িয়াছে। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের ভাবধারাও তাঁহার এই অনুভূতিকে পুষ্ট করিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট ভগবদনুভূতির রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। 'শান্তিনিকেতন', 'আত্মপরিচয়', 'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'মানুষের ধর্ম', প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নানা প্রবন্ধের মধ্যে, 'নৈবেদ্য', 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, 'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায়, 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' প্রভৃতি গদ্যকবিতাগ্রন্থে ও শেষজীবনের কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির স্বরূপ, মানুষ ও ভগবানের সম্বন্ধ, সৃষ্টি ও ভগবানের, ব্যক্ত ও অব্যক্তের লীলাতত্ত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা, সংকেত, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, আভাস নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহা জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমে সমুজ্জ্বল এক অপূর্ব ঈশ্বরানুভূতি। জগৎ-ব্যাপারের বিচিত্র বাস্তব ধারা ও বিভিন্ন কর্ম ও চিন্তা এবং প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও নিয়মকে স্বীকার করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি, দর্শনের যুক্তিবাদ, ইহাদিগকে গভীর অনু-ভূতি ও কবি-শিল্পীর হৃদয়-রস দিয়া সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, সম্মিলিত, এবং জারিত করিয়া এক অপূর্ব অধ্যাত্মবাদ ও জীবনদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। ইহাতে জগৎ ও ব্রহ্ম, অদ্বৈত ও দ্বৈত, বিশেষ ও নির্বিশেষ, বিজ্ঞান ও ধর্ম, বাস্তব-চেতনা ও অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম, অনিত্য ও নিত্য, ইহকাল ও পরকাল একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া আছে।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এক ছিলেন—বহু হইলেন—'একোঽহং, বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' । এই এক, অনন্ত, অসীম, নির্বিশেষ 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' নিজেকে প্রকাশ করিলেন সৃষ্টিতে বহুভাবে। তিনি কেবল সত্য নন, জ্ঞান নন, বিশেষ করিয়া তিনি আনন্দ। একাধারে সচ্চিদানন্দ। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' তাহা হইলে এই সৃষ্টি আনন্দরূপ—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবের

মধ্যে সত্য ও জ্ঞানের প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া আছে আনন্দের প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি প্রকাশ পায় নিয়মে, আনন্দের মূর্তি সৌন্দর্যে; মানবের মধ্যে আনন্দের মূর্তি প্রকাশ পায় প্রেমে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের প্রেম মূল-আনন্দের রূপ।

অসীম ব্রহ্ম নিজেকে সীমাবন্ধ করিয়াছেন মানুষে—পরমাত্মার প্রকাশ হইয়াছে জীবাত্মায়। এই মানবাত্মাও অমৃত, আনন্দের অংশ। নিজের আনন্দাংশের সঙ্গেই নিজের লীলা। এই আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে। তাই পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার বিশেষ সম্বন্ধটি প্রেমের। এই প্রেমের দ্বারা নিত্যপ্রেম-স্বরূপের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম সার্থকতা।

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ভাষণগুলির মধ্যে কবি এই পরম রসময়ের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন নানাভাবে ব্যাখ্যায়, 'গীতাঞ্জলি'তে প্রকাশ করিয়াছেন গানের সুরে, এবং 'রাজা'য় রূপায়িত করিয়াছেন নাটকের মাধ্যমে।

> "যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ।...তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়া নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না—সেই স্বয়ম্ভু সেই স্বত-উৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূলে।
>
> এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যাঁর সঙ্গে যোগ হবে তাঁর মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।" (প্রেম, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮-২৯)

এই প্রেমের মধ্যেই ভগবান ও মানুষ উভয়েরই সার্থকতা। ভগবান মানুষের এই প্রেমের দ্বারাই নিজেকে আস্বাদন করিতেছেন, আবার মানুষ বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে প্রেমের অধিকার লাভ করিয়া জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা লাভ করিতেছে। উভয়েরই উভয়কে একান্ত প্রয়োজন।

> "প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে।... তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই।...দর্শনশাস্ত্রে একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে।...ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন। তা হলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তা হলে সৃষ্টি হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের প্রণয়বন্ধন। তাঁর এই ইচ্ছাকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, সএব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা। এত বড় আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না।...সীমা

একটি পরমাশ্চর্য রহস্য।...ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—সেই পরম-গৌরবের উপরই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি মেনে নিয়েছেন—নইলে আমরা আছি কি করে? মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্বজুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ভালো লাগার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? তিনি নানা দিক দিয়ে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজের চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দ বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।" (সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, ১ম, পৃঃ ৩২-৩৬)

তাই ভগবান ও মানুষের মধ্যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্য-সম্বন্ধটি হইতেছে প্রেমের। একে অন্যকে কামনা করিতেছে—দান-প্রতিদানের লীলা চলিয়াছে। রস-সম্ভোগের প্রকৃতি ও আস্বাদন অনুসারে এই প্রেমের নানা রূপ। পিতারূপে, মাতারূপে, দাস ও দাসীরূপে, সখা বা সখীরূপে, বধূ প্রণয়িনীরূপে আমরা ভগবানের প্রেম-রস আস্বাদন করিতে পারি। মানবিক ভিত্তিভূমি হইতে মানবীয় রসের মধ্য দিয়া এই আস্বাদন, এই উপলব্ধি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও একান্ত কাম্য।

'রাজা' নাটকের রাজা ভগবান, বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সুদর্শনা মানবাত্মা বা জীবাত্মা। সুদর্শনার সহিত রাজার সম্বন্ধটি বধূর সম্বন্ধ। প্রেমের এই বিশিষ্ট রস-রূপের মধ্য দিয়াই তাহার উপলব্ধি অগ্রসর হইয়াছে, প্রেমের সাধনা চলিয়াছে। সুরঙ্গমা দাসীরূপে ভগবানকে লাভ করিয়াছে, ঠাকুরদা লাভ করিয়াছে বন্ধুভাবে। ইহারা উভয়েই ভগবানের প্রেম লাভ করিয়াছে এবং নিজের প্রেমও ভগবানকে নিবেদন করিয়াছে। ভগবানের প্রেমের স্বরূপ ইহারা বুঝিয়াছে এবং এই প্রেমলীলায় ইহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের জীবনে এই দান-প্রতিদানের উৎসব চলিয়াছে। এদিক দিয়া ইহারা সিদ্ধ প্রেম-সাধক। কিন্তু রানী সুদর্শনা প্রেমসাধনায় এখনো সিদ্ধ হইতে পারে নাই, দান-প্রতিদানের লীলাটি এখনো তাহার সহজ ও সার্থক হয় নাই। জীবনের প্রথম হইতেই বিবাহ দ্বারা ভগবানেও পতিত্ব-জ্ঞান তাহার হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রেমের সাধনায় ও নৈপুণ্যে এবং লীলারহস্য-জ্ঞানে তাহার সাফল্য আসে নাই। সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, ত্যাগে-ঐশ্বর্যে যে পতিপ্রেম অবিচল, জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে নব নব রূপে ও রসে যাহার অনির্বচনীয় আস্বাদন করা যায়, সেই পরম রমণীয় প্রেমোপলব্ধিতে তাহার সার্থকতা আসে নাই। আর এক ব্যক্তি কাঞ্চীর রাজা। সে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, সে অবিশ্বাসী, নাস্তিক। রাজাকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা ও তাঁহার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায় সুদর্শনার যে বাধা-বিঘ্ন, যে দ্বিধাসন্দেহ, যে দুঃখবেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনীই এই নাটকের ভিত্তি। ইহার সঙ্গে এক অংশে জড়িত আছে নাস্তিক কাঞ্চীরাজের পরিবর্তন ও ভগবানে আত্মসমর্পণ। তাই 'রাজা' নাটককে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—the 'inner drama' of 'human soul'.

প্রথমেই দেখি রাজার বাল্যবিবাহিতা পত্নী সুদর্শনা এক অন্ধকার ঘরে অবস্থান করিতেছে। সুদর্শনা বলিতেছে, 'আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই, তখন আমার

জ্ঞান ছিল না...ঘোমটার ভিতর থেকে ভাল করে দেখতেই পাইনি।' মানবাত্মার সঙ্গে ভগবানের যে এই পরিণয়-সম্বন্ধ তাহা সৃষ্টির আদি হইতে বর্তমান। পরমাত্মার আনন্দই তো রূপ লইয়াছে মানবাত্মায়। তাঁহার সার্থকতাই এই মানবাত্মার প্রেমে। মানবাত্মার কুঞ্জবনে প্রেমের লীলা করিবার জন্যই তাহাকে নিজ অংশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তো গোড়া হইতেই অচ্ছেদ্য।

"পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন, তার সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো-কিছু বাকি নেই, কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে এই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে! বলা হয়ে গেছেঃ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি 'অস্য' 'এষঃ' হয়ে আছেন। তিনি 'এর' 'এই' হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ
এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমোলোকঃ
এষোঽস্য পরম আনন্দঃ

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথাই নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা।" (পরিণয়, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮)

মানবাত্মা তাই ভগবানের বালিকাবধূ। 'এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকা-বধূ।' এখন সুদর্শনার সহিত প্রেমের লীলা চলিবে। তাহাকে স্বামীর স্বরূপ বুঝিতে হইবে, স্বামীকে একান্তভাবে আত্মদান করিতে হইবে, এ-সংসারকে স্বামীর সংসার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, দাম্পত্যজীবনের অনির্বচনীয় রস আস্বাদন করিতে হইবে, ঘোমটা খুলিয়া প্রিয়তমকে দেখিতে হইবে—তাহার সংকেত, ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। এই উদ্ভিন্নযৌবনা, স্বামিসঙ্গ-পিপাসু সুদর্শনার প্রণয়-জীবনের আরম্ভে তাহার অন্তরতম জীবনের কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব দিয়াই এই নাটকের আরম্ভ। সেটি কি? একটি রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া চোখ দিয়া রাজাকে দেখিবার তাহার কামনা। যেখানে 'আমি গাছপালা পশু-পাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।' অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্বামী-মিলনের কোন সার্থকতাই সে পায় না, বাইরের আলোয় হাজার জিনিসের মধ্যে মূর্তিতে স্বামীকে পাইবার তাহার কামনা। অন্ধকার ঘরের নিভৃত, নির্জন মিলনে সে তৃপ্ত নয়।

অন্ধকার ঘর মানুষের অন্তরের গভীর গোপনতল। এই স্থানই আত্মার নিভৃত নিকেতন। সেই নিভৃত অন্ধকার গুহার মধ্যে মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিরন্তর প্রেম-মিলন। এই অন্তরাত্মার নিভৃত নিবাসে চরম সত্যকে, পরম প্রেমময়কে উপলব্ধি করার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের মতে মানবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা।

"সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব? তাকে জানব কোনখানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা

এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন, সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও! তা হইলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে।" (নিজধাম, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩)

মানবের দুর্গম রহস্যময় স্থানই তাহার অন্তরাত্মার নিবাস। মানুষের অন্তরতম সত্তা যেমন গোপন, গভীর, দুর্গম, গুপ্ত, বিশ্বাত্মাও সেইরূপ গভীর ও গুপ্ত; তাই উভয়ের মিলন বাহিরের আলোকোজ্জ্বল প্রত্যক্ষের সীমানা হইতে ঊর্ধ্বে, অগোচরতা ও গভীরতার রহস্যময় অন্ধকারে।

"উপনিষৎ তাঁকে বলেছেনঃ গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং। অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর।...মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত, সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি; সেই গুহালোকই তার লোক।" (গুহাহিত, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭১)

সুদর্শনা রাজার প্রেমোপলব্ধি তাহার নির্দিষ্ট স্থানে করিতে চাহে নাই! অন্ধকার ঘরের সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করে নাই, ইহার তাৎপর্য সে বোঝে নাই। বাইরের প্রত্যক্ষ-গোচরতার মধ্যে একটি সুন্দর রূপে সে রাজাকে রূপায়িত দেখিতে চাহিয়াছে। ইহা তাহার মোহগ্রস্ত অবস্থা। এই প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র লালসা তাহার নির্মল আত্মার মালিন্যের, তাহার পাপের, তাহার অহং-এর অভিব্যক্তি। এই রূপতৃষ্ণা, এই সৌন্দর্যস্পৃহা তাহার সাধনার প্রথম বিঘ্নরূপে সমুপস্থিত।

ভগবান কোনো নির্দিষ্ট রূপে আবদ্ধ নন—বহু রূপে প্রকাশিত। বহু রূপে প্রকাশিত হইয়াও তিনি নির্দিষ্ট রূপহীন। রূপ গতিশীল অনিত্য; ভগবান স্থিতিশীল, নিত্য; ভগবান নিজেকে একটিমাত্র রূপে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলেন নাই। অনাদি-কাল হইতে সৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি নব নব প্রকাশের লীলা করিতেছেন। অফুরন্ত চলিয়াছে তাঁহার নব নব রূপের প্রবাহ, শতধারে উৎসারিত হইতেছে বিচিত্র সৌন্দর্য। সমস্ত রূপের মধ্যে থাকিয়াও তিনি রূপাতীত। এই অনন্ত গতির মধ্যেই অনন্ত স্থিতি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন।

"বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চির-পরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারা-প্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনই আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পূজা করি, তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরম সত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই—রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।"

"আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকে চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সব নামরূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি

ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্তকালের জন্য স্থান পাইত না...সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা; সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না;"

(রূপ ও অরূপ, সঞ্চয়, পৃঃ ১১-১৬)

ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনায় রূপ-সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান অনন্তরূপ হইলেও অরূপ। জল-স্থল-আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া সর্বত্র বিরাজমান তাঁহার আনন্দরূপ—তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য। সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য রূপের ধারা অনাদি কাল হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে—এ-রূপের খেলার আর অন্ত নাই। সেই অপরূপ অরূপ অনন্তরূপকে তাঁহার রূপের বিচিত্র লীলার মধ্যেই আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্তরের গভীরতম আনন্দের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, একটা নির্দিষ্ট রূপে ও খণ্ড-রসে নয়। তাই কবি 'রূপসাগরে ডুব' দিয়াছেন 'অরূপ-রতন আশা করি'; 'নব নব রূপে', 'গন্ধে বরণে গানে' ভগবানকে 'প্রাণে' আসিতে আহ্বান করিয়াছেন; তাই 'শিউলি-তলার পাশে পাশে, ঝরাফুলের রাশে রাশে, শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে' 'অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে' তাঁহার 'ভুবন-ভুলানো' আসিয়াছেন। 'কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে' অরূপ তাঁহার হৃদয়ে 'রূপের লীলা' করিয়াছেন।

"সুদর্শনা—তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন?

রাজা—আলোয় তুমি হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন।

সুদর্শনা—সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না?

রাজা—কে বললে দেখতে পায়! মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি।

সুদর্শনা—তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা—সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।

সুদর্শনা—সহ্য হবে না—তুমি বল কী! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে, তখন আমার এমনি মনে হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ওই সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিশে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না এ কী কথা।

রাজা—আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না?

সুদর্শনা—একরকম করে আসে বই কি। নইলে বাঁচব কি করে।

রাজা—কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা—সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষপ্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি ঐ রকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি

হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্কা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক-দূরের জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে; আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার সবকটি বীণার তার উতলা।

রাজা—এত বিচিত্ররূপে দেখছ তবে সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা—মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা—মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।"

এই-যে সুদর্শনা প্রকৃতিব ঘূর্ণায়মান ঋতু-মঞ্চে বিচিত্র-রূপের মধ্যে পরমসুন্দর রাজাকে দেখিতেছে, সে মোহমুক্ত, মালিন্যহীন, অপাপবিদ্ধ আদি সুদর্শনা। ইহাই মানবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। সে পরমসুন্দরের বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দরূপে পুলকিত, বিস্মিত ও তৃপ্ত। বিশ্ব-বীণাকারের রম্যবীণার তানে তাহার অন্তরতম সত্তা ঝংকৃত হইতেছিল। নিবিড় আনন্দের স্পর্শে সমস্ত অঙ্গ শিহরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাই নয়, সে মনে করিয়াছিল, তাহার পরম-প্রিয়তম পথিক-বন্ধুর সহিত জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহার প্রেমে একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে, কিংবা তাঁহার সহিত এক জীবন হইতে জীবনান্তরে যাইয়া নব নব আনন্দ-চেতনার আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিবে। কিন্তু যখনই এই সর্বব্যাপী আনন্দ-রসকে ছাড়িয়া সংকীর্ণ রূপসম্ভোগতৃষ্ণায় সে কাতর হইল, তখনই তাহার নির্মল স্বরূপ আবৃত হইল, তাহাকে পাপ স্পর্শ করিল, সে সুন্দর রূপভোগের লালসায় রাজাকে একটা বিশিষ্ট মূর্তিতে দেখিতে চাহিল। পাপ কি? রবীন্দ্রনাথের মতে অনন্ত আনন্দস্বরূপের সঙ্গে চরম মিলনের ও পরম প্রেমের পথে যে বাধা তাহাই পাপ। ভোগলিপ্সাই এই বাধা। সুতরাং ইহাই পাপ। এই পাপের তাড়নায় সে আঁধার ঘর ছাড়িয়া রাজাকে বাহিরে দেখিতে চাহিল।

বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে রাজা সুদর্শনাকে দেখা দিবেন বলিলেন। কিন্তু সুদর্শনাকে চিনিয়া লইতে হইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দিবে না, চিনাইয়া দিবে না রাজা কে।—

রাজা—রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা—কোথায় দেখবেন?

রাজা—যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

কিন্তু হায় সিদ্ধসাধিকা সুরঙ্গমা জানে, রাজা কখনো একটা নির্দিষ্ট মূর্তি ধরিয়া

দেখা দিবেন না। সে যে 'চপল-আঁখি বনের পাখি বনে পালায়', 'তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগল প্রায়'; 'হৃদয়-মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি', 'তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি'। উৎসব-পতি তো বসন্তের 'ফুলের বাসে সুখের হাসি', 'দখিন বায়ে' হৃদয়ের দ্বারে আসিবেন, চোখের সামনে কোনো মূর্তি ধরিয়া নয়। তাই সুরঙ্গমা বলিতেছে, "রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।"

মানুষ ও ভগবানের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য প্রেম-সম্বন্ধটি রাজার কথায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে,—

সুদর্শনা—আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা—পাই বই কি।

সুদর্শনা—কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ?

রাজা—দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কতো নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সুদর্শনা—আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাইনে।

রাজা—নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

মানুষের অন্তরাত্মায় আনন্দস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ, নিজেরই আনন্দ-অংশ ভগবান প্রেমরসাস্বাদনের জন্য পৃথক করিয়াছেন। তাই মানুষকে তাঁহার একান্ত প্রয়োজন—তাহাকে না হইলে তাঁহার প্রেমলীলাই হইবে না। সে-ই তো তাঁহার প্রেমের ধারক ও বাহক—তাঁহার অনন্ত প্রেম-কাব্যের নায়িকা। তাহাকে ঘিরিয়াই তো তাঁহার মিলন-বিরহের প্রেমসংগীত নানা সুরে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে। প্রেমের এই দুর্লভ অধিকার তিনিই মানুষকে দিয়াছেন। অনাদি কাল হইতে এই আমি-তুমির লীলা আরম্ভ হইয়াছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যেও ইহা প্রসারিত হইবে। বিশ্বপ্রকৃতির কতো সৌন্দর্য, কতো সংগীত এই প্রেমলীলার পুষ্টি-সাধন করিয়াছে। 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-যুগে এই ভাব তাঁহার বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। 'বলাকা'তেও গুটি-কয়েক এইরূপ কবিতা আছে। কবির শেষজীবনের কাব্যেও এইভাবের দু'চারিটি কবিতা আছে।—

"জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,...
কত যুগে যুগে, কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে,
অমৃতের রসবরষণ।" (গীতাঞ্জলি)

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।" (গীতাঞ্জলি)

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।" (গীতাঞ্জলি)

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,
তুমি তাই এসেছ নিচে—
আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।" (গীতাঞ্জলি)

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।" (গীতাঞ্জলি)

"আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিলো কায়া।
বিরহ-গান উঠলো বেজে
বিশ্বগগনময়
কত রঙের কান্নাহাসি
কত আশা ভয়।...
আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা,
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।" (গীতিমাল্য)

"তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।" (গীতিমাল্য)

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে ত হয়নি তোমার দেখা।...
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুট্‌ল আলোয় আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।...

আমি এলেম তাইত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।" (বলাকা)

"জীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোম্‌টা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ-আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি ক'রে পাপ্‌ড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।" ইত্যাদি (বলাকা)

তারপর বসন্তোৎসবে সমবেত রাজাদের মধ্যে সুদর্শনা রাজার ছদ্মবেশী, অত্যন্ত সুশ্রীদর্শন সুবর্ণকে দেখিয়া তাহাকেই রাজা বলিয়া মনে করিল। সৌন্দর্য-উপভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাহার দেহ-মন তরঙ্গায়িত।—

'ওই মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে।'

'আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারিদিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।'

রূপমুগ্ধা রানী রাজাকে প্রত্যক্ষ অভিনন্দনস্বরূপ পদ্মপাতায় করিয়া ফুল পাঠাইলে রাজবেশী তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না, কাঞ্চীরাজ বুঝিতে পারিয়া সুবর্ণের গলা হইতে মোতির মালা খুলিয়া রানীকে পাঠাইয়া দিল। ইহাতে রানীর অভিমানে দারুণ আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু এই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার কাঁটাকে স্বীকার করিয়াও সে-মালা রানী গলায় পরিল।

'আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছিনে...এযে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে তবু ত্যাগ করতে পারলুম না।'

রূপভোগতৃষ্ণা ক্রমেই প্রবল হইতেছে।

তারপর প্রমোদোদ্যানে অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে রানী জানিল যে, সুবর্ণ আসল রাজা নয় এবং সেই সঙ্গেই নিজের স্বামী আসল রাজার ভয়ংকর কালো মূর্তি দেখিল। তখন রানীর মনে প্রবল দ্বন্দ্ব—একদিকে সুন্দর পরপুরুষের প্রতি আসক্তি, অন্যদিকে কুরূপ, ভয়ংকর কালো, অথচ প্রেমময় স্বামীকে ভালোবাসিতে না পারায় নিজেকে অসতী ও অশুচি-বোধ। একদিকে পাপের দারুণ অগ্নি-জ্বালা ও লজ্জা, অন্যদিকে রূপের প্রতি তীব্র নেশা। শেষে রূপতৃষ্ণা—সৌন্দর্যভোগাকাঙ্ক্ষারই জয় হইল। রূপের নেশায় পাগল হইয়া, স্বামীর ভালো-বাসা উপেক্ষা করিয়া সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিল। তাহার ভালোবাসা যে রূপের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কুরূপ স্বামীকে যে সে কখনই ভালোবাসিতে পারিবে না, তাই রাজার সঙ্গ তাহার পক্ষে অর্থহীন ও গ্লানিকর।

সুদর্শনা—তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা—আমি আর এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা—ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা—কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তো ত্যাগ করতে পারলুম না।...

আমার পাপিষ্ঠ মন বললে, ওই হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম।

রাজা—তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে। কেমন দেখলে রানী?

সুদর্শনা—ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো।

রাজা—আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে-লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা—কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারিনে।

রাজা—হবে রানী হবে। যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।

সুদর্শনা—হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালোবাসায় কি হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।... কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি—তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা—তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্বুদের মতো শূন্য।

সুদর্শনা—তা হোক কিন্তু আমি পারছিনে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছিনে! আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সুদর্শনা রাজার ভীষণমূর্তি সহ্য করিতে পারিল না। পাপ যখন মানুষের অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, যখন অনন্ত সৌন্দর্যময় ও প্রেমময়ের সঙ্গে মানুষের সহজ ও স্বচ্ছন্দ মিলনে বাধা উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রেমময় ভীষণরূপে আবির্ভূত হইয়া নিদারুণ আঘাতে তাহার প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে সত্যের মধ্যে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন। রুদ্রমূর্তিতে তখন তিনি আবির্ভূত হইয়া প্রচণ্ড তাপে সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত করেন। যে-সৌন্দর্যলিপ্সা সুদর্শনাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহা অসত্য, অন্ধ ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে তাহা উপজাত, তাহা পরমসুন্দরকে ছাড়িয়া অসার, মেকী সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই ধূমকেতুর মত করাল মূর্তিতে তাঁহার আবির্ভাব। তাই ভীষণ আঘাতে সুদর্শনার মোহভঙ্গ করিয়া, রিপুতাড়িত সংকীর্ণ সৌন্দর্যভোগের লালসা ধূলি-সাৎ করিয়া জগৎ ও জীবনের মধ্যে পরম সুন্দরকে সার্থকভাবে দেখিবার মনোবৃত্তি গঠন করিবার প্রয়াস। সুদর্শনা যখন বুঝিবে পরমভয়ংকর, তিনিই পরমসুন্দর, তখনই তাহার সাধনা সফল হইবে। সুরঙ্গমা ইহা বুঝিয়াছিল।—

"আমাদের জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব, ভীষণকে সুন্দর বলে জানব, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' যিনি তাঁকে, ভয়ে নয়, আনন্দে

অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয়-অপ্রিয় সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই ভূমার মধ্যে অখণ্ড ক'রে, এক ক'রে, সুন্দর ক'রে দেখব। যিনি 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙ্গাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব—নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে; তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভবুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে; সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যযুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলাম, সুন্দরকে জানার জন্য কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার; প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা।" (সুন্দর, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-৩৮)

সুবর্ণের মালা যে রাজার—একথার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত সৌন্দর্যের মূলউৎসই সেই পরম সুন্দর, জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁহার প্রতিবিম্ব। সে সৌন্দর্যকে ভোগলোলুপ দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে হয় সংকীর্ণ ও জ্বালাকর। ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দরসের মধ্যেই তাহার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি।

পিতৃগৃহে দাসীবৃত্তিতে সুদর্শনার আহত আত্ম-অভিমান রুদ্ধ সাপের মতো কেবলই গর্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

'এতো বড়ো রানীর পদ এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে? মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া? সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না?'

তাহার বিশ্বাস, তাহার রাজা তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিবেন, তাহার কাছে হার মানিবেন, কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। সৌন্দর্যলিপ্সা এখনো প্রবল।

'আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারিনি—ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। এতোবড়ো অপরাধ! এতোবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম।'

যখন শুনিল যে, সুবর্ণ নয়, কাঞ্চীরাজ আগুন লাগাইয়াছিল, তখন তাহার মনে একটা ধিক্কার আসিল।

'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই। অমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড় বঞ্চনা করেছি?'

'লজ্জা! লজ্জা!' কিন্তু ধিক্কার তাহার স্বামিত্যাগে নয়, সুবর্ণ সত্যসত্যই আগুন লাগাইলে তাহার জন্য এই ত্যাগ সার্থক হইত। সুবর্ণ যে সব দিয়া তাহার মনের মতো হইল

না, এই জন্যেই লজ্জা। তারপর যখনই শুনিল যে, কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সুবর্ণ আসিতেছে, তখনই বলিল,—'সে আমার বীর, আমার পরিত্রাণকর্তা'। এখনো রূপতৃষ্ণা এবং আত্ম-অভিমান বা অহংকার সুদর্শনার উপর সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে।

তারপর যখন সুদর্শনার জন্য সাত রাজার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল ও পিতার সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল, এবং প্রত্যক্ষ আকর্ষণের বস্তু সুবর্ণের পলায়নের কথা শুনিল, তখন যেন তাহার উদ্দাম প্রবৃত্তির তরঙ্গ স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। নির্মল আয়নায় কালির প্রলেপ যখন হাল্কা হইতে থাকে, তখনই মুখের আভাস পড়ে; নানা রিপুর টানা-টানির মধ্যে বিবেক একটু আত্মপ্রকাশের অবসর পায়। এই দুঃসময়ে একমাত্র-নির্ভর রাজার কথা তাহার মনে হইল। সে জানিত, অপরাধ তাঁহার কাছে কম হয় নাই, হয়তো তিনি আসিবেন না, তবুও আশা, যদি তিনি আসিয়া পিতাকে রক্ষা করেন। তারপর, পূর্বজীবনের ক্ষণিক স্মৃতি ক্ষীণ বেদনার তুলিকা তাহার মনের উপর বুলাইয়া দিল।—

সুদর্শনা—দেখ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানালার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

সুরঙ্গমা—তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

সুদর্শনা—সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাইনে।

সুরঙ্গমা—হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে আর বাজায়।

সুদর্শনা—তা হবে, কিন্তু আমার মনে পড়ে সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নিবানো বাসরঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যেতো।

পরমপ্রেমময় ভগবান তাঁহার একান্ত প্রিয় মানুষকে কোনো অবস্থাতেই তো পরিত্যাগ করেন না। যখন পাপের আঁধার-যবনিকা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ আনে, তখনও তিনি তাহাকে নিতান্ত আপনার জানিয়াই শুভবুদ্ধি-উন্মেষের চেষ্টা করেন। তাই গৃহত্যাগের সংকল্পে তিনি সুদর্শনাকে বলিয়াছিলেন,—'ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন।' রাজার পরিচয় যে ভালো জানে, সেই সুরঙ্গমা বলিয়াছিল,—'তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন।' সুদর্শনাকে রাজা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন বলিলে সুরঙ্গমা সুদর্শনাকে বলিয়াছিল,—'যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তা হলে তাঁকে আর দরকার নেই। তা হলে তিনিই নেই। তা হলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য—তার মধ্যে থেকে বীণা বাজেনি—কেউ ডাকেনি—সমস্ত বঞ্চনা।' ভগবানের প্রেমের বীণা তো নিরন্তর আমাদের অন্তরে অন্ধকার-কক্ষের বাতায়নের নীচে বাজিতেছে, উচ্ছ্বসিত সুরের লীলায় আমাদের হৃদয়-কক্ষ প্লাবিত ও লীলায়িত। কিন্তু পাপের কোলাহল ও ধোঁয়ায় যখন সে ঘর আচ্ছন্ন, বাতায়ন রুদ্ধ, তখন সে-সুর শোনা যায় না। যখন নেশার উন্মত্ততা কমিয়া আসে, তখন কান ধীরে ধীরে আবার শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইতে থাকে।

তারপর দূর হইতে স্বয়ংবর-সভায় সুবর্ণের প্রকৃত রূপ দেখিয়া তাহার রূপের নেশা ছুটিয়া গেল। দুঃস্বপ্ন কাটিল। গভীর আত্মগ্লানিতে তখন মন তাহার জর্জরিত। এখন

নিদারুণ অনুশোচনার পালা। অনুশোচনাতেই তো পাপের ক্ষয়। সুদর্শনার অন্তর্জীবনের মোড় ঘুরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার একমাত্র প্রিয়তম রাজা তাহার চিত্ত পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে অবিশ্বাসিনী হইয়াছে ভাবিয়া সুদর্শনা মর্মান্তিক বেদনায় স্বয়ংবর-সভায় আত্মহত্যা করিবার সংকল্প করিল।—

'রাজা, আমার রাজা। তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না। দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ-দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব--কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি, বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সে মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলেনি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তার দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু আসুক,—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর—তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে—সে তুমিই সে তুমি।'

সুদর্শনার সাধনার প্রথম স্তরটি অতিক্রান্ত হইল। এই দুঃখবেদনার মধ্য দিয়া সে প্রেমের স্বরূপ বুঝিল, তাহার প্রিয়তমকে আরো আঁকড়াইয়া ধরিল। এই বেদনার মধ্য দিয়া পরমপ্রিয়তম আরো বেশি নিকটে মানুষকে টানেন—আগুনের মধ্যে ফেলিয়া তাহার সমস্ত ময়লা পুড়াইয়া তাহাকে খাঁটি করিয়া গ্রহণ করেন। রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের একটি প্রধান সূত্রই এই দুঃখের জয়গান। দুঃখই আধ্যাত্মিক জীবনের পরমসহায়—পরমসম্পদ। মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে শ্রেয় হইতে ভ্রষ্ট হয়, পাপের কালিমায় তাহার নির্মল সত্তা আবৃত হয়, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ তখন ক্ষুদ্রকেই বৃহৎ বলিয়া মনে করে, অসত্যকেই সত্য বলিয়া ভুল করে, ভ্রান্তির নানা আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া নিজেকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করে, তারপর একদিন কঠিন আঘাতে তাহার মোহ দূর হয়, ভুল ভাঙে, তখন সত্যকে, শ্রেয়কে সে একান্তভাবে গ্রহণ করে। দুঃখই সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাধির পরমৌষধি, দুঃখই ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে পাইবার সোপান, দুঃখের এই কল্যাণশক্তির কথা কবি তাঁহার এই যুগের নানা কবিতায় অপূর্ব-সুন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।—

"এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।" (গীতাঞ্জলি)

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠবে।" (গীতিমাল্য)

"দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌লো,
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থামলো।" (গীতালি)

"আঘাত ক'রে নিলে জিনে
কাড়িলে মন দিনে দিনে
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুঃখে নিলেম চিনে।" (গীতালি)

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।" (গীতালি)

"দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।"...ইত্যাদি (গীতালি)

এই দুঃখের দান সুরঙ্গমা পাইয়াছে, ঠাকুরদাও পাইয়াছে, তাই তাহারা দুঃখ-রথের রথীকে চিনিয়াছে,—চিনিয়াছে যে—'ব্যথা-পথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুমি, কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো চিরজীবন ধ'রে।'

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি ত্যাগের দ্বারা তপ্ত হয়েই এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে বাধা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।" (আমার ধর্ম)

তারপর সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী রাজাদের পরাজিত করিয়া ও শাস্তি দিয়া সুদর্শনাকে ফেলিয়া রাজা চলিয়া গিয়াছেন—এ-সংবাদ সুদর্শনা শুনিল। সুদর্শনার জীবনে নূতন সূর্যোদয় হইয়াছে, তাহার বিপর্যয়-মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু মনের দিক্‌চক্রবালের একদিকে একটুখানি কালিমা তখনও লাগিয়া আছে। সেই তাহার রানীত্বের অহংকার—প্রিয়তমা পত্নীর নিজস্ব অভিমানটুকু—একটা স্বতন্ত্র আদরলাভের গৌরববোধ। রাজা নিজে আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন—এই তাহার আকাঙ্ক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভগবানের প্রতি মানুষের প্রেমের আদর্শটি হইতেছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—সমস্ত অহংকার, অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া। ভগবানের নিকট হইতে তাঁহার প্রেম আমরা অজস্র ধারায় লাভ করিতেছি, তেমনি আমাদিগকেও সমস্ত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। তখনই দান-প্রতিদান সমান হইয়া প্রেমের যথার্থ স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিবে—মিলন নিরন্তর ও সার্থক হইবে।—

সুদর্শনা—সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বলত আমার উপর রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই—সেই জন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ হচ্ছে।

সুরঙ্গমা—অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা—তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতেই মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা—সব ঘুচবে রানীমা। কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিবেদন করবার ইচ্ছা।

"ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—'আপনাকে দিতে হবে' বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে, সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানাপ্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন-কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি। যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তির দ্বারা, ক্ষমা দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা, তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনভাবে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব, আমরা যেন না বলি যে 'তাঁকে পাচ্ছিনে কেন', আমরা যেন বলতে পারি, 'তাঁকে দিচ্ছিনে কেন'। আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার যা আছে আমি সকল দিতে
পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
সুখ দুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো—তা হলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

(আত্মসমর্পণ, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২-৩৩)

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। তত্ত্বের দিক দিয়া পরমাত্মার যা স্বভাব, মানবাত্মারও তাই স্বভাব। উভয়েই আনন্দময়, উভয়েরই সম্বন্ধ বিশুদ্ধ প্রেমের মিলন, উভয়েরই আনন্দময় স্বরূপ-উপলব্ধি।। তবে মানবাত্মা কেন মোহগ্রস্ত হয়, কেন সে পাপে কলঙ্কিত হয়? কেনই বা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্যমিলনে বাধা উপস্থিত হয়, আর কেনই বা সে দুঃখবেদনা অনুভব করে? রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ হইতেছে মানবাত্মার

অহংকার, আত্মাভিমান বা অহংবোধ। এই অহংবোধ বিকৃত হইলেই আত্মার আনন্দময় সত্তা আবৃত হয়। অহং যখন তাহার উপকরণ কেবলি সঞ্চয় করে, কেবলি নেবার ধর্মই অনুসরণ করে, তখনি সে লোলুপতার দ্বারা ভয়ংকর হইয়া ওঠে। অহং সঞ্চয় করিবে দান করিবার জন্য, তখনই আত্মা বন্ধ হইবে না, দানের দ্বারা সে মুক্ত হইবে। ঈশ্বরের আনন্দরূপ অমৃত-রূপ যেমন নিরন্তর বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত, আত্মাও তেমনি অহং-এর সমস্ত রচনা নিঃশেষে দান করিবে। এই দানের দ্বারাই তাহার যথার্থ প্রকাশ হইবে। আর একটি প্রশ্ন ওঠে, কেন ভগবান মানবাত্মার সঙ্গে এই অহংবোধ যুক্ত করিলেন, কেন এইরকম নিষ্পাপ স্কন্ধে ভয়ংকর সম্ভাবনাময় বস্তুটাকে চাপাইয়া দিলেন? ইহা ভগবানের লীলা। সীমার প্রধান শক্তিই তো অহং। এই অহং না হইলে সীমা কি ভাবে দান করিবে, সীমার সমস্ত দানের বস্তু যে অহংই সংগ্রহ করে। অহং না হইলে সীমা-অসীমের দান-প্রতিদানময় প্রেম-লীলাই তো চলে না। কিন্তু এই অহং যা-কিছু আহরণ করিবে, সঞ্চয় করিবে, সমস্তই সীমা অসীমকে দান করিবে, ইহাই তাহার সার্থকতা, না হইলে সে বন্ধ হইয়া পড়িবে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—

"আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কি? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কি? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয়, সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তা হলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি 'দেব' তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।"

"তবে অহং আছে কেন? তার একটি কারণ আছে। ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না—তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে। আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারি নে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে 'আমার' বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়। শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়; সে উপকরণকে বিশেষভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান ক'রে গ'ড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে

দেবে কী? অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার 'আমার' করে নেবার জন্যে এই অহংএর দরকার।...

ঈশ্বর ওইখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজী হয়েছেন। বাপ যেমন ছোট শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেলতে খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুস্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না... তা যদি না হন তবে তিনি যে খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, 'বাবা, কালসমুদ্রের উপর তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!'

এই যে তিনি 'আমার' বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্য কী? এর চরম উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম, অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম; আত্মার যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে আনন্দময় স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহংএর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

কিন্তু, অহংএর এই নেবার ধর্মটি যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময় স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।...

নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য, অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে ব'লেই। নিজের দিকে একবার টেনে আনবো বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বন্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।...অহংএর এই সমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বন্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ, এই বন্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বন্ধ নন, তিনি সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহংএর রচনা দ্বারা বন্ধ হবার জন্যে হয়নি—এই রচনাগুলির দ্বারাই সে মুক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে, কারণ সেগুলি সে দান করবে।" (স্বভাবকে লাভ, অহং, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০-৮৭)

তারপর সুদর্শনার অভিমান গলিয়া গেল। সে হাঁটিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রাত্রিতেই পথে বাহির হইল। এবার তাহার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।—

"সুদর্শনা—তার পণটাই রইল—পথে বের করে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ-গর্ব

ভাহা:. ...ড়ব না।

করে? রবীন্দ্র.

সুরঙ্গমা—কিন্তু সে-গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা—তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই।...তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেই রকম।

কাণ্ডী—মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা—না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে।...যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার এই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ সুখের খবর কে জানত।

ঠাকুরদা—একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা—না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদা—শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটেই আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা—শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।"

এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ রবীন্দ্রনাথের মতে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম পরিণতি। একেবারে সকল অহংকার-বিমুক্ত, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তবেই তাঁহাকে লাভ করা যাইবে—তবেই আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণ হইবে, সমাপ্ত হইবে।

"তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা...এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের নীচে গিয়ে বসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃতফল-ভারে সার্থক হোক। সর্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ওই একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা কোরো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ। যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হারজিত, তোমার সুখদুঃখ, ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে, তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে,

কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেকটি তরঙ্গ কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটির প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।"

(শক্ত ও সহজ, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬)

কবির এ-যুগের অনেক কবিতায়ও এই ভাবটি ফুটিয়াছে,—

"আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ।...
আমি তোমার যাত্রীদলের রবো পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নিচে।" (গীতাঞ্জলি)

"একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।"...ইত্যাদি (গীতাঞ্জলি)

এইবার সুদর্শনার পথে বাহির হওয়া। এই পথ বিশ্বের পথ। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া সর্বত্র আনন্দরূপকে উপলব্ধির পথ। এই বিশ্বানুভূতি, এই বিশ্ব-বোধ—সর্বভূতকে আত্মায় এবং আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ স্তর। আত্মসমর্পণের পরে এই বোধের উদ্ভবেই সাধনার পরিসমাপ্তি। এই বিশ্বব্যাপী অখণ্ড পরমানন্দময় রসকে বিচিত্রভাবে সৃষ্টির মধ্যে এবং হৃদয়ের গোপনতলে,—বাহিরে এবং ভিতরে সমানভাবে উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের মতে ঈশ্বর-সাধনার চরম আদর্শ। এই পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হইলেই আমাদের মুক্তি।

"বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে, সেই জন্য রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি। সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।" (মুক্তি, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭)

সুদর্শনা এই উপলব্ধির পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের ধূলিতেই আজ তাহার আনন্দের স্পর্শ—প্রেমের স্পর্শ। তাই সুদর্শনা বলিতেছে—'আজ আমার ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলোমাটিতেই মিলন হচ্ছে...আজকের দিনের অভিসারে সেই ধূলোই যে আমার অঙ্গরাগ।' আজ নিখিল বিশ্বেই তাহার প্রেমময়ের স্পর্শ—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ভালো, মন্দ, সকল রূপই আনন্দরূপ। যাঁহাকে সুদর্শনা হৃদয়ের মধ্যে একান্তভাবে পাইয়াছিল, সেই হৃদয়েশ্বরকে আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখিতেছি। এই বিশ্বরূপে না পাইলে একরূপে পাওয়াতে চরম সার্থকতা নাই। ভিতর ও বাহিরের মিলন হওয়া চাই।

সাধকের এই আকাঙ্ক্ষাটি এই যুগের কয়েকটি কবিতায়ও প্রকাশ পাইয়াছে,—

"যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে
সেইখনে হৃদয়ে পাব হৃদয়রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল
তারি 'পরে বিশ্বকমল
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে।" (গীতাঞ্জলি)

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে.
নয়কো আমার আপন মনে
সবায় যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।"...ইত্যাদি (গীতাঞ্জলি)

আর অন্ধকার ঘরের সাধনায় সুদর্শনার প্রয়োজন নাই। তাহার রাজার স্বরূপ সে ভালোরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। এখন আর একটি নির্দিষ্টরূপে সে তাহার প্রিয়তমকে দেখিতে চাহিবে না, কোনো রূপতৃষ্ণা তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবে না, কোনো পাপ স্পর্শ করিবে না, কোনো অহংকারের ভূত ঘাড়ে চাপিবে না, কোনো দুঃখবেদনা, অনুশোচনা ক্লিষ্ট করিবে না। সকল রূপ, সমস্ত সৌন্দর্যের চাবিকাঠিটি তাহার হস্তগত হইয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে অরূপ বিশ্বরূপের দর্শন তাহার হইয়া গিয়াছে। সাধনায় সে সিদ্ধ হইয়াছে। তাই রাজা বলিতেছেন,—'আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এসো এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।'

মানবাত্মার সাধনার এই বিচিত্রস্তর-সমন্বিত কাহিনী 'রাজা' নাটকের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু। স্তরগুলি এইভাবে নির্দেশ করা যায়,—

(১) অরূপ জীবন-স্বামীর সহিত তাহার নিভৃত হৃদয়ের মধ্যে মিলন।

(২) স্বামীকে নির্দিষ্টরূপে বাহিরে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, এই স্থানেই দ্বন্দ্ব বা বিরোধের বীজ-বপন।

(৩) বসন্তোৎসবে অত্যন্ত সুরূপ, রাজার ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে দেখিয়া রাজা বলিয়া ভ্রম। তাহার সৌন্দর্যে উন্মত্ত হওয়া ও পদ্মপাতায় ফুল পাঠাইয়া প্রেম-নিবেদন ও তাহার মালা-গ্রহণ। রূপতৃষ্ণা ও সৌন্দর্যভোগাকাঙ্ক্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে বিরোধের পুষ্টিসাধন।

(৪) বাগানে আগুন লাগা, নিজের স্বামীর ভীষণ কালো মূর্তি-দর্শন, সুন্দর পরপুরুষের প্রতি আসক্তির অপরিহার্য লজ্জা ও জ্বালা, অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণায় স্বামিত্যাগ ও পিতৃগৃহে গমন, সাত রাজার লালসার ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তীব্র অশান্তি-অনুভব। রূপতৃষ্ণা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার অনিবার্য পরিণাম। এইখানেই বিরোধের চরম পরিণতি।

(৫) আসক্তির পাত্রের প্রকৃত রূপদর্শনে ভুল ভাঙা। আপন স্বামীর প্রতি পুনরায় প্রেমের উদ্ভব। তীব্র অনুশোচনা ও আত্মহত্যার সংকল্প। পাপের ক্ষয় ও নিজ স্বামীর প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধি। এই স্থানেই বিরোধের পতন।

(৬) প্রকৃতিস্থ হওয়া ও নিজ স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ। বিরোধ বিলুপ্ত।

(৭) পথে বাহির হওয়া ও স্বামীর যথার্থ স্বরূপ-উপলব্ধি ও পুনর্মিলন। অরূপ জীবনস্বামীকে বিশ্বরূপের মধ্যে উপলব্ধির চরম আনন্দ। এইখানেই নাটকের শেষ।

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানেই সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া

আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

(অরূপ রতনের ভূমিকা)

এইবার নাটকের কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

একটি আখ্যানের মধ্যে তত্ত্বকে এমন সার্থক, সুন্দর ও অব্যর্থভাবে রসরূপে রূপায়িত করা রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রূপক-সাংকেতিক নাটকে দেখা যায় না। এই নাটকে সাংকেতিক নাট্যের চরম শিল্পকৌশল প্রদর্শন করা হইয়াছে। কস্তুরীপূর্ণ পাত্র হইতে অদৃশ্য সুগন্ধ উত্থিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করে, সুগন্ধি ফুলের মধ্য হইতে অদৃশ্য পুষ্পসৌরভ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে, তখন আমরা যেমন সেই সুরভিত আবহাওয়ায় এমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠি যে, সেই গন্ধের আধার স্থূল, দৃশ্যমান পাত্রের কথা বা ফুলের কথা আর মনে থাকে না, এই নাটকের মধ্য হইতেও সেইরূপ অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির যে সৌরভ উত্থিত হইতেছে, তাহাতেই আমাদের মনপ্রাণ মোহিত হইয়া এক দূর ভাবালোকে আনন্দ ও বিস্ময়ের মধ্যে বিচরণ করে, আধারের কথা আমরা ভুলিয়া যাই; অথচ আধার স্পষ্ট, স্থূলরূপে, সুদৃশ্যভাবেই বিরাজ করিতেছে। এই সুগন্ধি আবহাওয়া কেবল বাতাসেই সৃষ্ট হয় নাই, প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে, একটি সুসংবদ্ধ আখ্যানের মধ্য হইতেই উত্থিত হইতেছে। এই যে রূপ ও ভাবের অপূর্ব ও সার্থক মিশ্রণ, ইহাই সাংকেতিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপ। ইহার মধ্যে এমন একটা ছত্র নাই, যাহা অবান্তর বা অর্থহীন বা দুর্বোধ্য, পাত্রপাত্রীর সমস্ত উক্তি, দৃশ্য, নাট্যকারের মঞ্চনির্দেশ সমস্তই অব্যর্থভাবেই একটা সুসংগত ভাবের ইঙ্গিত বহন করিতেছে, অথচ বাহিরের দিক দিয়াও আখ্যানভাগের স্বাভাবিকত্ব, মনোহারিত্ব ও নাটকীয়ত্ব নষ্ট হয় নাই।

তত্ত্ব বাদ দিলেও সুদর্শনাকে আমরা একটি সাধারণ নারীরূপে দেখিতে পারি। সংসারের বহু নারীর জীবনেই তো এমনিতরো মোহের মেঘ ঘনীভূত হয়; আবার কাটিয়া যায়, ভুল ভাঙে, আবার নবজন্মের পরে নূতন জীবন আরম্ভ হয়, কখনো বা বজ্র মাথায় পড়িয়া দগ্ধ করে। সুদর্শনার অন্তর্জীবনের করুণ বিপ্লব, তাহার ব্যাকুলতা, স্বামিত্যাগের জন্য লজ্জা ও গ্লানি, পাণিপ্রার্থী রাজাদের উপদ্রব ও অসম্মাননা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক অভিমান, সর্বত্যাগী আত্মসমর্পণ ও শেষে একনিষ্ঠ গভীর প্রেমে স্বামী-নির্ভরতা প্রভৃতি যেন একটা বাস্তবের মায়া সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনোহরণ করে। তাহাকে যেন কোনো ভাবের সাংকেতিক মূর্তি বলিয়া মনে হয় না—সে যেন সজীব রক্তমাংসের নারী।

সমগ্র নাটকের মধ্যেও এই শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক পাত্রপাত্রী বাস্তব মাটিতে দাঁড়াইয়া চলাফেরা করিতেছে, কথাবার্তা বলিতেছে, অথচ তাহাদের স্বাভাবিক কথা-বার্তার মধ্য হইতে অন্তরালবর্তী অতীন্দ্রিয় ভাবের ইঙ্গিতটা বেশ সুস্পষ্টভাবে বাহির হইয়া আসিতেছে। উৎসবে সমাগত পথিকদল, নাগরিকদল পৃথক পৃথক মনোবৃত্তি ও চিন্তার পরিচয় দিতেছে, তাহাদের কথাবার্তা, সংশয়, কৌতূহল এক-একটি স্বতন্ত্র রূপে রূপায়িত হইয়াছে, কোথাও অস্বাভাবিকত্ব নাই, সবই স্বাভাবিকভাবে রাজার স্বরূপের ইঙ্গিত দিতেছে। এমন কি, দাসী রোহিণীকেও কবি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। অন্য দাসী সুরঙ্গমার প্রতি তাহার ঈর্ষা ও ইঙ্গিতটি কয়েকটি কথার মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে—'তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে-ই করিয়ে দেবে।'

সর্বোপরি রাজার চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের কলাকৌশল সর্বোচ্চ ধাপে উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে রাজা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে নাই, কোনো ঘটনায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই, অথচ তিনি সর্বত্র আছেন। সত্যই ভগবানের মতো অদৃশ্যে থাকিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাঁহার অদৃশ্য শক্তি সর্বত্র অনুভূত হইতেছে।

এই রাজাকে রাজ্যের মধ্যে দেখা যায় না বটে, কিন্তু এই বিশ্বরাজ্যে অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কার্য ঘটিতেছে। ভগবান এ-বিশ্বে সকলকেই স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধি-কার দিয়াছেন, কাহাকেও তিনি বাধা দেন না, নিষেধ করেন না। 'সে যে আমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছে', 'আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়।' 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' অথচ জগৎ-ব্যাপারে নিয়ম-শৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নাই। ভগবানের কাছে পৌঁছাইতে একটা বিশিষ্ট পথ নির্দিষ্ট হয় নাই। যে যে-ভাবে ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে চাহিবে, সে সেই ভাবেই পৌঁছাইতে পারিবে। "All roads lead to Rome." তাই রাজার রাজত্বে 'সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে।'

নাস্তিক কাঞ্চীরাজের চরিত্রটিও চমৎকার ফুটিয়াছে; বাহিরের কার্য ও ভাষণ আভ্যন্তরিক তাৎপর্যের সঙ্গে সুন্দর মিলিয়াছে। কাঞ্চীরাজ টাইপ-সিম্বল, প্রথমদিকে তাহার চরিত্রে রূপকের স্পর্শ আছে, শেষের দিকে সাংকেতিকতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

রাজা নাটকের যাহা বিষয়বস্তু, সেই রাজা ও সুদর্শনা—ভগবান ও মানুষ—পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিচিত্র বিরহ-মিলন-কাহিনী ও তাহার তাৎপর্য এবং মানুষের অধ্যাত্মসাধনার স্বরূপ প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচনা করা হইল। এখন প্রধান চরিত্রগুলির সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

সুদর্শনা পত্নীভাবে, সুরঙ্গমা দাসীভাবে, ঠাকুরদা বন্ধুভাবে এবং কাঞ্চীরাজ শত্রুভাবে রাজাকে ভজনা করিয়াছে। পাত্রপাত্রীগণের নানা ভাষণ হইতে ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু এই বিভিন্ন ভাবের ভজনার বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ কি নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে? সুরঙ্গমা রাজার দাসী, সুদর্শনার মধ্যেও পত্নীত্বের যে ভাব ছিল, তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়া অবশেষে সে দাসী সাজিল,—'বেঁচেছি, বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি সকলের নিচে।' 'আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।' ঠাকুরদা রাজার বন্ধু, একথা সুদর্শনা বলিয়াছেন, স্বয়ংবর-সভায় সে রাজার সেনা-পতিদের অন্যতম বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু রাজার বন্ধুত্বের কোনো বিশিষ্ট রূপে তাহার চরিত্রে ফোটে নাই, সুরঙ্গমাও যেমন রাজার প্রকৃতি সম্বন্ধে জানে, ঠাকুরদাও তাহাই

জানে। ইহা তাহারা সাধনা-সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানে। কিন্তু দাসীর সহিত বন্ধুর জ্ঞান-বিষয়ক বা আচরণগত বা হৃদয়গত কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। (সকলপ্রকার সাধনার মূলেই দেখা যায়, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, পত্নী, দাসী, বন্ধু সকলেই একস্থানে সমান হইয়া গিয়াছে।) সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের সাধনার বৈশিষ্ট্য নাটকের মধ্যে কোথাও পরিস্ফুট হইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

(বিভিন্ন প্রকারের রসের সাধনা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই সংস্কারটি গড়িয়া উঠিয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পঞ্চরসাশ্রয়-সাধনা-পদ্ধতি হইতে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া মানুষ ভগবানের সাধনা করিতে পারে, এই বিভিন্ন ভাবের সাধনার স্বরূপও ঐ ধর্মে নির্দিষ্ট আছে। এই মানবীয় রসের মধ্য দিয়াই ভগবানের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কবিমনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। বৈষ্ণবধর্ম 'প্রিয়েরে দেবতা করে, দেবতারে প্রিয়।' এই পঞ্চরসের সাধনার জ্ঞান কবি বৈষ্ণব-গীতিকাব্য হইতে পাইয়াছিলেন, ইহার কাব্যাংশ তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল, তত্ত্বাংশ নয়। বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বকে কবি গ্রহণ করেন নাই এবং এইপ্রকার রসাশ্রয়-সাধনার স্বরূপটি উপেক্ষা করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের ভগবান নির্দিষ্ট মূর্তিতে প্রকাশিত। সে অখিলরসামৃতমূর্তি দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। তাঁহার আর একটি মূর্তি আছে—চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি। শান্ত-রসের সাধকের নিকট তিনি ঐ বিভূতিসম্পন্ন, ঐশ্বর্যময় মূর্তিতে প্রকাশিত। কিন্তু আর চারিটি রসের সাধকের কাছে তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই মূর্তিই তাঁহার মাধুর্যময় মূর্তি। পঞ্চভাবের মধ্যে মধুর ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ—এইখানেই তাঁহার স্বরূপশক্তির উচ্চতম স্তর হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ। এই শক্তি দ্বারাই তাঁহার অনন্ত আনন্দময় অংশের উপলব্ধি হয়। হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ প্রেমে। এই প্রেমের চরম মূর্তিমতী প্রকাশ শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকাই প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দরস আস্বাদন করান।—

> হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেমসার—ভাব;
> ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম—মহাভাব।
> মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী,
> সর্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

এই কান্তাভাবে প্রেম-সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিজেকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ রাধিকার মতো কান্তাভাবে ভগবানকে ভজনা করিতে পারে। একমাত্র পুরুষ সেই পুরুষোত্তম—কান্তাভাবের উপাসক সবই নারী। এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে প্রেমলীলাই তাহাদের জীবনের চরম কাম্য। 'এই কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'।

তারপর ভগবানের দাস বা দাসীভাবে, সখা বা সখীভাবে, পিতা বা মাতাভাবে সাধনাও বৈষ্ণবসাধন-পদ্ধতি-সম্মত।

কিন্তু এই বৈষ্ণবভাব-সাধনার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ভাবসাধক ভগবানকে সেই ভাবের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াই দেখিবে। মধুরভাব-সাধক ভগবানকে একান্তভাবে তাহার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান আসিতে পারিবে না। অসীম সীমা হইয়াই সীমার সহিত প্রেমলীলা করিবেন। বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্যভাব আসিতে

পারিবে না। ঐশ্বর্যভাব আসিলেই মাধুর্যভজনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে পরিপূর্ণ প্রেমাস্বাদন হইবে না।

ঐশ্বর্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত;
ঐশ্বর্যশিথিলপ্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন;
তার প্রেমবশে কভু না হই অধীন।
আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেইভাবে,
তারে সে-সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে।
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি,
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি;
আপনাকে বড় মানে আমারে সম-হীন;
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।
(ঐ—আদির চতুর্থ)

সুতরাং বৈষ্ণব-রস-সাধনায় আমরা সুদর্শনাকে মধুরভাবের উপাসক বলিতে পারি না। সুদর্শনার সহিত রাধিকার সাদৃশ্য আসিতে পারে না। সুদর্শনার পত্নীত্ব-অভিমান চূর্ণ হইয়াছে, সে দাসী হইয়াছে এবং শেষে পথে বাহির হইয়া বহুরূপে প্রকাশিত অরূপ স্বামীর মিলন-স্পর্শ পাইয়াছে। প্রথমে বিশিষ্টভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, শেষে জগদীশ্বর-জ্ঞানের মধ্যে তাহার প্রেমের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। রাধিকার প্রেমের যে-গৌরব বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখিতে পাই, সুদর্শনা তাহা পায় নাই, বরং সে-গৌরব বিলয়েরই চেষ্টা তাহাতে আছে।

রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য—নট,
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।...
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন;
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
মোর গীত-বংশীস্বরে আকর্ষে ভুবন;
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।...
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস;
রাধার অধররসে আমা করে বশ।...
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু। (ঐ—আদির চতুর্থ)

তারপর রাধিকা মান করিলে, তিনি পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছেন, শেষে মহারাসে শতকোটি গোপীর সঙ্গে নৃত্যবিলাসে যখন শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্তি দেখিলেন, দেখিলেন যে-কৃষ্ণ তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীর সঙ্গেও নৃত্য করিতেছেন, তখন রাধার প্রতি তাঁহার সাধারণ প্রেম দেখিয়া, রাধিকা মন্ডলী ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন। 'কৃষ্ণ নিতান্তই আমার আর কাহারো নহে'—এই অত্যন্ত মদীয়তাজ্ঞানই তাঁহার মন্ডল-ত্যাগের কারণ। তারপর শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা চৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি;
তাঁরে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হইলা হরি।

সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভাব চিত্তে;
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে।
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া;
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ;
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ। (মধ্যের অষ্টম)

কান্তাভাবের প্রেমিকা এই রাধিকাকে বৈষ্ণবধর্মে এতোখানি উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে! তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় যে অপূর্ব তন্ময়তা, নিবিড় মিলনে যে-সর্ববিস্মরণী রসোল্লাস, যে-পরিপূর্ণ তৃপ্তি, রাজা-সুদর্শনার শেষ মিলনে তাহা দেখা যায় না।

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। রাধিকার প্রেমের পাত্র তো রূপধারী ভগবান। সুদর্শনার রাজা অরূপ, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ মিলনের সুযোগ নাই, কেবল বহুরূপের মাধ্যমে তাঁহার মিলনসুখ অনুভব করিতে হইবে। উভয়ের প্রেম-পাত্রের স্বরূপ বিভিন্ন, তাই উভয়ের সাধনার রূপ এক নয়। তাই সুদর্শনার প্রেমলীলা অত জীবন্ত ও গভীরভাবে পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় নাই।

ঠাকুরদার সখ্যভাবের সাধনাও ঐপ্রকার। উহার সহিত বৈষ্ণব-সখ্যরসের মিল নাই। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে রূপগোস্বামী সখ্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন—'বিমুক্তসংভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ'—অর্থাৎ দুইজনের সম্ভ্রমশূন্য, বিশ্রম্ভাত্মক যে রতি, তাহাকে সখ্য বলে। বিশ্রম্ভ কি? 'বিশ্রম্ভ গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো মন্ত্রণোজ্ঝিতঃ'—অর্থাৎ পরস্পর সর্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদ-প্রতীতি-রূপ গাঢ়বিশ্বাসবিশেষের নাম বিশ্রম্ভ। রাজার সহিত, ঠাকুরদার বন্ধুত্ব বিমুক্তসংভ্রমও নয়, বিশ্রম্ভাত্মকও নয়। ঠাকুরদা রাজার স্বরূপের গূঢ় রহস্যময় প্রকৃতি জানিয়া বরং সম্ভ্রম ও ভক্তিসমন্বিত। সুরঙ্গমার ভক্তিকে বরং দাস্যরতি বলা যায়। সে ভগবানের নানা ঐশ্বর্যময় প্রকাশকে পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যে এই নাটকে সুদর্শনাকে পত্নীরূপে, সুরঙ্গমাকে দাসীরূপে, ঠাকুরদাকে বন্ধুরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মূলে উপনিষদের 'সে বন্ধুর্জনিতা বিধাতা', 'পিতানোঽসি' প্রভৃতি উক্তি এবং সীমা-অসীম-তত্ত্বের নিজস্ব কাব্যময় উপলব্ধির প্রভাব আছে, তদুপরি বৈষ্ণবধর্মের মত-নিরপেক্ষ প্রভাবও কিছু পড়িয়াছে। মোট কথা, বিভিন্ন সাধনার স্বরূপ একই—সকলই মানবাত্মার অন্তরে ও বাহিরে উপনিষদের আনন্দময় ও রসময় ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এই যুগের কাব্যে প্রতিফলিত, এই নাটকের মধ্যেও তাহার আভাস আছে। আধ্যাত্মিক সাধকদের মতো ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া বা ভগবানকে লাভ করা তাঁহার কাম্য নয়, তিনি একটি স্থির উপলব্ধির চরম শান্তি ও সার্থকতা চাহেন না। তিনি ধর্মসাধক নন, তিনি কবি, ভাগবত-রসের শিল্পী। লীলাময় ভগবান যে-নানা বিচিত্র রূপ ও রসে সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, মানুষও তাঁহার সেই বিচিত্র স্পর্শ পাইতে পাইতে তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাহারই পিছনে ছুটিয়াছে।

কখনও তাঁহাকে একেবারে ধরিতে পারিতেছে না। শুধু চলিয়াছে ক্রমাগত অন্বেষণ, অনন্ত পথচলা, অফুরন্ত অভিসারযাত্রা, তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ানোর মধ্যেই সাধনার সার্থকতা—এই অন্বেষণের মধ্যেই তাঁহাকে পাওয়া। ইহাই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক রস-সাধনা বা ভগবদনুভূতির স্বরূপ। সুদর্শনাও বসন্তরাত্রে বালকদলের গান শুনিয়া বলিতেছে,—"আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে।" ইহার প্রতিধ্বনি কবির এই যুগের গানেও পাওয়া যায়—'তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর যবে আমার জীবন হবে ভোর' (গীতাঞ্জলি)। 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ' (গীতিমাল্য), 'শুধু তোমার চাওয়া সেও আমার পাওয়া' (ঐ), 'পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া' (গীতালি)।

এইবার কাঞ্চীরাজের সাধনা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা যাইতে পারে।

কাঞ্চীরাজ জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, নাস্তিক, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, কৌশলী, বিদ্রোহী, সাহস ও তেজ-সম্পন্ন। সে রাজার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বলিয়া রাজার বেশধারী ভণ্ড সুবর্ণকে সহজেই চিনিয়া ফেলিল। সুদর্শনার রূপখ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া সে তাহাকে দেখিতে চায়, সুবর্ণের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে জানিয়া তাহাকে সে হাতে রাখিল। ভণ্ড রাজাকে সুদর্শনা ফুল পাঠাইয়া প্রেমনিবেদন করিয়াছে জানিয়া রাজা যে সত্যই নাই, এ-বিশ্বাস তাহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল। কৌশলে সুবর্ণের গলার মালা পাঠাইয়া দিয়া তাহার সাহস বাড়িয়া গেল এবং সুদর্শনাকে লাভ করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইল। এই উদ্দেশ্যে সে বাগানে আগুন ধরাইয়া দিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। সুদর্শনার গৃহত্যাগ-সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া কান্যকুব্জের রাজসভায় উপস্থিত। সে সুবর্ণের বন্ধু হিসাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে সুদর্শনাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত। সুবর্ণ কাপুরুষ, যুদ্ধবিগ্রহে তাহার ভয়, তারপর অদৃশ্য রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ নহে। কিন্তু কাঞ্চীরাজ স্থিরবুদ্ধি, অবিশ্বাসী, নির্ভীক এবং সাহসী।

সুবর্ণ—কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে—কিন্তু—

কাঞ্চী—কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ—সত্য বলি, মহারাজ, ওই কিন্তুটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী—নিজের মনে ভয় থাকলেই ওই কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ—ভেবে দেখুন না বাগানে কী কাণ্ডটা। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী—ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

ইহাই জড়বাদী দার্শনিকের যুক্তি। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা অমোঘ প্রকৃতির নিয়মের বলে। সমস্তই কার্যকারণ-শৃঙ্খলা ও যুক্তির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ইহার মধ্যে যদি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, প্রাণপণ চেষ্টার পরেও যদি কোনো কাজ সফল না হয়, যখন যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না, তখন আমরা তাহাকে accident

বা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিই। ইহার মধ্যে যে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণকারীর অমোঘ হস্ত প্রসারিত হইয়া আছে, তাহা স্বীকার করাকে দুর্বলতা মনে করি। জগদতীত শক্তিতে অবিশ্বাসী মনের ইহাই ক্রিয়া।

স্বয়ংবর-সভায় যখন ঠাকুরদা প্রবেশ করিয়া রাজার সেনাপতি বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া সমবেত রাজাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল, তখন রাজাদের অনেকে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল, অনেকে সরিয়া পড়িল, একা কাঞ্চীরাজই সেই আহ্বান গ্রহণ করিয়া নির্ভীকভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। আত্মশক্তির উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, অতি-জাগতিক শক্তিকে সে 'আগাগোড়া ফাঁকি' বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য মানুষের মনে যে একটা বৃথা ভয়, তাহার বিশ্বাস, তাহা মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা মাত্র।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে অভাবিত বিপর্যয়।—

তৃতীয় (নাগরিক)—লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম—সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়—শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়—তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম—অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়—শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরেননি।

তৃতীয়—না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এ জন্মে মুছবে না।

প্রথম—রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায়নি—সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল ?

দ্বিতীয়—আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচার-কর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তারপরই কাঞ্চীরাজের বিরাট পরিবর্তন। রাজার অস্তিত্বে সে বিশ্বাসী, সে ভক্ত, রাজার কাছে চরম আত্মসমর্পণের জন্য তাঁহাকে খুঁজিতে পথে বাহির হইয়াছে।—

যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতে চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

আত্মশক্তিসচেতন, শক্তিশালী, ঐশীশক্তিতে অবিশ্বাসী লোকেরা যখন নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চেষ্টার পথে চলিয়া পদে পদে ব্যাহত হয়, তখন হঠাৎ তাহাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়, জড়শক্তির অতীত কোনো একটা শক্তি আছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। তখন যতোখানি শক্তি ও আবেগ লইয়া সে অবিশ্বাসী হইয়াছিল, ততোখানি শক্তি ও আবেগের সঙ্গেই সে আবার বিশ্বাসী হয়। কাঞ্চীরাজের নাস্তিকতায় কোনো দ্বিধা ছিল না, দুর্বলতা ছিল না, চলৎ-চিত্ততা ছিল না। যে-শক্তি, আবেগ ও বুদ্ধি ছিল অবিশ্বাসের অনুকূলে, ছিল বিদ্রোহের মূলে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া আসিল বিশ্বাসের দিকে, আত্মপ্রকাশ করিল ভক্তি ও আত্মসমর্পণে। শক্তির মাহাত্ম্যই বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি করে। পুরাণে ভগবানকে শত্রুরূপে ভজনা করার উল্লেখ আছে। রাবণ, শিশুপাল প্রভৃতি ভগবৎ-বিরুদ্ধাচরণের শেষফলস্বরূপ মৃত্যুতে ভগবানকে লাভ করিয়াছে। শত্রুরূপে ভজনাতে তিন

জন্মে মুক্তি এবং মিত্ররূপে ভজনাতে সাত জন্মে মুক্তি—এইরূপ কথাও পুরাণকার বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভীষণ শত্রুতার মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি, অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিচলিত নিষ্ঠা প্রকাশ পায়,—শত্রুর সম্বন্ধে একটা সর্ববিস্মরণকারী তন্ময়তা আসে, যেমন তেলাপোকা কাচপোকাকে ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকায় পরিণত হয়। এই শক্তি, এই তন্ময়তাই শত্রুতার অবসানে তাহাকে উচ্চাঙ্গের ভক্তে পরিণত করে। মনে হয়, এই শক্তি ও নিষ্ঠাকে প্রশংসা করিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ পরাজিত কাঞ্চীরাজকে বিচারকের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে রাজমুকুট পরাইয়া দিবার দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। 'অচলায়তনে' মহাপঞ্চককে কবি এই সম্মান দিয়াছেন। সংস্কারের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অটলতা দেখিয়া তাহাকেই নূতন, মুক্ত ধর্মের পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হইল। দুর্জ্ঞেয়বাদী, অর্ধবিশ্বাসী, দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী ঘোর নাস্তিক ভালো; কারণ, উহাদের পরিবর্তনের আশা কম। তাই অন্যান্য রাজা শাস্তি পাইল। পীড়ন ও শত্রুতার মধ্য দিয়া ভগবান মানুষকে জয় করিয়া লন, তাহাকে কৃপা ও উদ্ধার করেন, ইহা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলিয়াছেন ঃ—

"যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।" (গীতালি)
"পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিনলো না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধূলার 'পরে
ফেলো যারে মৃত্যু-শরে,
সে যে তোমার কোলে পড়ে,
ভয় কি বা তার পড়নকে ?" (গীতালি)

এই নাটকের যে-যুদ্ধ, তাহা প্রতীক-যুদ্ধ। ইহা জড়শক্তির সহিত আধ্যাত্মিক শক্তির যুদ্ধ, নাস্তিকতার ও দুর্বল বিশ্বাসের সহিত ধর্মবুদ্ধির যুদ্ধ, পাপের সহিত সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধ। মানবাত্মা পাপের কলুষে আচ্ছন্ন হইয়া অহং-এর প্রাবল্যে নিজেকেই সমস্ত শক্তির আধার মনে করে। তারপর একসময়ে ভীষণ আঘাতে তাহার মোহভঙ্গ হয়—নিজস্ব স্বরূপ সে উপলব্ধি করিতে পারে। ভগবানের এই ভীষণ আঘাত মুক্ত-আত্মা, ভগবৎ-প্রেমিক ঠাকুরদার মাধ্যমে কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে চালিত, তাই তাঁহার যোদ্ধৃবেশে রণক্ষেত্রে উপস্থিতি।

এইবার রবীন্দ্র-অধ্যাত্ম-সাধনার মূর্তিমান স্বরূপ ঠাকুরদার চরিত্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিব।

ঠাকুরদা-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক অপরূপ সৃষ্টি। অদ্বিতীয় রূপশিল্পী কবি উপনিষদের খনি হইতে কাঁচা সোনা আহরণ-করিয়া অত্যুজ্জ্বল কল্পনা ও গভীর অনুভূতির তাপে বিগলিত করিয়া অধ্যাত্মসাধনার যে-মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, সেই মূর্তিটি ঠাকুরদার মধ্যে রূপায়িত। প্রথমে, শারদোৎসবের মধ্যে আমরা ঠাকুরদাদার সাক্ষাৎ পাই। ছেলের দল

লইয়া সে শরতের আনন্দের সঙ্গে অন্তরের আনন্দ যোগ করিয়া শারদোৎসবে মাতিয়াছে। কিন্তু 'রাজা' নাটকের মধ্যেই আমরা ঠাকুরদা-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। তারপর 'ডাকঘর'-এ ফকিরবেশে, 'অচলায়তন'-এ দাদাঠাকুর-রূপে, 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয় বৈরাগী-রূপে, 'ফাল্গুনী'তে বাউলরূপে সে আমাদের দর্শন দিয়াছে। ইহা একই মূল-চরিত্রের নানা রূপাভিব্যক্তি। 'এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর।'

ঠাকুরদা মুক্ত-আত্মা। কিন্তু তাহার মুক্তি জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া নয়, ত্যাগ-বৈরাগ্যের মুক্তি নয় তাহার, জগৎ ও জীবনের সহিত যুক্ত হইয়াই তাহার মুক্তি,—ইহা প্রেমের মুক্তি, আত্মপ্রকাশের মুক্তি। ভগবানের স্বরূপ ও রহস্য সমস্তই তাহার বিদিত; পরমানন্দময় ও পরম-রসময়ের যে রসপ্রবাহ প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে শতধারায় প্রবাহিত, তাহাতে তাহার নিরন্তর সন্তরণ। মন তাহার সর্বদা আনন্দময়—গানে ও নাচে তাহার বন্ধনহীন উল্লাস সর্বদা উছলিয়া পড়িতেছে। সকল সংসারকে সে আপনার বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, সকলের প্রতি তাহার প্রেম ও দরদ, প্রকৃতির আনন্দের সহিত, সৌন্দর্যের সহিত একাত্ম হইয়া ঋতুতে ঋতুতে নব নব উৎসবে সে মত্ত। তাই 'দখিন হাওয়ার সঙ্গে তাহার পাল্লা', কুঞ্জবনের 'দ্বারী' সে—'উৎসবের সূত্রধর'। পরমলীলাময়ের লীলার গভীর তাৎপর্য বসন্তোৎসবে সে বুঝিয়াছে, তাই বিশ্বলীলার সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গ যোগ। সে নটরাজের চেলা, নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সে জীবনরঙ্গভূমিতে নৃত্যে মাতিয়াছে।

ঠাকুরদা বিশ্বরাজের বন্ধু। রাজার স্বভাব, তাঁহার কার্যকল্যাপ, মতিগতি সমস্তের তথ্য ও সত্য তাহার জানা আছে। 'আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়, সে যে সবাইকে রাজা করে দিয়েছে।' 'কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়', 'আমার রাজা যদি বা দেখা দিত, তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।' 'তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না আমি আছি। তিনি তো বলেন, তোমরাই আছ, তাঁর সবই তো তোমাদের জন্যে।' সে জানে, 'আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা'—কেবল কিংশুক ফুল আঁকা নয়। বাহিরে রাজার পদ্মের পেলবতা ও সৌন্দর্য—ভিতরে বজ্রের কাঠিন্য, তিনি তো কেবল নয়ন-ভুলানো নির্গন্ধ কিংশুক ফুল নন।

ঠাকুরদা জীবনের দুঃখ-বেদনার প্রকৃত তাৎপর্যটি বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে, জীবনের দুঃখ, শোক, মৃত্যু সেই লীলাময়েরই লীলা। ইহারা ভয়ংকর মূর্তিতে আসিলেও ভীত হইবার কারণ নাই, কারণ তাহার পরিণাম কল্যাণময়। রুদ্রমূর্তিই শিবমূর্তিতে পরিণত হয়—ধ্বংসের পরই নবসৃষ্টি। তাই 'একে একে পাঁচ পাঁচটি ছেলে মরার' নিদারুণ পুত্র-শোকের মধ্যেও এই লীলা-রসিক বন্ধুকে সে ছাড়িতে পারে নাই। 'ছেলে তো গেলই তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব।'

এইরূপ চরম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন, অহংমুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী, মানবপ্রেমিক, রসিক, বন্ধু-শিশু, আনন্দময় মহাপুরুষদের কাছেই ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায়টি প্রকটিত হয়। চিরন্তন সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদারক্ষার জন্য, বিকৃত পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া নবসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সেই অভিপ্রায়কে তাঁহারা জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে রূপায়িত করেন। তাই এই সদানন্দ বুদ্ধটির রাজার সেনাপতিবেশে যুদ্ধযাত্রা—তাই তো তাহার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙা ও নূতন ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা।

'রাজা' নাটকের পটভূমিকায় একটি বসন্ত-ঋতুর উৎসব আছে। এ-কথাটি উল্লেখযোগ্য যে, এই উৎসবের একটা তাৎপর্যের ইঙ্গিতও নাটকটির মধ্যে ক্রিয়াশীল। বসন্ত-প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের সমারোহ, যে রূপৈশ্বর্যের লীলা, সাধারণের চোখে উহাই তাহার চূড়ান্ত রূপ। তাহারা মনে করে, এই উজ্জ্বল রূপ কেবল ভোগের ইন্ধনস্বরূপ, রূপ-লালসা-তৃপ্তির উপায়স্বরূপ। কিন্তু আসলে এই বাহিরের রূপৈশ্বর্যের অন্তরালে আছে এক সুমহান্ রিক্ততা, এক আপন-ভোলা বৈরাগ্য, এক নিরাভরণ সরলতা। বসন্ত ঋতুর রাজা হইলেও অন্তরে সে সন্ন্যাসী, নিরাসক্ততা ও ত্যাগের মহিমায় সে মণ্ডিত। ঠাকুরদার গানে বসন্তের এই স্বরূপের বর্ণনা আছে। তাই বসন্তকে যাহারা বাহিরের উজ্জ্বলতা দিয়াই বিচার করে, বসন্তের সৌন্দর্যকে যাহারা শুধু ভোগের চোখেই দেখে, তাহারা ইহা প্রকৃত সৌন্দর্যের সন্ধানটি পায় না। ভোগবাসনার ঊর্ধ্বে, অচঞ্চল, অনাবিল, স্বচ্ছ, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আস্বাদটুকু হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়, কেবল গ্লানিকর, মোহময় মত্ততাই তাহাদের সার হয়।

সুদর্শনার সৌন্দর্য-ভোগাকাঙ্ক্ষা—রূপতৃষ্ণা ও তাহার পরিণাম এই নাটকের বিষয়-বস্তু। সুদর্শনা বসন্তের বাহিরের উজ্জ্বল সাজের মতো চোখ-ঝলসানো রূপে রাজার সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সৌন্দর্য তো কেবল চোখ-ভুলানো সৌন্দর্য নয়, সে তো কেবল ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য নয়, তাহার মধ্যে আছে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, অজস্র দানের রিক্ততাই তাহার স্বরূপ, তাহাতে আছে অগ্নি ও বজ্র, কোমল ও কঠোরের মধ্য দিয়া তাহা রূপায়িত। ইহার প্রকৃত স্বরূপটি না বুঝিয়া, ভোগের দৃষ্টি দিয়া কেবল তাহার বাহিরের ঔজ্জ্বল্যটুকু ধরিতে গেলে, তাহা ভীষণ কুৎসিত ও ভয়ংকর কালো মূর্তিতে প্রকটিত হইবে। তারপর ভোগাকাঙ্ক্ষা নির্মূল হইলে, চোখের নেশা কাটিয়া গেলে, পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ, নির্মল সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মেলে, তখন ভীষণই মধুর হয়, কালোর মধ্যেই জীবন-জুড়ানো আলোর দর্শনলাভ ঘটে, নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্যের মূলরহস্যটি অবগত হওয়া যায়। বস্তুত, ইহাই সুদর্শনার অন্তর্জীবনের ঘটনা। বসন্ত-উৎসবই এই ভাবের সংকেত দিতেছে। বসন্তোৎসবের একটা সাংকেতিক মূল্য এই নাটকের মধ্যে বর্তমান। বস্তুত ঋতু-উৎসবকে আমরা এই নাটকের মূলভাবের প্রতীক বলিয়া ধরিতে পারি।

অচলায়তন

(১৩১৮)

'অচলায়তন'-এর আখ্যানভাগটি 'রাজা' নাটকের মতো সুসংবদ্ধ নয়, 'রাজা'র নাটকীয় গুণও ইহাতে বিশেষ নাই, ইহাতে ঘটনার ক্ষীণসূত্রকে অবলম্বন করিয়া সংলাপের দ্বারা কতকগুলি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করিয়া একটা পরিণামের দিকে মন্থরভাবে অগ্রসর হইবার প্রয়াসই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া প্রাচীর-ভাঙার দৃশ্যে, ঘটনার দ্রুতগতি ও আবেগের চঞ্চল স্পন্দনে কতকটা নাটকীয়ত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে।

অচলায়তনের কথাবস্তু এইরূপঃ অচলায়তন নামক একটি আশ্রমে কতকগুলি শিক্ষার্থী এবং আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায়, অধ্যাপক মহাপঞ্চক প্রভৃতি বাস করে। উচ্চ প্রাচীরে আশ্রমটি সুদৃঢ়ভাবে ঘেরা—ভিতরে লোহার দরজা। বাহিরের পৃথিবী হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, বাহিরের কোনো লোকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এখানকার ছাত্রেরা কেবল নানা মন্ত্র মুখস্থ করে, নানা তন্ত্রানুসারে ক্রিয়াকাণ্ড করে, শাস্ত্র-বচন অনুসারে জীবন যাপন করে। শাস্ত্রের নানা বিধি ও নিষেধ উহারা নিখুঁতভাবে পালন করে। সামান্য একটু নিয়মলঙ্ঘনে উহাদের মহাপাতকের ভয়। শিক্ষকগণ উহাদের এই শাস্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, বিধিনিষেধ বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেন এবং এই শাস্ত্রনির্দেশ-পালন ব্যতীত জীবনের আর কোনো মহত্তর আদর্শ নাই, ইহাই তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে প্রকাশ করেন। ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন এখানে কঠিন নিয়ম ও নিষ্ঠার বাঁধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। অতি-প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান।

ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চক নামে একটি ছাত্র ছিল, সে প্রাণের সহিত এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই, সে মন্ত্র মুখস্থ করিতে পারে না, এই আশ্রম-জীবনে সে কোনো আনন্দ পায় না, বাক্যে ও ব্যবহারে সর্বদাই তাহার অনিয়ম ও বিদ্রোহ।

এই আয়তনের উত্তর দিকে ছিল একজটা দেবীর মন্দির। সেই মন্দিরের দিকের জানালা খোলা নিষেধ। আশ্রমের এক বালক শিক্ষার্থী সুভদ্র কৌতূহলবশে সেই জানালা খুলিয়াছে, তাহাতে আশ্রমের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। তাহার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে, সকলে তাহাই নির্ণয়ে ব্যস্ত। কিন্তু পঞ্চক বলে, ইহাতে তাহার কোনো পাপ হয় নাই, তাই সুভদ্রকে সে আশ্বাস দেয়। পঞ্চকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সকলে মিলিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে। এই আয়তনের সর্বাধ্যক্ষ আচার্য বহুকাল হইতে ক্রিয়া-কাণ্ড, তন্ত্রমন্ত্র লইয়া ব্যাপৃত আছেন বটে, কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রত-উপবাস-প্রায়শ্চিত্ত ও মন্ত্রাভ্যাসে তিনি অন্তরে কোনো আনন্দ ও শান্তি পাইতেছেন না। এই প্রাচীন ব্যবস্থা তিনি ছাড়িতেও পারিতেছেন না, অথচ ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তও হইতে পারিতেছেন না। সুভদ্রের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, সুভদ্রের কোনো পাপ হয় নাই এবং তাঁহার আশীর্বাদেই তাহার মঙ্গল হইবে। অচলায়তনের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে ইহা একেবারে নূতন ব্যবস্থা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাপঞ্চকের দল মনে করিল, আচার্য সনাতন ধর্ম বিনাশ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে অচলায়তন হইতে বাহির করিয়া দিল। ঐ সঙ্গে পঞ্চককেও নির্বাসন দিল। তাহারা উভয়েই দর্ভক-পল্লীতে আশ্রয় লইল।

অচলায়তনের বাহিরে শোণপাংশুদের বাস ও প্রাচীরের এককোণে দর্ভকপল্লী। উভয়ই অচলায়তনিকদের নিকট অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ। শোণপাংশুরা কর্ম-পাগল, দাদা-ঠাকুরকে লইয়া তাহারা রাতদিন মাতামাতি করে; আবার দাদাঠাকুর দর্ভকদের গোঁসাই, তাহাদের নিতান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র।

বহুদিন হইতে অচলায়তনের প্রতিষ্ঠাতা-গুরু অচলায়তন-পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে। সকলেই গুরুর আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। এমন সময় দাদাঠাকুরই গুরুরূপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার অস্ত্রধারী শোণপাংশুর দল। গুরুর আদেশে দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করা হইল। আকাশের অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অচলায়তনের সকলেই গুরুর বশ্যতা স্বীকার

করিল, ছাত্রেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, কেবল মহাপঞ্চক গুরুকে মানিল না, সে ম্লেচ্ছ শোণপাংশুদের দ্বারা অচলায়তন কলুষিত হইয়াছে বলিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল।

গুরু নূতনভাবে অচলায়তনের পুনর্গঠন করিলেন। তিনি পঞ্চককে নির্বাসন হইতে ডাকিয়া আনিলেন। মহাপঞ্চককেও বাদ দিলেন না, মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের হাতেই তিনি অচলায়তনকে নূতন করিয়া বৃহত্তর করিয়া গড়িবার ভার দিলেন।

এখন এই নাটকের ভাববস্তু ও আখ্যানভাগের মধ্যে উহার রূপায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

'রাজা'য় দেখা গিয়াছে, ভগবানকে গভীর প্রেম-ভক্তিতে হৃদয়ের অন্তস্তলে ও বিশ্ব-জগতের মধ্যে উপলব্ধির সাধনার বিচিত্র দ্বন্দ্বসংঘাতময় রূপ, অচলায়তনের মধ্যে আছে এই সাধনার বাধা ও সমস্যার রূপ ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত।

বিশ্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ—পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার, ভগবানের সহিত মানুষের যোগানুভূতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার সাফল্য। এই যোগ জ্ঞানের যোগ, কর্মের যোগ ও আনন্দের যোগ। আনন্দের যোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। আনন্দ হইতেই সমস্ত জীব উৎপন্ন, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং শেষে এই আনন্দের মধ্যেই সকলের প্রত্যাবর্তন। এই নিখিল সৃষ্টিই আনন্দরূপ। বিশ্বজগতের এই আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গলীলার সঙ্গে মানবজীবনের ছন্দ মিলাইয়া লওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সফলতা। এই ছন্দ-মিলানো, এই নিত্য-নিখিল-আনন্দের সঙ্গে যোগসাধন বুদ্ধি দ্বারা সাধ্য নয়, ইহা হৃদয়ের কাজ। আর হৃদয় দিয়া আনন্দকে গ্রহণ করিতে হইলেই তাহাকে রসরূপে পাইতে হইবে। আনন্দের রসই প্রেম; ভগবান তাই রসময়, প্রেমময়। মানুষ অন্তরে সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হইবে, আর বাহিরে তাঁহার প্রেমের অভিব্যক্তির সঙ্গে যোগসাধন করিবে। এই পরমপ্রেমোপলব্ধি, এই আনন্দময় বিশ্বানুভূতিই আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম পরিপূর্ণতা। তাহা হইলে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়া ভগবদনুভূতির ধারা প্রবাহিত। এই জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, জ্ঞান ও কর্ম প্রেমে আসিয়া সার্থকতা লাভ করে। ইহাই মোটামুটি রবীন্দ্র-অধ্যাত্ম-দর্শন।

জ্ঞানের দ্বারা যখন ভগবানের সহিত আমাদের যোগ হইবে, তখন আমাদের মধ্যে সর্বব্যাপী ঈশ্বরানুভূতির উদ্ভব হইবে। বিশ্ব-মানব ও বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত আমরা তখন একাত্মতা অনুভব করিব, এক বিশ্বব্যাপী অখণ্ড সত্যের উপলব্ধি হইবে আমাদের। এই বোধের দ্বারা মানুষ তাহার স্বরচিত ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙিয়া বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবে। তখন কোনো ভেদাভেদ, উচ্চ-নীচ, ছোটো-বড়ো জ্ঞান থাকিবে না; এক বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গে সমস্ত বিশ্ব তরঙ্গিত, এক মহান্ সত্যের দ্বারা সমস্তই আবৃত—এই বোধের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। সত্যের কোনো খণ্ডরূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সমগ্রকে পাইতে হইবে। জ্ঞান খণ্ডতার মধ্যে এক অখণ্ডকে—সান্তের মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় রত।

এই জ্ঞানের যোগ আমাদের কর্মের মধ্যে রূপায়িত করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা যদি আমরা সর্বভূতে ঈশ্বর-উপলব্ধি করিতে পারি, তবে এই উপলব্ধিকে আমাদের কর্মের মধ্যে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। সর্বসাধারণের জন্য হিতকার্য করা, বিশ্বমানবের কল্যাণের

জন্য কর্ম করা, ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করা বিশ্বেশ্বরকেই উপলব্ধি করা। ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের কর্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরহীন কর্ম নিরর্থক। তাহা হইলে অনন্ত-বোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং এই অনন্ত-বোধের প্রেরণায় জীবনের সমস্ত কর্ম করা মানুষের একান্ত কর্তব্য, কিন্তু প্রেম ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, সার্থক নয়। কর্মকে যদি আমরা ভালোবাসিতে না পারি, কর্মের মধ্যে যদি আনন্দ না পাই, তবে কর্ম তো বন্ধন। কর্মের মধ্যেই আমরা নিখিল-আনন্দস্বরূপকে, অনন্ত প্রেমময়কে উপলব্ধি করিব, তবেই কর্ম হইবে আমাদের সার্থক। প্রেম ও কর্মের সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথ এক চমৎকার উপমার দ্বারা বুঝাইয়াছেন। কর্মের দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মের সঙ্গে যোগসম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

> "কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসারকর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম, স্বামীর প্রতি আনন্দ। সেইজন্য, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি তাঁর নিজের প্রয়োজনে কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।"
>
> (কর্ম, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)

এই আনন্দময় বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আমাদের অন্তরের ও বিশ্বব্যাপী আনন্দরূপের সঙ্গে প্রেমের যোগেই আমাদের সার্থক মিলন হইবে। বিশ্বের মধ্যে প্রেমে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিশ্বপ্রেমের বন্ধনে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত আনন্দময়কে আমরা উপলব্ধি করিব। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের যোগ না হইলে জ্ঞান হইবে শুষ্ক,পাষাণবৎ কঠিন ও অচল; কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে না হইলে কর্ম হইবে শক্তির আস্ফালন, উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, দৈহিক চাঞ্চল্য ও পীড়াদায়ক বন্ধন। প্রেমই জ্ঞান ও কর্মকে সরস, অপূর্ব-শ্রীমণ্ডিত ও পরম-রমণীয় করে। তাই জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের পরিপূর্ণ মিলনই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম রূপ। ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনায় জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

কিন্তু এই সাধনায় বাধা আছে। জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, প্রেমেও বাধা। সে বাধা কি?

জ্ঞানকে অনন্তের বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যখন একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করা হয়, তখনই তাহা হয় বিকৃত। বৃহৎ ব্যাপ্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া তখন উহা খণ্ডরূপের মধ্যে স্থায়িভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া যায় এবং বদ্ধজলাশয়ের মতো পঙ্ক ও শৈবালদামে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন কেবল তন্ত্রমন্ত্র ও পুঁথির মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়; যুক্তিহীন, অর্থহীন আচার ও অনুষ্ঠানের অনুশাসন জীবনকে পরিচালিত করে, তাগা-তাবিজ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের দ্বারা স্বকল্পিত পাপ হইতে আত্মরক্ষার এবং ঐ সব কর্মের দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ের প্রচেষ্টা চলে। এই মিথ্যা জ্ঞানের প্রতি গভীর নিষ্ঠার বশবর্তী হইয়া মানুষ চারিদিকের সংস্পর্শ বাঁচাইবার জন্য উঁচু প্রাচীর তোলে, তাহাদের গণ্ডীর বাহিরের সকলকে অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলিয়া ধারণা করে। জ্ঞানের দ্বারা নিখিলের সঙ্গে মানুষ যে-অবাধ ও সহজ যোগ সৃষ্টি করিবে, সেই যোগ চিন্তার সংকীর্ণতা, আচারের মূর্খতা ও সহস্র কৃত্রিমতা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। এই সংকীর্ণ জ্ঞান-পন্থা-অনুসরণকারীরা একটা অভ্যাস ও আচারের মধ্যে জ্ঞানকে

অবরুদ্ধ করিয়া উহাকে শুষ্ক, কঠিন, অনড় পাষাণের আকারে পরিণত করে। এই অবস্থাই প্রকৃত জ্ঞানসাধন-পথের বাধা।

তারপর কর্ম যদি ঈশ্বরাভিমুখী না হয়, কল্যাণ-উদ্দেশ্যে কর্মকে যদি বিশ্বের মধ্যে বিস্তৃত না করা যায়, তবে সে-কর্ম নিজেকে ঘিরিয়াই একটা তুমুল আবর্ত তোলে। কর্মই তখন কর্মের শেষ পরিণাম হয়, একটা অর্থহীন উদ্দাম চাঞ্চল্যের মধ্যেই সে কর্ম আবদ্ধ থাকে, কোনো সর্বব্যাপী মঙ্গলের জন্য তাহার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এ-কর্ম কেবল অহংবোধকেই উদ্দীপিত করে এবং অবিরাম উত্তেজনার মধ্যে জ্ঞানহীন, উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন, আনন্দহীন সংকীর্ণরূপ ধারণ করে। ইহাই কর্মের বাধা।

প্রেমের মধ্যেও বাধা আছে। প্রেমের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে। সেই শক্তিই জ্ঞান—এই জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ আপনার সমগ্রতাকে উপলব্ধি করিতেছে এবং কল্যাণময় কর্মযোগে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে। এই শক্তির দিকটা উপেক্ষা করিয়া কেবল রসের দিকটাকেই একান্ত করিয়া তুলিলে প্রেমের দুর্বলতা ও বিকার ঘটে। তখন কেবল হৃদয়াবেগ ও ভাবালুতার মধ্যেই প্রেমকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। তখন প্রেমরস ও ভক্তিরসের মধ্যে একটা সম্ভোগেচ্ছা আসিয়া পড়ে এবং মানুষ এই হৃদয়ের রসসম্ভোগের মধ্যেই সাধনার চরমরূপ বর্তমান বলিয়া মনে করে। তখন জ্ঞানের বিশুদ্ধতা ও কর্মের কঠোরতা সে ভুলিয়া থাকিতে চায়। ইহাই প্রেম-ভক্তির বাধা। প্রেম-ভক্তি কেবল ভাবাবেশের মধ্যে নাই, উহাকে ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা, উপলব্ধির দ্বারা, কর্মের দ্বারা সর্বাঙ্গীণ করিতে হইবে।

এই বাধাগুলিই অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বিরাট সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিলেই—এই তিন প্রকারের অচলায়তন ভাঙিয়া জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম-ভক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন করিতে পারিলেই সাধনার সার্থকতা মিলিবে।

এখন এই বাধাগুলির কি রূপ অচলায়তন নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং নাট্যকার তাহার সমাধানের কি ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাই দেখা যাক্।

প্রথমে 'অচলায়তন' কথাটির তাৎপর্য ধরিতে হইবে। ইহার বাচ্যার্থ আমরা 'পর্বত-গৃহ' বা 'পাথরের বাড়ী' বলিতে পারি। ইহা দ্বারা কঠিন, অটল, স্থির, শুষ্ক, আলোবাতাস-হীন, ধরণীর শ্যামলতাবর্জিত একটি গৃহের কল্পনা আমাদের মনে উদিত হয়। মর্মার্থের দিক দিয়া ধরিতে গেলেও অচলায়তনের এই বিশিষ্ট রূপটিই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এখানে নিয়ম ও প্রথা অটল ও অচল, বহু প্রাচীনকাল হইতে সংস্কার ও অভ্যাসের একই ধারা এখানে চলিয়া আসিতেছে, বিপুল নিষ্ঠার সহিত দিনের পর দিন যুক্তিহীন, সার্থকতা-হীন মন্ত্র আওড়ানো হইতেছে ও অর্থহীন অনুষ্ঠানের হাস্যকর আড়ম্বর চলিতেছে। বাহিরের স্পর্শ এখানে নিষিদ্ধ, অবাধ আলো-বাতাসের প্রবেশ উচ্চ প্রাচীরে বাধাগ্রস্ত। এখানকার একঘেয়ে কর্মে হৃদয়ের কোনো সংস্রব নাই, ইহা একেবারে শুষ্ক, জীবনের রস, আনন্দ এখান হইতে অন্তর্হিত।

অচলায়তনিকদের সাধনার মধ্যে এই বিকৃত জ্ঞানসাধনার রূপ, শোণপাংশুদের কর্মের মধ্যে কর্মের উদ্দেশ্যহীন সংকীর্ণ রূপ, আর দর্ভকদের ভক্তির মধ্যে প্রেমভক্তির ভাবাবেশময় দুর্বল রূপ প্রকটিত। জ্ঞান, কর্ম, প্রেমের বাধাগুলি ইহাদের সাধনার মধ্যে রূপায়িত। এই তিনদলই অচলায়তনে বাস করিতেছে।

এই বাধাগুলি দূর করিলেন, এইসব সমস্যার সমাধান করিলেন গুরু আসিয়া। তিনি

অচলায়তন ভাঙিয়া তিন দলকে একত্র করিয়া, জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনসাধন করিয়া এক নূতন পরিপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা বা ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সমন্বয়মূলক সাধনতত্ত্বই অচলায়তনের মর্মকথা।

এখন নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক।

অচলায়তনের নির্দিষ্ট জ্ঞান-সাধনার প্রতীক মহাপঞ্চক। সে তন্ত্র-মন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্মে গভীরভাবে বিশ্বাস করে; নিখুঁতভাবে মন্ত্রপাঠ, নির্দোষভাবে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সম্পাদন এবং যুক্তি-তর্ক-বিচার-বর্জিত শাস্ত্রের আদেশ-পালনের মধ্যে তাহার সমস্ত সাধনা কেন্দ্রীভূত। সে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত এই তন্ত্র-মন্ত্র-আচার-অনুষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে; ইহাদের এক তিল বিচ্যুতিও সে সহ্য করিতে পারে না, তাহার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, কর্মপ্রচেষ্টা এই ক্ষেত্রটিতেই আবদ্ধ।

এই অচলায়তনের একজন শিক্ষার্থী তরুণ যুবক পঞ্চক এই আশ্রমের শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই, এখানকার অর্থহীন মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা ও অবিরত নানা হাস্যকর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সে এখানকার শুষ্ক জীবনে কোনো আনন্দ পাইতেছে না, তাই অন্তর তাহার কান্নার আবেগে উদ্বেলিত।

এই জীবনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে সে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু কিছুতেই সে পারিতেছে না। প্রাথমিক বজ্রবিদারণ-মন্ত্রটিই তাহার আয়ত্ত হয় নাই, তারপর চক্রেশ, মরীচী, মহামরীচী, পর্ণশবরী, ধ্বজাগ্রকেয়ূরী প্রভৃতি মন্ত্র তো পড়িয়াই আছে, তারপর অচলায়তনের ছাত্র বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিতে হইলে অন্তত পক্ষে যে শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চু-পরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন জানা চাইই, তাহাদের সহিত পঞ্চকের কোনো পরিচয়ই হয় নাই। মহাপঞ্চক তাহার ভাই, সে নানা উপদেশ দিয়া ও তিরস্কার করিয়াও পঞ্চকের মন অচলায়তনের শিক্ষা ও সংস্কারের দিকে ফিরাইতে পারে নাই। সে অচলায়তনের ছাত্র হইয়া সেখানে বাস করিলেও তাহার 'মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে, দূরে কোথায় দূরে'।

নানা অনুষ্ঠান-ব্রত-উপবাসে যে-পুণ্যসঞ্চয় হয়, আর যুক্তিহীন প্রথা ও শাস্ত্রশাসন না মানিলে যে-পাপ হয়, একথা তাহার অন্তর সাড়া দেয় না, ইহা সে বিশ্বাস করে না ও মানে না। বালক সুভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খোলায় আশ্রমের সকলের দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, সে মাতৃহত্যা পাপ করিয়াছে, কারণ উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী একজটা দেবী, সে-দিকের জানালা খোলা নিষেধ; কিন্তু পঞ্চক তাহা বিশ্বাস না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং সুভদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। সব দিক দিয়াই অচলায়তনের শিক্ষা ও কর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ-ঘোষণা, কিছুতেই তাহার মন ভরে না—তৃপ্ত হয় না। কেন পঞ্চকের এই বিদ্রোহ? কেন অচলায়তনের সাধনা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না? সে কী চায়? সে চায় রসময় সাধনা—যে-সাধনায় তাহার অন্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে তৃপ্ত হইবে। জ্ঞানের মধ্যে যদি হৃদয়ের রস সঞ্চারিত না হয়, প্রেম-ভক্তির দ্বারা যদি ভগবানকে অন্তরের অনুভবের মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান তো একটা শুষ্ক বোঝা মাত্র। তাই তাহার রসপিপাসু মন পুঞ্জীভূত শুষ্কতার মধ্যে রসের জন্য লালায়িত, তাই তাহার অস্থিরতা, তাই তাহার অন্তরের অবিরল কান্না! তারপর জ্ঞানের মধ্যে একটা অনন্তত্বের উপলব্ধি প্রয়োজন, সে উপলব্ধি না আসিলে জ্ঞান হয়

সীমাবদ্ধ, তখন কেবল শাস্ত্রবচন ও ক্রিয়াকাণ্ডের যান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই ইহার একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মনে হয়। তাই পঞ্চকের 'কাঙাল পরাণ উদাস' হইয়া 'অচিনপুরে' যাইতে চায়। আর এই জ্ঞান-সাধনায় রসের অভাবের জন্যই তাহার 'মন যে কাঁদে আপন মনে'।

পঞ্চকের চরিত্রে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান। অচলায়তনের শিক্ষা ও সংস্কার সে একেবারে ছাড়িতে পারে না; অচলায়তনের বিধি-নিষেধ না মানিয়া বাহিরে আসিয়া সে অস্পৃশ্য শোণপাংশুদের সঙ্গে মেশে, তাহাদের মুক্ত প্রাণ ও কর্মচাঞ্চল্যে আনন্দ পায়, আবার অচলায়তনের কাঁসরের বাজনা শুনিলেই 'আমার আর থাকবার জো নেই' বলিয়া দীপকেতন পূজার জন্য মাটি দিয়া ছোট ছোট মন্দির গড়িতে ছোটে। এই অর্থহীন, যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানে সে বিশ্বাস না করিলেও, ইহাদের না মানিলেও একেবারে ছাড়িয়া আসিবার সাহসও তাহার নাই, কেননা আশ্রয়চ্যুত হইয়া বাহিরে কোনো পরিপূর্ণ সার্থকতার রূপ সে দেখিতে পায় নাই। তাই তাহার হাজার বছরের পুরাতনকে ছাড়িবার ভয়।—

> খাঁচায় যে পাখীটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুরদুর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কেমন করে। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

পঞ্চক শোণপাংশুদের সহিত মিশিয়া দেখিয়াছে যে, তাহারা কোনো বিধি-আচার, কোনো সংস্কার মানে না, কেবল বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ প্রবাহিত হইয়া চলে: তাহাদের বেপরোয়া ভাব ও কর্মচাঞ্চল্যে পঞ্চকের সংস্কারের চাপে অবদমিত মনের নিরুদ্ধ উল্লাস ও কর্মপ্রবণতা আত্মপ্রকাশের উপক্রম করে। সে ইহাদের প্রতি একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে।—

> ওরে তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না।—
>
> —সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারো পা দুটো উঠছে। আমাকে যুদ্ধে এরা টানবে দেখছি।

এই শোণপাংশুরা সংকীর্ণ বা বদ্ধ কর্মের প্রতীক। তাহাদের কর্ম কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরিচালিত নয়, আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় উৎসারিত নয়। কর্মের মধ্যে তাহারা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে-আনন্দ বাধাবন্ধনহীন ভাবে যাবতীয় কর্ম করিবারই আনন্দ। তাহারা রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে চাষ করে, লক্ষ যুগের অন্ধকারে ঘুমে অচেতন লোহার ঘুম ভাঙায়, সমস্ত কাজেই তাহারা হাত লাগায়। কর্মই তাহাদের কর্মের পরিণাম, ইহার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই।—

> দেখি, খুঁজি, বুঝি,
> কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
> মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
> পারি, নাই বা পারি,
> না হয় জিতি কিংবা হারি,
> যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।

এই অকারণ, বারণ কর্মচাঞ্চল্য ও উল্লাসকে ব্যাপ্ত করিয়া কোনো বৃহত্তর ও মহত্তর সার্থকতার বোধ ইহাদের নাই। পঞ্চক ইহাদের আনন্দ ও উল্লাসের দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও চরম প্রাপ্তির সার্থকতা ইহাদের মধ্যে পায় না।

আবার দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত হইয়া পঞ্চক দর্ভকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দৈন্য ও গভীর ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। ভগবানের প্রতি তাহাদের পরম দীনতা ও গভীর ভক্তির গান শুনিয়া সে আত্মহারা হইয়া বলে,—

দে ভাই, আমার মন্ত্র-তন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক

আমাদের গান?

হারে, হাঁ ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মুখের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই তো আমার পড়াশুনা কিছু হোলো না, আমার ক্রিয়াকর্ম সব নিষ্ফল হয়ে গেল।

দর্ভকেরা ভাবাবেশসর্বস্ব দুর্বল ভক্তির প্রতীক। ইহারা নিজেদের নিতান্ত দীন মনে করে, সকলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ইহারা ব্যগ্র, ভক্তির পাত্রের কোনো বাছবিচার ইহাদের নাই।

রস-তৃষ্ণার্ত পঞ্চক ইহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া পিপাসা-শান্তির আশা করে, ইহাদের সরল ভক্তির গানে হৃদয় তাহার গলিয়া যায়, কিন্তু এই প্রকারের ভক্তিধারাকেই একান্তভাবে তাহার সাধনার বিষয় করিতে পারে না।

তাহা হইলে পঞ্চক কি প্রকার সাধনাকে কামনা করিতেছে? সে-সাধনা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের সাধনা। জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞানে পরিণত করিতে হইলে কি করিতে হইবে? এই জ্ঞান-সাধনায় নিষ্ঠার সহিত রসের সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। নিষ্ঠা জ্ঞানের শক্তির অংশ, মাটির মতো স্থির; ঈশ্বর চরম ও পরমসত্যরূপে আছেন—এই বিশ্বাস জ্ঞানের দৃঢ় ও কঠিন অংশ। জ্ঞানের যেমন শক্তির দিক আছে, তেমনি রসের দিকও আছে। না হইলে জ্ঞান সার্থক ও শ্রীমণ্ডিত নয়—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মত। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য,—

"অনেক সময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হইয়া ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে, সে অন্যকে আঘাত করে, তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না ব'লে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে এবং যারা অন্য দিকে আছে তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে ব'লে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারি ভিতের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনতে চায়।...ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার-বিচারকে মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার

নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এই জন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম ব'লে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।"

(রসের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬)

এই সাধনাই অচলায়তনের সাধনা—'অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে' আবদ্ধ। ইহা নীরস, কঠোর, আচারসর্বস্ব, সংস্কারগর্বিত, বিভেদসৃষ্টিকারী, ইহার সঙ্গে রসের সংযোগ না হইলে চরম সার্থকতা নাই। ভগবানের শক্তি অসীম, সর্বব্যাপী, নিয়ম তাঁহার অটল, অচল, ঐশ্বর্য তাঁহার অনন্ত, কিন্তু তিনি যে প্রেমে আমাদের কাছে ধরা দিয়াছেন।—

"যেখানে তিনি সুন্দর, যেখানে 'রসো বৈ সঃ', সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়—সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত কোমলতা!...তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে-ভঙ্গীতে হাসিতে-গানে-রসে-গন্ধে-রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে চরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।"

(রসের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬)

সুতরাং ভগবানকে কেবল অসীম অনন্ত বলিয়া জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে রসময়, প্রেমময়, সৌন্দর্যময় বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানের সহিত রসের যোগ করিতে হইবে, নিষ্ঠার সহিত প্রেমের যোগ করিতে হইবে, নইলে সে-জ্ঞান হইবে দুর্বল, অসম্পূর্ণ ও আত্মঘাতী। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের সহিত রসের সম্বন্ধটি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন,—

এই জীবধারী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না; কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরম রূপ হত, তা হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপর একটা রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেই-খানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ—তার চলাফেরা আসা-যাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় ব'লে, নম্র ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। এই জন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে,

এই জন্যেই কেবল সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এই জন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার এই নিশ্চলতা কাঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন-কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।...

কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণে লীলা। শুষ্কতায়, অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।"

(রসের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৭)

আবার শোণপাংশুদের কর্মে চাঞ্চল্য আছে, উদ্যম আছে, আত্মবিস্মৃতি আছে, কিন্তু আনন্দময় উপলব্ধির রসস্পর্শ নাই—প্রেমময়কে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার জন্য অন্তরের ব্যাকুল কামনা ও বেদনা নাই। তাহাদের অর্থহীন উদ্দামগতি আছে, কিন্তু সার্থক স্থিতি নাই—সার্থক রসময় অনুভূতি নাই।—

পঞ্চক

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না? তুমি যাঁর কথা বলো তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন?

দাদাঠাকুর

তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক

কিন্তু দাদা, আমি তোমার শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি ওরা চোখের জল ফেলতে শেখেনি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

দাদাঠাকুর

যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদের রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে বয়ে আনবে: কিন্তু দেখছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না; ঐ রকমই ওদের স্বভাব।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্য তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু আর-কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।

এই বর্ষণই রসের প্লাবন। ইহার জন্যই পঞ্চকের আকুল আগ্রহ। অচলায়তনের পাষাণগৃহের দারুণ গ্রীষ্মে তাহার কণ্ঠ-তালু শুষ্ক, দেহ-মন তপ্ত—সে ঘননীল মেঘের স্নিগ্ধতা ও বর্ষণ চায়।

দর্ভকদের সাধনা এই রসের সাধনা, কিন্তু তাহাদের রসের মধ্যে হৃদয়াবেগের প্রাধান্যই বেশি। তাহাদের ভক্তির ভিত্তির নীচে জ্ঞানের কাঠিন্য নাই, কর্মের গতি-চাঞ্চল্য ও ত্যাগ-স্বীকার নাই; ইহা অহেতুকী ভক্তির মাদক-বিহ্বলতা। এইপ্রকার ভক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ভক্তির বিকার বলিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণবভক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভক্তি বৈষ্ণব-আদর্শের ভক্তি নয়। ইহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। অনেকস্থলে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ!" (নৈবেদ্য)

"প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।...চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে মোদো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হয়ে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু, নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বর-বিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়—সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সব দিক থেকেই হরণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়।"

(বিকারাশঙ্কা, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৯)

দর্ভকপল্লীতে আসিয়া পঞ্চকের 'মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে,' কিন্তু বর্ষার প্লাবনের দানকে মৃত্তিকার ফলশস্যাশোভাবৃদ্ধিকারী শক্তি-রূপে এখনো সে পায় নাই। কেবল বর্ষার ধারাপাতের আভাস পাইয়াছে।

এই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমস্ত বাধা-বন্ধন দূর করিয়া ও তাহাদের সমন্বয়সাধন করিয়া পঞ্চকের সাধনাকে প্রকৃত সার্থকতার পথে কে লইয়া গেলেন? গুরু। কি করিয়া? প্রথমে তিনি অচলায়তনের উচ্চ প্রাচীর ও লোহার দরজা ভাঙিয়া, জ্ঞানকে তন্ত্রমন্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, অসীমের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন; তারপর সবাইকে আহ্বান করিয়া শোণপাংশুদের গতির তলদেশে স্থিতির আসন-স্থাপনের পরামর্শ দিলেন, আর পঞ্চককে ভাঙা ভিতের উপর বহু-বিস্তৃত করিয়া নূতন ধর্মমন্দির গড়িতে আদেশ করিলেন। অবশেষে মহাপঞ্চককেই সেই মন্দিরের আচার্য করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এখন এই গুরুকে এবং তাঁহার কার্য ও আদেশের তাৎপর্যটিকে বুঝিতে হইবে। দাদাঠাকুরের মধ্যে গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে—দাদাঠাকুরই গুরুর রূপে আসিয়া উপস্থিত। পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 'রাজা'র ঠাকুরদাদা ও অচলায়তনের দাদাঠাকুর একই ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধ এই মহাপুরুষ; জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়মূলক সাধনার মর্ম ইনি অবগত। গীতায় বলা হইয়াছে,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অরূপ ঈশ্বরের পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাস করেন না। ধর্মে, সমাজে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ভগবানের ইচ্ছা মহাপুরুষদের কাছে প্রকটিত হয়—revealed হয়, তখন তাঁহারা ভগবানের অভিপ্রায় কর্মের মধ্যে রূপায়িত করেন; তাঁহারাই অবতারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নূতন আদর্শ, নূতন বোধের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। এইরকম একটি মহাপুরুষ বা মহামানব এই দাদাঠাকুর। ইনি শুষ্ক জ্ঞানের বদ্ধ গণ্ডী ভাঙিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া জ্ঞানের সঙ্গে রসের মাধুর্য, প্রেম-ভক্তির সম্পদ যুক্ত করিলেন। শুষ্ক জ্ঞানের গণ্ডী ভাঙিলেই প্রেম-ভক্তির প্লাবনে মানুষে মানুষে সমস্ত বিভেদ ঘুচিয়া যায়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা লক্ষ্য করিবার বিষয়,—

"খৃষ্ট যে প্রেমভক্তির বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্র-বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করেনি—তার মৈত্রী, তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় ক'রে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়...ধর্মে যখন রসের বর্ষা নামে তখন...সেই পূর্ণতায় সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়।

ধর্মের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে যখন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন তখন সাধককে একথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা, আচার-অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা

তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে, ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।" (রসের ধর্ম)

খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির মতো দাদাঠাকুর এক মহাপুরুষ। ভগবানের স্বরূপবোধ ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার নিজের জীবন পরিচালিত। রবীন্দ্র-অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রকাশ তিনি। তাই জ্ঞানমার্গীদের কাছে তিনি গুরু, কর্ম-মার্গীদের কাছে তিনি দাদাঠাকুর, ভক্তিমার্গীদের কাছে তিনি গোঁসাই ঠাকুর। 'যে জানতে চায় না আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।' আর অচলায়তনের কাছে দর্ভকপাড়ায় যে তিনি প্রায়ই আনাগোনা করেন, তার কারণ—'এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা।' শুধু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী কর্মমার্গীদের কাছে তিনি 'খেলার মানুষ', 'মেলার মানুষ', 'মনের মানুষ', 'একলা হাজার মানুষ'; জ্ঞানমার্গীদের কাছে তিনি শাস্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বিধান-স্বরূপ; আর ভক্তিমার্গী-দের কাছে অতি সহজেই তিনি চলাফেরা করেন, কারণ ভক্তির পথই সবচেয়ে সোজা পথ। এই তিন পথের সাধকেরা ভগবানকে যে যে-ভাবে উপলব্ধি করে, ঠাকুরদাদার এই তিন দলের সহিত পরিচয়ের মধ্যেই তাহা ব্যক্ত। ভগবৎস্বরূপের ছায়া যেন ঠাকুরদাদা-চরিত্রে প্রতিফলিত।

ধর্মের মিথ্যা আচার যখন পরপীড়নের রূপ ধারণ করিয়াছে তখনই দাদাঠাকুরের যুদ্ধায়োজন।—

চতুর্থ শোণপাংশু

আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গিয়েছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর

চলো তবে।

সকলে

ওরে চল্‌ রে চল্‌।

দাদাঠাকুর

আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে, তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু

দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে

দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর

ওদের সেই ভাঙাপ্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরী করে দেব...আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে

হাঁ, চলবে চলবে।

এই যুদ্ধও 'রাজা' নাটকের যুদ্ধের মতোই প্রতীক-যুদ্ধ। জড়তার নিরুদ্বিগ্ন শান্তি

নষ্ট করিয়া, ভ্রান্ত-জ্ঞানের বন্ধ দুয়ার ভাঙিয়া, যুগ-যুগ-সঞ্চিত মিথ্যা আচারের ঘন-অন্ধকার রাত্রির বুক বিদীর্ণ করিয়া মূর্তিমান অশান্তির মতো, নিষ্ঠুর নিদারুণ আঘাতের মতো, ধূমকেতুর করালমূর্তির মতো, ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধসাধক মহাপুরুষদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইঁহারা ভগবানের প্রেরিত দূতস্বরূপ। ইঁহারা আসেন যোদ্ধার বেশে। দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ দেখে তাঁহাদের পরম শত্রুর বেশে।

কারণ তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া, কঠিন আঘাতে মানুষের সকল ভ্রান্তি নির্মূল করিয়া তাহাকে প্রকৃত বোধের পথে, আত্মোপলব্ধির পথে লইয়া যান। ইঁহারা মানবজাতির গুরু-স্বরূপ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগে যুগে ইঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে; যখনই অসত্য-অন্যায়ে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তখনই কঠিন আঘাত হানিয়া ইঁহারা মানবজাতিকে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা আসেন অশান্তির বেশে, শত্রুর বেশে, কিন্তু ইঁহাদের আঘাতের পরিণাম মঙ্গল।

"যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।...আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর মানের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে।" (আমার ধর্ম, আত্মপরিচয়, পৃঃ ৩৯)

তারপর শোণপাংশুদের সাহায্যে যোদ্ধৃবেশী গুরুরূপী দাদাঠাকুর অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—অচলায়তনের সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূর্ত-প্রতীক মহাপঞ্চককে গুরু গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখিলেন।

মহাপঞ্চক

পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ ক'রে এই বসলুম—যদি প্রায়োপ-বেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।...কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু

ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর

ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কি বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর

শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

তারপর যখন পঞ্চকের হাতে গুরু অচলায়তনের পুনর্গঠনের ভার দিলেন, তখন একেবারে মহাপঞ্চকের হাতেই সকলের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

পঞ্চক

আমাকে কি করতে হবে।

দাদাঠাকুর

যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক

সবাইকে কি কুলোবে।

দাদাঠাকুর

না যদি কুলোয় তাহলে এমনি ক'রে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে, সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িও না।

পঞ্চক

শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর

হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।

পঞ্চক

ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ। তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছট্‌ফট্‌ করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর

ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস ব'লে জানে—কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের ক'রে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্য তোমার মহাপঞ্চক দাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক

তাহলে আমার মহাপঞ্চক দাদাকে কি ঐখানেই—

দাদাঠাকুর

হাঁ ঐখানেই বই কী। তার এখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নেই। কী ক'রে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপরই। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ নিদীর্ণ ক'রে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্য ওর হাতে আছে।

মহাপঞ্চক সম্বন্ধে গুরুর এই ধারণা এবং তাহার হাতে নবগঠিত ধর্মায়তনের ভার দেওয়ার মধ্যে গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে।

পঞ্চকের অভাববোধ ছিল কিসের? অচলায়তনের শিক্ষাকে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই কেন? সে বিদ্রোহী কেন? কারণ জ্ঞানের সঙ্গে রসের যোগ ছিল না, কারণ জ্ঞান প্রেমের দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হয় নাই। পুরানো অচলায়তন ভাঙিয়া গুরু সকলকে সেখানে আহ্বান করিয়া রসের যোগের বাধা ঘুচাইলেন বটে, কিন্তু যে-শক্তিটা জ্ঞানের সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং যাহার অভাব তিনি কর্মপন্থী শোণপাংশুদের মধ্যে এবং ভক্তিপন্থী দর্ভকদের মধ্যে দেখিয়াছেন, যে-শক্তি জ্ঞানের ভিত্তি, তাহাকেই দৃঢ় রাখিবার জন্য তিনি মহাপঞ্চককে আহ্বান করিলেন। সে-শক্তি নিষ্ঠার শক্তি, অবিচলিত বিশ্বাসের শক্তি, প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া, বিচার-বিতর্ক-বুদ্ধিকে লোপ করিয়া, জীবন-মরণপণে সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার শক্তি। জ্ঞানকে ধারণ করে এই শক্তি; এই শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ জীবধাত্রী পৃথিবীর সঙ্গে, মানবদেহের অস্থিকঙ্কালের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। (পূর্বের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)

পৃথিবীর এই কঠিন দৃঢ়তা আছে বলিয়া তাহার উপরে আমরা নির্ভরে ও নির্ভয়ে বাস করি, অস্থিকঙ্কাল অভ্যন্তরে আছে বলিয়াই দেহ পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে না। এই শক্তি পূর্ণমাত্রায় মহাপঞ্চকের মধ্যে রূপায়িত। কিন্তু ভিত্তির এই দৃঢ়তার সঙ্গে সৌন্দর্য, গতি, রস, প্রাণ, ভাব, মাধুর্য নাই বলিয়া তাহার সাধনা অপূর্ণ। আবার শোণপাংশু ও দর্ভকদের সাধনার গতি আছে, কিন্তু দৃঢ়ভিত্তি নাই। তিনি মহাপঞ্চকের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইহাদের গতি ও রস যোগ করিতে পারিলেই সাধনার সার্থকতা আসিবে। তাই গুরুর মহাপঞ্চককে শিক্ষকের আসনে বসাইবার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে দৃঢ়তা ও রসের সম্মেলনই আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার সার্থক রূপ। নিত্যস্থিতির উপর নিত্যগতির লীলাই ইহার মর্মকথা। তাই মহাপঞ্চকের সহিত পঞ্চকের মিলনেই ইহার যথার্থ পরিপূর্ণতা।

এইবার আচার্য-চরিত্রের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। প্রকৃত জ্ঞানের সাধনা কি করিয়া বন্ধ ও ব্যর্থ জ্ঞানসাধনায় পরিণত হয়, তাহার ইতিহাস যেন আচার্যের জীবনে আভাসিত। আচার্য সত্যকার জ্ঞানসাধক, এই সাধনার অনুপ্রেরণা তিনি গুরুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সংস্কারের হৃদয়হীন পুনরাবৃত্তিতে সে-সাধনা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া রসহীন, বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। আচার্য তাহা বুঝিয়াছেন: তাঁহারই পরিচালনার ত্রুটিতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই। এই আয়তনের অধ্যক্ষ হিসাবে গুরুর কাছে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে, তাঁহার দায়িত্ব-পালনের ত্রুটিতেই যে এই সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হইবে, তাই গুরুর আগমন-সংবাদে তাঁহার মনে সংশয়, ভয়।—

> দেখো সুতসোম, অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠ্‌ছে, কাউকে বলতে পারছিনে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন এক্‌লা চুপ ক'রে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন ক'রে এসেছি। কিন্তু যে দিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছিনে। সে কেবলি আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই ব'লে ব'লে উঠছে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।...প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেই জন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার

পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি ব'লে একটা কিছু আছে। আজ গুরু আসবেন বলে মনটা থমকে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হোলো, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল মূর্খ কী পেয়েছিস। কিছু না, কিছু না, সুতসোম, আজ দেখছি—অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠছে।...আমার তো মনে হচ্ছে এই সমস্তই স্বপ্ন, এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডী, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপর্বের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপ্ন।—

এই সাধনার ব্যর্থতার স্বরূপ সম্বন্ধে নিজে তিনি সচেতন, কিন্তু ইহা এতোই প্রাচীন ও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ যে, নূতন-কিছু করিবার সাহস তাঁহার নাই। তাই আবার বলেন,—

না, না, তবে আমি ভুল করছিলুম সুতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে, এইই ঠিক, এই-ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।...অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি।...অনেক বছর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই।

কিন্তু আচার্য জানেন যে, এই সাধনা রসহীন হওয়ার জন্য ব্যর্থ, সংকীর্ণ, শুষ্ক, তাই পঞ্চকের মধ্যে রসের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া, তাহার বিদ্রোহ দেখিয়া তিনি মনে-মনে পঞ্চককে ভালোবাসেন, অভিনন্দিত করেন।—

তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না, তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন যন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও।—

প্রায়শ্চিত্তের কোনো সার্থকতা নাই জানিয়া তিনি সুভদ্রকে অভয় দেন।—

তুমি কোনো পাপ করোনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত ক'রে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই।

শেষে তিনি এইজন্য অচলায়তন হইতে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করিলেন।

তিনি গুরুর অপেক্ষায় আছেন, গুরু আসিয়াই এই শুষ্ক সাধনার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে প্রকৃত সাধনার মধ্যে আবার উন্নীত করিয়া লইবেন, তাঁহার ব্যর্থতাকে গুরুই সফল করিবেন। তাই তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদিগকে বলিতেছেন,—

গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম: তার শুক্‌নো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে। অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের

লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

তারপর গুরু যখন আসিলেন, তখন আচার্য তাঁহার ব্যর্থ সাধনার কথা গুরুকে অকপটে নিবেদন করিলেন। অচলায়তনের সাধনার ব্যর্থতার স্বরূপটি উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

দাদাঠাকুর

আচার্য, তুমি এ কী করেছ।

আচার্য

কী যে করেছি তা বোঝাবার শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর

যিনি তোমাকে মুক্তি দিবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য

কিন্তু বাঁধতে তো পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বেঁধেছি মনে ক'রে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারিদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর

যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে ব'সে আছেন, তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য

তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায়নি ব'লেই মনে ক'রে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিন রাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি।

দাদাঠাকুর

তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না, সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না ক'রে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য

আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর

যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের ক'রে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

অচলায়তনের সাধনার ব্যর্থতা দূর করিয়া তাহাকে সার্থক করা হইলে আর তো আচার্যের কাজ নাই। জীবনে তো তাঁহার এই উপলব্ধি আসিয়াছে, তিনি এখন সিদ্ধসাধক, মুক্তপুরুষ, পুনর্গঠিত অচলায়তনের শিক্ষার ভার তো পঞ্চকই গ্রহণ করিল, সুতরাং অধ্যক্ষের দায়িত্বও আর তাঁহার নাই। তাই গুরু তাঁহাকে সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া রসময় জ্ঞানসাধনার সিদ্ধ-সাধকরূপে সঙ্গী করিয়া লইলেন।

এখন নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও কবি-মনের পশ্চাদ্‌ভাগের একটি ধারণা বা চিন্তা এই নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা কবির ইতিহাস-চেতনা বা সমাজসমস্যা-চেতনার রূপ। কবির নিজের বক্তব্যেই এইটি প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং তাহার আলোচনা একটু প্রয়োজন।

অচলায়তন আমাদের ভারতবর্ষ। অতি সুপ্রাচীন কালে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আদি-গুরু সাধনক্ষেত্ররূপে তপোবনরূপে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই আদি-গুরু উপনিষদের ঋষিরা। তাঁহাদের সাধনা ছিল জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের পথে মুক্তির সাধনা। তারপর সাধনার উদ্দেশ্য কেন্দ্রচ্যুত হইল, এই সাধনায় নানা বাধা ও জঞ্জাল-সৃষ্টির ফলে শেষে অচলায়তনের মত সংকীর্ণ বদ্ধরূপের মধ্যে ইহা আবদ্ধ হইল। তপোবনের পরিবর্তে মঠ ও মন্দির-আয়তন অধ্যাত্ম-বিদ্যার স্থানে পরিণত হইল; গুরু হইলেন সিদ্ধাচার্য ও পুরোহিত। এই যুগকে আমরা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা ও আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের যুগ বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। এই যুগে ধর্মের প্রসার গেল, সকলকে আহ্বান না করিয়া সকলের বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করা হইল, বিধি-নিষেধের উঁচু প্রাচীর খাড়া করা হইল। দেখা দিল সাধনার একটি বদ্ধ ও বিকৃত রূপ। তারপর যেন ভগবানের ইঙ্গিতে অদৃশ্য গুরুর পরি-চালনায় বাহির হইতে উন্মুক্ত কর্মপন্থীর দল সেই প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া সেই অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িল। অচলায়তনের নিষ্ক্রিয় শান্তি নষ্ট হইল; 'লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া' প্রবেশ করিয়া আত্মকেন্দ্রিক, যন্ত্রবৎ মন্ত্র-আবৃত্তি ও ন্যাসপ্রাণায়ামের দিনের অবসান ঘটাইল। ইহারাই শক, হূণ, যবন, পারদ, পাঠান, মোগল এবং শেষে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি। এই শোণপাংশুর দল বার বার ভারত-অচলায়তনে ঢুকিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া বাইরের আলো-হাওয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে। তারপর ভারত তাহাদের গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সমস্ত শক্তি নিজেদের শক্তির সহিত মিশাইয়া নূতন করিয়া, বৃহৎ করিয়া আয়তন গড়িয়াছে। 'স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে', উভয়ের মিলনের ফলে নূতন শুভ্র সৌধকে 'আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড়' করানো হইয়াছে। এই সমন্বয়-সাধনের শক্তি ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত শক্তি—ইহাই তাহার সভ্যতার প্রাণবস্তু।

শোণপাংশুরা যদি কর্মসর্বস্ব, উদ্দাম, চঞ্চল, বিদেশী জাতির প্রতীক হয়, তবে দর্ভকেরা কি? তাহারও সংকেত কবি দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দর্ভকেরা আমাদের দেশীয় অনার্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণী—শবর, পুলিন্দ, ব্যাধ, কোল, ভীল ইত্যাদি। ইহারা জ্ঞানের ধার ধারে না, ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানও ইহারা করে না, কেবল সরল ভক্তিতে ভগবানকে ডাকে, কেবল 'নাম গান' করে। আচারমার্গীদের মতে তাহারা অন্ত্যজ, পতিত জাতি। কিন্তু তাহারাও এই ভারতবর্ষেরই একটা জাতি, তাই কবি তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন অচলায়তনেরি মধ্যেই—একটা স্বতন্ত্র পাড়ায়। রাজা আচার্য অদীনপুণ্যকে নির্বাসিত করিবার সময় বলিতেছেন,—'আয়তনের বাহিরে নয়...আমার পরামর্শ এই যে আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে, এ কয়দিন সেইখানেই তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।'

কবির বক্তব্য এই মনে হয় যে, ভারত অনার্যদের সাধন-বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করিয়া নিজের ধর্মমতের সহিত যুক্ত করিয়া এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গড়িয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় ইহাদের ভক্তি-অংশও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভাবে বারবার অচলায়তন ভাঙিয়া নূতন নূতন জাতির বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া ভারত বৃহৎ ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া নূতন নূতন প্রাচীর গড়িয়াছে—ধর্মের গণ্ডীকে, জীবনের গণ্ডীকে বহুদূর প্রসারিত করিয়াছে এবং বারে বারে মূল-সাধনার ধারাকে অব্যাহত রাখিয়া নব নব রূপবৈচিত্র্যে তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহাই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃতির যোগ্য,—

"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"...

"ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতে বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাবোধ কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।"...

"একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতি সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"

(ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, পৃঃ ৪৫-৪৬)

'অচলায়তন' নাটকটি প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে ভাঙিতে চাহেন, হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্রকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন প্রভৃতি বলিয়া একশ্রেণীর লোক তাঁহাকে দোষারোপ করে। সমসাময়িককালে এই বিষয় লইয়া বেশ একটু চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হয়। ইহার উত্তরে সুরসিক সমালোচক বিখ্যাত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি যে পত্রগুলি লেখেন, সেগুলির মধ্যে 'অচলায়তন' সম্বন্ধে কবির যথার্থ মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় সেগুলি উদ্ধৃতির যোগ্য।—

"অচলায়তনে গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি বলেন নাই—না যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে। গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।"...

"মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।...কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না—তখন মনন ঘুরিয়া গিয়া সে উচ্চারণ-ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়া রচিত, তাহাই চিত্তকে বন্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রুজয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে।"...

"অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব।...সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব অথচ তাহা আহত হইবে না ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।...নিজের দেশের আদর্শকে যে-ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণে আঘাত করিবে ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিলেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে।...ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না, কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব। অন্তরের যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র—অন্তরের সেই পাপগুলোকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে—যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে, আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি? আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দিশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।"

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৬-৫১০)

অবশ্য এখানে কবি হিন্দুসমাজকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু অচলায়তন বৌদ্ধ-বিহারেরই বেশী সাদৃশ্য বহন করে এবং মন্ত্রতন্ত্রগুলিও বৌদ্ধতন্ত্রের মন্ত্রেরি মতো। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal'-এ এই সব মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

এইবার ইহার নাটকীয় কলাকৌশল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

এখানে এ-কথাটি আবার স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সাধারণ নাটকের মানদণ্ডে ইহাদের বিচার হইবে না। এখানে প্রধান বিচার্য—তত্ত্ববস্তু রসরূপে রূপায়িত হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে কিনা। অবশ্য নাটকে হৃদয়গ্রাহিতার একটা প্রধান উপাদান চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি, কিন্তু এইপ্রকার নাটকেও ভাবের রসসঞ্চারের মধ্যে অনেকখানি হৃদয়গ্রাহিতার উপাদান আছে। ভাবের বিগ্রহ যদি কিছুপরিমাণ বাস্তবের সাদৃশ্য বহন করে, তবে রূপ ও ভাবের মণিকাঞ্চন-

যোগ হইয়া এইজাতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের উদ্ভব হয়,—যেমন আমরা 'রাজা' নাটকে দেখিয়াছি। অচলায়তনের নাট্যকৌশল 'রাজা'র মত উচ্চাঙ্গের নয়, তবুও চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু পরিমাণে, এবং আবহাওয়া-সৃষ্টিতে বিশেষ করিয়া, কলাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাপঞ্চকের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাপঞ্চকের চরিত্রটি একটি পরিপূর্ণ রূপক-সৃষ্টি। এই চরিত্রটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব, যুক্তিহীন, আচারনিষ্ঠ, তন্ত্রমন্ত্র-বিশ্বাসী গোঁড়া প্রাচীন-পন্থীর রূপক। ইহার অভিব্যক্তি স্থির, নির্দিষ্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। দিব্যানুভূতি বা অতি-জাগতিক চেতনার বিন্দুমাত্র স্পর্শ ইহার চরিত্রে নাই—আগাগোড়া নির্দিষ্ট একটি পোশাক-পরা। পঞ্চক ও আচার্য সাংকেতিক চরিত্র। তাহারা অচলায়তনের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু মন তাহাদের দূর-জগতে, কি এক অদৃশ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের চিত্ত লালায়িত। অচলায়তনের শুষ্ক জ্ঞানের তাপে তাহাদের চিত্ত তাপিত, কণ্ঠ তৃষ্ণারুদ্ধ, কেবল তাহারা রসের বর্ষণ ও প্লাবন কামনা করিতেছে।

এই নাটকে সাংকেতিক নাটকের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ-সৃষ্টিতে। বহু-প্রতীক্ষিত, আসন্ন নববর্ষার আগমনের মধ্যে নাটকের মূলভাবটির সংকেত নিহিত করা হইয়াছে। অচলায়তনের সাধনা, জীবন যেন শুষ্ক, নিদাঘ-তপ্ত, পঞ্চক ও আচার্য এই তাপ ও শুষ্কতায় কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া নববর্ষার সন্তাপহারী জলধারাপাতের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। পঞ্চক রসসাধনার প্রতীক দর্ভকদের পল্লীতে নির্বাসিত হইয়া অদূর-বর্তী আসন্ন বর্ষার আগমন বুঝিতে পারিতেছেঃ 'মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।' গুরুর আবির্ভাবও আসন্ন, গুরুই তো এই নববর্ষার বারিধারা।

পঞ্চক

আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর বজ্র। আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিল যে।

আচার্য

ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক

মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই সে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

এই বর্ষার আগমনের মধ্যে গুরুর আগমন সংকেতিত হইয়াছে। গুরু এই নববর্ষার জলভরা মেঘ। গুরুর মধ্যে কেবল স্নিগ্ধতারই সমাবেশ নাই। আছে বজ্র, আছে বিদ্যুৎ। বজ্রের কঠিন আঘাতে অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া বিদ্যুতের তীব্র জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করিয়া তিনি আসিয়াছেন। তাই তাঁহার যোদ্ধৃবেশ। শেষে অবিরল বর্ষণে অচলায়তনের জীবনে ও কর্মে আনিলেন রসের প্লাবন। পঞ্চক ও আচার্য এই বর্ষার আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিল। গুরুর আগমনে তাহাদের গ্রীষ্মসন্তাপ জুড়াইল, অচলায়তনের শুষ্কতা ও কাঠিন্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল সরস শ্যামলশ্রী। বজ্রবিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘরূপী গুরু তাই বলিয়াছেন,—

ভাবনা নেই আচার্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর্ ঝর্ শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে।

ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কা'রা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ম বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ দুর্যোগ এ'কে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

সংকেতের এমন অব্যর্থ ও অপূর্ব কাব্যময় প্রয়োগ কবির অসাধারণ শিল্পকৌশলের নিদর্শন। 'শারদোৎসবে', 'রাজা'য়, 'অচলায়তনে', 'ফাল্গুনী'তে কবি প্রকৃতিকে নাটকের মূল ভাবের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট সাংকেতিক শিল্পকৌশল।

ডাকঘর

(১৩১৮)

'ডাকঘর' নাটকের আকারে লিখিত হইলেও ইহাতে নাট্য-ধর্ম বিশেষ কিছু নাই। সুসংবদ্ধ প্লট বা আখ্যানভাগ ইহার নাই; ইহা একটিমাত্র ঘটনার নানা সংলাপ-মুখর বিবৃতি-মাত্র। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটি যেন একটি গীতিকবিতা—একটিমাত্র ভাবের কেন্দ্র হইতেই ইহার বিকাশ। একটি শান্ত, রুগ্ন, অসহায় বালকের অদম্য কৌতূহল, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও তাহার শেষ পরিণাম একটি করুণ-মধুর সুরসৃষ্টি করিয়া সমস্ত কথাবস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আমাদের হৃদয়কেও গভীরভাবে স্পর্শ করিতেছে। ইহার মধ্যে বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন বিচিত্র চরিত্রের রেখাপাত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য সম্মিলিত হইয়া একটিমাত্র ভাবের রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সংগীতের একটি তানের মধ্যে যেমন বিভিন্ন স্বরগ্রাম মিলিত হয়, উপলমুখর নানা নির্ঝরিণী যেমন একটি প্রবাহমান ধারাকেই পুষ্ট করে, তেমনি বিচিত্র চরিত্রের কার্য ও ভাষণ মিলিত হইয়া এক রুগ্ন বালকের অধীর আগ্রহের শেষ পরিণামরূপে একটি অখণ্ড, করুণ সংগীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই গীত-ধর্মী নাট্যবস্তু আমাদের ভাবলোকে এক অননুভূতপূর্ব আলোড়ন তোলে, এই অনুভূতি ও কল্পনার আলোড়নে কবির সংকেত একটি রাগিণীর মতো আনন্দবেদনায় আমাদের চিত্তে মুদ্রিত হয়। সাংকেতিক নাটকের ইহা এক অভিনব শিল্পকৌশল। এই শিল্পরীতি রবীন্দ্র-নাথের অন্য কোনো রূপক-সাংকেতিক নাটকে অনুসৃত হয় নাই। 'রাজা' নাটকের বাহিরের আখ্যানভাগটি সুবিন্যস্ত ও নাটকীয় গুণে সমুজ্জ্বল, 'অচলায়তনের' আখ্যানবস্তুটি অতটা সুসংবদ্ধ না হইলেও স্থানে স্থানে অপ্রত্যাশিত ঘটনার দ্রুত সংঘটনে নাটকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেমন—গুরুর আগমন, প্রাচীর ভাঙা, মহাপঞ্চকের বাধাদান, ছেলেদের অপর্যাপ্ত আলো-বাতাসের আনন্দোচ্ছ্বাস-সংবলিত পঞ্চম দৃশ্যটি। পরবর্তী নাটকগুলিতেও ঘটনা-সংস্থান ও আখ্যানবস্তু-সন্নিবেশের মধ্যে কমবেশি নাটকীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কিন্তু 'ডাকঘর'-এর সমস্ত বৈচিত্র্য ও নাটকীয়ত্ব মিলিয়া একটিমাত্র ভাবরসকেই উৎসারিত করি-তেছে; তাহারই অনুরণন সমস্ত হৃদয়তন্ত্রীকে অনির্বচনীয় কারুণ্য ও মাধুর্যে ঝংকৃত করি-

তেছে। ভাবের নাটকীয় রস-আস্বাদন অপেক্ষা নাট্যরূপায়িত ভাবের এই গীতিরস-পরিমাণ-আস্বাদন ইহাকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং রসিকমনে ইহার একটি নূতন আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। আরো একটি বৈশিষ্ট্য, ইহাতে কোনো গান নাই, অথচ গান রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় নাটকে ভাবপ্রকাশের একটা শক্তিশালী মাধ্যম। তাহা সত্ত্বেও এই নাট্যরূপী 'গদ্যলিরিক' অপূর্ব ভাবের মূর্ছনা সৃষ্টি করিয়া আমাদের বোধ, অনুভূতি ও কল্পনাকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

এখন এই নাটকের ভাববস্তু ও তাহার রসরূপে রূপায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, ইহা কবির 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতালি'-যুগে রচিত; তখন কবি-মানস যে-ভাবচক্রের মধ্যে ছিল, সেই ভাবই কমবেশি প্রতিফলিত হইয়াছে 'রাজা-অচলায়তন-ডাকঘরে'। ভগবদনুভূতিই এই যুগে কবি-মনের মূল-প্রেরণা। এই অনুভূতি বা উপলব্ধি কবির এই যুগের কাব্যে, গানে, নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রাজা' ও 'অচলায়তনে' ইহা আমরা দেখিয়াছি। 'ডাকঘরে' দেখি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য মানবাত্মার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। অসীম ও অনন্তের জন্য মানবাত্মার পিপাসা, নির্দেশহীন সুদূরের জন্য উৎকণ্ঠা ও তাহার পরিণাম অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্যে রূপায়িত হইয়াছে 'ডাকঘরে'।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের সমকালীন একটা বিশিষ্ট অনুভূতি বা ভাবদ্বন্দ্ব ইহার পটভূমিকায় বর্তমান থাকায় ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য আরো অব্যর্থভাবে বর্ধিত হইয়াছে। বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার মিলিত হইবার যে-আকাঙ্ক্ষা, অমলের মধ্যে তাহাই রূপায়িত। অমল এই মিলনকামী উৎকণ্ঠিত আত্মার প্রতীক।

ভগবানের সহিত মানুষের নিত্যপ্রেমসম্বন্ধ। 'রাজা' নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অনাদি অনন্ত কাল হইতে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মধ্য দিয়া মানবাত্মাকে তিনি বহন করিয়া আনিতেছেন। নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর হইতে অণু-পরমাণুকে চালনা করিয়া কতো পুষ্টি, কতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন, কতো পরিণতির মধ্য দিয়া বর্তমান শরীরে তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সৃষ্টি ভগবানের আনন্দরূপ, মানবাত্মাও সেই আনন্দরূপেরি অংশ। এই নিখিল পরিব্যাপ্ত করিয়া ভগবানের যে-আনন্দরূপ, তাহার সহিত রহিয়াছে মানুষের নাড়ীর যোগ, একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন, উভয়ে একই পরমানন্দের বিভিন্ন প্রকাশ। অসীম সৃষ্টির অণু-পরমাণুর সহিত অগণ্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকা, জল-স্থল-আকাশ-বাতাসের সহিত মানবাত্মার নিবিড় একাত্মতা, সেই অনাদিকালের আনন্দরূপের স্পর্শ তাহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই আনন্দের মধ্য হইতেই সে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উন্নীত হইয়াছে। এই আনন্দের মধ্যে সচল প্রাণের লীলা, এই প্রাণতরঙ্গই বিচিত্র সৌন্দর্যরূপে প্রকাশিত। পরমানন্দের অভিব্যক্তিই এই লীলাময় সৌন্দর্যে। জল-স্থল-আকাশে নানা বর্ণ-গন্ধ-গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন, তাহা অনুক্ষণ মানবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে; মানুষ সেই নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্যের মূলকারণ অসীম আনন্দময় সত্তার সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এই আনন্দের মধ্যেই তাহার চরম স্থান ও পরম সার্থকতা। বিশ্বের এই তরঙ্গিত সৌন্দর্যলীলায় মানুষের অন্তরাত্মা এক গূঢ় বেদনা অনুভব করে; সে-বেদনা অসীম ও অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষার বেদনা, তাই নিজেকে বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অসীম, অনন্ত ও আনন্দময় সত্তাকে সে

উপলব্ধি করিতে চায়। আবার পরম প্রেমময় ভগবানও তাঁহার প্রেমলীলার সহচর মানুষকে বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্যদূতের মারফতে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টিতে পরমানন্দময়ের প্রকাশ সৌন্দর্যে, মানবাত্মায় প্রেমে, উভয়ই একই আনন্দের লীলা; আনন্দের এক অংশ দ্বারা তিনি অন্য অংশকে আকর্ষণ করিতেছেন। আনন্দই সৃষ্টির মূলকারণ, আনন্দের মধ্যেই ইহার অবস্থিতি ও আনন্দই শেষ পরিণাম। এই আনন্দের দ্বারা আকর্ষণ না করিলে রসময় প্রেমলীলাই তো চলে না। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে মানুষ এক অনুপম অতুলনীয় সৃষ্টি, তাহার মধ্যেই যে ভগবানের বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব, বিশেষ লীলা, তাই এই লীলার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া বিশ্বরূপ ভগবান ক্রমাগত মানুষকে নিকটে ডাকিতেছেন। তাহা হইলে মানুষের অন্তরাত্মা সৃষ্টির সৌন্দর্যের প্রতি মূলসম্বন্ধের জন্য একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে এবং এই বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্য দিয়া চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করিতে চায় এবং চিরসুন্দর বিশ্বেশ্বরও বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্য দিয়া মানুষকে আকর্ষণ করিয়া লাভ করিতে চান।

এখন এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার, এই মিলন সার্থক হইবার বাধা কি? বাধা অহংবোধের প্রাবল্য, রিপুর তাড়না, প্রবৃত্তির কলুষময় উত্তেজনা, স্বার্থপরতা, সাংসারিকতার আবিলতা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি নির্মল, নিষ্কলুষ মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া বাধা ঘটায়। কিন্তু শৈশবে—মানবাত্মা যখন থাকে শুদ্ধ, নিষ্পাপ, নির্মল, তখন কে বা কাহারা তাহার স্বভাবসিদ্ধ অসীম ও অনন্তের তৃষ্ণাকে রুদ্ধ করে, আনন্দের মধ্যে, অমৃতের মধ্যে সার্থক হইবার তাহার কামনাটিকে নির্মূল করে, তাহার মিলনের আকাঙ্ক্ষাটিকে দমন করে? এই বাধা ঘটায় সংসারের চিরাচরিত মিথ্যা প্রথা, অভ্যাস ও সংস্কার-ধর্ম, সমাজের মিথ্যা রীতি নীতি, উদ্দেশ্যমূলক স্বার্থপর শাসন, তাহার আবিলতাময় সাংসারিক পরিবেশ। এই মিথ্যা প্রথা ও সংস্কারের প্রতিনিধি ধর্মের ব্যাখ্যাতা বা শাস্ত্রব্যবসায়ীরা, শিশুর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজন (যেমন কবিরাজ ও মাধব দত্ত); সমাজের মিথ্যা রীতিনীতির প্রতিনিধি সমাজপতি বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা (যেমন মোড়ল)। ইহারা তাহাকে একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া চাপ দিয়া, ঢালাই-পেটাই করিয়া গড়িয়া তোলে একটি নির্দিষ্ট আকারে, তাহার অনাবিল আদিম সত্তাকে রূপায়িত করে একটা কৃত্রিম আকারে। সে তাহার সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, আনন্দ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং চিরমুক্ত হইয়াও বদ্ধ কারাগারে অবরুদ্ধ হয়। সংসার ও সমাজের চাপে নিষ্পেষিত অসহায় এই শিশুর অন্তরাত্মা নিদারুণ বেদনা অনুভব করে। অমলের অন্তর্জীবনের ইতিহাসে এই করুণ বেদনার চিত্রটি আমরা লক্ষ্য করি।

শিশুর অন্তরাত্মা তাহার অনাবিল ও অবিকৃত সত্তায় বর্তমান থাকায় অসীম, আনন্দময়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সার্থকতা-লাভের যে-সহজাত আকাঙ্ক্ষা এবং পরম-প্রেমময়ের যে-চিরন্তন আহ্বান ও আকর্ষণ, তাহা সে সুতীব্রভাবে অনুভব করে। সে যে অনন্তপথের যাত্রী—বিশ্বপথিক, পথের ধারের কোনো পান্থশালাই যে তাহার চিরবিশ্রামের স্থান নয়, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় চালক সহযাত্রীর সহিত জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমাগত পথ চলাতেই যে তাহার সার্থকতা—এই চরম সত্য তাহার নিকট সুস্পষ্ট ও অবিকৃত থাকে; আর, এই অনুভূতি তাহার মধ্যে প্রবল থাকায় সে কেবলই বাহিরের সর্বব্যাপ্ত জীবনের মধ্যে ছুটিয়া যাইতে চায়; একটা অনির্দেশ্য, অবাস্তব ভাব-কল্পনায় নেশায় মত্ত হইয়া থাকে

এবং তাহার সংসার ও সমাজজীবনের সহিত নিজেকে কিছুতেই খাপ-খাওয়াইতে পারে না। ইহাই শিশু-জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। সে যদি বয়স্ক হইত, তবে জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত বাধা দূর করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু সে দুর্বল ও অসহায়, তাই সংসার ও সমাজের নিকট তাহার আত্মসমর্পণ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। অমলের এই করুণ অসহায় ভাবটি আমাদের চিত্তকে স্বভাবতই আঘাত করে—ভারাক্রান্ত করে।

এই বন্ধ অবস্থা হইতে তাহার মুক্তির উপায় কি? এই বন্ধনের বেদনা-শান্তির ঔষধ কি? এই বেদনা তো কেবল মানবাত্মাই অনুভব করিতেছে না, এই মানবাত্মাতে যাঁহার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ প্রেম, সেই পরমাত্মাও এই বেদনা অনুভব করিতেছেন। পরমাত্মার আনন্দের অংশই তো জীবাত্মা। অসীমই তো প্রেম-আস্বাদনের জন্য তাহার মধ্যে সসীম হইয়াছেন। উভয়ের একই স্বভাব, একই সত্তা। মানবাত্মার পীড়নই তাঁহার পীড়ন। তাই ভগবান তাহাকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হন; মানবাত্মার দেহ-রূপ আশ্রয়টিকে ভাঙিয়া তিনি তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার তাঁহার পরমানন্দের মধ্যে তাহার সার্থকতা দেন। এই মুক্তিই আসে মৃত্যুর রূপ ধরিয়া। মৃত্যুর দ্বারাই নির্মল, নিষ্পাপ আত্মা তাহার চিরন্তন, মুক্ত আনন্দময় সত্তা ফিরিয়া পায় এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করে। মৃত্যু তো শেষ নয়, ধ্বংস নয়, অবলুপ্তি নয়,—সে তো নবজীবনের সিংহদ্বার, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের অবতরণিকা, সে তো মানবের পরম বন্ধু। তাই মৃত্যুই অমলের মুক্তির দূত—তাহার পরমবন্ধু।

'রাজা' ও 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ বয়স্কদের অন্তরাত্মার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াছেন। কি করিয়া অহংবোধ নির্মল আত্মাকে আচ্ছন্ন করে, কি করিয়া ভোগাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির উত্তেজনা তাহাকে কলুষিত করে, মিথ্যা জ্ঞান ও সংস্কার তাহাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে, পরে নানা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া কি করিয়া পুনরায় সে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায়, কি করিয়া তাহার আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করে—ইহাই কবি উপস্থাপিত করিয়াছেন এই দুই নাটকে। ইহা পরিণত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস—তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ। এই বাধা তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়া অন্তরাত্মাকে আবিল ও পীড়িত করিয়াছিল; নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকৃত বোধ ফিরিয়া আসাতেই অস্বাভাবিক অবস্থার শেষ হইয়াছে, আত্মোপলব্ধির দ্বারা এই মানবজীবনেই তাহার মুক্তি ঘটিয়াছে। এ-বাধা তাহাদেরই সৃষ্টি, মুক্তিও তাহাদেরই কষ্টার্জিত। কিন্তু অপরিণতশক্তি, পরনির্ভর, অসহায় শিশুর আত্মোপলব্ধির বাধা তাহার নিজের সৃষ্ট নয়, ইহার অপসারণের উপায়ও তাহার নিজের হাতে নাই, সুতরাং এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে তাহার মুক্তির পথ বাহিরের কোনো শক্তির উপর নির্ভর করে। পূর্ব-নাটক দুইটিতে দেখিয়াছি, ভগবান কোনো অবস্থাতেই মানুষকে পরিত্যাগ করেন না, শুভবুদ্ধির প্রেরণা দিয়া, ভীষণ আঘাতে তাহার মোহাবরণ ভাঙিয়া, তাহার মুক্ত নির্মল স্বরূপ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন; জীবনের মধ্য হইতেই, সংসারের পারিপার্শ্বিকের মধ্য হইতেই তাহাদের মুক্তির উদ্ভব হয়, কিন্তু শিশুর বেলায় তিনি বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া তাহাকে মুক্তি দেন। শিশুর অন্তরাত্মার এই আধ্যাত্মিক সমস্যাটি রূপায়িত হইয়াছে 'ডাকঘর' নাটকে অমলের চরিত্রে।

এইবার নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক্। প্রথমেই আখ্যানভাগের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

মাধব দত্ত পাকা বিষয়ী লোক। বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়া সে অর্থসঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু সে নিঃসন্তান। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো বাপ-মা-মরা অমলকে সে কিছুদিন হইল পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি তাহার বড়োই মনে লাগিয়াছে, কিন্তু ছেলেটি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য মাধব দত্তের ভাবনার অন্ত নাই। কবিরাজের পরামর্শে সে অমলকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, 'শরতের রৌদ্র ও হাওয়া দুই-ই অমলের পক্ষে বিষবৎ', তাহাকে ঘরের বাহির হইতে দেওয়া নিষেধ। কিন্তু অমলের প্রাণ বাহিরে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করে। জানালার কাছে বসিয়া সে দূরপাহাড়ের দৃশ্য দেখে; নীল আকাশ যেন তাহাকে হাত তুলিয়া ডাকে; ছাতুর পুঁটুলি-বাঁধা-লাঠি-কাঁধে পথিককে ঝরনার জলে পা ডুবাইয়া পার হইয়া যাইতে দেখিয়া সে-ও তাহারি মতো পথে বাহির হইতে চায়। জানালার পাশ দিয়া দইওয়ালা যায়, সে ডাকিয়া তাহার সহিত আলাপ করে ও তাহারি মতো সুর করিয়া 'দ-ই' বলিয়া ডাকে; প্রহরীকে রাস্তায় পায়চারি করিতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া আলাপ করে এবং তাহার নিকট হইতে বাড়ীর সামনে রাজার ডাকঘর বসিবার সংবাদ শোনে; ছেলের দল তাহার সামনের রাস্তায় খেলা করে; শশী মালিনীর মেয়ে সুধাকে সে ডাকে, তাহার কাছে ফুল চায়। ঘরের বাহিরের বিচিত্র লোক ও তাহাদের কর্ম অমলের মন কাড়িয়া লয় এবং তাহাদের সহিত মিশিতে না পারিয়া সে বেদনা ও উৎকণ্ঠা বোধ করে।

বাড়ীর সামনে রাজার ডাকঘর বসিয়াছে শুনিয়া অমল রাজার চিঠি পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, মনে করে রাজা তাহাকে একদিন চিঠি লিখিবেন। ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুরদা বলে যে, তাহার নামে রাজার চিঠি রওয়ানা হইয়াছে, সে-চিঠি এখন পথে। অমল রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ব্যাকুল। এদিকে গ্রামের মোড়ল এই কথা শুনিয়া একদিন মাধব দত্তের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যঙ্গ করিয়া এক টুকরা সাদা কাগজ অমলের হাতে দিয়া বলিল, এই যে অমলের নামে রাজার চিঠি আসিয়াছে। অমল পড়িতে জানে না, সে মোড়লের কথা বিশ্বাস করিয়া ঠাকুরদাকে সেই চিঠি পড়িতে দেয়। ঠাকুরদা বলে, 'এ পরিহাস নয়, সত্যই রাজা লিখেছেন, তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজ-কবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।' সেদিন সন্ধ্যার পরই রাজদূত বদ্ধদ্বার ভাঙিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া জানাইল, 'রাজা আজ দুপুর রাত্রে আসবেন; আর তাঁর বালক-বন্ধুটির দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো রাজকবিরাজকে পাঠিয়েছেন।' রাজকবিরাজ আসিয়া বদ্ধ ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া অমলের শিয়রে বসিয়া বলিলেন, 'ওর ঘুম আসছে, প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও,—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক। ওর ঘুম এসেছে।' অমল ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময় শশী মালিনীর মেয়ে সুধা ফুল লইয়া ঘরে ঢুকিল। সে দেখিল অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কখন জাগবে?' রাজকবিরাজ বলিলেন, 'এখনি যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।' সুধা বলিল, 'তখন একটি কথা তার কানে কানে বলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।'

বিশ্বের বাধাহীন, বন্ধনহীন, সীমাহীন পরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিবার প্রবল ইচ্ছা মানবাত্মার সহজাত। ইহাতেই তাহার অসীমত্ববোধ পূর্ণ হয়, ইহাতেই তাহার সার্থকতা। সমস্ত সৃষ্টি পরমাত্মার আনন্দরূপ, নিখিল বিশ্ব তাঁহারি বিচিত্র সৌন্দর্যের মহামহোৎসবক্ষেত্র। এই আনন্দরূপ পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যোগযুক্ত হওয়াই চরম

আধ্যাত্মিক সফলতা। নিষ্পাপ, অমলিন মানবাত্মা ইহাই তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। তাই অমল বিশ্বের বিচিত্র আনন্দময় প্রকাশের মধ্যে অনির্বচনীয় কৌতূহল ও রহস্যের সন্ধান পায়, ইহাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করিবার জন্য তাহার নিরন্তর কামনা। তাহাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু মন তাহার পড়িয়া আছে বাহিরে। নীল আকাশ তাহাকে ডাকে, অনেক দূরে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিলেও অমল সে ডাক শুনিতে পায়।

আমার ঠিক বোধ হয়, পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানালার ধরে বসে ঐ-ডাক শুনতে পায়।

নাগরা-জুতো-পরা পথিক লাঠির আগায় ছাতুর পুঁটুলি বাঁধিয়া ধীরে ধীরে ঝরনা পার হইয়া চলিয়া গেল দেখিয়া তাহার মনে সাধ জাগে,—

—কতো বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

পথিকের মতো স্বাধীনতা ও আনন্দের সঙ্গে নব নব দৃশ্যের মধ্য দিয়া দূর-দূরান্তের যাত্রার রস ও রহস্য তাহার চিত্তকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে।

রাস্তায় দইওয়ালার হাঁক অমলের কাছে একটি বিস্ময়ের দ্বার খুলিয়া দেয়। দই-ওয়ালার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্রামের দৃশ্য—পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধার, পুরানো বড়ো গাছের তলায় গ্রাম, লাল মাটির রাস্তা, লালশাড়ী-পরা গয়লা মেয়েদের নদী হইতে মাথায় করিয়া জল লইয়া যাওয়া—আনন্দের এইসব রূপবৈচিত্র্য, এই সৌন্দর্য-মালা—সমস্ত মিশিয়া গিয়া একখানা অপরূপ গানের মতো তাহাকে আচ্ছন্ন করে। ইহাই তো বিশ্ববীণার সুর, এই সুরের সঙ্গে তো অমলের অন্তরাত্মার সুর বাঁধা, তাইতো সে অতো চঞ্চল হইয়া ওঠে।

অমল

...কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওয়ালা

হায় পোড়াকপাল। এ সুরও কি শেখবার সুর।

অমল

না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্য দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।

তাই সে সুর করিয়া হাঁকে,—

দই, দই, দই, ভালো দই। সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ীর দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই।—দই, দই, দই-ই—ভালো দই।

এখানে অমলের একটি উক্তি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।—

অমল

পাঁচমূড়া পাহাড়—শামলী নদী—কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি—কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওয়ালা

তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি।

অমল

না, কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয়, যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরানো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা

ঠিক বলেছ, বাবা।

অমল

সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওয়ালা

কী আশ্চর্য। ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বই কি, খুব চরে।

অমল

মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ী পরা।

দইওয়ালা

বা। বা। ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। বা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

অমল

সত্যি বলছি, দইওয়ালা, আমি একদিনও যাইনি।

ভগবান ও মানুষের, পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধের ধারণা রবীন্দ্রনাথের অনেক পদ্য ও গদ্য-রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভগবান অনাদি কাল হইতে সৃষ্টির মধ্য দিয়া—জল-স্থল-আকাশ, তরু-লতা-গুল্ম, পশু-পক্ষী ও বহুবিচিত্র জীবনের মধ্য দিয়া মানুষকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চালনা করিতে করিতে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করাইয়াছেন। সৃষ্টির আদিম অবস্থা নীহারিকা হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত প্রকাশের মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব ছিল, সেই অস্তিত্বধারার অস্পষ্ট স্মৃতি মানবাত্মার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। তাই বিশ্বের এই বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্য তাহাকে আকৃষ্ট করে, মনে হয় এগুলি তাহার বহুদিনের পরিচিত, ইহাদের সহিত একদিন সে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া ছিল। কবির ব্যক্তিগত জীবনেও অনুভূতির উদ্ভব হইয়াছিল। কবির এই অনুভূতিই রূপান্তরিত হইয়াছে অমলের অনুভূতিতে।—

"আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার

মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেই জন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।...নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই; তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে; তখন একথা বলিতে পারিয়াছিঃ

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখন এ-কথা বলিয়াছিঃ

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে;
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিক আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

এ-কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাইঃ

তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডলে, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র-ফুল-ফল-গন্ধরেণু।

...আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না।"

(বঙ্গভাষার লেখক, আত্মপরিচয়, পৃঃ ১৬-১৮)

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কতো দূরদূরান্তর দেশদেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে

যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অংকুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছে শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"

(ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ২০ই আগস্ট, ১৮৯২)

"এই পৃথিবীটা আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।...আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত, তখন তার ঘনশ্যামচ্ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজন একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

(ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯২)

"জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,...
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কতো কালে কালে কতো লোকে লোকে
কতো নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন।" (গীতাঞ্জলি)

"তা'র অন্ত নাই গো, যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তা'র অণু-পরমাণু পেলো কতো আলোর সঙ্গ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কতো ফুলের গন্ধ।
তা'রে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কতো ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।...

কতো শুক্‌তারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কতো বসন্ত যে ঢেলেছে তা'র অকারণের হর্ষ,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কতো তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।" (গীতিমাল্য)

তাই বিশ্বের এই আনন্দরূপের সঙ্গে, অনন্ত এই জগৎ-প্রাণের সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ এত নিগূঢ়, এত গভীর। নিত্যানন্দময় বিশ্বরূপ ভগবান মানবাত্মার রূপ-রূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তর এক সূত্রে গাঁথিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত তাহার ঐক্যদান করিতেছেন, সেই জন্যই তো মিলনের এত আগ্রহ, আনন্দলীলার সঙ্গে নিজেকে মিশাইবার এত অধীর উৎকণ্ঠা। তাই প্রহরীর ঘণ্টা বাজানো, সুধার সঙ্গ, ছেলেদের খেলা, পাখীদের দেশ ক্রৌঞ্চদ্বীপের কথা, নাকে-নোলক, পরনে-লালডুরেশাড়ী, বধূবেশিনী দইওয়ালার বোনঝির কল্পনা প্রভৃতি অসংখ্য আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ, তাহার মনোহরণ করে।

এখন 'চিঠি' ও 'ডাকঘর' কি দেখা যাক্। অমলের নিকট রাজার চিঠি আসা ও শেষে রাজার স্বয়ং আসা এই দুইটি বিশেষ তাৎপর্যময়।

রাজার চিঠি কি? চিঠিতে কি থাকে? চিঠিতে থাকে সংবাদ, বার্তা। যাহাকে সামনা-সামনি মুখে কিছু বলা যায় না, যে থাকে দূরে, তাহাকে সংবাদ জানাইতে হইলে, মনের কথা বলিতে হইলে, চিঠি প্রেরণ করা হয়। রাজা হইতেছেন বিশ্বের রাজা—বিশ্বেশ্বর। বিশ্বের অসংখ্য আনন্দরূপের মধ্য দিয়া, অজস্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকাশ। এই সৌন্দর্যরূপের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য—তাহার বর্ণগন্ধগীতই এই চিঠি। এই চিঠির মারফতে তিনি মানুষের নিকট তাহার সংবাদ জানাইতেছেন, তাহাকে ইঙ্গিত দিতেছেন, আহ্বান করিতেছেন—এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের সঙ্গে যে তাহার ঘনিষ্ঠযোগ এবং তাহার মধ্যে যে তাঁহার প্রেম আছে, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন।

"...নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকে একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি; আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতুম?...আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎপ্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ; সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।" (ছিন্নপত্র)

'এই চিঠির প্রতীক্ষায়, এই বর্ণগন্ধগীতময় বিচিত্র ভাষার তাৎপর্য ও রহস্য-নির্ণয়ের আশায়, এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যরূপের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ ও তাঁহার প্রেমের রস-উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় মানুষ উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, কারণ এই উপলব্ধির মধ্যেই তাহার চরম সার্থকতা। সেই জন্য অমল চিঠির আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।'

'ডাকঘর কি? ডাকঘরে চিঠি সব মজুদ করা হয় এবং সেখান হইতে চিঠি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট বিলি হয়। বিশ্বই ভগবানের ডাকঘর, এখানেই বিশ্বরাজের সমস্ত সৌন্দর্যলিপি মজুত থাকে; তারপর দিবারাত্রির উপযুক্ত ক্ষণে, ঋতুপরিবর্তনের বিচিত্র পর্যায়ে, জীবনের নানা রসের ধারায়, জল-স্থল-আকাশের নানা দৃশ্যপটের রূপবৈচিত্র্যে সেগুলি দিকে দিকে প্রেরিত হয়। মানুষের অন্তরাত্মার উদ্দেশ্যে সেগুলি প্রেরিত হয়। ডাকহরকরা কে? যাহারা এই সৌন্দর্য, এই বর্ণগন্ধগীত বহন করিয়া আনে। রাজার চিঠির তাহারাই দূত। যেমন ষড়ঋতু, দিবারাত্রির সৌন্দর্য-প্রকাশক সময়গুলি, যথা—সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি, নিশীথরাত্রির স্তব্ধতা, দুপুরের মন-কেমন-করা আবহাওয়া, মানবীয় হৃদয়-রস স্নেহ-প্রেম-দয়া প্রভৃতি,—মোটকথা বিশ্বের যাহা-কিছু সেই অপূর্ব সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে, যাহাদের রূপ ও রসের মাধ্যমে রাজার আনন্দরূপ মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়—তাহারাই ডাকহরকরা।'

অমল

(...রাজার ডাকঘরের ডাকহরকরাদের চেন?

ছেলেরা

হাঁ, চিনি বই কি, খুব চিনি।

অমল

কে তারা, নাম কী।

ছেলেরা

একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ—আরও কত আছে।)

প্রকৃতি-প্রেমিক ঋতু-উৎসবের মর্মজ্ঞ কবির নিকট ঋতুদেরই নাম হরকরাদের তালিকায় সর্ব-প্রথম। বর্ষার রূপ ও রসে কবি যে অনির্বচনীয় আনন্দের বার্তা পাইয়াছেন;—তাই 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে', তাঁহার 'হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে'—'সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল'; 'শ্রাবণ ঘন-গহন-মোহে' 'গোপন চরণ ফেলে' তাঁহার প্রিয়তম আসিবেন বলিয়া তিনি ঘর খুলিয়া রাখিয়াছেন; 'ঝর ঝর ভরা বাদরে' 'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে' কে 'নৃত্য' করিয়াছে; শরতে 'শিউলিতলার পাশে পাশে', 'ঝরাফুলের রাশে রাশে', 'শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে', 'অরুণরাঙা চরণ' ফেলিয়া তাঁহার 'নয়ন-ভুলানো' আসিয়াছে। তাই ঋতু-হরকরাদের নাম কবির মনে সর্বাগ্রে।

সমগ্র বিশ্বই প্রকৃতপক্ষে রাজার ডাকঘর;—তবু প্রত্যক্ষভাবে বালকের মন আকর্ষণের জন্য এবং উহার অস্তিত্ব বালকের জ্ঞান ও অনুভূতির পরিধির মধ্যে আনিবার জন্য ডাকঘরের একটা স্থান নির্দেশ কবি করিয়াছেন। 'নাটকীয় কৌশলের খাতিরেই ডাকঘর একেবারে অমলের বাড়ীর সম্মুখে স্থাপিত করা হইয়াছে।' মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বলিতেছে, 'শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।'

'অমলের ডাকহরকরা হইবার ইচ্ছার মধ্যে সংকেত এই যে, মানবাত্মাও নিত্যানন্দের

একটা আনন্দরূপ—তাঁহার সৌন্দর্য-প্রকাশের মাধ্যম। জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম দ্বারা জীবনে সে অসীম ও অনন্তের সৌন্দর্য-রূপেরই প্রকাশ করিতেছে, রাজার বাণী, সংবাদ, অভিপ্রায় সে বহন করিয়া দিকে দিকে প্রচার করিতেছে। সে রাজার ডাকহরকরারই কাজ করিতেছে।) অমলের নিষ্পাপ আত্মারও তাই ইচ্ছা যে, রাজার আনন্দলিপি সে দিকে দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে, রাজার সৌন্দর্য-প্রচারে সে সহায়ক হইবে। (যুগে যুগে নির্মল, মুক্ত আত্মারা এই আনন্দবার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিয়াছেন, 'লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে রাজার চিঠি বিলি করে' বেড়াইয়াছেন।'

অমলের আর একটি ইঙ্গিতও আলোচনার যোগ্য,—

অমল

ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপি চুপি বলো না, ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা

শুনেছি তো, তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।

অমল

পথে? কোন্ পথে। সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুরদা

তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল

আমি সব জানি, ফকির।

ঠাকুরদা

তাই তো দেখতে পাচ্ছি—কেমন করে জানলে।

অমল

তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয়, অনেকবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে, কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন, কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু-গলির ভিতর দিয়ে সে কেবলই আসছে—তারপরে আখের খেত—সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা

অমন নবীন চোখ তো আমার নেই, তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

সৃষ্টির প্রথম হইতেই এই সৌন্দর্যলিপি ভগবান মানুষের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। প্রকৃতির কতো বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়া অনাদিকাল হইতে এই আনন্দ-বার্তা ক্রমাগতই মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইতেছে,—বহু পূর্ব হইতেই চিঠি রওয়ানা হইয়াছে। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই চিঠি মানুষ পাইয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছে, প্রেমে চঞ্চল হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অস্পষ্ট স্মৃতি অমলের নিষ্পাপ অন্তরাত্মায় সঞ্চিত আছে, তাই সে রাজার সৌন্দর্যদূতকে অনেকদিন আগে হইতে আসিতে দেখিতেছি এবং প্রেমের বাণীর, মুক্তির বাণীর আশায় তাহার বুকের ভিতর ভারী খুশী হইয়া উঠিতেছে। এই চিঠিরই আকাঙ্ক্ষায় তাহার প্রতীক্ষা করার মধ্যেও সে আনন্দ পাইতেছে।

> প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভাল লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে, সে-কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।

এখন অমলের এই আনন্দ-রূপ ভগবানের উপলব্ধির পথে বাধা কি তাহাই দেখা যাক্। প্রথমেই শাস্ত্রবচনসর্বস্ব কবিরাজ। কবিরাজ অন্তঃসারশূন্য, বিকৃত শাস্ত্র এবং সংস্কার বা লৌকিক-ধর্মের প্রতীক। অমল প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত আনন্দরূপের—সৌন্দর্য-রূপের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তাহার সার্থকতা লাভ করিতে চায়, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়, কিন্তু কবিরাজরূপী ক্ষুদ্র প্রথা-ধর্ম বা সংস্কার-ধর্ম বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে যুক্ত হইতে বাধা দেয়। সে বলে, 'শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুইই বালকের পক্ষে বিষবৎ', সে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করিতে উপদেশ দেয়,—বাহিরের হাওয়া লাগাইতে নিষেধ করে। অসীম বিশ্বের সহিত, ঈশ্বরের আনন্দরূপের সহিত মানবাত্মার সংযোগ রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে বিকৃত-অর্থ শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়া শাস্ত্রব্যবসায়ী তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। 'ইহারাই প্রকৃতপক্ষে মানবাত্মার ব্যাধি সৃষ্টি করে। অমলের যে ব্যাধি তাহা প্রতীক-ব্যাধি—ইহা আধ্যাত্মিক-ব্যাধি। কেবল শাস্ত্রের বুলি আওড়াইয়া ইহারা মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেয়, কিন্তু তাহাতে কেবল রোগই বাড়ে; এইরূপ ধর্মধ্বজী ব্যক্তিরা চিকিৎসকের ছদ্মবেশে যেন যমদূতস্বরূপ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বিশেষভাবে ইহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করে, ইহাদেরই বিধান অনুসারে জীবনের যে-উন্মুক্ত বাতায়নপথে অসীম ও অনন্তের রাজ্য হইতে আলো-হাওয়া প্রবেশ করিবে, তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। মাধব দত্ত তাহাই করিয়াছে। যুক্তিহীন সংস্কার ও গতানুগতিকতার দ্বারাই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা প্রধানত শাসিত। কেবল এই ক্ষুদ্র, মিথ্যা ধর্মই যে মানুষকে বিশ্বের সহিত যুক্ত হইতে বাধা দেয় তাহা নয়, সমাজও সে-পথে বাধা সৃষ্টি করে। জড়বাদী শিক্ষা ও কৃত্রিম সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত সমাজ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে না। সাংসারিকতার উপরেও যে জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা আছে, আছে মহত্তর আদর্শ, ইহারা তাহা অনুভব করে না। অতি-জাগতিক কোনো শক্তিকে ইহারা ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দেয়; জড়শক্তির প্রয়োগ করিয়া, ভয় দেখাইয়া শাসন করিতে চায়। মোড়ল এই সমাজের প্রতীক। সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা, ভীতির দ্বারা, অমলের অনন্তের আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিতে চায়। 'শারদোৎসবের' লক্ষেশ্বরের মতো, 'অচলায়তনের' মহাপঞ্চকের মতো এই সংসার ও সমাজ মানুষকে প্রকৃতির সৌন্দর্য হইতে, অসীমের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত

করিতে চায়। এই সংসার ও সমাজের চাপে প্রকৃতির সৌন্দর্যউপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিশ্বের আনন্দরূপের সঙ্গে যুক্ত হইতে না পারিয়া, অমলের অন্তরাত্মা তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও সৌন্দর্য হারাইয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, এই রুদ্ধ অবস্থা হইতে বাহির হইয়া তাহার স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য সে ব্যাকুল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি অনেকাংশে অমলের মধ্যে প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে। কবিও একসময় এই সৌন্দর্যানুভূতির বাধার কথা চিন্তা করিয়া দুঃখ অনুভব করিয়াছেন,—

"...আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিবারাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝ-খানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে। কতোবড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতোবড়ো আশ্চর্য কান্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না। মনটা যেন আরো শতলক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্-বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!...যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে; পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায়, এইজন্যে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তাহলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।" (ছিন্নপত্র)

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী।...
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।

কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি।"
(উৎসর্গ, নং ৮, বিশ্ব)

তারপর অমলের শুদ্ধ, নিষ্পাপ, রুগ্ন, ব্যাকুল, অসহায় অন্তরাত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের হস্তক্ষেপ। তিনি রাজদূতকে পাঠাইলেন, সে প্রথমেই বন্ধ দরজা ভাঙিয়া প্রবেশ করিয়া জানাইল, মধ্যরাত্রে রাজা তাঁহার বালক-বন্ধুকে দেখিতে আসিবেন। তারপর অমলের ব্যাধির বিশেষজ্ঞ রাজকবিরাজের আগমন।

রাজকবিরাজ

এ কী। চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানালা আছে সব খুলে দাও। (অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ।

অমল

খুব ভালো, খুব ভালো, কবিরাজমশায়। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ সব খুলে দিয়েছে—সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

রাজকবিরাজ

অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরতে পারবে?

অমল

পারব, আমি পারব। বেরতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি, কিন্তু সে যে কোন্‌টা সে তো আমি চিনি নে।

রাজকবিরাজ

তিনি সব চিনিয়ে দেবেন।...
এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব—ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক; ওর ঘুম এসেছে।

অমলের রুদ্ধজীবনের যে-ব্যাধি, ইহার ঔষধ একমাত্র রাজবৈদ্যই জানেন; বিশ্ব-প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত অসীম আনন্দরূপের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই তো ইহার ঔষধ। তাই যেই তিনি আসিয়া দরজা-জানালা খুলিয়া দিলেন, অমনি অমলের ব্যাধির উপশম হইল। প্রকৃতির সৌন্দর্য-পিপাসু, অসীমের আনন্দ-রূপ-তৃষিত কবিও জীবনের শেষে রোগশয্যায় শুইয়া বলিয়াছিলেন—

"খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;

আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।"

(রোগশয্যায়)

অমলের ঘুম মৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যুতে মানবাত্মা অসীম অনন্ত পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, আত্মিক ব্যাধি বা জীবনের জ্বর একেবারে সারিয়া যায়, সৃষ্টির নিত্যানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে চরম সার্থকতা লাভ করে। পরমপ্রেমময় মৃত্যুর দ্বার দিয়া বালক অমলের অমলিন, অপাপবিদ্ধ আত্মাকে গ্রহণ করিয়া রুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তির শান্তি দান করিলেন। উৎকণ্ঠিত প্রবাসী গৃহে ফিরিয়া গেল। এইভাবেই অনন্তের মিলন-প্রয়াসী আত্মার জন্ম-জন্মান্তরের অভিসারযাত্রা।

মৃত্যুর প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গীর অজস্র নিদর্শন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। কবিতায়, গানে, গদ্যরচনায়, নাটকে বহুবার তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নৈমিত্তিক পাঠকের নিকটও তাহা সুপরিচিত; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যু নবজীবন, নবযৌবনলাভের সিংহদ্বার; মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বারে বারে জীবনকে নব নব রূপে ও রসে ফিরিয়া পাওয়া যাইতেছে, জীবনকে সত্য বলিয়া জানিতে হইলে, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় চাই, 'মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে' ইত্যাদি ইত্যাদি মৃত্যু-সম্বন্ধে বহু ভাব কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের পরমপ্রিয়তম ভগবান মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া আমাদের মিলন পরিপূর্ণ করিতেছেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাঁহার সহিত নব নব রূপে মিলন হইতেছে, এই ভাব রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।—

"মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তব মিলন-বেশে
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধো বাহুর ডোরে।" (গীতালি)

"তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর—
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন ডোর।" (গীতাঞ্জলি)

"ভেঙেছ দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।" (গীতালি)

আর একটি ঘটনার তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে—সেটি হইতেছে শেষ মুহূর্তে সুধার ফুল লইয়া প্রবেশ ও তাহার কথা 'সুধা অমলকে ভোলেনি'। ফুল প্রেমের প্রতীক।

একেবারে যবনিকাপাতের পূর্বে এই মানবীয় স্পর্শটুকু নাটিকাখানিকে এক অপূর্ব মাধুর্য দান করিয়াছে।

মানুষের প্রেম চায় তাহার আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে। প্রেমের পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে চিরন্তন বলিয়া মনে করে এবং পরস্পরের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিতে চায়। মানবীয় প্রেম তো অনন্ত প্রেমেরই প্রতিফলন। 'জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নাম ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ।' অসীম ও অনন্ত তো মানুষের মধ্যে প্রেমে, ও প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। প্রেম ও সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়ত্বের মূলে আছে অতীন্দ্রিয়, অতি-জাগতিক স্পর্শ। কিন্তু এই প্রেম তো প্রেমেই পর্যাপ্ত নয়, সার্থক নয়, অনন্ত প্রেমের সহিত ইহাকে যুক্ত না করিলে, এক সর্বব্যাপী আনন্দরসের মধ্যে ইহা উপলব্ধি না করিলে ইহা ক্ষণিক, সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র ও ভোগ-সর্বস্ব হইয়া পড়ে। মানবীয় প্রেম চিরন্তন প্রেমের সোপানমাত্র, ইহাই শেষ নয়। এক জীবনের মধ্যে আবদ্ধ প্রেমই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ নয়, সেই প্রেমকে চিরন্তন করিয়া, অমর করিয়া রাখিবার চেষ্টাও বৃথা। যে-অনন্ত আদি-প্রস্রবণ হইতে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া জগতে স্নেহ-প্রেমের পাত্রপাত্রীর মধ্যে অভিব্যক্ত হইতেছে, সেই বিশ্বব্যাপী অমৃতধারার, আনন্দধারার ক্ষণিক অবলম্বন-রূপেই তাহাদিগকে দেখিতে হইবে, বৃহৎ পটভূমিকা হইতে তাহাদের সরাইয়া লইয়া একটি মাত্র জীবনে আবদ্ধ করিলে চলিবে না।—

"প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? যে শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য, সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠি নি! যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই?... প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি!"

(মাতৃশ্রাদ্ধ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬)

সুতরাং মানবীয় প্রেমকে অনন্ত প্রেমের ভূমিকায় উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই তাহার প্রকৃত সার্থকতা। কিন্তু মানুষ তাহার প্রেমকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিয়া মৃত্যুর পর প্রেমপাত্রের স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়াই রাখিতে চায়, জীবনে যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে একান্ত করিয়াই দেখিতে চায়; সর্বব্যাপী অনন্ত আনন্দের মধ্যে, অমৃতের মধ্যে, সত্যরূপে, অমররূপে দেখিতে চায় না, জানে না। এইখানেই সংসারের নর-নারীর প্রেমের ব্যর্থতা।

তাই মানবী সুধা সাধারণ মানুষের প্রেমের স্বরূপটিই জানাইয়া গেল—তাহার প্রেমকে সে জীবনের মধ্যে, স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় করিবে, অমলকে সে ভোলে নাই, ভুলিবে না। কিন্তু হায়, যাহাকে সে ভোলে নাই, ভুলিবে না জানাইল, সে কোথায়? নাট্যকার অমলের ঘুমের পরে, জীবন্মুক্তির পরে সুধার আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। রাজকবিরাজকে তাহার অনুরোধ, অমল জাগিলে সুধার কথা তাহাকে যেন বলা হয়, কিন্তু অমল কি আর এই জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিবে? সুধা তাহাকে জীবনাবধি স্মৃতির মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে বটে, কিন্তু অমলের পক্ষে তাহা অর্থহীন। জগতের প্রেমের ইহাই ট্র্যাজেডি। ইহাই 'স্মরণের আবরণে মরণেরে' 'যত্নে ঢাকিবার' প্রয়াস! পরবর্তী যুগের 'শা-জাহান' কবিতার মধ্যে কবির এই ভাবটি চমৎকার রূপ লইয়াছে।—

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিলো নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছো তা ধূলিরে ফিরায়ে।

যে-অমল সুধা যেন তাহাকে ভোলে না বলিয়া তিন সত্য করাইয়াছিল, সে আজ বিশ্বপথিক, সংসারের কোনো প্রেমই আজ আর তাহাকে ফিরাইতে পারিবে না।—

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন। ১

আবার, অমলের যে স্মৃতি, সে-ও সুধার জীবনাবধি-ই, সে যদি দ্বিতীয় তাজমহলও গড়ে, তবুও তাহা ধূলিরই সামিল, অমলকে আর পাইবার উপায় নাই। অমলের মৃত্যুকালে সুধার আবির্ভাবে নাট্যকার এই সত্যেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"...প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে সীল-মোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে।...বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না।" ('রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধের প্রসঙ্গ. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড)

অবশ্য এ-বিষয়ে Browning-এর দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র। Browning বলেন, প্রেমই প্রেমের পুরস্কার। মানুষের প্রেম কোনো সময়েই ব্যর্থ নয়। কাহাকেও সত্যভাবে ভালোবাসিলে, তাহাকে একদিন পাওয়া যাইবেই, জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তরের মধ্যে এক-দিন তাহাদের মিলন হইবেই। মৃত কিশোরী Evelyn Hope-এর অপরিচিত বৃদ্ধ প্রেমিক বলিতেছে,—

God above
Is great to grant, as mighty to make,
And creates the love to reward the love;
I claim you still, for my own love's sake!
Delayed it may be for more lives yet
Through worlds I shall traverse, not a few:
Much is to learn and much to forget
Ere the time be come for taking you.

যে দেবতা সৃজনে অমেয় শক্তিমান্,
তাঁহারি বদান্য হস্তে অপ্রমেয় তেমনি যে দান!
প্রণয়-রচনা তাঁর প্রণয়েরি পুরস্কার তরে,
তাই আছে তোমা লাগি দাবী মোর প্রেমের ভিতরে;
হয়ত রয়েছে মাঝে বহুজন্মব্যাপী ব্যবধান,
লোক-লোকান্তরে আমি তোমা তরে হ'ব ভ্রাম্যমাণ,
হবে মোর বহুশিক্ষা, অনেক ভুলিতে হবে মোরে,
তারপরে একদিন তোমারে বাঁধিব বাহু-ডোরে।
(সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের অনুবাদ)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি অমলের অনুভূতির মধ্যে অনেকখানি রূপায়িত হইয়াছে। প্রথম, বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের সুতীব্র অনুভূতি; দ্বিতীয়, তাঁহার বাল্যজীবনের রুদ্ধাবস্থার স্মৃতি; তৃতীয়, ডাকঘর-রচনার পূর্বে কবির একটি বিশিষ্ট মনোভাব—এই তিনটিই অমলের চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রথমটির আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে, এখন শেষের দুইটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

শৈশবে কবি ভৃত্যতান্ত্রিক শাসনের চাপে অবাধে বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই। একস্থানে আবদ্ধ থাকিয়াই কল্পনায় বিশ্বের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার শৈশবের এই অবরুদ্ধ জীবনের আনন্দ-বেদনাময় স্মৃতি ও বিশ্বের মধ্যে রহস্যবোধ কবির অবচেতন মন হইতে বালক অমলের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অনেকটা ছায়াপাত করিয়াছে।—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকুর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গবাক্ষের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"
'মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ন ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলোর সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই চুড়ি চাই,

খেলনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।"
(অমলের দইওয়ালার ডাকের প্রতি আগ্রহ)

"ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটি মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটা অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে, বলো দেখি? কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৪-২০)

তারপর, কবি যখন 'ডাকঘর' রচনা করেন, * সেই সময় কিছুদিন হইতে তাঁহার মনে একটা অকারণ চাঞ্চল্য রাজত্ব করিতেছিল। তাঁহার মনে সমস্ত জগৎকে ভালো করিয়া দেখিবার ও জানিবার জন্য, সংসারের বন্ধন কাটাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবার জন্য একটা অহেতুকী ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল। মনে হইতেছিল, অসত্যের দ্বারা, স্থূল জড়ত্বের দ্বারা তাঁহার জীবন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—চারিদিকের অন্ধকারময়, বদ্ধ আবহাওয়া হইতে বাহির হইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবার জন্য তিনি একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষার অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার যেন ধারণা হইতেছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি সেই মুক্ত জীবনকে ফিরিয়া পাইবেন। ভগবান যেন তাঁহাকে ডাকিতেছেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তিনি মুক্তি ও যথার্থ আনন্দ পাইবেন। সমসাময়িক কয়েকখানা চিঠিতে এবং বিশেষ করিয়া 'ডাকঘর'-প্রসঙ্গে কবির পরবর্তী কালের বক্তৃতায় কবির এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।—

"আমি দূরদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল কিছুদিন থেকে মন বলছে, যে-পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব।...সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি, সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো যাত্রার পূর্বে এই ছোটো যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।"—তারিখ ২২শে আশ্বিন, ১৩১৮। (নির্ঝরিণী দেবীকে লিখিত, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৮)

"আপনার সমস্ত কামনা যখন আপনাকে বন্দী করতে উদ্যত হয়, তখন এক মুহূর্ত আর বিলম্ব না করে পালাতে ইচ্ছা করে।...আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে কালের কোনো প্রয়োজন, সংসারেব কোনো দায়িত্ব, আমাকে কোনোমতেই

* ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে পূজার ছুটির পর আশ্রম-বিদ্যালয় খুলিলে, শান্তিনিকেতনে রচিত।

বসে থাকতে দিচ্ছে না। বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়, ফাঁকায় ছুটে আয়, আর একদণ্ডও ঘরে নয়, এই কথাটা এমন করে অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যে, আজ আমার আর অন্য কোনো চিন্তা করবার জো নেই—এর কাছে অন্য সকল কথাই তুচ্ছ, তাই বেরিয়ে পড়বার আয়োজনে আমার একটুও ক্লান্তি বা কৃপণতা নাই—মন একেবারে পিছন ফিরে তাকাতে চাইবে না।"

"...যেমন কোরে হোক নিজের গর্তটার ভিতর থেকে নিজের নির্মল বিশুদ্ধ সত্তাটিকে বাহির করে আনতেই হবে।...যদি বেশ আপনাকে সকল বাধামুক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পারি, তা হলে বুঝব, আমার এ জীবনের ভিতরকার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে, এটাকে বদলে ফেলে আবার নূতন বাহন জুড়তে হবে...মৃত্যু ভালো কিন্তু মুক্তি চাই...খোলা রাস্তায় খোলা আলোয় খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে...আবরণ সব জীর্ণ হয়েছে, সেগুলো এবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাক—সর্বাঙ্গে লাগুক আকাশ।"

"নিজের মধ্যে বেড়া দিয়ে আমি কখনই টিঁকতে পারব না—চিরদিন ঘোর বন্ধনদশার মধ্যেও আমার চিত্ত কেবলি মুক্তি চেয়েছে, সেই মুক্তিকে হারিয়ে আমি কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে চলে যাব, কখনই না।"

"নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে লাভ করবার জন্যে ভারি একটা বেদনা বোধ করছি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছে না। কেবলি বলছে, বেরও,—না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার—আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন—আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিনে, বেরও, বেরও, বেরও,—সমস্ত অসত্য থেকে, সমস্ত স্থূলত্ব জড়ত্ব থেকে, বেরও বেরও—একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিশ্বাস গ্রহণ কর—আর নয়—আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়—কোথায় ভূমা কোথায়—কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।" (১৩১৮ সালের ২৩শে আশ্বিন হইতে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে পত্র কয়খানি হেমলতা দেবীকে লিখিত—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪)

'ডাকঘর'-রচনার সমকালে বন্ধজীবন হইতে বৃহৎ মুক্তির ক্ষেত্রে যাইবার জন্য যে-ব্যাকুলতা এই পত্রগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, সত্যই সে-ব্যাকুলতা যে 'ডাকঘর'-এর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, কবি তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে বলিয়াছেন পরবর্তী ১৩২২ সালের ৪ঠা পৌষে আশ্রমবাসীদের কাছে 'ডাকঘর' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার সময়।—

"'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখি নি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। পূর্বে আমার দু'একটি বেদনা এসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে

জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নাই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে, যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল—বহুদূরে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বহু বিস্তৃত অপরিচিতের মধ্যে সে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে। সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে।" (শান্তিদেব ঘোষ-রচিত 'রবীন্দ্র-সংগীত' গ্রন্থে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত—রবীন্দ্রসংগীত, পৃঃ ২২৩-২২৫)

কবির সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের সার্থকতালাভের সম্ভাবনার অনুভূতি অমলের মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে এবং এই মনোভাব তাঁহাকে 'ডাকঘর' লিখিতে অনুপ্রেরণাও যোগাইয়াছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেরণা যেখান হইতেই আসুক না কেন, কবি যখন তাঁহার শিল্পরূপ নির্মাণ করেন, তখন তাহা ব্যক্তিকে ও সাময়িকতাকে অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন তাহা সর্বকালের, সর্বমানবের ভাব-সত্য হওয়া ওঠে। ইহা অনেকবার তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে দেখা গিয়াছে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি মানবাত্মার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং মানবাত্মার সমস্যাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ব্যাকুলতাকে একটা চিরন্তন বাণীতে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। তাই বারান্তরে 'ডাকঘর' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি শুধু ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটিই—মূলসত্যটিই—প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত অনুভূতির কথার আর অবতারণা করেন নাই।

কবি 'ডাকঘর' সম্বন্ধে এন্ড্রুজ সাহেবকে লিখিয়াছেন.—

"Amal represents the man whose soul has received the call of the open road—he seeks freedom from the comfortable enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable. But Madhab, the worldly-wise, considers his restlessness to be the sign of a fatal malady; and his adviser, the physician, the custodian of conventional platitudes—with

his quotations from prescribed text-books full of maxims—gravely nods his head and says that freedom is unsafe and every care should be taken to keep the sick man within walls. And so precaution is taken.

But there is the Post office in front of the window, and Amal waits for the King's letter to come to him direct from the King, bringing to him the message of emancipation. At last the closed gate is opened by the King's own physician, and that which is death to the world of hoarded wealth and certified creeds, brings him awakening in the world of spiritual freedom." (Letters to a Friend)

আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ শিশুর মধ্যেই এই ব্যাকুলতাকে রূপায়িত করিয়াছেন এবং অমলকেই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শিশুর নিষ্পাপ, সংসার-মালিন্যাই অন্তরাত্মার পক্ষে মুক্তির জন্য একটি স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র আকুলতা অনুভব করা স্বাভাবিক। অজানার ডাক তাহার কাছেই সহজে পৌঁছায়, রাজার চিঠি সে-ই পায়, জীবন-রহস্যের আকর্ষণ তাহার নিকটই সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি সাহিত্যে কবি Wordsworth ও শিশুকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তাঁহার কাছে শিশু 'Mighty prophet,' 'Seer blest', 'the best philosopher'; শিশুর কাছে 'Immortality broods like a Day'. Wordsworth-এর 'Ode on the Intimations of Immortality' নামক কবিতাটি শিশু-জীবনেরই জয়গান। জার্মান-নাট্যকার হাউপট্‌ম্যান তাঁহার 'Hannele' নাটকে এক দরিদ্রা বালিকাকেই প্রধান চরিত্র করিয়াছেন। সেই বালিকাও মৃত্যুর মধ্য দিয়াই আকাঙ্ক্ষিত নবজীবন-লাভের আশা করিয়াছিল। এ-আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

ফাল্গুনী

(১৩২২)

'ফাল্গুনী'কে 'শারদোৎসব-এর মতো ঠিক ঋতু-উৎসবের নাটক বলিয়া ধরা যায় না। অবশ্য দুইটি নাটকেই তত্ত্ববস্তু আছে, তবে শারদোৎসবে উৎসবটাই প্রধান, তত্ত্বটা গৌণ। উৎসব করিতে বাহির হইয়া রাজসন্ন্যাসী উৎসবের মূলতত্ত্বটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আর 'ফাল্গুনী'তে তত্ত্বটাই প্রধান, তত্ত্বটা ইহার মেরুদণ্ড; একটি তত্ত্ব বা আইডিয়াকে রূপায়িত করিবার জন্যই উৎসবের আয়োজন, 'বৈরাগ্যসাধন'-ভূমিকার দৃষ্টান্ত-স্বরূপই বসন্তোৎসবের মধ্য দিয়া আখ্যানভাগকে উপস্থিত করা হইয়াছে। উৎসব এখানে তত্ত্বের বাহনমাত্র, তাই 'ফাল্গুনী'কে পূর্ণাঙ্গ রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

'ফাল্গুনী'র আলোচনায় প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট যুগের রচনা। এই যুগ 'বলাকা'র যুগ। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক চিন্তা কবির ভাব-কল্পনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছে, তাহাই কাব্যরূপ পাইয়াছে 'বলাকা'য়, আর 'ফাল্গুনী'তে সেই কল্পনাই প্রকাশ পাইয়াছে নাট্যরূপে রূপক-সাংকেতিকতার মাধ্যমে।

যে-চিন্তা কবির মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা হইতেছে সৃষ্টির গতিতত্ত্ব। গতির মধ্যেই বিশ্বশক্তির প্রাণের বিকাশ। গতি স্তব্ধ হইলে বস্তু পুঞ্জীভূত হইয়া বিশ্বকে মৃত-স্তূপ ও আবর্জনা-জঞ্জালে পূর্ণ করে। গতি আছে বলিয়াই স্তূপীকৃত বস্তু প্রতিমুহূর্তে ধ্বংস হইয়া সৃষ্টির নব রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, গতিই ধ্বংসের মধ্য দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহার প্রাণ, রূপ ও সৌন্দর্যকে অটুট রাখিয়াছে। মানবজীবনও এই গতিবেগে মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার চিরনবীনত্ব ও অনন্তত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে; চির-পথিক, অনন্ততীর্থ-যাত্রী মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বারে বারে তাহার অম্লান স্বরূপ ফিরিয়া পাইতেছে। আবার একটি মাত্র জীবনের মধ্যেও এই গতির মাহাত্ম্য অনুভব করা যায়। এই গতিবেগ ও প্রাণ-শক্তির প্রতীক হইতেছে যৌবন; যৌবন একই জীবনে নূতন জীবন সৃষ্টি করে, নূতন ভাবধারার জোয়ার আনিয়া মুক্তিস্রোত বহাইয়া দেয়। মানুষের জীবনে, সমাজে, ধর্মে এই যৌবনশক্তিই জরা, জড়ত্ব, স্থবিরতা ও গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃত সার্থকতার সন্ধান দেয়। এই যে গতি ইহাও যেমন সত্য, আবার স্থিতিও তেমনি সত্য। প্রকৃতির রূপ-রস, স্নেহ-প্রেম যেমন সত্য, আবার ইহাদিগকে ছাড়িয়া ধরণী হইতে বিদায় লইতে হইবে, ইহাও তেমনি সত্য। এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ সত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। সে-সামঞ্জস্য সাধন করে ধ্বংস বা মৃত্যু। মৃত্যুই সীমার বন্ধন মোচন করিয়া অসীমের মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ-সম্বন্ধে আমি গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ('রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা'—'বলাকা'-কাব্যগ্রন্থের আলোচনা)

তাহা হইলে এই তত্ত্বটি তিনটি ধারায় প্রকাশ পাইতেছে,—

(১) বিশ্বপ্রকৃতিতে,
(২) বিশ্ব-মানবের মধ্যে,
(৩) ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে।

(১) বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখা যায়, পুরাতনের মধ্য হইতেই নূতনের আবির্ভাব হইয়াছে। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, তবুও জগতের জীর্ণতা নাই; ফুল ঝরিয়া গিয়া, পাতা শুকাইয়া পড়িয়া, তাহার নবীনতাকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। গ্রীষ্মের রৌদ্রদীর্ণ আকাশ ও কঠোরতার পরেই বর্ষার জল-ভরা, স্নিগ্ধ মেঘ ও ধারাবর্ষণ; ঘনঘটা ও প্লাবনের পরেই শরতের সোনালী রৌদ্রমণ্ডিত আকাশ ও তাহার অনুপম ঐশ্বর্য; আবার শীতের অবসাদ, শীর্ণতা, শুষ্কতা ও জড়ত্ব ভাঙিয়া বসন্তের আনন্দময় আবির্ভাব;—এক-একটি রূপ বা অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অন্য একটি রূপের আবির্ভাব হইতেছে এবং এই নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জগতের চিরনবীনতা ও চির-সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ আছে।

"চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্যসামগ্রী। পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়া ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো—জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং

নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।...

জগৎ তেমনিই নবীন আছে, এ যে অনন্ত রসসমুদ্রের পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্‌ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা-আপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বর আঁচল থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতি রাত্রের অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, 'বলো দেখি আমি তোমার জন্য কি এনেছি'। তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকেই আপনি ধ্বংস করছে—সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতের একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।" (চিরনবীনতা, শান্তি-নিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯)

"পুষ্পকে কীটে কাট্‌লে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত, তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের ছিন্ন ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যু-কীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো ক'রে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য-ফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে? এই সৌন্দর্যের emphasis-এর মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ যদি তাই হত, তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন করে কালো করে শুকিয়ে ফেল্‌ত।" ('বলাকা'র কয়েকটি কবিতার কবি-কৃত আলোচনা)

(২) মানবেয় মধ্যেও এই সত্যেরই লীলা। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সে তাহার চিরনবীন প্রাণকে বারে বারে ফিরিয়া পাইতেছে। তাহার অন্তরাত্মার স্বরূপ চিরনবীন, জরাজীর্ণতার আবরণ তাহাকে কুয়াশার মত ঘিরিয়া রাখে মাত্র। এই আবরণ ছিন্ন হইলেই তাহার প্রদীপ্ত স্বরূপ আবার বাহির হইয়া পড়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সে বারে বারে তাহার সহিত অসীম, নিত্য-নবীন স্বরূপ উপলব্ধি করে।

"মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয়' না। ফাল্গুনীতে আমি এই কথাই বলেছি। সীমাকে পদে পদে মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণ-সঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ—form যদি স্থবির হয়—fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবে অচলরূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল, তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই, মানুষ যখন প্রথার গণ্ডীতে বন্ধ হয়ে থাকার দরুণ তার মনের প্রসারণশীলতা চলে গেল, তখন আবার একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে

দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক্, তার negative দিক্‌টার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।...সত্যের positive দিক্ হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিক্‌ও আছে। যদি সেটাকেই বড় করে দেখ্‌তুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়্‌ত। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি, জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে সত্যের positive দিক্‌টা। তবে এদুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যখন সীমার রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্য গতি নেই, তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাশ্বত স্বরূপকে দেখাতে হবে।...মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিদান করে চলেছে। মৃত্যুতে formএর কোনো বিনাশ হয় না, তার renewal বা নূতন নূতন প্রকাশ হয়।" (ঐ)

(৩) ব্যক্তি-মানুষের সংসার-জীবনে এই গতির মাহাত্ম্যই তাহাকে সার্থকতা দেয়, নব নব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নব নব সম্পদ্ আনয়ন করে। যৌবনই এই গতি-শক্তি। যৌবন কোনো স্থানে আবদ্ধ হয় না, কেবলি সম্মুখে অগ্রসর হইবার আনন্দে মত্ত হইয়া থাকে। মনের বিরাট পরিবর্তনসাধন যৌবনের কাজ। মনে যৌবনের বিকাশ হইলে, মন যৌবনের ভাবে ও রসে পূর্ণ হইলে, মানুষ জরা-বার্ধক্যের গণ্ডীতে ও জীবনের সঞ্চয়ে আবদ্ধ হয় না। সে তখন সংসারের উপর অন্ধ আসক্তি, ধন-জন-খ্যাতির লোভ, অর্থহীন সংস্কারধর্ম, প্রথার দাসত্ব, জরা-বার্ধক্যের ভয় প্রভৃতি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া জীবনের পথে নির্ভয়ে অনাসক্তভাবে আনন্দের সঙ্গে অগ্রসর হয়। জগৎ ও জীবনকে এক বৃহৎ লীলার অঙ্গস্বরূপ দেখিবার দৃষ্টি তাহার খুলিয়া যায়, আর তাহাতেই সে তাহার কর্মের মধ্যে খেলার আনন্দ পায়। যৌবন একটি মানসিক অবস্থা; যে-বয়সেই এই অবস্থা আসুক না কেন, এই আসক্তিহীন, আনন্দময়, অগ্রগতিশীল মানসিকতা থাকিলেই তাহাকে যুবক আখ্যা দেওয়া যায়। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও মানুষ যুবক থাকিতে পারে। দেহে যৌবন না থাকিলেও মনে যৌবন থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবক' বলিয়াছেন এবং শিল্পী নন্দলালকে 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"আমি যতক্ষণ স্থির হয়ে আছি ততক্ষণ বস্তুসমূহ ভারস্বরূপ হয়ে থাকে। তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন,—আমার পক্ষে দুর্বহ হয়। যখন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ধনজন যা কিছু জম্‌তে থাকে তা কিছুই চলে না, তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য আমি জেগে আছি। বইয়ের পোকা যেমন তার পাতার মধ্যে বসে বসে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এক জায়গায় বসে বসে কেবল খাচ্ছি আর জমাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই—মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। দুঃখ নূতন নূতন হয়ে বেড়ে চলেছে, বোঝাই হয়ে উঠেছে। আমি স্থির হয়ে আছি বলে সতর্ক বুদ্ধির ভারে, সংশয়ের শীতে জীবনের চুল পেকে গেল, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

আমি যেই চল্‌তে সুরু কর্‌লেম, অমনি মন তার মাথায় পিঠে যে বোঝা চারদিক্

থেকে এ'টে দিয়েছিল, চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের দ্বারা তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, ব্যথার সঞ্চয়ের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে আনন্দের আবেগে যে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (opinion এর) দুর্গে বন্ধ হয়ে বাঁধা আইডিয়ার মধ্যে থাক্‌লে সে বদ্ধ হয়ে ওঠে।

যা চলে না, স্থির হয়ে জম্‌তে থাকে তা মলিনতার আবর্জনা। মন যতই নূতন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চল্‌ছে, ততই সে নব নব সম্পদে ভূষিত হচ্ছে। সনাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (purified) হতে পারে না। চলার স্নানেই সকল বস্তু ধৌত নির্মল হয়ে যাচ্ছে। জরা জীবনকে যে পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি (vigour) সেই সঞ্চিত স্তূপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায়। সে বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হতে চায় না। তাই সে মলিন স্তূপের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে চালনা করা। চলার আনন্দরস পান করে মনে যৌবন বিকশিত হয়।" (ঐ)

'ফাল্গুনী'তে গতি-তত্ত্বের এই তিনটি ধারারই সমন্বয় করা হইয়াছে। সূচনাতে দেখা যায়, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার মাথার চুল পাকিয়াছে দেখিয়া তিনি জরা ও আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত, রাজকার্য তাঁহার কাছে দুর্বহ, শেষবয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পরমার্থ-চিন্তায় কাল কাটাইতে মনস্থ করিয়াছেন। এমন সময় কবিশেখরের প্রবেশ। কবিশেখর রাজাকে বুঝাইল যে, যৌবন গত হইলেও আর এক বৃহত্তর যৌবন আসিতেছে, সেই যৌবনের মধ্যেই প্রকৃত বৈরাগ্যের মন্ত্র আছে, সে-মন্ত্র সংসারের সমস্ত সঞ্চয় ফেলিয়া কেবলি চলা, কেবলি সম্মুখে অগ্রসর হইবার মন্ত্র। এই যৌবন-মন্ত্রের বৈরাগীরাই জীবনের সমস্ত দুঃখ হাসি-মুখে বহন করিতে জানে, কারণ সমস্ত দুঃখকে তাহারা পরম লীলাময়ের লীলা বলিয়া গ্রহণ করে। তারপর মৃত্যুভয় বৃথা, কারণ জীবনের মরণ নাই, সে নিত্যকালের, সর্বত্রই আনন্দময় 'আমি-আছি'র জয়। রাজার কর্তব্যকর্মে নৈরাশ্য ও মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্যই, তাঁহার 'প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখবার' জন্যই কবিশেখরের 'ফাল্গুনী' রচনা। ফাল্গুনীর মূল-গল্পটি হইতেছে শীতের বস্ত্রহরণ ও বসন্তোৎসব, ইহাতে প্রকৃতির ভিতরের গতির লীলাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, আর তাহারই মধ্যে প্রাণের গতিতত্ত্বকে রূপায়িত করা হইয়াছে। প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনের যৌবন-রহস্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি ও মানব-প্রাণের যৌবন-রহস্যকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এখন এই তত্ত্বকে তিনটি ধারার মধ্যে কিরূপে রসরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে দেখা যাক্।—

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান?
কবিবর যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।
সংবাদটা কোথায় পৌঁছল।
ঠিক আমার কানের উপর চেয়ে দেখো।
পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী?
যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করবার চেষ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ্ লাগাবে।

কই, রঙের আভাস তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ, চুপ, চুপ করো, কবি চুপ করো।

মহারাজ, এ যৌবন যদি ম্লান হল তো হোক না। আর-এক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, তুমি দেখছি বিপদ বাধাবে, কবি। যাও যাও তুমি যাও—ওরে, শ্রুতি-ভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন, মহারাজ।

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি?

হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয়, তো কী মহারাজ। সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা, তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চেলা।...

ওই শোনো, কবিশেখর, কান্না শোনো। ওই তো তোমার সংসার।

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

...তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো।

মহারাজ, এ দুঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখদুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি তিনি এই

সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে...মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে যে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়—যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগও করে তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারা, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

কবিশেখর রাজাকে আশ্বাস দিতেছে যে, দেহের যৌবন চলিয়া গেলেও আর এক যৌবন আসিতেছে। সে যৌবনের স্বরূপ কি? সেই যৌবন 'প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত যৌবন—তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।' এই যৌবন মনের যৌবন, একটা বিশিষ্ট উপলব্ধির ফল। এই উপলব্ধিতে সিদ্ধ হইলে মনের এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়—মন হয় চির-যৌবনের রসে সিক্ত ও রঙে রঙীন। তখন সংসারের ধন-জন-মান-খ্যাতির উপর আর আসক্তি থাকে না, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়, জীবনকে এক আনন্দময় খেলার মতো গ্রহণ করা যায়। ইহা 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'রই একটি রূপ। এই নূতন যৌবনের উপলব্ধির মূলভিত্তি হইতেছে আত্মার চির-যৌবনের স্বরূপকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি আসিলেই দেহের জরা হয় মিথ্যা এবং মৃত্যুতেও মানবাত্মার ক্ষয় নাই জানিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে জীবনকে গ্রহণ করা যায়। এই সাধনলব্ধ দ্বিতীয় যৌবন যে-মানুষ লাভ করে, সে প্রাণের নিত্যস্বরূপের জ্ঞানলাভের দ্বারা এক চিরন্তন আনন্দলোকে প্রবেশ করে। এই সাধন-সিদ্ধ দ্বিতীয় যৌবনের মূর্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যের বৃদ্ধ-যুবক ঠাকুরদাদা-চরিত্রটি।

'বলাকা'য় কবি এই দ্বিতীয় চিরন্তন যৌবনকে আবাহন করিয়াছেন ও তাহার বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। এ-যৌবন 'বয়সের মায়াজালের বাঁধনখানা' খণ্ডন করে; এ-যৌবন 'কাঙাল আয়ুর ভিখারী' নয়; ইহার বাণী 'শুষ্ক পাতায় রয়' না 'কভু বাঁধা পুঁথির বাঁধনে'; ইহা 'আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি-ভারে কুণ্ঠিত' নয়; এই 'অশান্ত', 'দুরন্ত', 'প্রমত্ত', 'চিরজীবী' যৌবন 'শিকল-দেবীর পূজাবেদী' ধূলিসাৎ করে ও 'জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে' চারিদিকে 'প্রাণ অফুরান দেদার ছড়িয়ে' দেয়। কবিরও দেহের যৌবন বিদায় লইয়াছে, আসন্ন বার্ধক্যের চিন্তা তাঁহার মনকেও করিয়াছে আচ্ছন্ন, কবিও এই যৌবনের আবাহন দ্বারা তাঁহার জীবনে ও জীবনের পরপারে নূতন ভাব-কল্পনার আলোকে জরামৃত্যুমালিন্য-হীন, চিরানন্দময় আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন।—

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তা'র পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধঢালা।...
লিখেছে সে—
এসো এসো চলে এসো। বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার।
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার। (বলাকা)

'ফাল্গুনী' নাটকের রাজাকে আমরা 'ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ', আর কবিশেখরকে 'দার্শনিক-কবি রবীন্দ্রনাথ' বলিয়া ধরিতে পারি। 'বলাকা'য় ও 'ফাল্গুনী'তে ভাব-কল্পনার নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও মনোহর সংগীতে যৌবনের যে-জয়গান, তাহার মর্ম অনেকখানি সুস্পষ্ট।

এ নাটকে গান আছে নাকি।
হাঁ, মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।
গানের বিষয়টা কী।
শীতের বস্ত্রহরণ।
এতো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।
বিশ্বপুরাণে এ গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীতবুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।
এতো গেল গানের কথা, বাকিটা?
বাকিটা প্রাণের কথা।
সে কি রকম।
যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—
তখন কী দেখলে।
কী দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।
কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।
না, মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

এই গানের বিষয় যে শীতের বস্ত্রহরণ, এইটিই প্রকৃতির যৌবনলীলা; আর নাট্যের বিষয়টা যে প্রাণের কথা, এইটিই মানুষের অন্তরাত্মার যৌবনলীলা। বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলিতেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সে একই লীলা। দৃশ্যের গোড়ায় গীতিভূমিকায় প্রকৃতি অভিনেতা, দৃশ্যের মধ্যে অভিনেতা মানব—প্রকৃতির লীলা সুরে ব্যক্ত, মানবপ্রাণের লীলা ঘটনায় ব্যক্ত। ইহার পিছনে আছে 'বৈরাগ্যসাধন'-ভূমিকায় ব্যক্তির যৌবন-লীলা। এই তিনটি লীলা অপরূপ শিল্পকৌশলে একত্রে গ্রথিত করিয়া ভাব, রূপ ও সুরের সমন্বয়ে এই অপূর্ব নাটকটি রচিত হইয়াছে।

'ফাল্গুনী' সম্বন্ধে এখন রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক্।

"জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল, সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটাকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত; এর উপর যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধ্বসে যেত।

"বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।"

"ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, 'ভয় নেই বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে—আচ্ছা, দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্।' প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে. নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।"

"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস

করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণ দ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ-উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘানিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলছেঃ যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।...যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কী হত।'

"বসন্তের কচি পাতার এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।"

এইবার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা যাক্।—

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।

এক হচ্ছে সর্দার।

সে কে।

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

সে কে।

যাকে আমরা ভালবাসি—আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে।

আর কে আছে।

দাদা—প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।

আর-কেউ আছে।

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ?

হাঁ, মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না বলেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

সর্দার জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক। সেই শক্তির স্বরূপ হইতেছে গতি। এই গতিই জীবনকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিচালনা করিয়া তাহার স্বধর্মকে অটুট রাখিয়াছে। ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই জীবন। তাই সে জীবন-সর্দার। 'এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া—পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়।' তাহার গান—

আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে।...
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর-পানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো—মোদের
মিলবে না কূল।

জীবন রূপ-রূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া অনন্তের অভিসারে যাত্রা করিয়াছে; কোনো অবস্থাতেই সে অচল নয়, আবদ্ধ নয়। আবদ্ধ হইলেই তাহার জীবনত্ব—তাহার স্বধর্ম নষ্ট হয়।

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে। (বলাকা)

সর্দার বলে,—'আমি কিছুই নিষ্পত্তি করি নে, সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি—ওই আমার সর্দারি।' তাই সে মান্ধাতার আমলের বুড়োকে ধরিয়া আনিবার নূতন খেলায় যুবকদলকে প্ররোচনা দেয়; সেই আদ্যিকালের বুড়োকে ধরিবার জন্য নিজে মৃত্যুর অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে; শেষে সেই বুড়োর পরিবর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেই বাহির হইয়া আসিয়া বিস্মিত যুবকদলকে জানায় যে বুড়ো কোথাও নাই, একমাত্র সে-ই কেবল আছে। জন্মমৃত্যুর আবর্তনের মধ্যে এই জীবনই বারে বারে ঘোরাফেরা করিতেছে।

চন্দ্রহাস॥ এ কী, এ যে তুমি।
তুমি! সেই আমাদের সর্দার!
আমাদের সর্দার রে!
বুড়ো কোথায়।

সর্দার॥ কোথাও তো নেই।
কোথাও না?
সর্দার॥ না
তবে সে কী।
সর্দার॥ সে স্বপ্ন।
চন্দ্রহাস॥ তবে তুমিই চিরকালের।
সর্দার॥ হাঁ।
চন্দ্রহাস॥ আর আমরাই চিরকালের?
সর্দার॥ হাঁ।
(যুবকদল)—পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই। সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তারপর গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে, যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।
চন্দ্রহাস॥ এ তো বড় আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

এই জীবনের জরা-বার্ধক্য নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, এ নিত্য-নবীন; পিছন হইতে এই ধুলাবালি, এই জরা-বার্ধক্য দেখিয়া মানুষ মনে করে, ইহাই বুঝি তাহার স্বরূপ, কিন্তু সম্মুখ হইতে দেখিলে দেখা যায়, যে, তাহার চিরতারুণ্য বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নাই।

চন্দ্রহাস প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতীক,—'আমরা যাকে ভালবাসি, আমাদের প্রাণকে যে প্রিয় করেছে'। এই বিশ্বাস ও প্রেমই জীবনকে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে, ইহার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, বাধা-বিপত্তি, অসম্পূর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরে, ইহার মধ্যে আনন্দ পায়। জীবনের পথ চলা হয় সুন্দর, মধুর ও সার্থক। চন্দ্রহাস তাই গান করে,—

বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

তাই তাহার

চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,

নবযৌবনের দল বলে, 'চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না। ও কাছে থাকলে মনে হয়, কিছু হোক বা না হোক মজা আছে। এমন-কি, বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয়, সে আরও বেশি মজা।'

বিশ্বাস ও প্রেমই প্রাণের গূঢ় রহস্য জানে, সে জানে প্রাণকে নূতন করিয়া পাইতে হইলে তাহাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়া পাইতে হইবে, তাই সে রাত্রে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অরুণোদয়ে আসিয়া নবযৌবনের দলকে জানাইল যে, বৃদ্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্রহাসই জানে জীবনের লীলারহস্য, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান, তাই বাউল বলে,—চন্দ্রহাস বলে গেল, 'আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।' সে-ই বোঝে বসন্ত-উৎসবের তাৎপর্য,—সে-ই বোঝে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া না পড়িলে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন সার্থক হয় না। তাই বাউল বলে, 'সে বললে যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।' 'সে বললে—

বসন্তের ফুল গাঁথল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে,
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আনল আমার,
বরণডালা।'

চন্দ্রহাস জীবন-সর্দারের প্রধান সহকারী। জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম না থাকিলে, প্রাণের প্রতি সত্যকার দরদ না থাকিলে, জীবন তো একটা অর্থহীন প্রলাপমাত্র—তাৎপর্য-হীন, আনন্দহীন ছুটিয়া-চলা মাত্র। বিশ্বাস ও প্রেমই আমাদের এই ছুটিয়া-চলাকে করে মধুময় ও সার্থক। সে নবযৌবনের দলের পরম বন্ধু; সে না হইলে পথ-চলা আনন্দহীন হয়, খেলার রসে মন ভরিয়া ওঠে না। তাই চন্দ্রহাসের ক্ষণিক অদর্শনে নবযৌবনের দল বলে,—'আমরা চলব না, যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি।'

দাদা ঘর-ছাড়া যুবকদলের অন্যতম। বয়স তাহার সবচেয়ে কম হইলেও, তাহাকে অধিক-বয়স্ক বলিয়া মনে হয়। কবি ইহার পরিচয় দিতেছেন,—"ইহারা যাহাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে; এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে, বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ-ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।" শিক্ষার প্রভাবে ও সংস্কারের চাপে তরুণ বয়সেই যাহাদের মন রসহীন, চাঞ্চল্যহীন, যুক্তিসর্বস্ব ও গতানুগতিক-পন্থী হয়, দাদা সেই অকালপক্ক যুবক-বৃদ্ধদের প্রতীক। ইহারা পুঁথির বচন ও নীতিবাক্য অনুসারে চলে এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের প্রতিই বেশি দৃষ্টি দেয়। দাদা চৌপদী কবিতা লেখে, তাহা উপদেশপূর্ণ নীতিবাক্য। দাদা বলে, 'আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শৌখিন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।' এই দাদাদের যৌবনসুলভ উদ্দাম-চাঞ্চল্য নাই, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য ও কাজের প্রতিই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

নবযৌবনের দল॥ আমাদের খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা॥ কেন আপত্তি করি বলব? শুনবি?

সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস॥ বল কি তুমি দাদা। সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই যে তার লক্ষ্য।

দাদা॥ তাহলে কাজটা?

চন্দ্রহাস॥ চলার বেগে যে ধুলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা॥ সব জিনিসেরই সীমা আছে, তোদের যে কেবলই ছেলেমানুষি।

দাদা-চরিত্র অচলায়তনের মহাপঞ্চকেরি আর একটি রূপ। সে জ্ঞান ও কর্মের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রতীক। এই চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। সর্দার ও চন্দ্রহাসদের দলের অকারণ আবরণ গতিবেগ একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে যদি তাহার তলদেশে একটা স্থিতির ভিত্তি না থাকে। নিত্যস্থিতির উপর নিত্যগতির লীলাই রবীন্দ্র-দর্শনের একটি প্রধান সূত্র। গতির সহিত স্থিতির সামঞ্জস্যবিধানই উভয়কে সার্থক করে, এক অন্যকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। জীবনের মধ্যে এই কেন্দ্রাতীত ও কেন্দ্রানুগ শক্তির সমন্বয়ের যে রূপ, তাহাই জীবনের প্রকৃত রূপ। তাই রবীন্দ্রনাথ 'দাদা'র কাব্যে লোকহিত, নীতি-প্রচার ও তাহার বৃদ্ধসুলভ অচঞ্চলতা প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করিয়াও তাহাকে সম্মানের স্থান দিয়াছেন। তাহাকে বসন্তসাজে সজ্জিত না করিয়া বসন্ত-উৎসব শেষ করা হয় নাই। চন্দ্র-হাস বলিতেছে,—

'আমরা তোমার মাথায় পরাব নব-পল্লবের মুকুট, তোমার গলায় পরাব নব-মল্লিকার মালা, পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর-কেউ তোমার আদর বুঝবে না।

চন্দ্রহাস তাহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছে, আর দাদাও তাহার শেষ চৌপদীতে বসন্তোৎসবে তাহাদের খেলার উদ্দেশ্যের সফলতার ইঙ্গিত দিয়াছে,—

সূর্য এল পূর্বদ্বারে, তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার—
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

ইহা বাউলের কথারই প্রতিধ্বনি। গতি ও স্থিতির মিলন হইয়াছে।

অন্ধ বাউল ঠাকুরদাদা-চরিত্রেরই অন্যতর রূপ। দেহের স্থূল দৃষ্টিদ্বারা অতীন্দ্রিয় রহস্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অন্তরের দৃষ্টি দিয়াই তাহা দেখিতে হয়। এ-বিষয়ে বাহিরের দৃষ্টি অর্থহীন, তাই বাউল অন্ধ। 'চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আর আমার ভয় নেই।' বাউল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জগৎ ও জীবনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাবিদ্, অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ, সাধুপুরুষ। সে বিদ্যজ্ঞানের, দিব্যানুভূতির প্রতীক। এই অন্ধ বাউলই বুড়োর সন্ধান দেয়, চন্দ্রহাস ও তাহার দলকে গুহার পথে পরিচালিত করে। এই অন্তর্দৃষ্টি, এই দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই জগৎ ও জীবনের রহস্য জানা যায়।

তাহা হইলে সর্দার ক্রমাগত সম্মুখে পরিচালিত করে, অর্থাৎ জীবন নিরন্তর গতিশীল। চন্দ্রহাস এই চলাকে আনন্দময় করে, অর্থাৎ জীবনের প্রতি অনুরাগ—প্রেম এবং উহার সার্থকতায় গভীর বিশ্বাস এই ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হওয়াকে, এই নিরন্তর পথ-চলাকে রসময়, মধুময় করে। বাউল তাহাকে যৌবনগ্রাসী আদ্যিকালের বুড়োটার গুহার সন্ধান দেয়, অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানই প্রেমকে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সাহায্য করে

ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান দেয়। আর শেষে দাদার সহিত চন্দ্রহাসের দলের মিলন হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের কাঠিন্য ও নিষ্ঠার সহিত প্রেমের মিলন হওয়া প্রয়োজন, কারণ জ্ঞানের কাঠিন্যের উপরই প্রেমের কোমলতা ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে সার্থকতা দেয়—না হইলে উভয়েই অসম্পূর্ণ। ইহাই 'ফাল্গুনী'র রূপক-সংকেতের ভিতরের কথা।

নাটকীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই রূপক-সংকেত-প্রয়োগের কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্।

প্রথমেই পথ। নানা-ঘটনা-সংকুল, বিচিত্র-অভিজ্ঞতাময়, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবনের গতিই এই পথ। জীবনের স্বরূপকে পথের সংকেতে ব্যক্ত করা রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের একটি অঙ্গ। বিশেষ করিয়া রূপক-সাংকেতিক নাট্যে কবি পথকে অনেক স্থলেই ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী নাটক 'মুক্তধারা'য় করা হইয়াছে। এই পথেই নবযৌবনের দল উৎসব করিতে বাহির হইয়াছে, 'ভয় চৌপদী, পণ্ডিত ও পুঁথি ছাড়িয়া' বুড়ো-খোঁজার খেলায় মাতিয়াছে, জীবনের স্বরূপের সন্ধানে তাহারা উৎসাহী।

ঘাট জীবনের শেষপ্রান্ত। ঘাটের মাঝি সেই সব অন্তর্দৃষ্টিহীন, শাস্ত্রের বাঁধা-বুলিসর্বস্ব, পরলোকের বিধানদাতার দল। ইহারা জীবনের তাৎপর্য বোঝে না, জানে মৃত্যুই জীবনের পরিণতি—জানে না যে মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয় না। ইহারা কেবল শাস্ত্রের বাঁধাবুলি আওড়ায় এবং সেই বুলি অনুসারেই সকলের পথনির্দেশ করে। সে বলে—'আমার হচ্ছে পথ ঠিক করা, কাদের পথ সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।'

কোটাল হইতেছে লৌকিক-জ্ঞান-সর্বস্ব, জরা মৃত্যুভয়ভীত বৃদ্ধ। সে জানে, লোকে জীবনের রাস্তা দিয়া আসিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া যায়। জরা-মৃত্যু মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ নিয়ম। তাই সে বলে—'সেই চিরকালের বুড়োই তো তোমাদের খোঁজ করছে। সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের 'পরে তার বড়ো লোভ।'

মাঠ স্থিতির প্রতীক। এখানে আসিয়া নবযৌবনের দলের সন্দেহ জাগে, স্থির করে—'পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়'। 'আমরা চলব না'।

গুহা মৃত্যুর প্রতীক। এই মৃত্যুর দেশের চিত্র কবি অতি চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়া মৃত্যুর সার্থকতা সম্বন্ধে এক অপূর্ব সংকেত দিয়াছেন।—

"দেখছিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতরো? এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যারা সেখানে বলছিল 'চল্ চল্', তারা এখানে বলছে 'যাই যাই'।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা। মনটার ভিতর কেমন ব্যথা দিচ্ছে, তবু লাগছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল। পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনও আমরা দেখি নি। ঊর্ধ্বশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে, চার-পাশের দিকে নয়। বিদায়ের বাঁশীতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি। আর, দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চলে চলে না যেত তা হলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়ত। চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তা হলে যৌবন

শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি। এই জায়গাটাতেই এসে শুনতে পাচ্ছি, জগৎটা কেবল 'পাব পাব' বলছে না, সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'ছাড়ব ছাড়ব'। সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।"

মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন এত মধুর এবং মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থক-স্বরূপ উদ্ভাসিত।

এই নাটকে বসন্তোৎসবকে একটি ভাবের সংকেতরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে যে লীলা, মানুষের জীবনেও সেই একই লীলা। বসন্তের মধ্যেও চোখের জল লুকানো, তাই সে অতো রমণীয়, ছাড়ার সুরে পাওয়ার গান তাহার অন্তরে বাজে, ঝরাপাতার সঙ্গে কচিপাতার হয় মিলন। যৌবনের মধ্যেও আছে কান্না, তাই সে সবুজ; ইহার মধ্যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভোগ ও ত্যাগের মহামিলন, তাই সে অতো মধুর, অতো কাম্য। এ আলোচনা পূর্বেও করা হইয়াছে।

মুক্তধারা

(১৩২৯)

'মুক্তধারা' নাটকখানির আলোচনার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক পরিবেশ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

দেশ ও কাল সাহিত্য-শিল্পীর মনে যে ভাব ও চিন্তার রেখাপাত করে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট কল্পনা ও অনুভূতির মধ্য দিয়া অনেকাংশে শিল্পরূপে প্রকাশ পায়। যে-সমস্ত সাহিত্য-শিল্পীর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভাব-কল্পনা চিরন্তন সত্যের আদর্শ ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সমসাময়িক ঘটনা বা চিন্তাধারাকে তাঁহাদের সর্বজনীন আদর্শ ও নীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তাহার মূল্য নির্ধারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন-চেতনা প্রথম হইতেই একটা সার্বভৌম আদর্শ ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত,—দেশের ও বিদেশের সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিকে তিনি সেই চিরন্তন আদর্শ ও নীতির মাপকাঠিতে চিরদিনই বিচার করিয়াছেন। মানবাত্মার সর্ববন্ধনমুক্তিই তাঁহার আদর্শ—পরিপূর্ণ মানবতার তিনি পূজারী। যেখানেই মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করা হইয়াছে ধর্মের শুষ্ক আচার ও মিথ্যা সংস্কার দ্বারা—সমাজের যুক্তিহীন, হৃদয়হীন রীতি-নীতি দ্বারা, রাজনীতির স্বার্থবুদ্ধি, ভয় ও বলপ্রয়োগ দ্বারা, সেখানেই তাঁহার মনোগত আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেই ধর্ম, সেই সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনীতি তিনি অন্তর হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির এই সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও রুদ্ধাবস্থা মানুষের অকল্যাণকর বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন এবং প্রবন্ধে, ভাষণে, সাহিত্যসৃষ্টিতে নির্ভীকভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সুবিপুল রচনাবলীর মধ্যে ইহার বহু নিদর্শন ছড়াইয়া আছে।

প্রথম স্বদেশী-আন্দোলনের গোড়াতে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহার গানে ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে মাতাইয়াছেন, কিন্তু যখন কর্মপন্থা নেতিবাচক বয়কট ও ইংরেজ-বিদ্বেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল, তখন তিনি ঐ আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কবির মতে একমাত্র আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা, স্বাবলম্বনের দ্বারা, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের দ্বারাই স্বাধীনতালাভ সম্ভব,—পরের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, 'আবেদন-নিবেদনের থালা' বহন করিয়া, হৃদয়াবেগের তুবড়ি ছুঁড়িয়া বা দ্বেষ-হিংসা প্রচার করিয়া এই স্বাধীনতা আসিবে না। বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা, ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা সমস্ত অন্ধসংস্কারের বাধাকে দূর করিয়া মনে-প্রাণে স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিবে। বাহির হইতে স্বরাজ আসিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, ইহা অকর্মণ্য, দুর্বলের কৈফিয়ৎ মাত্র। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মত। দ্বিতীয় স্বদেশী-আন্দোলনে অসহযোগ ও চরকা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব সকলের সুবিদিত। গান্ধীজীকে ব্যক্তিগত-ভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিলেও রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ ও চরকার মধ্যে স্বাধীনতার কোনো সূত্র দেখিতে পান নাই। এ বিষয়ে তাঁহার একটিমাত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিলেই স্বাধীনতা বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন, তাহা পরিস্ফুট হইবে,—

> "আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিরশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন; সে কি এই চরকা-চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালনা হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে? স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না?" (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কালান্তর, পৃঃ ৩৫০)

ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তিনি মানবের সর্বাঙ্গীণ, পরিপূর্ণ মুক্তির কামনা করিয়াছেন। পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনেই প্রকৃত স্বাধীনতা, যথার্থ মুক্তি। সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার যেখানে বিরহ নাই, সেখানে তিনি কোনো সার্থকতা দেখেন নাই। মানুষের অন্তরতম সত্তার দেশে কালে কোনো পরিমাপ নাই,—সে নিত্যমুক্ত, স্বাধীন, বৃহৎ, মহৎ ও চিরন্তন। কোনো ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র অন্যায় বিধিনিষেধের দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিলে, তাহাকে পীড়ন ও নির্যাতন করিলে, তাহারা সত্য আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অমঙ্গলজনক ও নিন্দনীয় হইবে। মানুষকে অবহেলা, পীড়ন, হনন মানুষের জঘন্যতম অপরাধ। রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো মানবতার পূজারী পৃথিবীতে বিরল। তাঁহার এই মানবতাবাদ একটা মূলগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এই কথাটি সর্বদা স্মরণীয়। তাঁহার দীর্ঘজীবনে কি স্বদেশে কি বিদেশে যখনই মানুষ পীড়িত হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ

বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছে, তখনই তাঁহার উচ্চ কণ্ঠ হইতে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। দেশের মনুষ্যত্বপীড়ক ধর্মসংস্কার ও সমাজ-ব্যবস্থার, এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতি রুদ্ধদৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি সমান-ভাবে নিন্দা করিয়াছেন;—বিদেশী শাসকের মনুষ্যত্বপীড়নের প্রতিবাদে উপাধি পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে পাশ্চাত্ত্য দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সর্বগ্রাসী জাতীয়তাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্বরতা ও রক্তপাতকেও তিনি রোগ-শয্যা হইতেই ধিক্কার দিয়াছেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কবির জীবনে এই প্রথম। দূর হইতে ইহার সংবাদ পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত খানিকটা আলোড়িত হইল। কবির মন তখন 'বলাকা-ফাল্গুনী'র যুগে। ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্য দিয়াই নবজীবনের বিকাশ হয়, এইটিই তখন তাঁহার মনের প্রধান ভাব-গ্রন্থি। তাঁহার বিশ্বাস হইল, যুদ্ধের এই ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্য দিয়াই পৃথিবীতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইবে। 'ক্রন্দনের কলরোল' ও 'লক্ষ বক্ষ হইতে মুক্ত রক্তের কল্লোল'-এর মধ্য দিয়াই দেখা দিবে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'। 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত' খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এবং 'রাত্রির তপস্যা' 'দিন আনিবে'—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের আশা। এই যুদ্ধপর্বের শেষ না হইতেই কবি জাপান ও আমেরিকা যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের তখন মধ্যাবস্থা। যুদ্ধের মূলকারণ যে অন্ধ জাতীয়তাবোধ ও লুব্ধ আত্মপ্রসার-নীতি, তাহা তাঁহার চিন্তাশীল মনে এইবার প্রতিভাত হইল। আমেরিকায় তিনি পাশ্চাত্ত্য ন্যাশন্যালিজমের স্বরূপ ও ভারতের জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তাহার প্রভেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আমেরিকা তখনও যুদ্ধে নামে নাই। তারপর যুদ্ধ শেষ হইল। যুদ্ধ-শেষের কিছুদিন পরে কবি আবার ইউরোপ ও আমেরিকা-ভ্রমণে বাহির হইলেন। এক বৎসরেরও অধিক সময় তিনি ইউরোপের নানাদেশে ও আমেরিকায় কাটাইলেন। যুদ্ধের মধ্যবর্তী ও পরবর্তী সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি, স্বাজাত্যবোধ, সভ্যতার রূপ, ঐশ্বর্যের সংগ্রহনীতি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। তিনি দেখিলেন, পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রনীতির অর্থ—নানা উপায়ে পররাজ্য-গ্রাস, ছলে-বলে-কৌশলে বিজিত রাজ্যকে দমনে রাখা; জাতীয়তার অর্থ—নৈর্ব্যক্তিক সংঘশক্তির সম্প্রসারণ-নীতি, সন্দেহ, বিরোধ ও বিজয়; সভ্যতার অর্থ—উচ্চতর আদর্শহীন ও নীতিহীন, অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য-সরলতা-অবকাশ-বর্জিত, বিজ্ঞানপুষ্ট যান্ত্রিকতা এবং হৃদয়হীন, অপরিমেয় সঞ্চয়লিপ্সা। ইহার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অবসর নাই, অন্তরাত্মার মুক্তির লীলা নাই। যে-সভ্যতা ও শাসন মানুষেরই কল্যাণের জন্য, সেই মানুষ ইহার মধ্য হইতে নির্বাসিত, ইহাতে তাহাকে চাপিয়া মারিবারই বিচিত্র আয়োজন। কবির আশা ব্যর্থ হইল, যুদ্ধোত্তর জগৎ নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিল না, মৃত্যুসিন্ধুমন্থনে মানুষের ভাগ্যে অমৃত উঠিল না।

'মুক্তধারা' ও পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী'তে এই যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকাই রবীন্দ্রনাথের মানস-পটভূমি। ইহাদের পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রনীতি, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও যান্ত্রিক সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার ভাব, চিন্তা ও অনুভূতি এবং বিদেশী পাশ্চাত্ত্যশক্তির শাসন ও শোষণযন্ত্রে স্বদেশবাসীর শোচনীয় অবস্থার জ্ঞান এবং তাঁহার বিশিষ্ট মানবতাবাদ একত্র মিলিয়া তাঁহার কবি-চিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই শিল্পরূপ প্রকটিত হইয়াছে এই দুই নাটকে।

'মুক্তধারা'র আখ্যানভাগটি এইরূপঃ—উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ বিজিত অথচ বিদ্রোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনিতে না পারিয়া সেই রাজ্যের জলসরবরাহের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মুক্তধারা ঝরনা এতকাল তাহাদের পিপাসিত কণ্ঠ ও চাষের ক্ষেত সরস করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় এক বিরাটকায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ নির্মাণ করিয়া সেই মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। শিবতরাই-এর পিপাসা ও চাষের জল চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব হইতেই শিবতরাই-এর প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া দু'বছর খাজনা বন্ধ করিয়াছে। দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তাহারা কোনোরূপে ক্ষুধার অন্ন জুটাইয়াছে, কিন্তু উদ্বৃত্ত কিছু না থাকায় খাজনা দিতে পারিতেছে না। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে শিবতরাই-এর শাসনভার দিয়াছিলেন তাহাদের বশে আনিবার জন্য। কিন্তু অভিজিৎ ভিন্ন প্রকৃতির লোক; সে চিরদিনের মত শিবতরাই-এর বাসিন্দাদের উত্তরকূটের অন্নজীবী হইয়া থাকিবার দুর্গতি হইতে মুক্ত করিবার জন্য বহু-কালের রুদ্ধ নন্দিসংকটের পথ কাটিয়া দিয়াছে, যাহাতে শিবতরাই-এর পশম বিদেশের হাটে বিক্রীত হইয়া অর্থসমস্যার সমাধান করিতে পারে। ইহাতে শিবতরাইবাসীরা যুব-রাজকে দেবতার মতো ভক্তি করিতে লাগিল বটে, কিন্তু যুবরাজের এইপ্রকার কার্যে উত্তর-কূটের স্বার্থান্ধ প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল। যুবরাজের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিল তাহারা। রাজা বাধ্য হইয়া তাহাকে সরাইয়া আনিলেন এবং রাজার শ্যালককে সেখানে শাসনকর্তা করিলেন। তাহাতে শিবতরাই-এর প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতে লাগিল। এদিকে তাহারাও ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে খাজনা না দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই বিদ্রোহী প্রজাদের জল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের পূর্ণমাত্রায় বশ্যতা স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যেই এতদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর মুক্তধারার বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে।

এই বাঁধ বাঁধিবার যন্ত্রনির্মাণে বহু চেষ্টা, অর্থব্যয় ও প্রাণব্যয় করা হইয়াছে। এই বিরাট যন্ত্রের পাদপীঠে বহু যুবকের তাজা প্রাণ বলি দেওয়া হইয়াছে। 'পুত্রহারা অম্বা' কাঁদিয়া ফিরিতেছে, 'নাতি-হারা বটুক' সকলকে ঐ পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে। এত-দিনের শ্রম, প্রাণ ও অর্থের বিনিময়ে আর বিরাট দৈত্যের মতো যন্ত্র আকাশে মাথা উঁচু করিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়াছে।

এই যন্ত্র-নির্মাণের সাফল্যে আজ উত্তরকূটবাসীরা আনন্দে অধীর। ভৈরব-মন্দিরে তাহারা পূজা দিতে চলিয়াছে, সেইসঙ্গে তাহারা যন্ত্ররাজ বিভূতিরও বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করিয়াছে। পথ দিয়া দলে দলে তাহারা ভৈরব-মন্দিরের দিকে চলিয়াছে।

যুবরাজ অভিজিৎকে মুক্তধারার নিকটে ঝরনাতলায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। সে রাজার নিজের পুত্র নয়, তবুও রাজা তাহাকে ছেলেবেলা হইতে পুত্রের মত পালন করিতেছেন এবং তাহাকেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী করিয়া যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সে সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে, দেশ-কাল-জাতির গণ্ডীর বাহিরে,—বিশ্ব-মানবের সর্ব-প্রকার বন্ধনমুক্তিই তাহার ব্রত। শিবতরাই ও উত্তরকূট তাহার নিকট দুইই সমান। মুক্ত-ধারার বাঁধ দেওয়াতে সে গভীর মর্মাহত হইয়াছে; শিবতরাইবাসীকে দেবতা-প্রদত্ত পিপাসার জল হইতে যেন বঞ্চিত না করা হয়, এই অনুরোধ করিয়া বিভূতির নিকট সে দূত পাঠাইয়াছে, কিন্তু যন্ত্রগর্বোন্মত্ত বিভূতি তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

এদিকে অভিজিৎকে শিবতরাই-এর পক্ষাবলম্বী মনে করিয়া উত্তরকূটের প্রজারা তাহার

উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। রাজা বাধ্য হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বন্দি-শালায় আগুন লাগিয়া গেল। মোহনগড়ের রাজা খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে উদ্ধার করিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু অভিজিৎ যাইতে সম্মত হইল না।

অভিজিৎ বন্দিশালায় নাই দেখিয়া উত্তরকূটবাসীরা তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতেছে; আবার যুবরাজ বন্দী হইয়াছে শুনিয়া হাজার হাজার শিবতরাইবাসী তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি—পথে অবিশ্রাম লোকের আনাগোনা। এমন সময় মুক্তধারার জলস্রোতের শব্দ শোনা গেল—যেন 'অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল'। সকলেই বুঝিল, মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়াছে—মুক্তধারা ছুটিয়াছে।

এমন সময় কুমার সঞ্জয় সংবাদ আনিল—'অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন। মুক্ত-ধারার স্রোতে তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না। ঐ বাঁধের একটি ত্রুটির সন্ধান কি করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানেই যন্ত্ররাজকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিল। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।' এইখানেই নাটকের শেষ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবি-রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটকের সহিত 'মুক্ত-ধারা'র একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী তিন নাটকেই বর্তমান। অভিজিৎ ও উদয়াদিত্যের এবং বিশ্বজিৎ ও বসন্তরায়ের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'মুক্তধারা' প্রকৃত পক্ষে ভিন্নশ্রেণীর নাটক, উহাদের এক পর্যায়ভুক্ত নয়।

এখন এই আখ্যানভাগের মধ্যে ভাববস্তু কি ভাবে রসরূপে রূপায়িত করা হইয়াছে দেখা যাক্‌।

মুক্তধারা কি? মানব-জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম গতিই মুক্তধারা। গতির স্রোতে মানুষ ক্রমাগত ভাসিয়া চলিয়াছে, জন্ম-জন্মান্তরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। এই গতিই জীবনের স্বরূপ, এই গতির মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। এই গতির স্রোত রুদ্ধ হইলেই মানুষের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া ওঠে, নানা জালজঞ্জাল ও ক্লেদপঙ্কে তাহার সাবলীল প্রাণের লীলা ব্যাহত হয়, মানুষ তাহার নিত্য-মুক্ত স্বাভাবিক সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই রুদ্ধ অবস্থা জীবনের বিকৃত ও অসত্য রূপ, সর্ববন্ধনমুক্ত গতিই তাহার জীবনের স্বরূপ, মুক্তধারাই তাহার জীবনের প্রতীক।

এই নাটকে একটিমাত্রই দৃশ্য,—সেটি হইতেছে পথ। এই পথ ভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। এই পথের পার্শ্বে রাজা রণজিতের শিবির স্থাপিত হইয়াছে। রাজা পদব্রজে ভৈরব-মন্দিরে আরতি দেখিতে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে, শিবতরাই-এর লোকও চলিয়াছে। নাটকের সমস্ত ঘটনা এই পথের উপরেই ঘটিয়াছে। এই পথের মধ্যে গভীর তাৎপর্যমূলক সংকেত আছে। নাটকের ভাববস্তুর মেরুদণ্ডটিই এই পথের সংকেত। কবি প্রথমে এই নাটকের নাম দিয়াছিলেন 'পথ'।—

> "আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম, শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই, সে গল্পের কিছু এতে নেই..."
>
> (ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮)

এই পথ জীবনের নিরন্তর অগ্রসর হওয়া—অবিরাম চলার প্রতীক। পথের উপরেই জীবনের বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হইতেছে, তাহারই মধ্য দিয়া মানুষ অগ্রসর হইতেছে। মানুষ এই পথ ধরিয়াই জীবন হইতে জীবনান্তরে চলিতেছে, সে অনন্ত পথের পথিক, সে কোনো স্থানেই আবদ্ধ হয় না, কোথাও তাহার স্থায়ী ঘর নাই, জীবনের সমস্ত ঘটনাই পথের উপর ঘটে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয়ও এই পথে, আবার তাহার ক্ষয়ও এই পথেরি উপর, যদি কিছু পাইবার বস্তু থাকে, তাহাও এই পথেই পাওয়া যায়। কোন্ অনাদি কাল হইতে মানুষ এই পথে বাহির হইয়াছে, কবে এই পথ-চলার শেষ হইবে, তাহা কেহ জানে না। পথই সীমাহীনতার ইঙ্গিত দেয়, জীবনের অনন্তত্ব ও অসীমত্বের সংকেত দেয়। রবীন্দ্র-কাব্য ও নাটকে পথের গুরুত্ব অনেকখানি, কবির ভাবজীবনের সহিত ইহা বিশেষভাবে জড়িত। কবি তো নিজেই 'পথ-পাগল পথিক'; 'সপ্তঋষির গগনসীমা হতে' 'মন্ত্র' শুনিয়া, 'বচনহারা, অচেনা অদ্ভুত'-এর দূতের বার্তা পাইয়া নিশীথে তিনি পথে বাহির হইতে আকুল; 'আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা ঘরছাড়া ওই নানাদেশের পথের নেশা' তাঁহার লাগিয়াছিল, তিনি 'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ, বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুকে' 'অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে' কতোবার বাহির হইয়াছেন 'পথের 'পরে'।

এই চির-পথিক মানুষের স্বরূপ কবির উপলব্ধিতে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। 'আমি পথিক, পথ আমারি সাথী',—

বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা
পথে যেতেই ভালোবাসা
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥ (গীতালি)

এই পথটি যে ভৈরব-মন্দিরের দিকে গিয়াছে, ইহার মধ্যেও একটি তাৎপর্য আছে। সেই পথিক-বন্ধু লীলাময় দেবতা পথের শেষে পথিকের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সমস্ত পথিক তাঁহারই দিকে চলিয়াছে। তিনিও তো পথিক, মানুষের 'পথের সাথী', তিনিও পথে নামিয়া মানুষ-পথিকের সঙ্গে খেলায় মাতিয়া ক্রমাগত তাঁহার দিকে টানিয়া লইতেছেন—জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই লীলাচ্ছলে ক্রমাগত তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাই কবির কথা,—

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।...
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে
তা'র চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া। (গীতালি)

মুক্তধারাকে রুদ্ধ করিয়াছে কে? রাজা। কিসের দ্বারা? এক বিরাটকায় লৌহ-যন্ত্রের দ্বারা। রাজার আদেশে রাজ-ইঞ্জিনীয়ার বিভূতি বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিবার জন্য এটি নির্মাণ করিয়াছে—মানুষের সচল জীবনধারায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে রাজশাসন যন্ত্রশক্তির সহায়তায়। পাশ্চাত্ত্যের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ইহাই স্বরূপ। পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি বিপুল শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-শক্তি বুদ্ধির শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি। এই যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই তাহারা বিজিত জাতিকে দমন করিতেছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে, অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, জয় করিতেছে। যন্ত্রই পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের মূলশক্তি বলিয়া তাহাদের শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, সভ্যতা যন্ত্রের আকারে পর্যবসিত হইয়াছে, যান্ত্রিক রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচ্যের বিজিত জাতিকেও তাহারা এই যান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতার দ্বারা শাসন করিতেছে। এই বিরাট যন্ত্রের পেষণে মানুষ দলিত, মথিত,—যন্ত্রের চাপে তাহার মনুষ্যত্বকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করা হইতেছে। উচ্চতর আদর্শ, মহত্তর নীতি ও প্রকৃত মানবতাবোধ ইহাদের নাই,—আছে কেবল উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ, যোদ্ধৃসুলভ দেহ-মন, যন্ত্রশক্তির দর্প ও অহংকার, যন্ত্রগর্বোদ্ধত শাসন ও ন্যায়-বিগর্হিত রাষ্ট্রনীতি। উত্তরকূটের রাজ্যশাসনে পাশ্চাত্ত্য জাতির এই অন্ধ জাতীয়তা ও যন্ত্রগর্বোদ্ধত শাসন এবং ন্যায় ও সত্যবিচ্যুত রাষ্ট্রনীতির রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যন্ত্র ইহাদেরই প্রতীক।

এই উগ্র জাতীয়তাবোধকে জন্মদান ও ধারণ করে ইহাদের শিক্ষা। শৈশব হইতেই শিশুদের মনে এই ভাবটি সঞ্চারিত করা হয় যে, তাহারা আকারে ও মানসিকতায় জাতি হিসাবে সকলের বড়ো, তাহাদের ঐতিহ্য প্রভুজাতির ঐতিহ্য, সকলের উপর শাসন বিস্তার করিতেই তাহাদের জন্ম। উত্তরকূটের বালকদের শিক্ষার মধ্যেও এই সংকেতটি নিহিত।

গুরু

যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হইতে গৌরব বোধ করতে শেখে তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ

বিভূতি কি করেছে এরা সবাই জানে ত?

ছেলেরা

(লাফাইয়া হাততালি দিয়া)

জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ

কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা

(উৎসাহে)

র জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ

কেন জব্দ করা?

ছেলেরা

ওরা যে খারাপ লোক!

রণজিৎ

কেন খারাপ?

ছেলেরা

ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

কেন খারাপ তা জান না?

গুরু

জানে বই কি, মহারাজ। কি রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

ছেলেরা

হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু

আর ওরা আমাদের মতো—কি বল্ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা

নাক উঁচু নয়।

গুরু

আচ্ছা আমাদের গণাচার্য কি প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাকলে কি হয়।

ছেলেরা

খুব বড় জাত হয়।

গুরু

তারা কি করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা

হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু

উত্তরকূটের মানুষ কোনো দিন যুদ্ধে হেরেচে জানিস্?

ছেলেরা

কোনো দিনই না।

গুরু

আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগজিৎ দুশো তিরানব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো দাক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা

হাঁ, দিয়েছিলেন।

গুরু

নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন

এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যা গুরু। কতো বড় দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরী করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন।

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী, তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মানি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল ব'লে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন্ এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মানি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে; সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সে দিক্‌কার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নিমানা।" (শিক্ষার মিলন, কালান্তর, পৃঃ ১৮৫)

দেহ ও মনে উত্তরকূটবাসীরা কর্মঠ ও যোদ্ধৃজাতির মতো গঠিত,—

শিবতরাইবাসী

১

দেখছিস্, ভাই, কি চেহারা ঐ উত্তরকূটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে সুরু করেছিলেন, শেষ করে উঠতে ফুরসৎ পান নি।

২

আর দেখেছিস্ ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরার ধরনটা?

৩

যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।

১

ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২

...ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে উইপোকার মতো সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।

৩

আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

২

ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

বিজিত জাতির আকৃতি ও স্বভাবকেও তাহারা ঘৃণা ও বিদ্রূপ করে,—

উত্তরকূটবাসী ১

ও ভাই, ঐ যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২

কি করে বুঝলি?

উ ১

কান-ঢাকা টুপি দেখছিস্ নে? কি রকম অদ্ভুত দেখতে? যেন উপর থেকে থাব্ড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২

আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১

কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়! (সকলের হাস্য)

উ ৩

তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য)

উ ১

পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েছে কি রে?

ধর্মকে ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করিতে চায়; ভগবানকে মনে করে, তিনি কেবল তাহাদেরই দেবতা ও তাহাদের দুষ্টবুদ্ধির সহায়ক, এবং দুষ্টবুদ্ধির সাফল্যের জন্য ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে চায়, তাঁহার দয়া প্রার্থনা করে,—

বিশ্বজিৎ

কি নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকলের তৃষিতের জন্য দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলাধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ

শত্রুদমনের জন্য।

বিশ্বজিৎ

মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ

যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিব-তরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ

তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

ইহাই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তরের রূপ। ইহারা বাহিরে ধর্মবিশ্বাসের একটা কৃত্রিম ছদ্মবেশ পরিয়া অধর্মের ব্যাবসা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও কবি ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন,—

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতার...

স্তূপাকার লোভ বক্ষে করিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা। (নবজাতক)

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিয়া শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট-দর্শন
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো। (নবজাতক)

বুদ্ধির অহংকার ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দর্পে তাহারা ভগবানের সমকক্ষ হইবার স্পর্ধা করে। তাহাদের মতে এই যন্ত্র-সাধনার সফলতার কাছে মানুষের প্রাণ তুচ্ছ, মনুষ্যত্ব নগণ্য, মানুষ ইট-কাঠ-পাথরের মতো ব্যবহারের বস্তু। যন্ত্রশক্তিই তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের বস্তু—

দূত

যন্ত্ররাজ-বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি

কি তাঁর আদেশ?

দূত

এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি

তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত

শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি

দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত

তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—

বিভূতি

চাষের ক্ষেতের কথা কি বলছ?

দূত

সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধবার উদ্দেশ্য ছিল না?

বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি

না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত

ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙতে পারবে না?

বিভূতি

না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত

অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি

অভিশাপ! দেখ, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কতো মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?...যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব একথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর।

যন্ত্র-দানবের উপাসকদলের ইহাই মনোভাব। ভগবানকে তাহারা গ্রাহ্য করে না, মানুষকে মনে করে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সামান্য একটা উপায় মাত্র। তাই যন্ত্রের বলি সুমনের জন্য পুত্রহারা অম্বা কাঁদিয়া ফেরে; বটুক বুড়ো তাহার দুই জোয়ান নাতির তাজা রক্ত যন্ত্রবেদীর উপর ঢালিয়া দিয়াছে, তাই সে বিদর্ণ-বক্ষে সকলকে ঐ পথে যাইতে নিষেধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে।

অভিজিৎ কর্তৃক মুক্ত নন্দিসংকটের পথটা আবার বাঁধিবার কথা উঠিয়াছে, লোক-সংগ্রহও চলিতেছে, তবে বিস্তর বলির প্রয়োজন।

বিভূতি

...আপাতত ঐ নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কংকর

তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি

না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুস্কিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং

বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি

মরবার লোক বিস্তর চাই।

কংকর

মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

এইভাবে শাসন-যন্ত্রের বলি, যুদ্ধ-যন্ত্রের বলির রক্তধারায় ধরাতল এখনও প্লাবিত হইতেছে। 'বৈশ্যের যন্ত্র' আজ 'ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র', শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উত্তরকূটবাসীরা দেশের স্বার্থে পরপীড়নে অগ্রসর হইলেও ইহারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে বিশ্বাস করে না। কোনো একটা কাজ আশানুযায়ী কলের মতো না ঘটিলেই তাহাদের সন্দেহ, অধৈর্য ও ক্রোধ বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা নিজেদের রাজা, মন্ত্রী, যন্ত্র-রাজ বিভূতিকে পর্যন্ত সন্দেহ করিয়াছে। মোহনগড়ের রাজা খুড়ো মহারাজকে তাহারা সন্দেহ করিয়া তাহার 'সোনার খনিটা', 'গোষ্ঠের পঁচিশ হাজার গরু', 'জাফ্‌রাণের খেত' কাড়িয়া লওয়াই তাহার উপযুক্ত শাস্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। যান্ত্রিক শাসনরীতির ইহাই একটি বড়ো দৌর্বল্য। ইউরোপীয় রাজনীতিতে এখন পর্যন্তও ইহা চলিতেছে—এই অবিশ্বাসের কারণেই নানাস্থানে purge-এর কথা আজও শোনা যায়।

এখন এই যন্ত্রসর্বস্বতায় পীড়িত হইতেছে কে? পীড়িত হইতেছে মানুষের অন্তরাত্মা, তাহার মনুষ্যত্ব। কুমার অভিজিৎ মানুষের সেই নিপীড়িত অন্তরাত্মার প্রতীক। সমষ্টিগতভাবে মানুষের এই অন্তরাত্মা নিপীড়িত হইতেছে পরাধীন, শোষিত জাতির মধ্যে। সমগ্র বিজিত, পরাধীন জাতির অন্তরাত্মার প্রতীক হইতেছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। উভয়েই মোটের উপর একই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন,—একজনের বিদ্রোহ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানদৃপ্ত মূল-যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে, আর একজনের বিদ্রোহ যান্ত্রিক ব্যবস্থা-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। মূলত উভয়ের বিরুদ্ধতাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে ও মানুষের মুক্তির সপক্ষে,—তাই উভয়ের মধ্যে সমপ্রাণতা ও সমক্রিয়তা বর্তমান।

অভিজিৎ জানে মানুষের সর্ববন্ধনমুক্ত অন্তরতম সত্তাকে কোনো বন্ধনে বাঁধিয়া আবদ্ধ করিলে সে পীড়িত হইবে, বিকৃত হইবে,—তাই মানুষের বন্ধনমুক্তিই অভিজিতের সংকল্প, স্বপ্ন ও সাধনা। সে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহী শক্তি। যন্ত্র মানুষের সচল, স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহকে রুদ্ধ করিয়াছে, ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য হরণ করিয়াছে, দেবতার মহিমাকে ম্লান করিয়াছে, তাই সে যন্ত্রকে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও ধ্বংস করিয়াছে।

কবি মুক্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিতের জন্মস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে রাজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহার জন্মরহস্য তাহাকে জানানো হয় নাই। এই জন্মরহস্যের মধ্যে কবির সংকেত এই বলিয়া মনে হয় যে, 'অন্তরাত্মার নিরন্তর গতিশীল স্বরূপের জ্ঞান ও তাহার বন্ধনের অনুভূতি অভিজিতের মধ্যে স্বত-উৎসারিতভাবে এতোই প্রবল যে, রাজসিংহাসন ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সে নিজের মুক্ত সত্তা ফিরিয়া পাইবার জন্য এবং অপরাপর বদ্ধ আত্মার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। রণজিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে সেই রক্ত ও পারিপার্শ্বিকের গুণে হয়তো তাহার মধ্যে মুক্তি-কামনা এতো প্রবল না-ও হইতে পারিত। অভিজিতের আত্মঘাতী উন্মাদনার কারণও বোধ হয় কবি ঐ-রহস্যের মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। মোটকথা,

তত্ত্বের দিক দিয়া মানবাত্মার স্বরূপ-নির্দেশের উপরই কবি বেশি জোর দিয়াছেন। কোনো বন্ধন মানবাত্মাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবনের মুক্ত-স্বরূপকে ফিরিয়া পাওয়া যায়—বোধ হয় ইহাই কবির ইঙ্গিত। সে নিজের মুক্তি এবং সমগ্র বদ্ধ-মানবের মুক্তি কামনা করে।

মানুষকে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত করাই অভিজিতের চিরকালের সাধনা। সে নিজে কোনো অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে না, অন্যকেও থাকিতে দিবে না।

বিশ্বজিৎ

...সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি দেখছ, ভাই?" সে বললে, "যে সব পথ এখনো কাটা হয় নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনি মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, "ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

নন্দিসংকটের যে-পথ সে খুলিয়া দিয়াছে, তাহা অবরুদ্ধ জীবন-পথের প্রতীক। যে-অন্নে মানুষের ন্যায় অধিকার, শাসন-যন্ত্রের চাপে তাহা বন্ধ হইয়াছিল, জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাই অভিজিৎ সেই 'অন্ন-চলাচলের পথ খুলিয়া' দিয়াছে,—'চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে মুক্তি' দিয়াছে। শুধু এই-খানেই তাহার কাজ শেষ নয়, অনাগত ভবিষ্যতে মানুষ যত বন্ধনে বাঁধা পড়িবে, সমস্ত বন্ধনই সে কাটিবে, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই তাহার ব্রত। এইভাবে যে-অসীম ও অনন্ত এই পথের শেষে রহিয়াছেন, তাঁহার নিকটতর হইবে সে। তাই 'উত্তরকূটের সিংহাসনের মধ্যে তাকে আটকে রাখা যাবে' না।

মুক্তধারার বাঁধই যান্ত্রিকতার চরম রূপ। যন্ত্রের প্রবল শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত। এই বাঁধ ভাঙা সহজসাধ্য নয়, তাই অভিজিৎ প্রাণের বিনিময়েও তাহা ভাঙিতে প্রস্তুত। ঐ বাঁধ না ভাঙিলে জীবন অর্থহীন—পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের সত্যকার উপলব্ধি অসম্ভব। এই পরম সত্যলাভের কাছে রাজসিংহাসন তুচ্ছ। বরং রাজসিংহাসনই সত্যলাভে তাহাকে বাধা দিতেছে।—

সঞ্জয়

বুঝতে পারছিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ।

অভিজিৎ

...আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ীর পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়

কিছুদিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল।

অভিজিৎ

ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের

ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এ'কে দিলে।...

সঞ্জয়

রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

অভিজিৎ

বুঝলুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বে'ধেছে। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে যখন ওরা লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

এই যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অভিজিৎ নিজেকে ও অন্যকে যন্ত্রের বজ্রমুষ্টি হইতে উদ্ধার করিতে চায়, ইহা তাহার জগৎ ও জীবনের প্রতি অনাসক্তি বা বৈরাগ্য নয়, জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা নয়। সে এই জগৎ ও জীবনকে সত্যই ভালোবাসে বলিয়া যন্ত্রের হাতে ইহাদের বিকৃতি সহ্য করিতে পারে না। যে-যন্ত্র ধরণীর সৌন্দর্য ও জীবনের মাধুর্য হরণ করিয়াছে, বিধাতার দান এই অপূর্ব সুন্দর জীবনকে করিয়াছে তিক্ত ও বিষাক্ত, অভিজিৎ প্রাণ দিয়া সে-যন্ত্র ভাঙিতে উদ্যত, জীবন দিয়া সেই অমূল্য জীবনকে উদ্ধার করিতে চায় সে। সে কঠোর নয়, নীরস নয়; জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের আবেদন তাহার কাছে অত্যন্ত বেশি বলিয়াই সে অকাতরে অক্লেশে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। ইহাদের মূল্য তাহার প্রাণের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি।—

—কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানে গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ

ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়

সকালে যে আসনে তুমি পুজায় বস, মনে আছে ত সেদিন তার সাম্‌নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগ্‌বার আগেই কোন্‌ ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জান্‌তে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্‌বার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পুজো গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়্‌ছে না?

অভিজিৎ

পড়্‌ছে বই কি। সেই জন্যেই সইতে পাচ্ছিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়

গোধূলির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে—এর মধ্য দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁচচ্ছে না?

অভিজিৎ

হাঁ, পৌঁচচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে।—চেয়ে দেখ, ঐ পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌ছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আমি নমস্কার করি।—

ধনঞ্জয় বৈরাগী বিজিত, অত্যাচারিত জাতির আত্মিক প্রতীক। আত্মার শক্তি জড়শক্তি নয়, শারীরিক বল বা যন্ত্রের শক্তি নয়,—সে-শক্তি বৃহত্তর নীতির শক্তি। শত অত্যাচার, শত অপমান অন্তরাত্মাকে নিষ্পেষিত করিতে পারে না,—অত্যাচার হয় দেহী মানুষটার উপর, অন্তরের মানুষটা থাকে অক্ষত। তাহার প্রকাশ সত্যের মধ্যে—সত্যভাষণ, সত্যচিন্তা ও কল্যাণ-কর্মে। ধনঞ্জয় সমগ্র অত্যাচারিত জাতির অন্তরাত্মাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির দ্বারা,—তাহার যুদ্ধ স্থূল ও জড়ের সহিত সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তির, হিংসার সহিত অহিংসার। ধনঞ্জয় অত্যাচারিত হইয়াও জড়শক্তির, দৈহিক বলের আশ্রয় লয় নাই, নির্ভয়ে সত্যকথা বলিয়াছে;—মানুষের অন্তরতম সত্তার কাছেই সে আবেদন জানাইয়াছে, ন্যায় ও নীতির দোহাই-ই দিয়াছে। সে তাহার অনুচরদিগের কাছেও তাহার নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছে,—

মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।... আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।...তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন, তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, যেখানে অপমান পৌঁছবে না।...তোরা যে মনে মনে মারতে চাস্, তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তার কাম্‌ড়ে লেগে থাকে।—

রাজার সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিরোধ, তাই অহিংস সংগ্রাম, সত্যের যুদ্ধ, আত্মিক শক্তির দ্বারা ন্যায়বোধ ও মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের চেষ্টা। রাজা ও ধনঞ্জয়ের কথোপকথন,—

রণজিৎ

খাজনা দেবে কি না, বল।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ

দেবে না? এতবড় আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয়

যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ

আমার নয়?

ধনঞ্জয়

আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ

তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়

ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ

তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বই তো নয়।...দেখ, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়

যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওয়ালা সেইখানে বাস করেন।

রণজিৎ

...বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

ধনঞ্জয়

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।...যিনি সব দেন, তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হোল চোরাই মাল, সে টিকবে না। রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হোল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফস্‌কে গেছে।...

রণজিৎ

উদ্ধব, বৈরাগীকে শিবিরে বন্দী করে রাখ।

ধনঞ্জয়

(গান) তোর শিকল আমায় বিকল কর্‌বে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধর্‌বে না।

পরাধীন জাতির লোকেরা তাহাদের নেতার উপর একটি অন্ধ ভক্তি পোষণ করে। নেতার উপদেশ ও বাণী জীবনে অনুসরণ করিয়া তাহারা তাহাদের মনের পরিবর্তন সাধন করে না, কেবল নেতার ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকেই দেবতা বানাইয়া ভক্তি করে। আর, তাহাতেই মনে করে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ধনঞ্জয় তাহাদের এই দুর্বলতাকে নিন্দা করিতেছে,—

শিবতরাইয়ের লোক

তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলাম।

ধনঞ্জয়

তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ

কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর্ সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়

তারপরে বিকেল যখন হবে! তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস ত মজবি।...

তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল।...আমার জোরেই কি তোদের জোর? একথা যদি বলিস তাহলে আমাকে শুদ্ধ দুর্বল করবি।

ধনঞ্জয় রাজাকে এই পরনির্ভরশীল অনুচরদিগের সম্বন্ধে বলিতেছে,—

ওদের যতই মাতিয়ে তুলছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না ত। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ

ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়

তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পেঁছিল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।...আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চল্‌ল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

এই সব উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের ছায়াপাত রহিয়াছে। মনের সর্ব-বন্ধন-মুক্তিই যে স্বাধীনতা এবং সেটি যে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাধনার দ্বারা সম্ভব করিতে হইবে, অন্যের ইচ্ছা বা আদেশে নয় এবং রাজত্ব যে কেবল রাজার নয় প্রজারও—এই সব ভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে।

(কালান্তর প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

পরাধীন ভারতের অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধীর সহিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রের যে প্রভূত সাদৃশ্য আছে, সে-বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মাজীর রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্বে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৩১৬) এই চরিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। অবশ্য এইপ্রকার সত্যদর্শী, সিদ্ধসাধক, পরমভক্ত, আনন্দময় পুরুষ 'শারদোৎসব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মুক্তধারা' পর্যন্ত কবির সব নাটকেই কিছু কিছু পরিবর্তিত রূপে দেখিতে পাই, তবে 'মুক্তধারা'র মধ্যে সেই 'ঠাকুরদাদা'-চরিত্রের রাজনৈতিক রূপটিই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ইহার মধ্যে সমসাময়িক বিশেষ একটা রাজ-নৈতিক মতবাদের প্রতিফলন হইয়াছে।

ধনঞ্জয় শিবতরাইবাসীদের বলিতেছে,—'যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা। তা সে অন্তরেই হোক তার বাইরেই হোক।'

ধনঞ্জয়ের এই উক্তির মধ্যে যন্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতটি নিহিত আছে। যন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের এক বিরাট শক্তির প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। মানুষের

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ইহাই শ্রেষ্ঠ দান। বিজ্ঞান বস্তুবিশ্ব জয় করিয়াছে, করিয়াছে মানুষকে অসাধারণ শক্তিশালী, জগতের নব নব সত্যের আবিষ্কার করিতেছে, এক কথায়, বিজ্ঞান সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এক উচ্চতর ভিত্তির উপর। মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠকীর্তি যে-যন্ত্র, তাহার প্রকৃত কার্য মানুষের সেবা করা,—মানুষের দেহমনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা, মানব-জীবনকে সৌন্দর্যময় ও আনন্দময় করা। কিন্তু যন্ত্র যখন মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, মানুষের মনুষ্যত্বকে পিষিয়া মারে, মানুষের দুষ্টবুদ্ধির সহায়ক হইয়া পীড়নের যন্ত্র হয়, তখনই তাহা নিন্দনীয়। তখন তাহা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ না হইয়া হয় অভিসম্পাতস্বরূপ। যন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটিই মানুষের পরম সহায়ক, তাহার পীড়নকারী শক্তিটি নয়। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অভিসম্পাতকে—যান্ত্রিকতাকে নিন্দা করিয়াছেন।—

> "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ডরূপে প্রবল যে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্র-নীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।"
>
> (স্বাধিকারপ্রমত্ত, কালান্তর, পৃঃ ১১৬)

এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যন্ত্র মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ প্রসারের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। মানুষের বৃহত্তর আদর্শ ও নীতিকে যদি উহা গ্রাস করে, তবে উহা অসম্পূর্ণ ও গ্লানিকর হয়। আবার বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি-বর্জিত, যন্ত্রের অলৌকিক-দান-বঞ্চিত, তত্ত্ব-ও-নীতি-সর্বস্ব মানবজীবনও অসম্পূর্ণ। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। এই সামঞ্জস্যের মধ্যেই, এই বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মিলনেই উভয়ের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে দেখিয়াছেন, বিজ্ঞানের এই আধ্যাত্মিকতাহীন, শক্তি ও তত্ত্বনীতিহীন যান্ত্রিকতা, আবার প্রাচ্যজাতির বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে দেখিয়াছেন, বস্তুবিশ্বের জ্ঞানবর্জিত, নির্জীব আধ্যাত্মিকসর্বস্বতা। এই পশ্চিম ও পূর্বের মিলনই জীবনের যথার্থ স্বরূপ। ইহাই দেহ-আত্মার মিলন। দেহ ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব যেমন অসার্থক, সেইরূপ আত্মা ব্যতীত দেহের অস্তিত্বও নিরর্থক। আধিভৌতিক বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সমন্বয়ই জীবনের পরিপূর্ণ রূপ। বিভূতি ও অভিজিতের মিলনেই মানবজীবনের সার্থকতা। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সীমার মধ্যে অসীমের মিলন।

> "পশ্চিম-মহাদেশ বাহ্যবিশ্বের নিয়মতত্ত্বকে জেনে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর, পূর্বমহাদেশ

অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনযন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানেই বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়ের মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

(শিক্ষার মিলন, কালান্তর, পৃঃ ১৮৯)

অভিজিৎ যান্ত্রিকতার প্রতিবাদে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। যান্ত্রিকতায় মানুষের যে-প্রাণ নিপীড়িত, অভিজিৎ সেই প্রাণ দিয়া যন্ত্রকে ভাঙিয়াছে। ইহা যেন যন্ত্রের কাছে প্রাণের প্রতিবাদ। যদি সে বৃহত্তর ও বেশি শক্তিশালী যন্ত্র দিয়া এই যন্ত্র ভাঙিত, তবে তো যন্ত্রেরই জয় ঘোষণা করা হইত। এই যে প্রাণ দিয়া যন্ত্র ভাঙা, ইহাই সার্থক প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ পীড়নকারীর অন্তরাত্মাই প্রতিবাদ—তাহারই দেবসত্তার প্রতিবাদ পশুসত্তার বিরুদ্ধে—ইহাই তাহাকে যন্ত্রের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝাইবার পথ। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার একখানা পত্রাংশ হইতে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না,—

"তোমার চিঠিতে machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ, সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্য সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে—"আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতবো, আমি মারকে না-মারা দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে; যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজের বন্দী মানুষটি বল্‌ছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে, মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"

(রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩২-৩৩, কালিদাস নাগকে লিখিত)

উত্তরকূটবাসীরা যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ভিতরের মানুষকে মারিতেছে, সে-মানুষের প্রতীক হইতেছে তাহাদেরই যুবরাজ অভিজিৎ। নিজেরাই নিজেদের অন্তরাত্মাকে হনন

করিয়াছে, তাই তাহাদের ট্র্যাজেডি মর্মান্তিক। কিন্তু এই ট্র্যাজেডির বোধ কি ইউরোপের কোনো দিন হইবে? যন্ত্র যে তাহাদের ভিতরকার মানুষকে মারিতেছে, এই বুঝিয়া তাহারা কি কোনো দিন যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এই মানুষের মুক্তির জন্য অগ্রসর হইবে? আর 'মন্ত্রী' ধনঞ্জয়—শত-সহস্র আঘাত-নির্যাতনের ঊর্ধ্বে যাহার অন্তরাত্মা দুঃখক্ষোভহীন হইয়া অম্লান জ্যোতিতে দীপ্যমান, তাহার লাঞ্ছনা কি যন্ত্রের অপব্যবহারের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ফিরাইবে? কেবল 'যন্ত্রী' বিভূতির বিরাট যন্ত্রটাই 'আকাশে দাঁত মেলে অট্টহাস্য' করিতেছে। কবি সেই অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়তো আশা পোষণ করিতেছেন। ধ্বংসের দেবতা ভৈরব কি এই বিকৃত অবস্থাকে ধ্বংস করিয়া নূতন সৃষ্টির পত্তন করিবেন? কবি কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও সেই নূতন সৃষ্টির জন্য 'মহামানবের' অপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

এইবার নাটকের কলাকৌশল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

রূপক-সাংকেতিক নাট্যের উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা প্রদর্শিত হইয়াছে এই নাটকে। নাটকের দৃশ্যসংস্থান ও ঘটনার স্থান-নির্দেশের মধ্যে কবি সুকৌশলে ইহার মূলভাবটির সংকেত স্থাপন করিয়াছেন।

সমগ্র নাটকের ঘটনা ভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথের উপর ঘটিতেছে; পথের শেষ প্রান্তে উহার পটভূমিস্বরূপ আছে একদিকে মন্দিরচূড়া, অপরদিকে লৌহযন্ত্রের মাথা। মন্দিরের ত্রিশূল ও যন্ত্রের মাথা দূরে আকাশে দেখা যাইতেছে। মন্দিরের পাদদেশ-প্রবাহিণী মুক্ত-ধারায় যাহার দ্বারা বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, সেই যন্ত্রের অগ্রভাগটা ত্রিশূলের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে আকাশে দেখা যাইতেছে।

এই নাটকের মূলদ্বন্দ্বটি হইতেছে যন্ত্রের সহিত প্রাণের, যান্ত্রিকতার সহিত আধ্যাত্মি-কতার, বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের, দৈত্যের সহিত দেবতার, মানুষের পশু-অংশের সহিত দেব-অংশের। মানুষের মধ্যে দেবতার অংশ-রূপী যে অন্তরাত্মা, সে নির্যাতিত, দেবতার দান যে জলধারা, তাহা রুদ্ধ,—দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে এই অন্ধ জড়শক্তি তাহার মাথা-রূপ নিশান দেবমন্দিরের ত্রিশূলের পাশে উড়াইয়া দিয়া তাহাকে স্পর্ধাভরে যেন আহ্বান করিতেছে। নাটকের এই মূলভাব-দ্বন্দ্বটি দৃশ্যের সংকেতে চমৎকার পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

পশু শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন মন লইয়া রুদ্ধদৃষ্টি এই মূর্খেরা বিচার করিতেছে যে, এই দেববিরুদ্ধ কাজে দেবতাই বুঝি তাহাদিগের সহায়তা করিতেছেন, তাই তাঁহার উদ্দেশে পূজা ও উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। ইহাদের এই উৎসবের মধ্যে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসটি, মর্মান্তিক শ্লেষটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া আছে। নাটকীয় কৌশলের ইহা একটি সার্থক অঙ্গ।

পশুশক্তির এই আপাতজয় ও তাৎপর্যহীন ব্যঙ্গ-উৎসবের মধ্যে দেবতার রোষ যে স্তম্ভিত ও উদ্যত হইয়া আছে, তাহা চারিদিকের আবহাওয়ার মধ্যে ও উত্তরকূটবাসীদের অবচেতন মনের ভয়-সংশয়ের মধ্যে আভাসিত।

অমাবস্যার রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে। অন্ধকারে নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরের দিকে চলিয়াছে। শত্রুজয়ের জন্য দেবতার বিশেষ পূজা-উৎসব। ঐ সঙ্গে যাহার শক্তিবলে শত্রুজয় করা হইয়াছে, সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির অভিনন্দন। কিন্তু বিভূতির অভিনন্দনটাই যেন বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, দেবতা পিছনে পড়িয়া আছেন। একদিকে যন্ত্রশক্তির দাপে নাগরিকগণের যেমন উল্লাস, অপরদিকে যন্ত্রের বলিস্বরূপ প্রদত্ত পুত্রের শোকে উন্মাদিনী

অম্বার করুণ-কাতর পুত্রঅন্বেষণ ও পৌত্রহারা বৃদ্ধ বটুকের সাবধান-বাণী, উত্তরকূটবাসীদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, তাহার উপর পূজারীদের 'বন্ধন-ছেদন', 'সংকট-সংহর', 'প্রলয়ংকর' ভৈরবের স্বরূপ বন্দনা—সমস্ত মিলিয়া এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে যে, মনে হইতেছে যেন একটা সংকট বা বিপদ আসন্ন। স্বয়ং রাজা ও তাঁহার অনুচরদের নিকটেও যন্ত্র যেন এক অশোভন ও অমংগলসূচক রূপ ধারণ করিয়াছে।

রণজিৎ

মন্ত্রী, ওটা কী আকাশে?

মন্ত্রী

মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ

এমন স্পষ্ট তো কোনো দিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী

আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ

দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভাল হয় নি।

মন্ত্রী

আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

কুন্দন

ওই দেখ চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে

১

দিনেব বেলায় ও সূর্যের সংগে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সংগে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন

বিভূতি তার কীর্তিটা এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

অভিজিৎ ও ধনঞ্জয় পূর্ণাংগ সাংকেতিক-চরিত্র, আর বিভূতি ও রণজিৎ রূপক-চরিত্র। অভিজিতের মৃত্যুর দারুণ আঘাতে রণজিতের মোহমুক্তি সহজেই অনুমেয়।

রক্তকরবী

(১৩৩১)

পশ্চিমের, বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ, যান্ত্রিক শাসন ও সভ্যতা এবং লুব্ধ, বহু-সংগ্রহী ধনতন্ত্রবাদ 'রক্তকরবী'র পটভূমিকা। 'মুক্তধারা'য় ইহাদের রাষ্ট্রনীতির রূপটির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, 'রক্তকরবী'তে জোর দেওয়া হইয়াছে ইহাদের বহুগ্রাসী, উৎকট-সংগ্রহশীল

ধনতন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর। 'মুক্তধারা'য় বর্তমান ইউরোপের এবং 'রক্তকরবী'তে বর্তমান আমেরিকার ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমটাতে পীড়নের যন্ত্র বিশেষভাবে রাষ্ট্রতন্ত্র, অপরটিতে ধনতন্ত্র; একটির ক্ষেত্র বিজিত ও অসন্তুষ্ট অংশ-বিশিষ্ট রাজ্য, অপরটির ক্ষেত্র তাল-তাল স্বর্ণ-সংগ্রহের কারখানা; একটিতে যান্ত্রিকতার পলিটিক্যাল রূপের প্রাধান্য, অপরটিতে অর্থগৃধ্নু ইনডাস্ট্রিয়াল রূপের প্রাধান্য। 'মুক্তধারা'য় রাজার প্রতাপ ও অস্তিত্ব বিদ্রোহী প্রজাদের শাসনের মধ্যে রূপায়িত, 'রক্তকরবী'তে ফ্যাক্টরি ও তাহার আনুষঙ্গিক কর্মী-দলের মধ্যে। 'যক্ষপুরী' বিশেষভাবে স্বর্ণ-উত্তোলনের একটা কারখানা, ঐশ্বর্য-সংগ্রহের কেন্দ্র, কুবেরের স্থান, এখানে ঐশ্বর্যের রূপটাই বেশি প্রকটিত। যক্ষপুরীর পরিকল্পনায় আমেরিকার ছায়াপাত হওয়া অসম্ভব নয়।

"অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরাজীতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইটানিক ওয়েলথ্। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অংকগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়।... আটলান্টিকের ওপারে ইঁটপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচরমচরের অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়? আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই,—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না।"

(শিক্ষার মিলন, ১৩২৮ সাল, ভাদ্র, কালান্তর, পৃঃ ১৭১-৭২)

'নাট্যপরিচয়' ও 'অভিভাষণে' এই কুবের ও লক্ষ্মীর উল্লেখ আছে। যক্ষপুরীর রাজার ঐশ্বর্যের শক্তি কি ঐরূপ প্রবল নয়?

এই নাটকের আলোচনায় আপাতদৃষ্টিতে একটি বিষয়ে বিভ্রান্তি-সৃষ্টির আশঙ্কা আছে। সেটি এই।

কবি বলিয়াছেন, "এই নাটকটি সত্যমূলক; আমার রক্তকরবীর পালাটি 'রূপকনাট্য' নয়, রক্তকরবীর সমস্ত পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।" আবার নিজেই রামায়ণের রূপক ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মধ্যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার যে দ্বন্দ্ব আছে, এবং তাহারি যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, 'রক্তকরবী'র মধ্যে, তাহারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। আবার 'রক্তকরবী'র মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)

এই নাটককে সত্যমূলক বলা এবং স্বয়ং কবিরই একই জিনিসের দুইপ্রকার ব্যাখ্যার বৈষম্য ইহার সম্বন্ধে একটুখানি জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের স্বরূপ—তাহার প্রবণতা, তাহার বিশেষ ভাব বা তত্ত্বানুভূতি, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত দিক্‌ই, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির আলোচনায় স্মরণ করা কর্তব্য। একই কবি-মানসের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাঁহার কাব্য, নাটক, গান, গদ্য প্রবন্ধ ও কতকগুলি কাব্য-রসাত্মক ও তত্ত্বমূলক কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া—বিভিন্ন রূপে, বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাঁহার কবি-প্রতিভা ঐন্দ্রজালিক রূপদ্রষ্টা, রূপস্রষ্টা, রূপদক্ষ। এই অপূর্ব কারুকার্যময়, বিচিত্র মূর্তি ভাঙিলে দেখা যায়, মূলধাতুটি প্রায় একই। সে-কথা তিনি কাব্যে বলিয়াছেন, তাহাই বিভিন্ন আকারে ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে নাটকে, আবার নাটকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অন্য আকারে প্রকাশ পাইয়াছে প্রবন্ধে, গানে বা কাব্যে। এক তাঁহার কথা-সাহিত্যের মধ্যে 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্প ও কয়েকখানা উপন্যাস ছাড়া তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষেই একথা খাটে। ইহাদের মধ্যেই যেন আমরা সাধারণত যাহাকে সত্য বলি, বাস্তব বলি, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবির ভাব-কল্পনার রঙে ইহাদের নিজস্ব রঙের বদল হয় নাই। সুতরাং তাঁহার একখানি সাহিত্য-সৃষ্টির বিচার করিতে বসিলে তাঁহার সমগ্র মানসক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটি সৃষ্টির বিচার করিতে বসিলে রচনার প্রতি ও কবির প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

আর একটি বিষয়ও স্মরণে রাখা প্রয়োজন। দীর্ঘ ষাটবছরেরও অধিককাল ধরিয়া কবির যে-অবিরাম সৃষ্টিস্রোত চলিয়াছে, তাহার এক-একটা বাঁক বা পর্ব আছে; সেই-সেই বাঁকে কবি এক-একটা বিশিষ্ট ভাব-চক্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন, সেই ভাবেরই বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে সেই সময়ের সাহিত্য-সৃষ্টিতে। যে-কারণেই হউক, অনেক সময় কবিকে তাঁহার নিজের রচনা ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, তখন তিনি তাৎকালিক ভাব-ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন, বা তাৎকালিক বিশিষ্ট অনুভূতিটি আর নাই, তখন দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া তাঁহার কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব বা চিন্তার আওতায় ফেলিয়া সেই শিল্পসৃষ্টিকে বিচার করিয়াছেন বা সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তখন একই জিনিসকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখাতে জটিলতাসৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

কবি-মানসের এই দুইটি প্রবণতা মনে রাখিয়া আমরা পরে এ-বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এখন প্রথমে যে-ভাববস্তু কবি 'রক্তকরবী'তে রূপায়িত করিতে চাহেন, কবির নিজস্ব উপলব্ধি ও চিন্তাধারা-অনুসরণে তাহার একটা পূর্ণ পরিচয় দিলে এই নাটকের তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হইবে।

'রাজা' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহাদের মূলবিষয়টি হইতেছে—মানুষের অন্তরাত্মার অবরোধ ও তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ—তাহার অন্তরতম সত্তার বিকৃতি ও বিকৃতি হইতে মুক্তি। কবি মানুষের অন্তর্জীবনের এই বন্ধন ও মুক্তির ইতিহাসকে একটা কাহিনী অবলম্বন করিয়া বাহিরে রূপদান করিয়াছেন নানা ঘটনার ও প্রকৃতির নানা পরিবেশের সংকেত দ্বারা। আত্মার এই বদ্ধ অবস্থা ও বন্ধনদশা ঘটে কি করিয়া? ঘটে কখনো নিজের মধ্য হইতে, কখনো বাহিরের

চাপে। নিজের মধ্য হইতে ঘটে রিপুর তাড়নায়, অন্ধ আসক্তির প্রেরণায়, 'অহং'-এর দারুণ প্রাবল্যে; বাহির হইতে ঘটে ক্ষুদ্র, খণ্ড ধর্মে, সংকীর্ণ সমাজ-বিধানে; যন্ত্রপর্যবসিত, অন্তঃসারহীন শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থায়। রূপাসক্তি বা সৌন্দর্য-ভোগ-স্পৃহা বন্ধ করিয়াছিল সুদর্শনাকে (রাজা); ক্ষুদ্র, আচারসর্বস্ব, আনুষ্ঠানিক ধর্ম বন্ধ করিয়াছিল মহাপঞ্চক ও অচলায়তনিকদিগকে (অচলায়তন); অমলকে রুদ্ধ করিয়াছিল লৌকিক ধর্ম-বিধি (কবিরাজ), সমাজ (মোড়ল) ও পরিবার (মাধবদত্ত) (ডাকঘর); ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজাকে বন্ধ করিয়াছিল জীবন-উপভোগের প্রচণ্ড আসক্তি, জরা-বার্ধক্যের ভ্রান্ত ভীতি ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা (ফাল্গুনী); রাজা রণজিতকে বিজ্ঞানের বলদৃপ্ত শক্তিমত্ততা, সাম্রাজ্যলিপ্সা (মুক্তধারা); আর যক্ষপুরীর রাজাকে বন্ধ করিয়াছে অপরিমেয় ধনলোভ, প্রচণ্ড জড়শক্তির দম্ভ ও যান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা।

মানুষকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে দুইটি অংশ আছে, একটি পশু-অংশ, অপরটি দেব-অংশ। একটি animality, অন্যটি rationality—কবির ভাষায় 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি'। এই দুইটি সত্তা পাশাপাশি বাস করে, এই দুই-এর সমন্বয়েই মানুষের স্বরূপ। এই পশু-অংশের কাজ কি? দেহকে রক্ষা করা, প্রাণকে ধারণ করা, শক্তি-সঞ্চয়ের দ্বারা বস্তুবিশ্বকে অধিকার করিয়া জীবনকে বৃহত্তর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করা, জড়ের উপর প্রভুত্ব করিয়া দেহ-সুখের বিজয়োল্লাসে টিকিয়া থাকা। এইটিই হইতেছে 'অহং'। মানুষের জীবনে এই পশু-অংশের, এই অহং-এর বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই দেব-অংশ বা আত্মা বর্তমান থাকে। এই জড়দেহ ও জড়বুদ্ধি না থাকিলে আত্মার অবস্থানই অসম্ভব হইত। এই সীমাকে আশ্রয় করিয়াই অসীমের প্রকাশ।

এই পশু-অংশ বা অহং যখন প্রবল হইয়া ওঠে, তখন দেব-অংশ বা আত্মাকে ইহা একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বন্ধ করিয়া ফেলে, তখন স্তূপাকার জড়শক্তির সঞ্চয়ের দ্বারা সে কেবলি ফাঁপিয়া ওঠে। অপর্যাপ্ত উপকরণের মত্ততায় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই মানুষ তখন একান্তভাবে গ্রহণ করে,—ধনদৌলত, ঘরবাড়ি, খ্যাতি-প্রতিপত্তির মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়। ফলে কি হয়? দেশকালপাত্রের অতীত যে-আত্মা, "সে আটকা পড়ে, তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মরতে থাকে।"

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? সে হইল—এই দুই অংশের মিলন—ইহাদের সামঞ্জস্য। অহং সংগ্রহ করিবে আত্মার জন্য;—মানুষের জ্ঞান হইবে সর্বব্যাপ্ত, সে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া নিজের সার্থকতা লাভ করিবে, তাহার কর্ম হইবে নিজের ভোগ-সুখের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বের কল্যাণে, প্রেমে যুক্ত হইবে সে বিশ্বমানবের সঙ্গে। মানুষ বিজ্ঞানের সাধনা করিবে, বস্তুবিশ্ব জয় করিবে, তাহার মহত্তর অংশের ব্যাপ্তি ও সার্থকতার জন্য। বিচিত্র রচনাজালের মধ্যে নব নব রূপে ও রসে সে তাহার মুক্ত স্বরূপকেই উপলব্ধি করিবে। এই পশু-অংশ বা অহং এবং দেব-অংশ বা আত্মার সামঞ্জস্যেই মানুষের প্রকৃত সার্থকতা। এই 'কূল ও নদী', 'সীমা ও অসীম', 'স্থিতি ও গতি'র সামঞ্জস্যই রবীন্দ্র-দর্শন।

অবরুদ্ধ আত্মা কি করে? সে নিরন্তর মুক্তি পাইতে চায়, তাহার রুদ্ধ অবস্থাকে ভাঙিয়া বাহির হইতে চায়। তাই মানুষ বিরাট বস্তু-শক্তিকে পদানত করিলেও, ঐশ্বর্য ও

ক্ষমতার শত আয়োজনের মধ্যেও প্রকৃত তৃপ্তি পায় না, শান্তি পায় না—আনন্দ পায় না। তাহার বৃহত্তর অংশ—পরিপূর্ণস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহার তো সার্থকতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, শান্তি নাই; তাই সে আরো চাই, আরো চাই করিয়া নিরন্তর ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন,—পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও শান্তি সে কখনই পায় না। আত্মার মুক্তিতেই মানুষের পরিপূর্ণ জীবনোপলব্ধি—প্রকৃত আনন্দ ও সন্তোষ-লাভ হয়। বদ্ধ আত্মার মুক্তি ঘটিলেই তাহার জীবনের আনন্দময় স্বরূপকে ফিরিয়া পায়।

আত্মার এই মুক্তি কিরূপে ঘটে? ঘটে কখনো ভিতর হইতে, কখনো বাহিরের আঘাতে। ভিতর হইতেই এই দেব-অংশ জাগ্রত হইয়া পশু-অংশকে বিধ্বস্ত করে, মানুষ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন আবিল দৃষ্টি কাটিয়া গিয়া স্বচ্ছ দৃষ্টি ফিরিয়া আসে, নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া মানুষের মানসিক পরিবর্তন হয় এবং মানুষ জীবনের সত্যরূপটির দর্শন পায় এবং পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির সার্থকতা লাভ করে। তেমনি আবার, বাহিরের কোনো আকস্মিক আঘাতেও, সত্যজ্ঞানের শক্তিতেও এই বদ্ধ অবস্থা চূর্ণ হইয়া আত্মার মুক্তি সাধিত হয়; মানুষ তাহার পূর্ণ সত্তার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তর্জীবনের পরিবর্তনে মুক্তি আসিয়াছিল সুদর্শনার; অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া গুরুর আগমনে মুক্তি আসিয়াছিল মহাপঞ্চকের, অচলায়তনিকদের; মৃত্যুর দ্বারা অমলের; কবিশেখরের আশ্বাস ও প্রকৃত জ্ঞানদানে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার; রণজিতের দ্বিতীয় সত্তা অভিজিতের প্রাণদানে রণজিতের—অভিজিতের প্রাণদান রণজিতেরই মোহমুক্তির জন্য; আর, যক্ষপুরীর রাজার মুক্তি আসিয়াছিল প্রাণলীলারূপিণী, সৌন্দর্য ও প্রেমের বিগ্রহস্বরূপিণী নন্দিনীর দ্বারা। সুদর্শনা ও যক্ষপুরীর রাজা নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল,—দেব-অংশের প্রেরণায় ও শক্তিতে পশু-অংশ বিধ্বস্ত হইয়া জীবনের প্রকৃত স্বরূপ তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা নিষ্ক্রমণ ঘটিয়াছে, তাহাই এই সব নাটকের বিরুদ্ধ শক্তি, সেইগুলিই পশু-শক্তির কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।

এখন এই আলোকে 'রক্তকরবী'র দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ মাটির তলা হইতে তাল তাল সোনা তুলিতেছে, পৃথিবীর অন্ত্র বিদীর্ণ করিয়া অপর্যাপ্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করিতেছে। বস্তুবিশ্বকে জয় করিবার জন্য সে বস্তুতত্ত্ববাদী বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করিয়াছে, নব নব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা তাহার সঞ্চয় বাড়িতেছে। যতই সে বস্তুবিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, ততই তাহার ধনরত্নের সঞ্চয় বাড়িতেছে, বাড়িতেছে শক্তি অসাধারণভাবে। বিজ্ঞান-শক্তি বা যন্ত্র-শক্তির দ্বারা সে বিশ্ব জয় করিয়া তাহার শক্তির দম্ভ ও বিভূতি চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। তাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ, রাজ্য সমস্তই বস্তু-সাধনা ও ধন-সাধনার অঙ্গরূপে গঠিত, তাহার ধন-সঞ্চয় ও শক্তি-প্রকাশের যন্ত্ররূপে পরিণত। তাহার মধ্যকার দেব-অংশ লুপ্ত; বৃহত্তর জীবন মূর্ছিত; মুক্ত, সহজ আনন্দ বাধাগ্রস্ত; প্রেম ও কল্যাণবুদ্ধি অস্তমিত। সে কেবল একটা বিরাট অতিকায় দানবের মতো ধরার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ধনশোষণ করিতেছে ও প্রচণ্ড শক্তিবলে জগৎকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিতেছে। জীবন তাহার ধর্মহীন, হৃদয়হীন, জড়শক্তি-গর্বিত দৈত্য-জীবন।

কিন্তু ইহাই তো তাহার জীবনের প্রকৃত স্বরূপ নয়, তাই তাহার শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। বৃহত্তর জীবন অবদমিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে মনেরি এক গোপন-তলে, তাহারি অতৃপ্তি ও অসন্তোষ এই রাজদৈত্যের জীবনকে করিয়াছে তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন।

তাই তাহার বিপুল ঐশ্বর্য ও বিরাট শক্তির অন্তরালে সর্বদাই সে অতৃপ্ত, নিরানন্দ, ক্লান্ত। এই বৃহত্তর সত্তা কি কামনা করে, কি চায়? সে চায়—জড়ের কারাগারের এই অচলত্ব ও স্থবিরত্ব ছাড়িয়া বিশ্বব্যাপ্তি, চায় গতি, চায় জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-উপলব্ধি, চায় সকলের সহিত হৃদয়ের আনন্দ-বন্ধনে যুক্ত হইতে—চায় প্রেম। এই সকলের দ্বারা সে নিজেকে সার্থক করিতে চায়। রাজদৈত্যের মধ্যে এই জীবন-গতি, এই প্রাণ-চাঞ্চল্য, এই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো সুপ্ত আছে, অতৃপ্ত পড়িয়া আছে;—তাই জীবনকে সে কেবল রসহীন, আনন্দহীন, যন্ত্র-ঘর্ঘর-মুখর, যান্ত্রিক-কর্ম-সাধনের মত্ততা ও লুব্ধ সঞ্চয়ের প্রয়াসরূপেই পাইয়াছে।

তারপর এই রুদ্ধ, অসম্পূর্ণ জীবনে রাজার মুক্তির দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দূত নন্দিনী। রাজার অন্তরাত্মা যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল এবং যাহা না পাইয়া অশান্তি, অতৃপ্তি অনুভব করিতেছিল, তাহার মূর্তিমান প্রকাশ সে দেখিল নন্দিনীর মধ্যে। সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য, সেই সৌন্দর্য, সেই প্রেম, যাহা তাহার বৃহত্তর জীবন অন্তরে অন্তরে কামনা করিতেছে, তাহারাই নন্দিনীর মধ্যে রূপায়িত। সে যেন রাজারই বৃহত্তর জীবনের প্রতিরূপ। তখন ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এই দ্বিতীয় সত্তা তো মরে না, কেবল রুদ্ধ ও অসাড় হইয়া থাকে মাত্র, সে জাগিয়া উঠিয়া পশু-সত্তার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাজা একবার নন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর বার তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়া কর্মে ব্যাপৃত হয়। এই দুই শক্তির প্রবল টানাটানির পর রাজার পশু-সত্তা পরাজিত হইল, দেব-সত্তার জয় হইল। নন্দিনী জিতিল। রাজা নিজেই ধ্বজা-দণ্ড ভাঙিয়া নন্দিনীর সঙ্গে জালের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাজা তাহার অস্বাভাবিক রুদ্ধ জীবন হইতে মুক্ত হইয়া সার্থক জীবনের সন্ধান পাইল। ইহাই 'রক্তকরবী'-নাটকের ভাববস্তুর কাঠামোটুকু।

এখন নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। এই নাটকের মূলদ্বন্দ্বটি হইতেছে রাজা ও নন্দিনীর মধ্যে। এই দুইটি বিরুদ্ধশক্তির চারিদিকে উভয়দলের লোকের সমাবেশ। এক-পক্ষের শক্তির কেন্দ্র রাজা, তার সঙ্গে আছে অধ্যাপক, পুরাণবাগীশ, খোদাইকরেরা, সর্দার, গোঁসাই, মোড়ল,—অন্যপক্ষে আছে নন্দিনী, আর তার সঙ্গে বিশু, কিশোর ও নেপথ্যে রঞ্জন। ইহাদের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করা যাক্।

রাজা একটা জটিল জালের আবরণে বাস করে। এই জাল কি? এই জাল হইতেছে রাজার নিত্যমুক্ত, সর্বপ্রসারী, আনন্দময় স্বরূপের বাধা। এই বাধার রূপটি কি? বস্তুতন্ত্রের নিরেট সাধনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা অপর্যাপ্ত শক্তিলাভ ও প্রভূত ঐশ্বর্যসম্ভোগ; মনুষ্যত্বহীন, হৃদয়হীন, সঞ্চয়কামী, শোষণশীল সমাজ-ও-যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব, আনন্দ-হীন বদ্ধ জীবন। ইহাই রাজার অন্তরতম, মুক্ত, আনন্দময় সত্তাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদেরই সংকেত জাল। অচলায়তনের প্রাচীর, মুক্তধারার বাঁধ ও রক্তকরবীর জাল মূলত একই জিনিস—যাহা অন্তরাত্মাকে আবদ্ধ করে, আবৃত করে—স্বরূপ-উপলব্ধির বিঘ্ন ঘটায়।

নন্দিনীর কাজ জালের মধ্যে ঢুকিয়া রাজাকে জালের আড়াল হইতে বাহির করিয়া আনা। সে জালের দরজায় ঘা দিয়া বলে,—'আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। কুন্দফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি, তোমার গলাতে মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।' রাজা বলে—'না,

ঘরের মধ্যে নয়, আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো, আমার সময় নেই, একটুও না।' বৃহত্তর জীবনের আবেদনে সাড়া দিতে তাহার বদ্ধজীবনের স্বভাবতই অনিচ্ছা ও ভয়,—তাই সেই শূন্য জীবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার সাধনাতে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে চায়—অনভ্যস্ত আনন্দকে ভয় করে। নন্দিনী প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে তাহার মনকে আকৃষ্ট করাইতে চায়, 'পৌষের সোনা-ছড়ানো রোদ্দুরে পাকা ধানের লাবণ্য' দেখাইবার জন্য মাঠে লইয়া যাইতে চায়। সৌন্দর্যকে তো হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায় না, তাহাকে পাওয়া যায় অন্তরের আনন্দময় উপলব্ধির মধ্যে। রাজার বস্তুসর্বস্ব জড়বাদী মন তাহাতে সাড়া দেয় না, বলে, 'আমি মাঠে যাব, কোন্ কাজে লাগব।' রাজার কাছে কাজের অর্থ প্রয়োজনের ফল, আর পাওয়ার অর্থ বস্তুরূপে পাওয়া। তাহার জীবনে প্রয়োজন-হীন অকাজ নাই, খেলা নাই, হৃদয় দিয়া কোনো বস্তু-গ্রহণ নাই। নন্দিনী রাজার অদ্ভুত শক্তির প্রশংসা করে, সেই শক্তির অভিনন্দনের প্রতীক-স্বরূপ কুন্দফুলের মালা তাহার গলায় পরাইতে চায়। শক্তিই প্রাণকে ধারণ করে, জীবনকে বহন করে, তাই নন্দিনী শক্তিকে শ্রদ্ধা করে, শক্তিতে আনন্দিত হয়। কিন্তু এ-শক্তি তো নিরেট পাথরের মতো কঠিন ও ভারী, মরুভূমির মতো শুষ্ক,—এ তো অন্ধ জড়শক্তি, বস্তুশক্তি, যন্ত্রশক্তি। ইহার প্রকাশ হৃদয়হীন যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, অপর্যাপ্ত সংগ্রহের মধ্যে—ইহার মাহাত্ম্য দীর্ঘকাল সুশৃঙ্খলভাবে টিকিয়া থাকিবার মধ্যে। নন্দিনী বলে,—'যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেই তাল-তাল সোনাগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।' 'কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—দেখে আমার মন নাচে।' কিন্তু ধরণীর সঙ্গে সহজ আনন্দে যুক্ত না হইলে এ-শক্তি সার্থক নয়, তাই নন্দিনী বলে, 'তাইতো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।' রাজা তাহার শক্তিস্তম্ভের তল-দেশের গহ্বরকে ভালো করিয়া জানে, তাহার জীবনের দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে,—তাই এই শক্তিকে সার্থক করিবার জন্য খোঁজে পথ, চায় এই বদ্ধ অবস্থা হইতে বাহির হইতে। এই বস্তুতান্ত্রিক, জড়বাদী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা বিশ্লেষণপন্থী, প্রত্যক্ষজ্ঞানসর্বস্ব,—সূক্ষ্ম অনুভূতির রহস্য ও অনির্বচনীয়তার রাজ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম,—ভাবলোক হইতে নির্বাসিত। ইহাদের জড়শক্তিও তাহাই,—কেবল প্রতাপেরই দম্ভ,—তাহাতে কেবল কাঠিন্য, শুষ্কতা, যান্ত্রিকতা; তাহাতে কোমলতা নাই, লাবণ্য নাই, নাই প্রাণ, নাই শ্রী, নাই আনন্দ। রাজার আত্মবিশ্লেষণে এই রূপটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

> নন্দিনী, তোমাকে তোমার রূপের মায়ার আড়াল থেকে ছিনিয়ে আমার মুঠোর মধ্যে পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।...তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারিনে কেন।...
>
> আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।...পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা—সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলার একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।...

আমার যা আছ সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না,—শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পেঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না...আমি একান্ত মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি তিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

ইহাই জড়বাদী যান্ত্রিক শক্তির অন্তরের আক্ষেপ। কেবল দেহবাদ ও ভোগসুখ-সর্বস্বতার পরিপুষ্টির জন্য অপর্যাপ্ত উপকরণ ও বিপুলধনরত্ন-সংগ্রহের শক্তি ও কৌশলের মধ্যে যে মানুষের অন্তরাত্মা বঞ্চিত, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানুষের প্রেমের সঙ্গে যুক্ত না হইলে যে জীবনের পরিপূর্ণতা-লাভের সহজাত আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ,—তাহারই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটুকু যক্ষরাজের আত্মবিশ্লেষণে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জীবনের পরিপূর্ণতা এই বিপুল শক্তির সহিত সৌন্দর্য ও প্রেমের সহজ মিলনের মধ্যে নিহিত। ইহাদের সহজ মিলনেই হইয়া ওঠে জীবন আনন্দময় ও সার্থক। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এই মিলনাত্মক দ্বৈত-নৃত্য চলিতেছে,—এই নৃত্যে কঠিনের সহিত মধুরের, বজ্রের সহিত মেঘের সম্মিলিত নৃত্য। নটরাজের বিশ্বনৃত্যের ছন্দ ও সুরে যেমন শক্তির সহিত সৌন্দর্যের মিলন-নৃত্য, মানবের মধ্যেও ইহারই লীলায়িত গতি অভিব্যক্ত। মানুষ যেমন প্রাণকে ধারণ করিবার শক্তি অর্জন করিবে, তেমনি প্রাণের লীলাকে—সৌন্দর্য-মাধুর্যকেও উপভোগ করিবে। ইহাতেই তাহার পূর্ণ সার্থকতা। মকররাজ এতদিন অন্ধের মতো প্রাণকে ধারণ করিবার জড়শক্তি—বিজ্ঞানশক্তিকেই অর্জন করিয়াছে, জীবনের অন্য অংশের—প্রচ্ছন্ন ও অবদমিত সৌন্দর্য-মাধুর্য-অংশের প্রতি দৃষ্টি দেয় নাই। আজ প্রাণের সেই সহজ লীলা-অংশের—সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের—মূর্তিমতী প্রকাশ নন্দিনীকে দেখিয়া সে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।—

নন্দিনী, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতে পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠছে। একদিন গভীর রাত্রে ভীষণ শব্দ শুনলুম...সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি—সে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কি দেখছ।

নেপথ্যে (রাজা)। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।...সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্কা হয়ে যায়।...সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি অমন সহজ হয়েছ, অমন সুন্দর।

এই ছন্দ, এই সুসংগতিই তাহার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া আছে। তাহার প্রকৃত অন্তরতম সত্তা বিধাতা যেন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। 'বিধাতার সেই বন্ধমুঠো আমাকে খুলতেই হবে।' নিজের প্রকৃত সত্তাকে সে বাহির করিবেই—ইহাই তাহার সংকল্প।

নন্দিনীর আবির্ভাবে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। ইহা তাহার নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই বিদ্রোহ। নিজের এক-সত্তার সহিত অন্য-সত্তার দ্বন্দ্ব। ক্রমে এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে শক্তির হৃদয়হীন অভিযান, বুদ্ধির অনুশীলন-দীপ্ত শক্তির দম্ভ, দৈত্যের মতো দীর্ঘদিন বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়দ্বারে সমস্ত জানিবার ও বুঝিবার প্রেরণা. উদ্দেশ্যহীন অপরিমেয় সঞ্চয়ের লালসা,—অপর দিকে প্রাণের লীলা, সৌন্দর্য ও প্রেমের দম্ভহীন সর্বজয়ীশক্তি—আকাশের আলো, বাতাসের গান, সুদূরের আকাঙ্ক্ষা, জীবনে যা-কিছু মধুর, কোমল, অনির্বচনীয়, হৃদয়রঞ্জন, সেই সহজ আনন্দের আকর্ষণ। এই দ্বন্দ্বের নানা অভিব্যক্তি রাজার কথায় ও কাজে।—

নন্দিনী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তারপরে, যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না'? আমি বললুম, 'একটুও না'। তখন আমার খোলা চুলের মধ্যেই দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।...এক সময় ঝেঁকে উঠে বর্শা-ফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই'। আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে। আমি কি তোমার পুঁথি।' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কি রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাস।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে লাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখ্খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বল্লে, 'কখ্খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।' মানে বুঝতে পারুম না।

রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের সার্থক চিত্র এটি। সৌন্দর্য যে হাতে ধরা যায় না, কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়, আর প্রেমও যে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি এবং এমন একটা জিনিস, যাহার জন্য আত্মবিসর্জন অতি সহজ—এই বিষয়টি সে বুঝিতে পারে না, অথচ ইহার প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে সে, আর সেই জন্যই এক গূঢ় ব্যাকুলতাও অনুভব করে। রঞ্জন যে নন্দিনীর প্রেমের পাত্র, এবং উভয়েই সেই প্রেমে ধন্য, এইটি তাহার বঞ্চিত হৃদয়কে কাঁটার মতো বিদ্ধ করে, তাই রঞ্জনের উপর তাহার ঈর্ষা। আবার এই আত্মবিস্মৃত অবস্থা হইতে বস্তুনিষ্ঠ মন তাহাকে এক ধাক্কায় পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনে—তখনই সে মায়াপাশ ছিন্ন করিবার জন্য নন্দিনীকে বাহিরে যাইতে বলে।

এই দ্বন্দ্ব—এই দেব-দানবের যুদ্ধ, রাজার মনে ক্রমেই তীব্রতর হইতেছে। এই দ্বন্দ্বের আর একটি সুন্দর চিত্র—

নন্দিনী।...মা গো, তোমার হাতে ওটা কী।

নেপথ্যে (রাজা)। একটা মরা ব্যাঙ...এই ব্যাঙ একদিন পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে

থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি।

নন্দিনী। আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতর বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।...

নন্দিনী। মনে হয়, যে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও, তুমি সময় নষ্ট কোরো না।—না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ওই যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী। এ নিয়ে কী হবে।

নেপথ্যে। ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারি রক্তআলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি; আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তাহলে—

নন্দিনী। তাহলে কী হবে।

নেপথ্যে। তাহলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।...

নন্দিনী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারি জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন?...ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?...

নেপথ্যে। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারি রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে।... তারপরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাঁড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে—যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।...আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি?...

সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকানো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না...আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব...পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখীর ছায়া দেখে...শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি।

নন্দিনী! নন্দিনী!...সামনে তোমার চোখেমুখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছেগুচ্ছ কালোচুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।...

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।...

নেপথ্যে। থাক্ থাক্, থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওই-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশু। ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলরকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।—

এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালায় মকররাজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, তাই সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া তাহার পশু-সত্তার মৃত্যু ঘটাইয়া সে মুক্তি কামনা করে।

ইহার পরেই এই দ্বন্দ্বের—এই বিরোধের চরম পরিণতি।—

নন্দিনী। (জানালায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি...আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও এখনি যাও।

নন্দিনী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।...

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।...

নন্দিনী। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।...

নেপথ্যে। ...স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্ঘাটন) ওকি! ওই কে প'ড়ে। রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!...এই তো আমার রঞ্জন। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন?

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতে পারি।

নন্দিনী। তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে।

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি।—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।...

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।—আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি।...রাজা, কোথায় সেই বালক।...

রাজা। বুদবুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।...আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা-হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন্।

নন্দিনী। কোথায় যাব।

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি...এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে, নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী। যাব আমি।

রঞ্জনের মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে এই দ্বন্দ্ব ধূলিসাৎ হইল, রাজা তাহার মুক্ত স্বরূপকে ফিরিয়া পাইল—রাজার মুক্তিতেই বিরোধের অবসান। ইহাই 'রক্তকরবী'র নাট্যবস্তুর মূলসূত্র।

এখন রঞ্জন ও নন্দিনীর স্বরূপ বুঝিলে ইহা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। রঞ্জন কি? রঞ্জন যৌবনের প্রতীক। যৌবনের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যৌবনের স্বরূপ হইল অফুরন্ত শক্তি ও সাহস, ছন্দায়িত গতিবেগ, আনন্দের সর্বব্যাপী অনুভূতি—সৌন্দর্য, প্রেম ও কল্যাণের বিশুদ্ধ উপলব্ধি। এই যৌবন কেবল বয়সের যৌবন নয়—ইহা মনের ও হৃদয়ের যৌবন। এই যৌবন অন্তরাত্মার চিরসম্পদ—প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক্ষেত্র। ইহাই মানুষের দেব-অংশের নিত্যস্বভাব। অপাপবিদ্ধ, অহংমুক্ত মানুষের ইহাই বিশুদ্ধ সত্তা। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার মধ্যেও এই যৌবনকে দেখা গিয়াছে। রঞ্জনের মৃত্যুতে তাই রাজা আক্ষেপ করে,—'আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।' রাজার মধ্যেও এই নিত্য-যৌবন আছে, ইহাই তাহার বিশুদ্ধ সত্তা; কিন্তু তাহার ঘোরতর যান্ত্রিক নিয়ম-ব্যবহার দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ—মৃত। রাজার জীবনে তাহার প্রকাশ নাই—সে তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে

না; অথচ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উহার স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করিতেছে। উহাই রাজার চিত্ত-দ্বন্দ্বের কারণ।

নন্দিনী কে? সে লীলাময় প্রাণের প্রতীক। প্রাণের লীলার প্রকাশ সহজ আনন্দে। আনন্দের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সৌন্দর্যে ও প্রেমে, সর্ব-বন্ধনহীন মুক্তির মধ্যে। এই সৌন্দর্য, প্রেম ও মুক্তি একটি নারীমূর্তির মধ্যে রূপায়িত করা হইয়াছে। সে নারী নন্দিনী। তাই নন্দিনী মূলত প্রাণলীলারস-মূর্তি, আনন্দ-স্বরূপিণী—সৌন্দর্য প্রেম-ও মুক্তি-রূপিণী।

এই প্রাণের লীলা যৌবনের মধ্যে মূর্ত—উহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের ক্ষেত্র। যৌবনের দুর্দম গতিবেগের মধ্যে, তাহার নিখিলপ্রসারী উচ্ছল আনন্দের মধ্যেই প্রাণের যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত। যৌবনের বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্য হইতেই প্রাণ তাহার যথার্থ সঞ্জীবনীশক্তি, তাহার আত্মবিকাশের সহজ ও স্বাভাবিক প্রেরণা, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম সার্থকতালাভের সামর্থ্য সংগ্রহ করে। তাই রঞ্জন ও নন্দিনীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। রঞ্জন-বিহনে নন্দিনী তাহার সৌন্দর্য ও প্রেমের চরম মূর্তি প্রকাশ করিতে পারেনা—পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। রঞ্জন ছাড়া সে অসম্পূর্ণ। তাই রঞ্জনের সংগে মিলিত হইবার এতো আকাঙ্ক্ষা নন্দিনীর।

রক্তকরবীর তাৎপর্য কি? নন্দিনীর যাহা স্বরূপ, রক্তকরবী তাহারই প্রতীক। নন্দিনী মানবকন্যা,—সে প্রাণ, সৌন্দর্য ও প্রেমের শক্তিরূপে বাহিরের নানা সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশিত, আর তাহার মধ্যকার এই প্রাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বস্তুনিরপেক্ষ ভাবটি রক্তকরবী ফুলের সংকেতে ব্যক্ত। মূলত রক্তকরবী ও নন্দিনী একই বস্তু। দেহী তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে সংকেতরূপে বাহিরে ধারণ করিয়াছে মাত্র।

রাজা রঞ্জনকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ঈর্ষা-সঞ্জাত অকস্মাৎ ক্রোধের এক মূঢ় উচ্ছ্বাসে তাহাকে হত্যা করিল। প্রাণের সমস্ত লীলায়িত চাঞ্চল্য, উদ্বেলিত আনন্দ-সাগরের ঊর্মি-নৃত্য ও নব নব জীবনবিকাশের আলোকজ্জ্বল দিগ্‌বলয়ের উপর চিরতরে কৃষ্ণ-যবনিকা নামিয়া আসিল। রঞ্জনের মৃত্যুতে নন্দিনীর জীবন ব্যর্থ হইল। যৌবনহীন, আনন্দহীন জীবনের ব্যর্থতার হাহাকারে রাজার অবরুদ্ধ সত্যকার সত্তা অবশেষে সবলে সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া জালের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া আসিল। তাহার মধ্যকার বিভীষণ-অংশ রাবণ-অংশকে বধ করিল। তখন অন্যান্য বিগতমোহ লোকদের সংগে রাজা সমস্ত যক্ষপুরীকে ধ্বংস করিতে ছুটিল।

কিন্তু রঞ্জন কি সত্যই মরিয়াছে? রঞ্জন তো কখনো মরিতে পারে না—তাহা হইলে প্রাণ মিথ্যা, নন্দিনী মিথ্যা, রক্তকরবী মিথ্যা। মৃত্যুর মধ্য দিয়াই যৌবনের জয়যাত্রা, প্রাণই সেই জয়যাত্রার বাহন। তাই নন্দিনী বলে—'বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।' আবার বলে—'মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না।' 'ও আবার আসার জন্য প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।' 'জয় রঞ্জনের জয়' বলিয়া নন্দিনী ছুটিয়া গেল 'শেষ মুক্তিতে'। তাহার ডানহাতের রক্তকরবীর গুচ্ছ খসিয়া পড়িয়া যক্ষপুরীর ধুলায় লুটাইতে লাগিল। রঞ্জনের রক্তের রেখা, নন্দিনীর বুকের রক্ত, আর রক্তকরবীর গুচ্ছ একত্রে উজ্জ্বল লাল আভায় যক্ষপুরীর বুকে অম্লান দীপ্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। রঞ্জন-নন্দিনীর আত্ম-বিসর্জনে যক্ষপুরীর মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিল, যৌবন ও প্রাণেরই চিরন্তন জয় ও অমরত্ব ঘোষণা

করিয়া গেল তাহারা। এই নন্দিনী ও পরোক্ষভাবে রঞ্জন কর্তৃক মোহগ্রস্ত রাজার উদ্ধার-সাধন ও যক্ষপুরীর নিরেট রুদ্ধতার মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য বহন করিয়া আনাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

এই মূল-বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হইয়াছে আধুনিক ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও অর্থ-গৃধ্নুতা, বিজ্ঞানসাধনার শক্তিবলে প্রকৃতির উপর প্রভুত্বস্থাপনের দম্ভ, অনাত্মবাদী বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতা এবং নিয়মতন্ত্রসর্বস্ব যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার পটভূমিকায়। এইসব বিরুদ্ধশক্তির প্রভাবে কি করিয়া মানুষের অন্তরাত্মা আবদ্ধ হয় এবং কি করিয়া প্রাণশক্তি, সৌন্দর্য ও প্রেমের শক্তি তাহার রূপান্তর ঘটাইয়া উদ্ধারসাধন করে, ইহারই কাহিনী এই নাটকের পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু।

এখন এই বিরুদ্ধশক্তির স্বরূপ বিচার করা যাক্। যক্ষপুরীর সমাজ ও শাসনে উৎকট ধনতন্ত্রের রূপটি প্রকটিত। রাজ্যের সমস্ত পরিচালন-ব্যবস্থা একটা কলের নিয়ম-তন্ত্রের অধীনে যন্ত্রের আকারে পর্যবসিত হইয়া বস্তুসংগ্রহে, অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত। সারা দিনরাত চলিয়াছে সোনার তাল খুঁড়িয়া বাহির করিবার কাজ। ব্যক্তি-মানুষের এখানে কোনো অস্তিত্ব নাই, মানুষ এখানে এই বিরাট সংগ্রহ-যন্ত্রের অংশস্বরূপমাত্র, তাহার মূল্যও এই উদ্দেশ্যের দ্বারা নিরূপিত। মানুষ এখানে সংখ্যায় পরিণত, সে এখানে ৬৯ঙ বা ৪৭ফ, বাস করে. ট ঠ পাড়ায়, কি দন্ত্য-ন বা মূর্ধান্য-ণ পাড়ায়। মূল-রাজশক্তি এখানে একটা পাষাণ-দৃঢ় কাঠামো, একটা নৈর্ব্যক্তিক শাসনযন্ত্রের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত। রাজার মূল্য এখানে এই শাসনযন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে, এই শাসন ও শোষণের প্রতীক হিসাবে—ব্যক্তিমূল্য এখানে স্বীকৃত নয়। এই শাসনের ধারক ও বাহক কতকগুলি কর্মচারী। এই কর্মচারিতন্ত্র বা আমলাতন্ত্রই এই শাসনযন্ত্রকে পরিচালিত করে। এই শাসনে মনুষ্যত্বের কোনো চিহ্ন নাই, জীবনের বৃহত্তর আবেদনের কোনো স্পর্শ নাই। শাসক ও শাসিত বা শোষিতের দল উভয়েই এখানে প্রাণহীন, হৃদয়হীন যন্ত্রস্বরূপ—এই যন্ত্রস্বরূপত্বের মধ্যেই তাহাদের সার্থকতা নির্ধারিত।

চরিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে ও তাহাদের উপর নন্দিনীর প্রভাব লক্ষ্য করিলে ইহা আরো স্পষ্ট হইবে।

এই সংগ্রহশীল ধনতান্ত্রিক রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি বস্তুবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বুদ্ধি। অধ্যাপক তাহারই ধারক ও বাহক। তাহার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি এই বিজ্ঞানদৃপ্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শাসনের কৌশল ও তত্ত্ব-আবিষ্কারে নিযুক্ত। বস্তুতন্ত্র অনাত্মবাদী, জড়-শক্তির উপাসনায় নিরত; বিজ্ঞানবুদ্ধি অতি-প্রাকৃত শক্তিতে অবিশ্বাসী; তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্র ও মানুষের অন্তরতম সত্তাকে অস্বীকার করে। বস্তুতন্ত্রের স্বরূপ হইল কোনো-কিছুকে বস্তুহিসাবে জানা ও পাওয়া এবং দেহ ও তাহার ভোগবিলাসকে অটুট রাখা। রাজার উক্তির মধ্যে ইহার চমৎকার স্বরূপ-উদ্ঘাটন আছে,—'এই বস্তুতত্ত্ববিদ্যা *তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে—কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়?*'

অধ্যাপক 'দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই' চলেছে, সে 'নিরেট নিবরকাশ-গর্তের পতংগ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে' আছে। এই বস্তুজ্ঞানসাধনার আড়ালে অধ্যাপক অন্তরিত হইয়া ছিল। হঠাৎ নন্দিনীর আবির্ভাবে তাহার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। জীবনের আনন্দময় স্বরূপের আভাস সে নন্দিনীর মধ্যে পায়। সে বলে—'তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে

সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে'; 'ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে।'...'আমাদের এই যক্ষপুরে যা-কিছু ধন ওই ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে...যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।'...অধ্যাপক নন্দিনীর রক্তকরবীর কঙ্কণ হইতে একটা ফুল প্রার্থনা করে, বলে, 'কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে...ওই রক্তআভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়...সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানিনে, রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখতে এসেছ।' নন্দিনী শোষণশীল ধনতন্ত্রের রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হয়—'ওকি ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ওই-যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কিদরজা দিয়ে? কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।' ওসব নন্দিনীদের গাঁয়ের লোক,—ওই যে জোয়ান দুই ভাই অনুপ আর উপমন্যু, আর তলোয়ার-খেলোয়াড় শকুলু একেবারে আখের মতো চিবিয়ে-ফেলা মূর্তি। অধ্যাপক ইহার তত্ত্ব নন্দিনীকে বুঝায়,—'নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে'। রাজার যে 'অদ্ভুত শক্তির চেহারা'য় নন্দিনীর মন মুগ্ধ হয়েছে, 'সেই অদ্ভুতটি হল তার জমা, আর কিম্ভুতটি হল তার খরচ। ওই ছোটো-গুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।' নন্দিনী বলে, 'ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।' অধ্যাপক বলে, 'তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ার বিরুদ্ধে যাবে।' নন্দিনী—'দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে।' অধ্যাপক—'ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে। জাল তাই বেড়েই চলেছে; ওদের যে থাকতেই হবে।' নন্দিনী—'থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্য যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।' অধ্যাপক—'সেই রক্ত-করবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বলো এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।' এই তত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনার পর অধ্যাপক নন্দিনীকে বলে—'শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণশোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।' বস্তুবাগীশ পুরাণ-বাগীশকে বলে, 'ওই যে একটি মেয়ে ধানীরঙের-কাপড়-পরা পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে. সব বেশ মিল খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারিদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়।'

এই যে জড়তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ, এও আনন্দলোকের বার্তাবাহিনী নন্দিনীর প্রভাবে তাহার অবরুদ্ধ সত্তাকে ফিরিয়া পাইল; সে এতোদিন ছিল একটা 'জালের পিছনে'—'মানুষের সবটুকু বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে' ছিল,—সেই শুষ্ক বিদ্যার জাল ছিঁড়িয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

ফাগুলাল। কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক।

অধ্যাপক। কে-যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে—পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল। রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক। এই বারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব।

তারপর সর্দার। এই ধনতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র চালু করিবার শক্তিটা ইহারই হাতে। এই যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সে বদ্ধপরিকর; এই ব্যবস্থার একচুল ত্রুটি সে সহ্য করে না, ছলে-বলে-কৌশলে একটা নির্দিষ্ট নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সে সদা-জাগ্রত। রাজশক্তির বহিঃপ্রকাশ যে গভর্ণমেণ্ট, ইহারাই তাহার ধারক ও বাহক। একটা বিশিষ্টনীতি অনুসারে এই শাসনযন্ত্রকে নিখুঁতভাবে চালু করিবার দায়িত্ব ইহাদের। তাই রাজার ব্যক্তিগত মতামতের বা রুচি ও অভিপ্রায়ের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত নয়; এই যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার নীতিই তাহার কাছে বড়ো। তাই রাজা ব্যক্তিগত ভাবে যখন সেই শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে সৈন্যদের সাহায্যে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছে।

সর্দারের অন্তরাত্মা জড়ের জালে কঠিনভাবে আবদ্ধ। সে তাহার বৃহৎ, মুক্ত সত্তার, আনন্দময় সত্তার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারে না,—তাহার সে-সত্তা অসাড় ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কদাচিৎ এক-আধবার নন্দিনীর প্রভাবে ক্ষণিকের জন্য তাহার অন্তরতম সত্তার একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই আবার সে চাঞ্চল্য দূর হওয়ায় জড়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দিনী সর্দারের বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে নাই। প্রাণধর্মের কোনো চাঞ্চল্য, আনন্দের, সৌন্দর্যের, প্রেমের কোনো প্রেরণা তাহার নিরেট জড়সত্তাকে টলাইতে পারে নাই। সে এক কঠোর, কঠিন যান্ত্রিক-ব্যবস্থার প্রতীক। তাই নন্দিনী বলে,—'ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।' বিশু বলে,—'প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।' ইহাই সর্দারের স্বরূপের যথার্থ বর্ণনা। সে নন্দিনীকে বলিয়াছে,—'ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।' সত্যই শেষ বোঝাপড়া হইয়াছে তাহার নন্দিনীর সঙ্গেই। নন্দিনীর প্রাণদানে তাহার কি কোনো পরিবর্তন হইয়াছে? তাহার অন্তরাত্মা কি মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে? নাট্যকার তাহার কোনো ইঙ্গিত দেন নাই।

তারপর, গোঁসাই। ধর্মকে এই লুব্ধ, শোষণশীল, আত্মপ্রসারী ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। 'ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।' এই শাসনযন্ত্র-পরিচালকেরা অধর্মকে ধর্মের মুখোশ পরাইয়া

উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য খাড়া করে। অর্থের বিনিময়ে চার্চ বা পুরোহিত-সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনবোধে ইহারা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করে। এইসব ভাড়াটিয়া ধর্মযাজক 'নাম গ্রহণ করে ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করে সর্দারের।' শোষিত ও অসন্তুষ্ট শ্রমিক যাহাতে বিদ্রোহ না করিতে পারে, সেজন্য একদিকে ইহারা সৈন্য মজুত রাখে, অপরদিকে পরকালের পাপের ভয় ও পুণ্যের লোভ দেখাইয়া তাহাদের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। গোঁসাই বলে,—'বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়চড় করছে, মূর্ধান্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরী হল বলে। আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটা দমন হয়, তারপরে আমাদের পালা।' একটা উচ্চনীতির ও স্বার্থত্যাগের দোহাই দিয়া শ্রমিক ও কর্মীদের অন্নবস্ত্রের দাবিকে মাথা তুলিতে না দেওয়া শোষকদের একটা সুপরিচিত কৌশল। গোঁসাইয়ের মুখ দিয়াও সেই কথাই বাহির হয়,—'আহা এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টি'কে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে-নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হাল্কা হয়ে যাক।' ইহার পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত করেন নাই কবি। নন্দিনী সত্যই বলে,—'মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যাবসা তোমার।'

মোড়ল পূর্বে সাধারণ খোদাইকর ছিল, পরে কর্মদক্ষতায় মোড়লের পদে উন্নীত হইয়াছে। 'এখানকার মোড়লেরা এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।' গুপ্তচরবৃত্তির দ্বারা শ্রমিক-মহলের সমস্ত গোপন সংবাদ সর্দারকে সরবরাহ করাই ইহাদের কাজ।

শ্রমিক-দম্পতি ফাগুলাল ও চন্দ্রার চরিত্র দুইটি সমগ্র নাটকের মধ্যে একটু বাস্তবের স্বাদ ও গন্ধযুক্ত। ফাগু সরল, অকপট, গোঁয়ার শ্রমিক। যক্ষপুরীর কর্ম গ্রহণ করিলেও ও তাহার হালচালে অভ্যস্ত হইলেও তাহার মন-বুদ্ধি একেবারে আচ্ছন্ন হয় নাই, সে নিষ্প্রাণ ও হৃদয়হীন যন্ত্রে পরিণত হয় নাই। শ্রমিকদের মদ না হইলে ছুটি কাটে না, তাই সে ছুটির দিন সকালে মদ চায়। সে বলে,—'বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে চায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।' বন্দিনী যে-মুক্ত আনন্দময় জীবনের ইঙ্গিত দেয়, ফাগুলালের মনে যে তাহার আবেদন নাই, তাহা নয়। তাই বলে,—'সত্যি-কথা বলি দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।' ফাগুর জীবনে ধর্মোপদেশ অর্থহীন, তাই সে অকপটে সর্দারকে বলে,—'না না, সে হবে না সর্দারজি। এখন সন্ধ্যেবেলায় মদ খেয়ে বড়োজোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।...সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।' শ্রমিক-বিদ্রোহের সে নেতা। বিশুকে বন্দী করা হইয়াছে শুনিয়া বন্দিশালা

ভাঙিতে সে উদ্যত। নন্দিনীর উপর প্রথমে তাহার অবিশ্বাস হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল, সে-ই বুঝি বিশুকে ধরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন সে বুঝিল, রাজা বন্দিশালা ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তখন নন্দিনীর প্রতি তাহার সাময়িক অবিশ্বাস চলিয়া গেল। পুরুষোচিত বীরত্বসহকারে সে নন্দিনীকে 'নিরাপদ জায়গায়' রাখিতে চাহিল। কিন্তু নন্দিনী ছুটিয়া চলিল যুদ্ধে প্রাণ দিতে। সেও 'নন্দিনীর জয়' বলিয়া চলিল যুদ্ধে। নন্দিনীর প্রভাব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে সে, সেই প্রভাবই তাহার জীবনে ঘটাইয়াছে রূপান্তর।

চন্দ্রা দোষে-গুণে-গড়া অনেকটা সাধারণ বাস্তব নারী। নন্দিনীর প্রতি স্বাভাবিক নারীজনোচিত ঈর্ষা, সরল ধর্মবিশ্বাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোভ ও পল্লীজীবনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ চরিত্রটিকে অনেকখানি জীবন্ত করিয়াছে।

বিশুর নামের পিছনে একটা চিরন্তন বিশেষণ লাগানো হইয়াছে—'পাগল'। এই-জাতীয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকমাত্রেরই একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি। ইহারা 'ভাবের পাগল' বা 'মুক্তি-পাগল'। বিশু—ঠাকুরদাদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি চরিত্রের সমশ্রেণীর। ইহারা জ্ঞানী, আনন্দ-প্রাণ, তত্ত্বজ্ঞ, মুক্তপুরুষ এবং অন্যের মুক্তি-সাধনাই ইহাদের কাজ। বিশুর জীবন অবশ্য একটু অন্য ধরনের। একটি নারীর প্রতি প্রেমই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল যক্ষপুরীর মধ্যে। সেই নারীর সোনার প্রতি লোভই বিশুকে যক্ষপুরীতে আনিয়া গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ করিয়াছিল। সেই জীবনে বিরক্ত হইয়া যখন বিশু সে-কাজ ছাড়িয়া দিল, তখনই 'সর্দারনীদের কোঠাবাড়ীতে' আর 'তাসখেলার ডাক পড়ে না' দেখিয়া সেই মেয়েটি তাহাকে ছাড়িয়া গেল। সেই অবধি কোনোরকমে সে সাধারণ খোদাইকর হইয়া আছে। কিন্তু এ-জীবনে সে বিতৃষ্ণ ও প্রতিক্ষণ এখান হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে। নন্দিনীকে যক্ষপুরীর মধ্যে দেখিয়া সে মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিল। 'যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমনসময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো আছে।' নন্দিনী—'পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।' বিশু নন্দিনীকে বলে—'ঘুমভাঙানিয়া' 'দুখজাগানিয়া' 'সমুদ্রের অগম পারের দূতী'। কারণ, নন্দিনীই জাগাইয়াছে তাহার মধ্যে জীবনের বৃহত্তর স্বরূপের জন্য আকাঙ্ক্ষা, আর সেই সাধারণের অপ্রাপনীয়কে পাইবার আকাঙ্ক্ষার বেদনাই সে ভোগ করিতেছে। সে বলে,—'কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর. দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।' যক্ষপুরীর সর্দারেরা যখন বিশুকে বন্দী করিল, তখন বিশু বলিল,—'এতদিন পরে আমার মুক্তি হল...সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।'

এখন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কবি বলিয়াছেন,—'এই নাটকটি সত্যমূলক।' সত্যমূলক বলিতে আমরা বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকে বুঝি। দেশে কালে পাত্রে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে এবং ইহাদের পাত্রপাত্রী বাস্তবের রক্তমাংসের নরনারীর সমধর্মী—ইহাই স্বভাবত আমাদের মনে হয়। কিন্তু কবি এই বাস্তবের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—'এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে

কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।' সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহার বাস্তব ভিত্তি কবির ভাব-কল্পনার মধ্যে। এই নাটকের সত্য কবির ভাব-কল্পনার সত্য—তাঁহার জ্ঞান-বিশ্বাসের সত্য।

প্রথম হইতেই নাটকের আলোচনাতে আমরা দেখিয়াছি যে, বাস্তবধর্মী নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সেরূপ নাটক রচনা করেন নাই। রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে কবি যে-কয়খানা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের আখ্যান-ভাগের পিছনেও একটি আইডিয়া বা তত্ত্বকেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় রোমাণ্টিক ও মিস্টিক কবির দৃষ্টি সব সময়েই বাহ্যবস্তুর রূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরালে নিহিত ভাব বা তত্ত্বের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই ভাব বা তত্ত্বকেই বৃহত্তর সত্য বলিয়া কবি ধারণা করিয়াছেন। রূপক-সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে যখন ভাব বা তত্ত্বই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখন অন্তরাত্মার গভীর তত্ত্বের বাহন চরিত্রকেও তিনি বাস্তব চরিত্রের পর্যায়ে ফেলিয়াই দেখিয়াছেন,—বাস্তবরূপ ও ভাবরূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখেন নাই। 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে এন্ড্রুজ সাহেবকে কবি লিখিতেছেন,—

With regard to the criticism of my play, *The King of the Dark Chamber* that you mention in your letter, the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarshana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature. (Letters to A Friend)

এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে সাধারণ ভাবে আমরা বাস্তব বলিতে যাহা বুঝি, কবির বাস্তব ঠিক তাহা নয়। সুদর্শনা ও লেডী ম্যাকবেথের মধ্যে তিনি কোনো প্রভেদ বুঝিতে পারেন না। আত্মার গূঢ় আধ্যাত্মিক চেতনা মানবজীবনের অন্যান্য বাস্তব অনুভূতির সমপর্যায়ে বলিয়া তাঁহার ধারণা।

তারপর কবি যখন কোনো সাহিত্যসৃষ্টির সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনও কোনো মহৎ ভাব, বৃহৎ আদর্শ বা নীতির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে সর্বাগ্রে এবং তাহারই মাপকাঠিতে তিনি প্রধানত রচনার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। 'শকুন্তলা'র মধ্যে মূলত তিনি Paradise Lost and Paradise Regained দেখিয়াছেন, 'কুমারসম্ভব'-এর মধ্যে দেখিয়াছেন,—মদন যখন ভস্মীভূত হইল, তখনই প্রকৃত প্রেম ও সৌন্দর্যের উদ্ভব হইল। পার্বতী দেহের সৌন্দর্য দ্বারা হরকে লাভ করিতে পারেন নাই, দুঃখ-তাপে দগ্ধ হইয়া কল্যাণী তাপসীর বেশেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। বাস্তব-সত্য অপেক্ষা ভাব-সত্যই তাঁহার কাছে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতে—শিল্পীর ভাব-কল্পনায় যাহা সত্য, তাহাই প্রকৃত সত্য। তাঁহারই কথা—'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি, ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।' এক্ষেত্রে কবিই বড়ো ঐতিহাসিক। 'কৃষ্ণচরিত্র'-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"তথ্য যাহাকে ইংরাজীতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভা-

বলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎ ব্যক্তির কার্য-বিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।"

বিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন মনীষী ব্যক্তি রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যানভাগের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্বের সমাবেশ দেখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া রামায়ণকে সেই তত্ত্বের রূপক-রূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের অন্যতম।

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে কবি ('পরিচয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৫—৩৩) রামায়ণ-মহাভারত যে একপ্রকার রূপক-কাব্য, তাহাই বলিয়াছেন। কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারেঃ

..."অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

"আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের একটা মহা উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিন জন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র।...এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী।...এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন।...বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।...

'...শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু-ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই সীতাকে অর্থাৎ হলচালন-রেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।...বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে

একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।”

'যাভাযাত্রীর পত্র'-এর মধ্যেও ('যাত্রী', পৃঃ ২১৪-১৫) কবি প্রসঙ্গত এই মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন,—

“হরধনু-ভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ, রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি; তার পিছনে ঘরে বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।...

“রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর একটা কথা আমার মনে আসছে, সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে, এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার অবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের ক্ষেতকে যে কি রকম নষ্ট করে সেও জানা কথা।...”

'রক্তকরবী'র অভিভাষণ-এ রূপক-ব্যাখ্যায় আরো অগ্রসর হইয়া নূতনভাবে রবীন্দ্রনাথ ধারণা করিয়াছেন,—রাম-রাবণের যুদ্ধের অন্তরালে আছে কৃষিমূলক সভ্যতা ও যন্ত্রমূলক সভ্যতা—'কর্ষণজীবী' ও 'আকর্ষণজীবী' সভ্যতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস—agriculture বনাম industry-র যুদ্ধের কাহিনী। 'সীতা' শব্দের মূল অর্থ হলচালনরেখা, অর্থাৎ কৃষিবিদ্যা। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিবাহের মর্ম হইতেছে বলশালী আর্যগণ কর্তৃক কৃষিবিদ্যাকে গ্রহণ। রাবণ 'আকর্ষণজীবী' সভ্যতার প্রতীক। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের তাৎপর্য এই যে, কৃষিসভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া যন্ত্রসভ্যতা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। রাম রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেন—ইহার মর্ম আকর্ষণজীবী সভ্যতা ধ্বংস হইয়া কর্ষণ-জীবী সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।

রামায়ণের এই রূপক-ব্যাখ্যায় ইতিহাসের কালক্রম বা সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। কৃষিসভ্যতা যে আদিযুগের ও বহু পরে যে যন্ত্রসভ্যতা আসিয়াছে এবং যন্ত্রসভ্যতা ধ্বংস করিয়া কোনোদিন যে কৃষিসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ইতিহাসের এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। কবির ভাব-কল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে সীতা, নবদূর্বাদলশ্যাম রাম, পাষাণী অহল্যা, রাবণ প্রভৃতি যে-রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই সত্য। ইহাই রবীন্দ্র-কবি-মানসের নিগূঢ় প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য।

'রক্তকরবী'র মধ্যে রামায়ণের এই ভাব-কল্পনার ছায়া কিছুটা প্রতিফলিত হইয়াছে। 'রক্তকরবী'র দু'একটা চরিত্রের সহিত রামায়ণের কবি-কল্পিত চরিত্রের সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার

দ্বন্দ্ব রক্তকরবীর মূলভাববস্তু নয়। মূলভাববস্তু হইতেছে যন্ত্রের চাপে অন্তরাত্মার অবরোধ—এবং মুক্ত জীবনানন্দের, স্বচ্ছন্দ প্রাণলীলার প্রেরণায় সেই অবরোধ হইতে মুক্তি। এই মূলতত্ত্ব-উপস্থাপনের জন্য বাহন হিসাবে কবি রক্তকরবীতে যে-পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের কাহারো কাহারো সহিত কবি-কল্পিত রামায়ণের কোনো কোনো নর-নারীর সাদৃশ্য হয়তো আছে। তুলনায় বিষয়গুলি মিলাইলে যে পরিপূর্ণ মিল হয় না, তাহা সুস্পষ্ট। কেবল আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার রূপটির সহিত রামায়ণের রাবণ-সভ্যতার সামান্য মিল আছে মাত্র। কবির কল্পনা অনুসারে ইহা একটা সাদৃশ্য মাত্র। ইহা তত্ত্ববস্তু নয়।

কবি-কল্পিত সাদৃশ্যগুলি কবিরই কথায় এখানে উল্লেখ করা যাক্।—

"আমার পালায় একটি রাজা আছে! আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদি কবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ-বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ-দ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানব-কন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে।...

"আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।...

"স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থানের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণ-সিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।...

"কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বেষ-হিংসা বিলাস-বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো

কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকেরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল।...

"কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।...

গল্পটার মধ্যে তারি প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপর ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।...

"হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখ-দুখ বিরহ-মিলন ভালো-মন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তাহলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এটিই মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্ম-প্রকাশ।"

এই সাদৃশ্যগুলির উপযুক্ততা বিচার করিলে দেখা যায়, আধুনিক কালের সমাজ ও রাষ্ট্রের যে পটভূমিকা কবি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার হৃদয়হীন, আনন্দহীন, ধর্মহীন, প্রেম-হীন অপর্যাপ্ত শক্তিমদমত্ততা ও অপরিমেয় অর্থগৃধ্নুতার সংগে রাক্ষসসভ্যতার ভাবগত সাদৃশ্য ও সেই শক্তির প্রতীক রাজার মধ্যে যে রাবণ ও বিভীষণ একত্রে বাস করিতেছে ইহাই সুপ্রযুক্ত, অন্যান্য সাদৃশ্য অপরিস্ফুট।

এখন কবির যুক্তি এই যে, রামায়ণ রূপক হইয়াও যদি বাস্তব নরনারীর সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-কাহিনী বলিয়া গৃহীত হয়, তবে তাঁহার রক্তকরবীই বা রূপক হইলেও কেন বাস্তব মানুষের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-কাহিনী বলিয়া গৃহীত হইবে না? যেমন রামায়ণ রূপক হইলেও রূপক নয়, সেইরূপ রক্তকরবী রূপক হইলেও রূপক নয়। "শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি।" কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কবি কি সত্যকার মানবীর ছবি আঁকিয়াছেন? সীতাকে যেমন রক্তমাংসের মানবকন্যা বলিয়া বোধ হয়, কবির মানবকন্যা তো সেইরূপ নয়। নন্দিনী ব্যক্তি-মানুষও নয়, শ্রেণী-মানুষও নয়, সে নারী-প্রকৃতির কবি-কল্পিত ভাবমূর্তি। নন্দিনী যে ভাবলোকবিহারিণী, কবি নিজেই সে-কথার ইঙ্গিত দিয়াছেন নানা স্থানে। 'তুমি যে

সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর', 'সে সমুদ্রের অগম পারের দূতী', সে বাস্তবের ঊর্ধ্বস্তরের—'মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।' তাহার প্রণয়ী ভাবলোক-নিবাসী, নেপথ্য-বিহারী, রহস্যময় ইঙ্গিতস্বরূপ; রক্তকরবীর গুচ্ছ, কুন্দফুলের মালা, আর নীলকণ্ঠ-পাখীর পালকে তাহার চারিদিকের আবহাওয়া এমন রহস্যময় যে, তাহার বাস্তব-সত্তার পরিবর্তে সংকেত-সত্তাই বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নন্দিনীর উপর কবির বাস্তবতার দাবি টিকে না।

এখন দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। কবির ব্যাখ্যার সবটাই উদ্ধৃত করা গেল।—

> "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।
>
> "এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবলশক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

নারীর যাদুস্পর্শে যে পুরুষের জীবনে বিরাট রূপান্তর সাধিত হয়, ইহা একটি সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্ব। পুরুষ নিরন্তর বাহিরের কঠিন সংগ্রামে রত, বস্তু-সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার মধ্যে তাহার সমস্ত উদ্যম কেন্দ্রীভূত, শক্তির ঐশ্বর্য ও গর্বেই তাহার আত্মপ্রকাশ। জীবন তাহার রূঢ়, রুক্ষ, কঠোর হৃদয়হীন ও যান্ত্রিক—নারীর স্পর্শেই সে-জীবন হয় সার্থক ও পরিপূর্ণ—সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, প্রেমে। কবি বলিয়াছেন, যক্ষপুরীর পুরুষেরা যাপন করিতেছিল এক আনন্দহীন, হৃদয়হীন, প্রেমহীন, লোভজর্জর জীবন; নারী নন্দিনীর আবির্ভাবে তাহাদের রুদ্ধ জীবনের কারাগার ভাঙিয়া গিয়া তাহার মধ্যে ছুটিল উন্মুক্ত প্রাণ-প্রবাহ। ইহা খুবই ঠিক—নন্দিনীই যক্ষপুরীর যান্ত্রিকতার মধ্যে আনিয়াছে প্রাণের চাঞ্চল্য, সঞ্চার করিয়াছে সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেগ। রাজা, অধ্যাপক, সর্দার, মোড়ল, খোদাইকর—সকলকে সে এক অননুভূতপূর্ব স্পর্শে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—এই নন্দিনী কি 'ব্যক্তিগত মানুষ' নন্দিনী? এই নন্দিনী কি জগতের বাস্তব নারীর প্রতিনিধি? তাহাকে তো সেই ভাবে, সেই রসে সৃষ্টি করা হয় নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কোনো ঘটনা-পরিণাম নাই, প্রেমের কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতি নাই,—তাহার প্রেম সকলের প্রতি সমভাবে ব্যাপ্ত। সে নিঃসন্দেহে একটি তত্ত্ব বা ভাবের মূর্তি। রঞ্জনের

প্রতি তাহার প্রেম তত্ত্বগত, ভাবগত—যৌবনের প্রতি প্রাণের—জীবনের স্বাভাবিক অনুরাগ। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীকরূপেই সে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে চঞ্চল করিয়াছে,—আনন্দহীন বস্তুসাধনা, যন্ত্রসাধনা ছাড়িয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি আকর্ষণের একটা নৈর্ব্যক্তিক অস্ত্ররূপেই সে কল্পিত হইয়াছে, ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর, বাস্তব নারীভাবেই সে যদি পুরুষের জীবনকে পূর্ণ করিত, সার্থক করিত, তবে তাহার আবির্ভাবের পূর্বে কি যক্ষপুরীতে নারী ছিল না? চন্দ্রা ছিল, সর্দারনীরা ছিল, অন্য শ্রমিকদেরও স্ত্রী ছিল। অনুমান করা যায়, বিশুরও একদিন স্ত্রী ছিল। তাহাদের দ্বারাই তো পুরুষদের পরিবর্তন সম্ভব ছিল। তাহা তো হয় নাই। মূলকথা, নন্দিনী একটি সম্পূর্ণ সংকেত-চরিত্র, বাস্তব নারীমূর্তি সে নয়।

তাহা হইলে 'রক্তকরবী' সম্বন্ধে কবির মন্তব্য-আলোচনায় দেখা যাইতেছে,—(১) 'রক্তকরবী' বাস্তব সত্যমূলক নাটক নয়, সর্বতোভাবে কবির ভাব-কল্পনা-সত্যমূলক নাটক, (২) 'রক্তকরবী' পুরোপুরি রূপক-সাংকেতিক নাটক, (৩) 'রক্তকরবী'র দ্বিতীয় আলোচনায় যে-নারীপ্রভাবের উপর কবি জোর দিয়াছেন, নাটকীয় চরিত্রের উপর সে-প্রভাব বাস্তব নারীর নয়, সে-প্রভাব ভাবের প্রতীক নারীর, প্রাণশক্তি, জীবনানন্দ, সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম রূপায়িত—সংকেতিত যে-নারীর মধ্যে, সেই নারীমূর্তির প্রভাব। সুতরাং মূলতত্ত্বের ইহা সমর্থক ও পরিপূরক—বিরুদ্ধ নয়।

এখন ইহার নাটকীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন।

ফসল-কাটার গানটি এখানে আবহসংগীত-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যক্ষপুরীর সৌন্দর্যহীন, আনন্দহীন জীবনের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের একটা আহ্বানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'ফাল্গুনী'র গীতিভূমিকা ও 'মুক্তধারা'র ভৈরবপন্থীদের গানও এইরূপ ভাবের ইঙ্গিতাত্মক গান।

'রক্তকরবী'র মধ্যে বিশেষ নাট্যধর্ম নাই। ইহা অনেকটা গীতধর্মী। কেবল শেষের দিকে বন্দিশালা ভাঙিবার চেষ্টায় নাটকীয় ঘটনার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিক্ষিপ্ত নানা ভাবের অপূর্ব কাব্যময় চমকপ্রদ বাণীরূপই ইহার একটি বৈশিষ্ট্য।

'রক্তকরবী'তে একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বে বলা হইয়াছে—'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র আখ্যানভাগের কাঠামো-নির্মাণে পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের কিছু বাস্তব মাল-মশলা ব্যবহার করা হইয়াছে।

'রক্তকরবী'তে দেখি—কবি গূঢ় অধ্যাত্ম-সাধনা বা ধর্মবোধ বা মানবাত্মার সংকট রূপায়িত করিবার জন্য পূর্বের অবিমিশ্র কাল্পনিক আখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে-পরিবেশে তাঁহার আখ্যানবস্তু স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-জীবন ও সমাজ-জীবন-সমস্যার একটি সুপরিচিত চিত্র। সেই জন্য 'রক্তকরবী' একটা বিশিষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে এবং তত্ত্বকথার মধ্যেও একটা নূতন বাস্তবরসের আস্বাদ দেয়। 'রক্তকরবী'র মূল প্রতিপাদ্য যন্ত্র-সভ্যতায় নিষ্পেষিত মানবাত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। এই ভাবটি সংকেত ও রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। রূপকের অংশগুলি এমন মননশীলতা ও সার্থকতায় নির্মিত যে সমান্তরাল অর্থ-তাৎপর্যে বাস্তবের একটা সুসংগত ছবি আমাদের কল্পনায় ফুটিয়া উঠে। একথা বলা যায়—রক্তকরবী নাটকে সংকেত ও রূপকের সঙ্গে একটা বাস্তবতার অনুভূতিও হৃদয়ে জাগ্রত হয়। তাহার প্রধান কারণ আখ্যানবস্তুর পরিবেশ ও নির্মাণ-কৌশল। নাটকের মধ্যে নন্দিনী, রঞ্জন, রাজা ও

অনেকাংশে বিশু-পাগল সাংকেতিক চরিত্র। তাহাদের চারিত্রিক পরিমণ্ডলের মধ্য হইতে মানবাত্মার সংকটময় অবস্থার রহস্যময় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে; তাহাদের ঘিরিয়া নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা-ঝংকার উঠিতেছে। কিন্তু আধুনিক ধনসংগ্রহশীল যন্ত্র-সভ্যতার যে রূপকটি নাটকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পাত্র পাত্রী ও পরিবেশ এমন সচেতনভাবে কল্পিত ও সুচাররূপে গঠিত যে রূপকের মাধ্যমে আমরা অতি-সহজে নাট্যকার-উদ্দিষ্ট ভাব হৃদয়ংগম করিতে পারি এবং সংগে সংগে পরিচিত বাস্তবের একটি চিত্রও আমাদের কল্পনা-নেত্রে ভাসিয়া উঠে। রূপক যেন অনেক-স্থলে সীমা হারাইয়া বাস্তবের সংগে মিশিয়া যায় এবং আমাদের মনে একটা বাস্তবতার প্রতীতী সঞ্চার করে।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যবিস্তার দ্বারাই অর্থাগম হয়। এই অর্থাগমের মূল উৎস মিল ও ফ্যাক্টরী। এই কল-কারখানার মালিক পুঁজিপতি শিল্পপতিরা। ক্রমাগত production বা উৎপন্ন দ্রব্য বাড়িয়া চলিয়াছে আর সেই সংগে প্রতি ঘণ্টা মিনিট-সেকেণ্ডে আয়ের মাত্রা লাফাইয়া বাড়িতেছে। রাষ্ট্র এই পুঁজি-পতিদের অর্থে ও প্রভাবে পরিচালিত। সমাজের উপরেও ইহাদের প্রভাব অসীম। রাষ্ট্র ও সমাজ এই ধনসঞ্চয়ের দ্বারা চরম বৈষয়িক উন্নতিলাভের আদর্শকে একমাত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার দ্বারা এই আদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহার ক্রমোন্নতি সাধনের মধ্যে সমস্ত প্রয়াসে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে।

এই অর্থ-উপার্জনের মূল উৎস যে মিল-ফ্যাক্টরী তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অপরিহার্য উপাদান হইতেছে শ্রমিক। কল-কারখানা বলিতেই তাহার মজুরের সমস্যা অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে। এই শ্রমিক-মালিক-সমস্যা পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের একটা বড়ো সমস্যা। শ্রমিকদের ঘর্মবিন্দু ও রক্তবিন্দুর উপর নিরন্তর গড়িয়া উঠিতেছে মালিকের বিপুল মুনাফা। শ্রমিকদের মধ্যে শৃংখলা-বিধান, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন বা অন্যরূপে শোষণ-ব্যবস্থার জন্য নানাপ্রকারের আয়োজন রচিত হইয়াছে। মিল বা ফ্যাক্টরী-সংলগ্ন স্থানে শ্রমিকদের বাসস্থান দান, নানা ব্লকে সেই অঞ্চল বিভক্ত, সারি সারি তাহাদের 'বাসা', তাহারা যাহাতে শান্ত থাকে এবং কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করে তাহার জন্য সদা সতর্কদৃষ্টি ও নানা কৌশল-প্রয়োগ, ইহাদের বাসস্থানের নিকটে মদের দোকানের অবস্থিতি, তাহাদের মতি-গতি জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্য বহুপ্রকারের কর্মচারীর ব্যবস্থা প্রভৃতি—ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিচিত চিত্র। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, ভাব-চিন্তার রূপকের মধ্য দিয়া এই চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ফাগুলাল, গোকুল, বিশু প্রভৃতির কথাবার্তা, তাদের মদ-খাওয়া, অনুপ, উপমন্যু, শকলু, কঙ্কু প্রভৃতি শোষিতরক্ত, হৃতস্বাস্থ্য শ্রমিকদের ছায়ামূর্তি, মোড়ল ও সর্দারদের চিন্তা ও আচরণ, শেষে শ্রমিক-বিদ্রোহের আভাস প্রভৃতি আমাদিগকে সেই বাস্তব চিত্রই স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই রক্তকরবীতে আধুনিক সমস্যার একটা আবেদন আমাদিগকে আকর্ষণ করে।

কালের যাত্রা

(ভাদ্র, ১৩৩৯)

দুইটি ক্ষুদ্র নাটক 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথ সমগ্র গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন 'কালের যাত্রা'। গ্রন্থখানি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের ৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে কবির 'সস্নেহ উপহার'।

"১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। 'কবির দীক্ষা', 'শিবের ভিক্ষা' নামে ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।" (গ্রন্থ-পরিচয়)

'কালের যাত্রা' এই নামকরণে মনে হয় কবি দুইটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ভাব-সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই নিরবচ্ছিন্ন কালের যাত্রার কতো ধ্বংস, কতো নূতন সৃষ্টি, কতো উত্থান-পতন, কতো নব নব রূপের উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। এই পুরাতনের বিলয় ও নূতনের আবির্ভাবের মূলে নিহিত আছে একটা কারণ। যখনই একপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে অসত্য, অন্যায় ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করে, তখনই চিরন্তন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে, স্রোতোধারায় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তারপর প্রাচীনের পরিবর্তনের পর নবীন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কালের যাত্রাপথে যতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমস্তই পারিপার্শ্বিকের অসামঞ্জস্যের জন্য, মানুষের স্বার্থ-কামনায় ও অসত্য ব্যবহারের জন্য; উহা দূর হইলেই কালের যাত্রা নবতর পথে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। মহাকাল তাই যাত্রাপথে ধ্বংস ও নবসৃষ্টির মধ্য দিয়া সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর করিয়া, সমস্ত অশোভনতা মুছিয়া দিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। সমস্ত অচলতা ও বিক্ষোভের মূল এবং ধ্বংসের কারণ এই সামঞ্জস্যের অভাব—এই ভারসাম্যের বিপর্যয়।

কবি মহাকালের এই যাত্রাকে নটরাজ শিবের নৃত্যলীলার অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার একপাদক্ষেপে সৃষ্টি, অন্যপাদক্ষেপে ধ্বংস। অনাসক্তভাবে, স্বার্থ-দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া চলিয়াছে মহাকালের এই লীলা। সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই সত্য। সৃষ্টি না করিলে মহাকাল ধ্বংস করিবেন কি? তাঁহার সৃষ্টি-ক্ষমতা আছে বলিয়াই তিনি ধ্বংস করিতে পারেন। তিনি শ্মশানেশ্বর, ধ্বংসের দেবতা, সর্ব-রিক্ত, অকিঞ্চন,—আবার তিনিই নবসৃষ্টির বিধাতা, নব নব ঐশ্বর্যের জন্মদাতা। তিনি একাধারে দরিদ্র, নিঃস্ব এবং অতুল সম্পদশালী, ঐশ্বর্যবিলাসী। তিনি যেমন ত্যাগ করেন, তেমনি ভোগ করেন।

মানুষকে বুঝিতে হইবে মহাকালের এই লীলার মর্ম,—হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এই ধ্বংস-সৃষ্টির তাৎপর্য, কালের যাত্রার এই রহস্য। তাহা হইলেই কালের যাত্রাপথ হইবে সহজ ও স্বাভাবিক, উদ্ভব হইবে না বিরোধ-সংঘাত বা অভাবনীয় পরিস্থিতির, ঘটিবে না ধ্বংস ও পরিবর্তন। স্বার্থ ও লোভের পুষ্টিসাধন করিলে, অনেককে বঞ্চিত করিয়া বা নির্যাতিত করিয়া অযথা স্ফীত হইলে, কালের যাত্রায় বিঘ্নসৃষ্টি হয়। মানুষ ভোগ করিবে ত্যাগের জন্য, সঞ্চয় করিবে দানের জন্য, তবেই ভোগ হইবে সার্থক। ত্যাগী না হইলে ভোগী হওয়া যায় না, আবার ভোগী না হইলে ত্যাগী হওয়া অর্থহীন।

তাই কালের যাত্রায় অন্যায়, পীড়ন, লোভ ও স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা মানুষের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন করিলে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, আবার একান্ত রিক্ততা, দারিদ্র্য বা ঔদাসীন্য কিংবা স্বার্থকর ভোগ বা লুব্ধ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাও বিঘ্ন ঘটায়।

এই দুইটি ভাব-সত্যের আদর্শ জনসমাজে পরিবেষণ করার ভার কবির উপর। কবি জনগণের চিত্তে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-বোধ সৃষ্টি করে, জাগ্রত করে একটা সৌন্দর্য-চেতনা, তাতেই মানুষে মানুষে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, অন্তরে অন্তরে তালের বাঁধন কাটে না। আবার কবিই স্বয়ং মহাদেবের শিষ্য। তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতার ভোগ ও ত্যাগের প্রকৃত মর্ম সকলের নিকট প্রচার করেন।

এই দুইটি তত্ত্বকে কবি রসরূপে রূপায়িত করিয়াছেন তাঁহার 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে—দুইটি নাটিকার মাধ্যমে।

এখন এই ক্ষুদ্র রূপক-নাট্য দুইটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক্।

রথের রশি

রাজার রাজ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসিয়াছে। সকালবেলায় স্নান সারিয়া নরনারী মেলার পাশে পথের ধারে অধীর আগ্রহে দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিবৎসরের মতো এবারেও তাহারা রথ-টানা দেখিবে। কিন্তু রথ আর আসে না। রথের দড়ি যাহারা টানে, তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও রথ নড়াইতে পারিতেছে না। পথের উপর অজগর সাপের মতো অসাড় দড়িটা অচল হইয়া পড়িয়া আছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া কোনো ফল পায় নাই, মহাকালের পাণ্ডা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। আজ প্রথম শুভযাত্রার দিন অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় সকলেই প্রমাদ গণিতেছে, সকলেই ভাবী অমঙ্গলের আশংকায় উদ্বিগ্ন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

সর্বনাশ এলো।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।...
দেখতে পাচ্ছ না, আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না, লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতচ্ছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল।...
তোমরা কেবলি করেছ ঋণ,
কিছুই করোনি শোধ,

দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

সমবেত নরনারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মেয়েদের ভক্তি বেশি; তাহারা দড়ির উপর ঘি-দুধ, গঙ্গাজল ঢালিল, পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া দড়ি-দেবতার পূজার আয়োজন করিল, কতো মানত করিল, রাস্তা-ঠাকুর আর গর্ত-প্রভুর পূজার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু পুরোহিত নিষ্ক্রিয়, নিস্তব্ধ। মন্ত্র পড়িতে সাহস করে না।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

কী হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তখন রাজা নিরুপায় হইয়া আহ্বান করিলেন সৈন্যদের। তাহাদের সাহায্যে নিজেই চেষ্টা করিলেন রথ চালাইতে। কিন্তু রথ একটুও নড়িল না। বলদৃপ্ত সৈনিকেরা লজ্জিত, বিস্মিত।

সন্ন্যাসী বলিলেন, সৈনিকদের টানে রথ চলিবে না।—

তোমরা (সৈনিকেরা) দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যতো তীর ছুঁড়েছ বিঁধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে
বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাৎলামিতে দুর্বল করবে কালকে।

তখন মন্ত্রী ডাক দিলেন ধনপতিকে। ধনপতি তাহার দলবল লইয়া চেষ্টা করিল রথ চালাইতে, কিন্তু রশিটা আরো আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, আর তাহাদের হাত হইল যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাহারা অপারগ হইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় শূদ্রপাড়া হইতে ছুটিয়া আসিল দলে দলে শূদ্রেরা। তাহাদের দলপতি মন্ত্রীকে বলিল, মহাকাল-বাবা তাহাদের আদেশ দিয়াছেন, তাহারা আসিয়াছে বাবার রথ চালাইতে। শূদ্রের স্পর্ধায় সৈনিক রক্তচক্ষু হইল, পুরোহিত অস্পৃশ্যের ঔদ্ধত্যে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাইল,—বলিল, যাহারা বরাবর সংসার চালায় তাহারাই রথ চালাইবে, শূদ্রের কর্ম নয়।

শূদ্র-দলপতি বলিল,—

সংসার কি তোমরা চালাও ঠাকুর।...
আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচো,
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।

মন্ত্রীর আদেশে শূদ্রেরা 'জয় জয় মহাকালনাথের জয়' বলিয়া রথের রশিতে দিল টান। চাকার শব্দে আর্তনাদ করিয়া উঠিল আকাশ। ধুলা উড়াইয়া চলিল রথ।

আশ্চর্যের বিষয়, রথ চিরাভ্যস্ত পথে চলিল না। সবেগে ছুটিল কাঁচা পথ ধরিয়া পল্লীর দিকে। ধনপতির দল শঙ্কিত হইয়া দেখিল—রথ চলিয়াছে তাহাদের ধনভাণ্ডারের দিকে; সৈনিক দেখিল—চলিয়াছে তাহাদের অস্ত্রশালার দিকে;—সকলে নিজ নিজ স্থান সামলাইবার জন্য ছুটিল। রথের এই অভাবনীয় গতিতে সকলেই হতবুদ্ধি, ব্যাপারটা কি কেহই বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় কবি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই কবিকে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল।

২য় সৈনিক

এ কী উল্টোপাল্টা ব্যাপার, কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না,
মানে বুঝলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নিচের দিকে নামলে না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করল তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে,
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমরা শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান,
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয় তো।
একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই,
সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে,
জয় আমাদের হাল লাঙ্গল চরকা তাঁতের।
তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর একবার অচল হয়,
বোধ করি, তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর।
রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা ছন্দ মানি, জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে,
চাল-চলন যার এক পাশে বাঁকা;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল-মানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ওদিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কী করবে কবি।

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল?

কবি

যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা,

তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খাল খন্দগুলো মার মূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়ের দল যে এত ভক্তিভরে পূজা দিল, মানত করিল, তাহাদের এই পূজা-অর্চনা, সাধ্য-সাধনা কেন বিফল হইল, একথা কবিকে জিজ্ঞাসা করিল তাহারা। কবি তাহার উত্তর দিলেনঃ—

১মা

এ হোলো কি ঠাকুর। তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে।
দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হোলো মিছে।
মানলে কিনা শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া।
ছি ছি কী ঘেন্না!

কবি

পুজো তোমরা দিলে কোথায়।

২য়া

এইতো এইখানেই।
ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল,—
রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

৩য়া

আর ওরা, যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন,
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান,
বড়োটাকে দিলেন কাৎ করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

ইহাই নাটকের কথাবস্তু।

এখন দেখা যাক্ এই নাটকে কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন।

কালের রথে ইতিহাস-বিধাতা মহাকাল বসিয়া আছেন। জাতি-শ্রেণী-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সেই রথ টানিয়া লইতেছে। মানুষের পরস্পর-সম্পর্কের সামঞ্জস্য-পূর্ণ সম্মিলিত শক্তিতেই রথ চলিতেছে। মানুষের এই পরস্পর-সম্পর্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তিই রথের রশি বা দড়ি। যখন সমাজে এই মানুষের কোনো এক শ্রেণী বা জাতি অন্য শ্রেণী বা জাতিকে উপেক্ষা করিয়া, কিংবা বিদ্বেষ বা ঘৃণা করিয়া নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করে, তখনই এই সামঞ্জস্য হয় নষ্ট, পরস্পরের স্বাভাবিক সম্বন্ধটি হয় ছিন্ন, মানুষে মানুষে প্রাণের বাঁধন হইয়া পড়ে আলগা। ফলে পরিচালনী শক্তি পায় হ্রাস এবং ক্রমে ক্রমে রশিটা হইয়া যায় অকর্মণ্য, হাজার টানিলেও রথ আর নড়ে না। তখন আবার শক্তির সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য জন-গণ-ভাগ্য-বিধাতা মহাকাল সেই স্বার্থপর, সর্বগ্রাসী, অন্যায়-স্ফীত শ্রেণীর অস্বাভাবিক উচ্চতা, গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে খর্ব করিয়া, উপেক্ষিত ও পদদলিত শ্রেণীকে টানিয়া ঊর্ধ্বে তোলেন। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, তালভঙ্গ ঘটে না এবং কালের রথ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলে। এই পরিবর্তনই কালের ইতিহাসে যুগান্তর।

কালের রথ একযুগে ব্রাহ্মণের হাতের টানে চলিয়াছে, শেষে সমদর্শী ব্রাহ্মণ্যশক্তি পুরোহিত-তন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া সমস্ত শক্তি আত্মসাৎ করিল। যখন নিজেরা প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য অন্যান্য শ্রেণীকে উপেক্ষা করিল, তখনই ভারসাম্যের হানি হইল, ছন্দপতন ঘটিল। তারপর সে-অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের যুগ আসিল; যতোদিন অন্যান্য শ্রেণীর সহিত তাল রাখিয়া এই প্রাধান্য বজায় ছিল, ততো দিন কোনো বিরোধ-সংঘাত বা পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু যখন এই ক্ষত্রিয় রাজশক্তি গর্বোদ্ধত হইয়া অন্যান্য শ্রেণীকে পীড়ন করিতে লাগিল, সামরিক শক্তির বিলাসে মত্ত হইল, তখনই আবার সামঞ্জস্য নষ্ট হইল। পট-পরিবর্তন হইল ইতিহাসের এবং বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ আসিল। এই যুগে ধনিকরাই কালের রথ টানিতেছে, তাহাদের অর্থে পুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও সৈনিক তাহাদেরই আদেশ পালন করিতেছে। অন্য সমস্ত শ্রেণীর শক্তিই আজ অর্থহীন, বৈশ্য-শক্তিই পরিচালনা করিতেছে আজ সকলকে। আজিকার দিনে সমস্ত শক্তিই গ্রাস করিয়াছে ধনিক। তাই আবার ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে, সামঞ্জস্য ভগ্ন হইয়াছে, ছন্দপতন হইয়াছে। মহাকালের রথ সেজন্য আজ অচল। এবার সর্বনিম্ন স্তরের শূদ্রের পালা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন উচ্চবর্ণের দ্বারা সমাজের এই নিম্নস্তরের শূদ্রেরা এতোদিন নির্যাতিত হইয়াছে, পায় নাই তাহাদের ন্যায্য অধিকার; অপমানে, লাঞ্ছনায়, অবজ্ঞায় জর্জরিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে সকলের পশ্চাতে। অথচ তাহাদেরই অক্লান্ত শ্রমে নির্বাহ হইতেছে সংসারযাত্রা, বাড়িতেছে সভ্যতা; সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসনের ইন্ধন জোগাইতেছে তাহারাই। তাই মহাকাল আজ চির-নির্যাতিত শ্রমিকের দিকে গড়াইয়া পড়িলেন, তাহাকে নিম্নস্থান হইতে টানিয়া উঠাইলেন,—আর টানিয়া নামাইলেন অতি-স্ফীত ধনিক, সৈনিক ও পুরোহিতকে তাহাদের উচ্চ আসন হইতে। এইভাবে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করিলেন, ছন্দ মিলাইলেন। এই সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা কালের রথ আবার চলিল। আজ এক প্রাচীন যুগের অবসান, আর এক নবযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইয়াছে। আজ অবহেলিত, নির্যাতিত, শোষিত জনগণের ন্যায্য অধিকার-লাভের দিন সমাগত।

ইহাই এই নাটিকায় কবির বক্তব্য।

এই বক্তব্যটি কথাবস্তুর মধ্যে কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে দেখা যাক্।

সৃষ্টির প্রথম হইতে মানুষের পরস্পরের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কই কালের রথ টানিয়াছে। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে এই নিয়মই দেখা যায়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ ও ক্ষমতা-প্রিয়তায় সে-সহজ সম্বন্ধ আজ বিকৃত হইয়াছে; দড়ি তাহার বন্ধনী-শক্তি হারাইয়া অকর্মণ্য হইয়াছে, তাই কালের রথ আর চলে না। একদিন 'পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ; ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।' কালের যাত্রার প্রথম সভ্যতার যুগে পুরোহিতরাই ছিল মহাকালের রথের প্রধান বাহক, কিন্তু মন্তর-পড়ার দিন গত হইয়াছে,—'কী হবে মন্তরে, কালের পথ হয়েছে দুর্গম, কোথাও উঁচু কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত; করতে হবে সব সমান, তবে বিপদ ঘুচবে।' তারপর ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধবিগ্রহে, হানাহানিতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হইয়াছে ছিন্ন-ভিন্ন, সামঞ্জস্য হইয়াছে চূর্ণ-বিচূর্ণ, দড়িটা ক্ষত-জর্জর। 'তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর; যেখানে যতো তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে; ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর; তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে, বলের মাৎলামিতে দুর্বল করবে কালকে।' তাই সৈনিকের টানে রথ চলে না। এখন ধনিকদের সময়। 'আজকাল চলছে যা কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে।' পুরোহিতের মাথা বৈশ্যের টাকায় কেনা। ধনিকদের আদেশেই সৈন্যেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেছে। ধনিক বলে, 'সৈনিক, তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে? আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে!...তোমার শতঘ্নীকে যে আমাদেরই হুকুম ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর এক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।' সৈনিকের 'তলোয়ারগুলো কোনোটা খায় ওদের নিমক, কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।' ইহাদের হাতে রথের 'রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল।' তখন স্বয়ং মহাকালই তাহার উপায় করিলেন। তিনি ডাক দিলেন শূদ্রদের—যাহারা পুরোহিত, সৈনিক, ধনিকদিগের দ্বারা অবহেলিত, নির্যাতিত, শোষিত—যাহারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ। তাহাদের দলপতি আসিয়া বলিল, 'এবার বাবা মহাকাল ডাক দিয়েছেন, তাঁর রশি ধরতে...কেমন করে জানা গেল সে ডাক তা কেউ জানে না। ভোর বেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে, ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—ডাক দিয়েছেন বাবা।' শূদ্রের পরাজিত মনোভাব দূর হইল, আত্ম-চেতনার উদ্ভব হইল, কী এক অনুপ্রেরণায় তাহারা অগ্রসর হইল সমাজে তাহাদের এতোদিনের হারানো স্থান গ্রহণ করিতে। রথ সবেগে চলিল, কিন্তু এতোদিনের অভ্যস্ত পথে না গিয়া অন্য পথ ধরিল। এতোদিনের নিয়মের পরিবর্তন হইল। এখন যুগান্তর উপস্থিত, তাই অভাবনীয় পরিবর্তন সম্ভব। পুরাতনের ধ্বংসের পরই নবযুগের উদ্ভব হয়। 'যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।' ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের ক্ষমতা, যুদ্ধ-বিলাসীদের অস্ত্রসজ্জা, ধনীর ধন-সম্পদ, নবযুগের এই নব-পরিস্থিতিতে ওলট-পালট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তাই তাহারা শঙ্কিত এবং নিজ নিজ ঘর আগলাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় রত।

কেন এই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল, এতোদিনের অবজ্ঞাত, নির্যাতিত শূদ্র কেন প্রাধান্য লাভ করিল? তাহার কারণ এই যে, মহাকালই এই সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন, ভারসাম্য রক্ষা করিলেন। 'এক দিকটা হয়েছিল অতিশয় বেশি, ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন

ছোটোর দিকে, সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাৎ করে; সমান করে নিলেন তার আসনটা।' ছোটো-বড়োর প্রভেদ ঘুচাইয়া তিনিই এ-ব্যবস্থা করিলেন।

স্ব-স্ব-স্বার্থান্বেষী জনগণের কাছে এই সামঞ্জস্য-তত্ত্ব প্রচার করিবার ভার কবির। 'রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।' কবি সৌন্দর্যের উপাসক, তাঁহার সাধনা ছন্দের। সৌন্দর্যের অর্থ অবয়বের সমস্ত অংশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ—অপূর্ব সমন্বয়। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতি হইতেই কবির ছন্দের প্রেরণা, ছন্দের সাধনা। ছন্দও তো শব্দ-গুলিরই পরিমিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপন। তাহাতেই সুসংগত তালের সৃষ্টি। এই সৌন্দর্যের অনুভূতি, এই ছন্দের চেতনা কবির মনে থাকে বলিয়াই সংসারে, সমাজে সৌন্দর্যহানি, ছন্দঃপতন তিনি দেখিতে পারেন না, পীড়া অনুভব করেন এবং ভ্রান্ত জনগণের কাছে সৌন্দর্য ও ছন্দের-মহিমা প্রকাশ করেন। মানব-সমাজে ছন্দ কি? সমস্ত জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহজ, সরল স্বাভাবিক সম্পর্কই ছন্দ। স্বার্থবুদ্ধি, বিদ্বেষ, প্রভুত্বপ্রিয়তা, হিংসা প্রভৃতির দ্বারা এই ছন্দের পতন হয়, তাল কাটে, সৌন্দর্যের আদর্শচ্যুতি ঘটে। তখন একটা অংশ বড়ো হইয়া অপর অংশকে কোণ-ঠাসা করে বলিয়া সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। 'এক-ঝোঁকা হইলে তাল কাটে'! কবি তাঁহার কাব্যে-গানে এই ছন্দ ও তালের কথা প্রচার করেন—মানুষে মানুষে, সমাজের অংশে অংশে হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ভুলিয়া, সকলকে সমান ও ন্যায্য অধিকার দিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হইয়া সকলকে চলিতে হইবে, তবেই কালের রথ সহজভাবে চলিবে। 'আমি তাল রেখে গান গাব; যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।' সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের অন্তরের প্রেম ও প্রীতির বন্ধন যদি দৃঢ় থাকে, তবেই তাল কাটিবে না। এই বন্ধনই তো রথের দড়ি। তাতেই কালের রথ সচল। তাই কবির উপদেশ,—

'এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না।'

এই নাটিকায় একটি কথা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এতোদিনের নির্যাতিত, মৃতপ্রায় শ্রমিক-শ্রেণীর অভ্যুদয় ও ন্যায্য মর্যাদা-প্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করিয়াছেন,—

আজকের মতো বলো সবাই মিলে,
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে, যদি এককালে এই নব-জাগ্রত শূদ্রশক্তি মনে করে, অন্যান্য শ্রেণীকে দমাইয়া তাহারাই প্রভুত্ব করিবে, অন্যান্যের ন্যায্য অধিকার হরণ করিবে, তখন আবার ছন্দোভঙ্গ হইবে, আবার সামঞ্জস্য নষ্ট হইবে, আবার কালের রথ অচল হইবে। তখন হয়তো শূদ্রেরা মনে করিবে, উহারাই প্রভু, আর সকলে দাস, 'হয়তো ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই, হয়তো শুরু করবে চেঁচাতে, জয় আমাদের হাল লাঙ্গল চরকা তাঁতের,' কিন্তু তাহাতে বর্তমান দুর্ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হইবে। তখন—

আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই ক্ষুদ্র নাটকটি একটি সুন্দর রূপক-নাট্য। সাংকেতিকতার লক্ষণ ইহাতে নাই। সাধারণ নাটকের মানদণ্ডে এ-জাতীয় নাটক বিচার্য নয়, এ-কথা পূর্বে কয়েকবার বলা

হইয়াছে। বিরোধ-সংঘাত বা সুনির্দিষ্ট নাটকীয় পরিণাম ইহাতে নাই। পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে একটা ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে মাত্র এবং ইহারই অন্তরালে কবি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন একটি তত্ত্বের। তবুও ঘটনার মধ্যে একটা নাটকীয় গতি লক্ষ্য করা যায়। এই নাটিকাটির বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নিখুঁত রূপকের কাঠামো নির্মাণে। ঘটনা-ধারার তলে-তলে একটা সমান্তরাল ইঙ্গিত বা তাৎপর্য আগাগোড়া বর্তমান আছে। পুরোহিত, সৈনিক, ধনপতি, নারীরা অব্যর্থভাবে সমাজে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের, কর্ম ও ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছে, তাহাতে অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হইয়াছে।

কবির দীক্ষা

এই অতি-ক্ষুদ্র নাটকটি প্রকৃতপক্ষে নাটক নয়—নাটকীয় কোনো গুণই ইহাতে নাই। ইহাতে দুইজনের সংলাপের মধ্য দিয়া একটা বিশিষ্ট ভাব বা তত্ত্বকে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় তত্ত্ব। ইহা মূল উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' শ্লোকটি। প্রাচীন-ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য, সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে কবি এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়াছেন। এই 'ত্যাগবিদ্ধ ভোগ'ই প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সমাজের আদর্শ ছিল। তাঁহার অনেক গদ্যরচনায় এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় কবি এই তপোবন-আদর্শের মধ্যেই—ভোগ ও ত্যাগের এই সমন্বয়ের মধ্যেই যে ভারতের বৈশিষ্ট্য, একথা ব্যক্ত করিয়াছেন। আধুনিক ভারত ভোগের আদর্শ, ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের আদর্শ ত্যাগ করিয়া রিক্ত, নিঃস্ব হইয়াছে, এবং বর্তমান ইয়োরোপ ত্যাগের আদর্শ, দানের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অপরিমিত ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের দ্বারা ভোগবিলাসে মগ্ন হইয়াছে। উভয় আদর্শের মিলন প্রয়োজন, তবেই উভয়ে সার্থক হইবে। এই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের কথা তিনি অনেক প্রবন্ধে বলিয়াছেন।

নাটকের আখ্যান-ভাগটি এইরূপঃ—

কবির এক ভূতপূর্ব এবং অধুনা গুরুত্যাগী শিষ্যের সঙ্গে কবির কথোপকথন হইতেছে। এই ব্যক্তিটি এক সময়ে কবির দলে ভর্তি হইয়াছিল, কিন্তু 'পরম ধার্মিক ভবভয়-নিবারিণী সভার সভাপতি' বলিলেন,—'ঐ লক্ষ্মীছাড়া কবিটা তোমাকে দিচ্ছে রসাতলে।' তাহার খুড়ো-জেঠারা বলিলেন,—'কবির দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা, না আছে পরমার্থের।' তখন সে কবিকে ছাড়িয়া তত্ত্বানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

তত্ত্বানন্দ স্বামী শৈব, শিবমন্ত্রে দেন দীক্ষা; সে-মন্ত্র একেবারে ত্যাগের মন্ত্র—সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন সাজা। কবিও শৈব, তিনিও শিবমন্ত্র দেন; সে-মন্ত্র ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যের মন্ত্র—আগে ভোগের জন্য সঞ্চয় করিয়া পরে ত্যাগের দ্বারা নিঃস্ব হওয়া।

ঐ-ব্যক্তির বিস্মিত প্রশ্নে কবি তাঁহার মতবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

তত্ত্বানন্দ স্বামী
শিবমন্ত্র দেন প্রলয় সাধনায়

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

অবাক করলে,
তুমিতো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বলো বৈঠিক কথা।
তোমরা তো মেতে আছ নাচে-গানে।

জগৎ-জোড়া নাচ-গানেরই পালা আমাদের প্রভুর।
কী বলেন তত্ত্বানন্দ স্বামী।

প্রলয় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে।
ত্যাগের দীক্ষা নিয়েছি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ?
উপুড় করবে শূন্য ঘড়াটাকে?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ, কবি।

ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝরনায়,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হোলো ত্যাগী,
তবে সব আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিব ভিক্ষুক, সেটাতো মানো।
মহত্ত্ব দিলেন তিনি জগতের দারিদ্র্যকে।

দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে।
মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়,
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

কবি শৈব, তাঁহার উপাস্য দেবতা শিবের ত্যাগের মর্ম তিনি ভালো জানেন। শিব একদিকে সর্বত্যাগী, শ্মশানবাসী, সমস্ত ভোগস্পৃহাবর্জিত, কিন্তু অন্যাদিকে তিনিই আবার অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী। তিনি নিজের ভোগের জন্য ভিক্ষা চাহেন না, অন্নপূর্ণার দানকে সার্থক ও পরমতৃপ্তির উৎস-স্বরূপ করিতে চাহেন। মানুষ সেই অন্নপূর্ণা, শিব তাহার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—'আমাদের দানকে তিনি করতে চান সার্থক।' কিন্তু মানুষ যদি নিঃস্ব হয়, সর্বরিক্ত হয়, তবে সে কী দান করিবে? শূন্য ঘড়া হইতে কি জল বর্ষণ করা যায়? মহাদেবকে ভিক্ষা দিতে হইলে মানুষকে ঐশ্বর্যবান হইতে হইবে। ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিই প্রকৃত দারিদ্র্যের মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে।

তত্ত্বানন্দ স্বামীর যে-ত্যাগমন্ত্র, তাহাই আমাদের সাধারণগ্রাহ্য বৈরাগ্য-মন্ত্র—সংসার-ত্যাগের মন্ত্র—সাংসারিক জীবনকে অগ্রাহ্য করিবার মন্ত্র। কিন্তু কবির ত্যাগমন্ত্র ভিন্ন। উহা সংসার-ত্যাগের মন্ত্র নয়, জীবনকে অস্বীকার করিবার মন্ত্র নয়। উহা সংসারকে, জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র,—কিন্তু একান্তভাবে ভোগের জন্য গ্রহণ নয়, ত্যাগের পরম আনন্দ-লাভের জন্য, ঐশ্বর্যের চরম সার্থকতা-লাভের আশায়। সুতরাং জাগতিক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিতে হইবে, জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে, ভোগের আয়োজন পূর্ণ করিতে হইবে,—কিন্তু তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাকেই সর্বস্ব মনে করিলে চলিবে না। ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিতে হইবে দানের মহান গৌরবের জন্য, ভোগ করিতে হইবে ত্যাগের পরম সার্থকতা-লাভের উদ্দেশ্যে।

শিবের যে সর্বশক্তি, সর্বত্যাগী মূর্তি, তাহারই উপাসক আমরা ভারতীয়েরা। 'আমরা কোণে বসে আছি নেংটি পরে। আমাদের কী আছে যে আমরা দান করব?' আর ইয়োরোপীয়েরা শিবের ঐশ্বর্যময় মূর্তির উপাসক,—

মেনেছে ওরা মহাভিক্ষুর দাবী
তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ,
ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

উভয়ের সাধনাই অসম্পূর্ণ—শিবমন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য যে ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য—সঞ্চয় ও দানের সমন্বয়, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। ভারত জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া নিঃস্ব সাজিয়াছে, আবার ইয়োরোপ দানহীন অপরিমিত সঞ্চয়ের দ্বারা স্ফীত হইয়াছে, ত্যাগহীন ভোগের দ্বারা ঐশ্বর্যমদমত্ত হইয়াছে। এই আত্মভোগসর্বস্ব ঐশ্বর্যই হইয়াছে তাহাদের নানা অশান্তির কারণ। উভয়ের মিলন হইলে, ঐশ্বর্য ও ত্যাগের মণি-কাঞ্চন যোগ হইলে, তবেই শিবমন্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করা হইবে। কবির শৈব-দীক্ষায় উভয় অংশের মিলনের বাণী প্রচারিত।

শিবের এই দুই মূর্তির মিলন—এই ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'তপোবন' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃতির যোগ্য—

"...ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সাধনায় সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন; এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হইয়াছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।"

(শিক্ষা, পৃঃ ১১১, শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৪১৯)

তাসের দেশ

(১৩৪০, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, ১৩৪৫)

'একটি আষাঢ়ে গল্প'—এই নামীয় রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প (আষাঢ়, ১২৯৯; গল্পগুচ্ছ, ১ম খণ্ড) এই নাটকটির ভিত্তি। গান, সংলাপ ও দৃশ্য-যোজনায় ইহাকে নাটকে রূপায়িত করা হইয়াছে। কাঠামোটি রূপকথার হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত ভাবের আবেদন সকল কালের; রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে সেই ভাব ব্যঙ্গরসমিশ্রিত হইয়া আমাদের চিত্তকে এক অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়; গান ও নাচের সংযোগে ইহার অভিনয়-সাফল্যও সহজেই অনুমেয় এবং বাস্তবিক পক্ষেও মঞ্চে ইহার অভিনয় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রূপক-সাংকেতিক নাটক অপেক্ষা কম সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। মূলগত ভাবের দিক্ হইতে 'অচলায়তন'-এর সহিত ইহার একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অচলায়তনের মতো ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প-সৌন্দর্য নাই, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তত্ত্ব-রূপায়ণই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য স্থবিরতা হইতে মুক্তি, জীবনের গতির মাহাত্ম্য-প্রচার এবং যৌবনের জয়গান রবীন্দ্রনাথের একটি অতি-প্রিয় তত্ত্ব। বহু রচনায় ইহার প্রকাশ রহিয়াছে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকের নিকট তাহা সুবিদিত।

ইহার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (বর্তমান সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। কবি যে-উদ্দেশ্যে এই নাটকটি রচনা করেন, উৎসর্গ-পত্রে তাহার একটা আভাস আমরা পাই। কবি লিখিয়াছেন—

"কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

কবির বক্তব্যটি সুস্পষ্ট। আমাদের দেশকে কবি তাসের দেশের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন। এদেশ পরিবর্তন-বিমুখ, নিয়ম-শাসিত, গতানুগতিক প্রথার অনুগামী ও জীবন-চাঞ্চল্য-বিহীন। রাজপুত্র যেমন তাসের দেশে সঞ্চার করিয়াছিল নূতন প্রাণ, ছবির দলকে যেমন পরিবর্তিত করিয়াছিল মানুষে, কবি আশা করেন, সুভাষচন্দ্রও সেইরূপ এই জীবন্মৃত দেশে সাড়া জাগাইবে নূতন প্রাণের।

গল্পের কথাবস্তু এইরূপ। এক রাজপুত্র তাহার যন্ত্রচালিতবৎ অভ্যস্ত একঘেঁয়ে জীবনে বিরক্ত হইয়া একটা চাঞ্চল্য অনুভব করিল—'বুড়োমানুষীর সুবুদ্ধি ঘেরা জগতে' প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিল। সে ঘর ছাড়িয়া তাহার অনির্দেশনীয় আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহার 'স্বপ্নের ধন'—'নূতন'-এর অন্বেষণে নিরুদ্দেশ বাণিজ্য-যাত্রা করিল। সঙ্গে গেল তাহার বন্ধু সদাগরপুত্র। পথে নৌকাডুবি হইয়া তাহারা ভাসিতে ভাসিতে তাসের দ্বীপে আসিয়া উঠিল।

এই তাসের দেশের অধিবাসীরা কাগজ-নির্মিত, চার-রঙের তাস-জাতীয় প্রাণী। তাহারা 'বুকে-পিঠে চ্যাপটা', 'চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলে'; তাহাদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা সবই নিয়ম-বাঁধা। সেখানে এক অনড় নিয়ম ও প্রথার রাজত্ব। প্রাচীনকাল হইতে সমাজে তাহাদের পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হইয়া আছে, তাহার এতটুকু পরিবর্তন বা প্রতিবাদ করিতে কাহারো সাহস নাই, প্রতিবাদ যে হইতে পারে এমন বিশ্বাসটুকুও নাই। বাপ-

পিতামহদের আমল হইতে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, নির্বিচারে তাহাই নিখুঁতভাবে পালন করাই তাহাদের কাজ।

গল্পের বর্ণনাটি বিশদ ও চিত্তাকর্ষক,—

"...চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কতো মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই। সকলেই যথানির্দিষ্টমতে আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলীক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদের উপর দাগ বুলাইয়া চলা...কেবল নিয়মে চলা-ফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠা-পড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল ফ্যাল ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অথবা জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই।...

আশ্চর্য স্তব্ধতা ও শান্তি। পরিপূর্ণ স্বস্তি ও সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত সুবিহিত—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ ও ক্ষুদ্র বিশ্রাম।"

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র তাসের দেশের এই এতোদিনের অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে লইয়া আসিল একটা চাঞ্চল্য। তাহারা প্রতিপদে নিয়ম ভাঙে, হাসে, ইচ্ছামত চলাফেরা করে। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক স্পর্শে দ্বীপবাসীরাও তলে-তলে জীবন-চাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিল,—এতোদিন পরে দেখিল, ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায়। তখন 'পুতুলের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার' হইল; সঞ্চার হইল 'নিয়মের জারক রসে জীর্ণ মনে' নব চেতনার। জীবন-চেতনায় সাড়া দিল তাসানীরাই প্রথম। তাহারা ইচ্ছামত চলিতে লাগিল, চুল বাঁধিতে লাগিল, সাজিতে লাগিল, গান গাহিতে লাগিল। তাহারাই প্রথমে আইন অমান্য করিল, প্রচার করিল,—'ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থকের আবর্জনা।' শেষে পুরুষদের মধ্যেও এই চাঞ্চল্য হইল সংক্রামিত। সকলের মধ্যেই জাগিল স্বাধীন কর্তৃত্বস্পৃহা ও আত্মবিশ্বাস। তাস-জীবন হইতে মনুষ্য-জীবনে হইল তাহাদের রূপান্তর—সকলেই হইয়া গেল মানুষ।

'তাসের দেশ'-এর লক্ষ্যস্থল নিঃসন্দেহে আমাদের ভারতবর্ষ এবং আমরা এ-দেশ-বাসীরাই হইতেছি এই তাসদেশবাসী অদ্ভুত প্রাণী। যুক্তিহীন নিয়ম বা প্রথার দাসত্বে আমরা বিশেষত্ব-বর্জিত কলের মানুষ; আমরা বিচার করিয়া জীবনে পদক্ষেপ করি না; কেবল চিরাচরিত রীতি ও তন্ত্র-মন্ত্র মানি, পুতুল-বাজির পুতুলের মত পিছনের এক অদৃশ্য শক্তির চালনায় উঠিতেছি, বসিতেছি, নাচিতেছি। প্রাচীনত্বে অগাধ বিশ্বাস আমাদের, খাঁটি আর্যদের বংশধর বলিয়া আমরা গর্ব করি, এবং আমাদের 'কৃষ্টি'-রক্ষার জন্য সতত যত্নপর আমরা। নূতনের একান্ত বিরোধী আমরা,—নানা 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের সনাতন মতকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি।

'একটা আষাঢ়ে গল্প'-রচনার পটভূমিকায় সমসাময়িক কালের কবিচিত্তের একটা বিক্ষোভ বিদ্রূপাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই গল্পটি-রচনার কিছুদিন পূর্ব হইতে সুবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি হিন্দুধর্মের নানা আচার ও প্রথার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়া উহাদের উপযোগিতা-প্রমাণে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। সুলেখক চন্দ্রনাথ বসুও তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ও সংস্কার, সামাজিক ব্যবস্থা, জাতিভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-বিচার, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতির মধ্যে ধর্মের গূঢ় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় ('মানসী') ও নাট্যে ('ব্যঙ্গ-কৌতুক') এই উৎকট আর্যামির ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমেই এই 'নব্যহিন্দু'দের প্রচার বাড়িয়াই চলিতেছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১২৯৮) চন্দ্রনাথ বসু 'আহারতত্ত্ব' বলিয়া একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন, আত্মার শক্তিবর্ধনই আহারের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এ-রহস্য ভারতীয়গণই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (পৌষ, ১২৯৮) 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মত'-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "...আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই...একথা সত্য বটে, স্বল্পাহারা বা অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়।... কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধি-সাধন তাহা নহে... প্রবৃত্তিকে রিপুজ্ঞান করিয়া শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক...কর্মেই মানুষের কর্তৃশক্তি ও আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়।...প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন ও কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তিদমনই সর্বোৎকৃষ্ট।"

তারপর চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধেরও (সাহিত্য, মাঘ, ১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেন 'চন্দ্রনাথ বসুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামক এক প্রবন্ধে (সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯)। এই নব্যহিন্দু-মতবাদের পৃষ্ঠপোষকেরা ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রতিমাপূজার সমন্বয়, বেদের অপৌরুষেয়তা, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রভৃতি প্রচার করিয়া দেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ধারা রোধ করিতেছিলেন এবং সর্বপ্রকার প্রগতির সম্ভাবনাকে নির্মূল করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করেন। 'কর্মের উমেদার' প্রবন্ধে (সাধনা, মাঘ, ১৯৯৮) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে স্থিতিশীল, জড়মূর্তি, শাস্ত্রভারবাহী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী "...আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ ও মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতেই পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে...ইউরোপ যেমন মেসিনযন্ত্রের ভার বহন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভারতবর্ষ শাস্ত্রের ও বিধিনিষেধের ভার বহন করিতেছে...আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি।" রবীন্দ্র-মানসের এই প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-এর মধ্যে। বহু পরে রচিত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের (ভাদ্র, ১৩২৪) মধ্যেও কবি ভারতীয়দের এই দাস-মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন।—

"অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহ প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁট খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্ম-মাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর

সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত, সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি বিলাতি চশমা পরিলেও না।"

পরবর্তী কালের 'তাসের দেশ'-এর মধ্যেও এই প্রতিবাদ ও চিত্ত-বিক্ষোভই রূপ পাইয়াছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আবরণে।

প্রসঙ্গত নাটকের দুইটি কৌতূহলোদ্দীপক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারেঃ—

(তাসদলের অদ্ভুত আওয়াজ দেখিয়া সদাগরের হাসি)

ছক্কা

এ কী ব্যাপার। হাসি!

পঞ্জা

লজ্জা নেই তোমাদের, হাসি!

ছক্কা

নিয়ম মানো না তোমরা, হাসি!

রাজপুত্র

হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা

অর্থ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পারো না? পাগল না কি তোমরা।

রাজপুত্র

...চিনলে কী করে।

পঞ্জা

চাল চলন দেখে...দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর

আর তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই।

পঞ্জা

জানো না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগণ্ড, অর্বাচীন, অজাতশ্মশ্রু...

ছক্কা

এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপুত্র

আমরা বিদেশী।

পঞ্জা

বাস্। আর বলতে হবে না। তার মানে তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুষ্টি নেই, শ্রেণী নেই, পংক্তি নেই।

রাজপুত্র

...তোমাদের পরিচয়টা?

ছক্কা

আমরা ভুবনবিখ্যাত তাস-বংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ...ঐ পঞ্জা বর্মণ. .সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে ঐ তিরি ঘোষ, ঐ দুরি দাস।

সদাগর

তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক্কা

ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন, পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব...শুভ গোধূলি লগ্নে পিতামহ চারমুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই...বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ করে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এরা সকলেরই প্রণম্য।...তাসবংশের আদি কবি ভগবান্ তাসরঙ্গ-নিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন, সেই ছন্দেব মাত্রা শুনে শুনে আমাদের সাড়ে সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতির উদ্ভব।

রাজপুত্র

অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞ্জা

আচ্ছা, তাহলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র

কেন।

পঞ্জা

নিয়ম। ভাই ছক্কা, ঠুং মন্ত্র পড়ে ওদের কানে একটা ফুঁ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র

কেন।

পঞ্জা

নিষম।

*　　*　　*　　*

রাজা

শোনো বিদেশী।...তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ। জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ—এসব কেন।

রাজপুত্র

রাজা সাহেব, তোমরা যে কেবলি উঠছ, বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই বা কেন।

রাজা

সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র

এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা

ইচ্ছে! কী সর্বনাশ। এই তাসের দেশে ইচ্ছে! বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কী বলো।

ছক্কা পঞ্জা

আমরা ওর কাছে ইচ্ছে মন্ত্র নিয়েছি।...

রাজা

যাও যাও, এখান থেকে সব চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পৌঁছল না কথাটা? চিঁড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা? হঠাৎ এমন হলো কেন?

হরতনী

ইচ্ছে।

অন্য টেক্কারা

ইচ্ছে।

রাজা

ও কী রানী বিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

রানী

আর বসে থাকতে পারছি নে।

রাজা

রানী বিবি, সন্দেহ হচ্ছে তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী

সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা

জানো, চাঞ্চল্য তাসের দেশে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ!

রানী

জানি, আর এও জানি এই অপরাধটাই সবচেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।

রাজা

শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাসের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ?

রানী

আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।

রুইতন

হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি।

রাজা

চুপ।

হরতনী

এরা হেঁয়ালীকে বলে শাস্তর।

রাজা

চুপ।

হরতনী

বোবাকে বলে সাধু।

রাজা

চুপ।

হরতনী

বোবাকে বলে পণ্ডিত।

রাজা

চুপ।

পঞ্জা

এরা মরাকে বলে বাঁচা।

রাজা

চুপ।

রানী

আর স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।

সকলে

জয় ইচ্ছের জয়।

রাজা

রানীবিবি, তোমার বনবাস।

রানী

বাঁচি তাহলে।

রাজা

নির্বাসন। ওকী, চললে যে। কোথায় চললে।

রানী

নির্বাসনে।

রাজা

আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রানী

ফেলে রেখে যাব কেন।...সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।

রাজা

কোথায়।

রানী

নির্বাসনে।

রাজা

আর এরা, আমার প্রজারা?

সকলে

যাব নির্বাসনে।...

রানী

কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুত্র

এই যে আছি আমরা।

রানী

মানুষ হতে পারব আমরা?

রাজপুত্র

পারবে, নিশ্চয় পারবে।

রাজা

ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।

রাজপুত্র

সন্দেহ করি। কিন্তু রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

(৫)

সামাজিক নাটক

এ পর্যায়ে আলোচ্য নাটকগুলিকে আমরা ব্যাপকভাবে সামাজিক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। অবশ্য সামাজিক নাটক বলিতে বর্তমানে আমরা বাস্তব সমাজের পরিবেশে যে-সামাজিক সমস্যামূলক ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত-মুখর নাটক বুঝি এগুলি ঠিক তাহা নহে। একটা পরিবারের বা নির্দিষ্ট সমাজের কতকগুলি নরনারীর ব্যক্তিগত ঘটনাবিশেষই এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু, তাই আলোচনার সুবিধার জন্য সমধর্মী এই নাটকগুলিকে একটা শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। এ-পর্যায়ের 'বাঁশরী' ব্যতীত কোনটিই কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়—অন্যান্য নাটক উপন্যাস, গল্প, কবিতা বা কাহিনীর নাট্যরূপ। 'বাঁশরী'তে খানিকটা আধুনিক সামাজিক নাটকের রূপ দেখা যায়।

'প্রায়শ্চিত্ত'কে কবি ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন (প্রথম হিতবাদী সংস্করণ, ৩১শে বৈশাখ, ১৩১৬)। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের মূলবৈশিষ্ট্য ইহাতে দেখা যায় না। ইতিহাসের একটা যুগের ঘটনাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রে যে-বিচিত্র কর্ম, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণত তাহাই প্রধান ভিত্তি। এই নাটকের প্রতাপ, বসন্ত রায় প্রভৃতি চরিত্রগুলির সহিত সমসাময়িক ইতিহাসের কোনো সম্বন্ধ নাই,—ঘটনাগুলি একটা পারিবারিক ব্যাপারমাত্র। যশোহর-চন্দ্রদ্বীপের কলহ, বসন্ত রায়ের হত্যার চেষ্টা, উদয়াদিত্যকে বন্দী করা—সবই পারিবারিক ঘটনা। 'ঐতিহাসিক-প্রতাপ' অপেক্ষা 'মানুষ-প্রতাপ'ই, এই সব ঘটনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত

(১৩১৬)

এই নাটকের কথাবস্তু রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাস হইতে গৃহীত। সুতরাং এখানে কথাবস্তুর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'প্রায়শ্চিত্ত' কবির পরিণত হাতের রচনা এবং নাট্যরূপে রূপায়িত বলিয়া ঘটনা-সমাবেশ, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপের বাগ্‌-ভঙ্গি-বিষয়ে উপন্যাস অপেক্ষা অনেকটা উন্নততর। নাটকে কেবল একটি চরিত্র কবির নূতন সৃষ্টি—সে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র।

নাটকটির মূলদ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দুইটি অ-সম শক্তির মধ্যে। একপক্ষ উগ্র, প্রচণ্ড, অত্যাচারী, হৃদয়হীন,—কেবলি অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে,—অপরপক্ষ ক্রমাগত সহনশীল, অত্যাচারীর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সুযোগঅন্বেষী, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, বৈরাগ্য ও ত্যাগের দার্শনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন,—শেষে সমস্ত দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া সংসার-

ত্যাগী, মুক্ত। সুতরাং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের আবর্ত-সংঘাতে নাটকীয়ত্ব কোথাও তেমন জমিয়া উঠে নাই। প্রতাপ রাজদণ্ডের অহংকারে স্ফীত হইয়া প্রজাপীড়ন করিতেছে, মন্ত্রীর পরামর্শ মানিতেছে না, প্রজাদের নেতা ধনঞ্জয়কে কারারুদ্ধ করিয়াছে, প্রজাবৎসল যুবরাজকে বন্দী করিয়াছে, পিতৃবাক্যে হত্যার চেষ্টা করিয়াছে, তুচ্ছ পারিবারিক সম্মানের জন্য কন্যার বৈধব্য চিন্তা না করিয়া জামাতার হত্যার আদেশ দিয়াছে,—কিন্তু উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, সুরমা, বিভা কেহই নির্যাতিত হইয়া প্রতি-আক্রমণের চিন্তা করে নাই,—অন্যায় ও অত্যাচারের বলিস্বরূপে পরিণত হইয়া অসহায়ভাবে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে একপক্ষের অবিরাম জয়ের অভিযান, আর অপরপক্ষের নিরন্তর আত্ম-ত্যাগ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা একটা করুণ রসের সৃষ্টি মাত্র, নাটকীয় রসের কোন চমৎকারিত্ব বা আবেদন সঞ্চার করে না।

কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এই পরাজিত পক্ষই সত্য, ন্যায় ও উচ্চ আদর্শের বিচারে প্রকৃত জয়ী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই, পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে নাই পশুশক্তি;—সহনশীলতার দ্বারা, সহজ আচরণের দ্বারা, তাহারা অত্যাচারীর সত্য-জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি-উন্মেষের চেষ্টা করিয়াছে। সে-শুভ-বুদ্ধির ফল নাটকের কর্মের মধ্যে কোথাও ব্যক্ত না হইলেও, প্রতাপের কোনো পরিবর্তন না হইলেও, ইহাদের নীতি ও সাত্ত্বিক কর্মপন্থা আমাদের একটা বেদনামিশ্রিত সহানুভূতি ও নীরব অনুমোদন লাভ করে। কোনো অনুচিত কর্ম বা বাক্যের দ্বারা উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া এতোগুলি ভালো লোক যে রক্ষা পাইল, তাহাতেই যেন আমরা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

এই নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাহাকে আমরা পরবর্তী নাটক 'পরিত্রাণ' ও 'মুক্তধারা'তেও দেখিতে পাই বটে, কিন্তু এই নাটকেই তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। অবশ্য এইজাতীয় চরিত্র—যথা, 'শারদোৎসব', 'রাজা' ও 'ডাকঘর'-এর ঠাকুরদাদা, 'অচলায়তন'-এর ঠাকুরদাদা প্রভৃতির সঙ্গে আমরা সবিশেষ পরিচিত, তবুও ইহার কর্ম ও ভাষণ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের আদর্শ ও পন্থার সহিত সাদৃশ্য বহন করায় আমাদের কৌতূহল-দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী মাধবপুরের প্রজা-বিদ্রোহের নেতা। রাজার অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে তাহারই পরামর্শে প্রজারা খাজনা বন্ধ করিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে সে অকপটে ইহা স্বীকার করিয়াছে। তাহার মতে প্রজার ক্ষুধার অন্ন রাজার নয়, উদ্বৃত্ত অন্নই রাজার, আর রাজার রাজত্বও একলা রাজার নয়,—অর্ধেক রাজত্ব প্রজার। প্রজারা হাতিয়ার লইয়া রাজদ্বারে যাইতে চাহিলে সে বারণ করিয়াছে, মার খাইলেও উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নায়ক মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ ও কর্মপন্থার সহিত ধনঞ্জয়ের উক্তি ও কর্মের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ধনঞ্জয়ের অকপট সত্যভাষণ, কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য, অহিংসা সংগ্রাম প্রভৃতি পরবর্তী কালের গান্ধীজীর আন্দোলনের মধ্য দিয়া সর্ব-ভারতীয় ব্যাপকতা ও রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। মহাত্মাজী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা passive resistance-আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন এই মতবাদ ও কর্মপন্থা ভারতে প্রচারিত হয় নাই এবং খুব কম লোকই এইরূপ অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস-কল্পনায় তখনই এইরূপ একজন অহিংস,

সত্যাগ্রহী নেতার চিত্র উদিত হইয়াছিল এবং ভাবী দিনের মহাত্মাজী ও তাঁহার আন্দোলনকে তিনি অনেক পূর্বেই খানিকটা রূপায়িত করিয়াছিলেন।

ধনঞ্জয়-চরিত্রের রাজনৈতিক অংশই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ইহার আধ্যাত্মিক অংশও সমভাবে লক্ষ্যের বিষয়। বরং এই আধ্যাত্মিক অংশই রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাকে প্রেরণা দিয়াছে। সে সত্যদ্রষ্টা, ভগবদ্‌ভক্ত, ঐশী অভিপ্রায়ে আস্থাবান, দেহাতীত আত্মায় বিশ্বাসী, ন্যায় ও সত্যের পূজারী। তাই যখনই ন্যায় ও সত্য পদদলিত হইতে দেখিয়াছে, দেখিয়াছে অবিচার ও অত্যাচার, তখনই নির্যাতিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে নিভীকভাবে রাজশক্তির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

'পরিত্রাণ' 'প্রায়শ্চিত্ত' অপেক্ষা কতকটা সংক্ষিপ্ত, সংহত ও কথঞ্চিৎ উন্নত।

গৃহপ্রবেশ

(আশ্বিন, ১৩৩৩)

'গৃহপ্রবেশ'—'শেষের রাত্রি' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের নাট্য-রূপায়ণ। গৃহ-নির্মাণ ও গৃহপ্রবেশের প্রসংগটি গল্পে স্থান পায় নাই; তা ছাড়া, উকিল অখিল ও ডাক্তারকে নূতন করিয়া নাটকে প্রবেশ করানো হইয়াছে। গৃহপ্রবেশ-সমস্যার আনুষঙ্গিক হিসাবে অখিলের অবতারণার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্রেমহীনা পত্নীর ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যে একটি রুগ্ন, মরণপথযাত্রী, প্রেমিক, কবি-প্রাণ, উদার-হৃদয় স্বামীর মানসিক আলোড়ন ও ব্যর্থ প্রেমের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং উদার ক্ষমায় তাহা ভুলিবার জটিল চিত্ত-দ্বন্দ্বই এই নাটিকার বিষয়বস্তু। এই দ্বন্দ্ব একান্তভাবে স্বামী যতীনের চিত্ত-লোকের সামগ্রী। বাহিরের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকাশের দ্বারা নাটকের ঘটনাপুঞ্জকে ইহা প্রভাবান্বিত করে নাই। খণ্ড খণ্ড দুই-একটি সংবাদ বা অনুমানের মারফতে বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় রোগশয্যাশায়ী যতীনের মনে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও তাহার মৃত্যুতে ইহার পরিসমাপ্তি। প্রতারিত হৃদয়ের মিথ্যা সন্তোষ ও সান্ত্বনা বঞ্চিত জীবনের স্তব্ধ বেদনার সহিত মিশিয়া একটি করুণ, অশ্রু-সজল সুর-মূর্ছনায় সমস্ত নাটক-টিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ইহা যেন একটি অনির্বাণ প্রেমদীপের কম্পমান আলো-ছায়ার ক্ষণিক নর্তন, একটি বেদনা-মধুর গীতিকবিতার আবৃত্তি। মাসি আর হিমি নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া একেবারে যতীনের জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়া এই মূল করুণ সুরটির আলাপনের সহায়তা করিয়াছে নানাভাবে। নাটকে তাহাদের কার্য কেবল যতীনের এই সুরোচ্ছ্বাস উৎসারিত করিবার জন্য, একটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিত্ত-দ্বন্দ্বকে ফুটাইবার জন্য। যতীনই একটিমাত্র চরিত্র, যে সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রকাশকে উজ্জ্বল এবং একমাত্র দর্শনীয় বস্তু করিয়াছে।

এইরূপ রচনা গদ্যকাব্য বা কাব্যধর্মী ছোটগল্পেরই উপযুক্ত, নাটকের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ সার্থকতা সম্ভব নয়। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ গল্পটির নাট্যরূপ দিবার সময় গৃহপ্রবেশ-সমস্যাটি জুড়িয়া দিয়া ইহার নাটকীয় সম্ভাবনা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু

তাহাতেও ফল বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গৃহপ্রবেশ-সমস্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব নাটকের কোনো ঘটনার মধ্যে অনুভূত হয় নাই, যতীনের হৃদয়-দ্বন্দ্বেরও কোনো মোড় ফিরায় নাই,—প্রায় নেপথ্যেই সমস্যাটি মাসির দ্বারা সামাধানপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন হইয়া বসিয়া আছে। যে মণিকে কেন্দ্র করিয়া যতীনের চিত্ত-বিক্ষোভ, গৃহপ্রবেশ তাহারই সহিত জড়িত,—তাহারই আনন্দবিধানের দ্বারা যতীনের মনোময় প্রেমের আদর্শকে —প্রেমের স্বপ্নকে সার্থক করিবার একটি উপায়মাত্র; মূলদ্বন্দ্ব-ধারাটি যেমন মণির অভিমুখী, এই গৃহপ্রবেশ-সমস্যাটিও তেমনি মণির সহিতই জড়িত,—মূলধারার অন্যতর উপধারা-রূপে উহার সহিত যুক্ত হইয়া উহাকেই পুষ্ট করিতেছে। প্রাধান্য বা স্বতন্ত্র সার্থকতা কিছুই নাই।

যতীনের মনে ছিল এক প্রেমময়ী, সর্বস্বদানোন্মুখী পত্নীর আদর্শ। সেই নারীকে সে মনোমন্দিরে বসাইয়া পূজা ও ধ্যান করিত। সুন্দরী মণির মধ্যে সে দেখিতে চাহিয়াছিল তাহার সেই আদর্শপত্নীর রূপ, কিন্তু মণি যতীনকে ভালোবাসিতে পারিল না, স্বামিপ্রেমের কোনো অনুভূতিই তাহার অন্তরে জাগিল না। যতীনের প্রেমস্বপ্ন রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া গেল। শেষে স্বপ্নভঙ্গের জন্য মর্মান্তিক বেদনা ও নিদারুণ ব্যাধির নিশ্চিত পরিণাম-সম্ভাবনার জন্য হতাশা, উভয়ে মিলিয়া এক করুণ বৈরাগ্য তাহার মনকে পূর্ণ করিয়া দিল। চির-বিদায়ের পূর্বে বঞ্চিত জীবনে প্রেমহীনা পত্নীর মধ্যেই তাহার স্বপ্ন-সাধ-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা খুঁজিল; মণির সমস্ত তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যকে ক্ষমা দ্বারা, সম্ভাব্য কারণের অনুমান দ্বারা লঘু ও উপেক্ষণীয় করিয়া সেই অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি ও সান্ত্বনা-লাভের চেষ্টা করিল। ছলনা ও মিথ্যার কৌশলে মাসি তাহার এই সান্ত্বনালাভে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। পরিণামে উদার ক্ষমা ও ত্যাগের সঙ্গে মণির মধ্যেই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ রূপায়িত দেখিবার জন্য তাহার শেষ প্রচেষ্টা,—তাই তাহার দ্বিতীয় তাজমহল 'মণি-সৌধ'-নির্মাণের কল্পনা—'গোধূলি-লগ্নে মণির সঙ্গে গৃহপ্রবেশের আয়োজন'—ছায়াকে কায়ার গৌরবদানের প্রয়াস—মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইবার করুণ প্রচেষ্টা। ইহাই যতীনের অন্তর্জীবনের ইতিহাস।

মাসির চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি। যতীন-মণির সম্বন্ধ ও তজ্জনিত যতীনের ভাব-দ্বন্দ্বই এই নাটকের মূলবিষয় হইলেও মাসিই এই দ্বন্দ্বকে ধারণা করিয়া আছে। মাসির বৃন্তেই এই নাট্য-কাহিনীটি ফুটিয়া উঠিয়া দর্শনযোগ্য হইয়াছে। মাসি যেন নদীর নিম্নতলের মৃত্তিকা, তাহার উপরেই নদীর সমস্ত প্রবাহ বিচিত্র খেলা খেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

পুত্রহীনা বিধবা মাসির হাতেই যতীন মানুষ। মাসি তাহার হৃদয়ের সমস্ত সন্তান-বাৎসল্যের বেড়া দ্বারা যতীনকে বাহিরের সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইয়া, নিরন্তর স্নেহ-রসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যতীনের সমস্ত সত্তাটাকে সে যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া, যতীনের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত একেবারে এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যতীনের হৃদয়তারের ঝংকারে সারাক্ষণ তাহার দেহ-মন ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। এমন অনুপম মাতৃ-চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে খুব কম আছে।

মাসির যতখানি হৃদয়-মাধুর্য, বুদ্ধির দীপ্তিও তাহা অপেক্ষা কম নয়,—কর্মক্ষমতাও সমানভাবে বর্তমান। সে মণিকে বুঝাইতেছে, যতীনকে কৌশলে ভুলাইতেছে, প্রতিবেশিনী-দের ঠেকাইতেছে। অখিলের সঙ্গে বাড়ীরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার বুদ্ধি ও কর্ম-

দক্ষতা পরিচালনী শক্তিরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও তাহার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য ও সংযমের ভারসাম্য বিচলিত হয় নাই।

সংসার ও মানবজীবনের মধ্যে তাহার অন্তর্দৃষ্টিও অসাধারণ। মণির বিরূপতা সত্ত্বেও যতীন মণিকে একান্তভাবে ভালোবাসে এবং মণিই প্রকৃতপক্ষে যতীনের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ, তাহা জানিয়াও মাসি মণির উপর রাগ করে নাই বা কটু কথা বলে নাই; বরং মণির এই অস্বাভাবিক ব্যবহার ঢাকিবার জন্য প্রতিবেশিনীদের নিকট, যতীনের নিকট, শত মিথ্যা কথা বলিয়াছে,—কাহারো নিকট তাহার এতটুকু নিন্দা করে নাই। মণির এই নারীচিত্তবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে মাসি সত্যদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছে, এই সত্য তাহার পক্ষে বেদনাদায়ক হইলেও তাহার জন্য বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করে নাই, নিষ্ঠুর ভাগ্যকে স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে।—

হিমি

দেখো মাসি....মনে হয় যেন বিধাতা ওর ওপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। ওর কাছে দুঃখকষ্টের কোনো মানেই নেই।

মাসি

ভগবান ওর বাইরের দিকটা যত্নে গড়তে গিয়ে ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পান নি। তোর দাদার এই বাড়ীর মতো আর কি। খুব ঘটা করে আরম্ভ করেছিল—বাইরের মহল শেষ হোতে হোতেই দেউলে—ভিতরের মহলের ভারা আর নামল না। আজ ওকে কেবলি ভোলাতে হচ্ছে। বাড়ীটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও।

হিমি

বুঝতে পারি নে, এটা কি আমাদের ভালো হচ্ছে।

মাসি

কী জানিস, হিমি। মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না হোক, কী এল গেল। তাই ওকে বলি, একান্ত মনে সংকল্প করেছে যা, সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমি, সেইটেই তো সত্য।

হিমি

বাড়িটা যেন তাই হোলো। কিন্তু বউদিদি?

মাসি

হিমি, তোর বউদিদিকে যিনি সুন্দর করেছেন, তাঁর সংকল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে-মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন যে-মণি, সেইতো কৌস্তুভরত্ন, তার মধ্যে কোথাও কোনো খুঁত নাই। মৃত্যুকালে যতীন সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।

এমন হৃদয়, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও দার্শনিক সত্যদৃষ্টি খুব কম নারীর মধ্যেই দেখা যায়।

মণির চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বোধ হয়। সে ফুলগাছের যত্ন করে, 'জন্তু-জানোয়ার' ভালোবাসে, অথচ স্বামীর প্রতি একেবারে উদাসীন। ইহার কারণ তাহার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

মণি সর্ববন্ধনবিমুখ, চিন্তা-ভাবনা-মুক্ত,—কোনো প্রকারের দায়িত্ব-গ্রহণে পরাঙ্মুখ। জীবনের বিন্দুমাত্র গভীরতা-বর্জিত যে হাল্কা হাওয়া, তাহাতেই তাহার রঙীন ওড়না

উড়াইয়া সে জীবনপথে চলিতে চায়। দায়িত্বহীন, সহজ, সরল, তরল আনন্দ ও উল্লাসের অবকাশ-ক্ষেত্রেই তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার। পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে পড়িলেও সে নগ্ন প্রকৃতির শিশুকন্যা; তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া সে চলিতে পারে না; যে-কাজ বা প্রথা-সংস্কারের মধ্যে সে স্বাভাবিক আনন্দ পায় না, তাহার বন্ধন সে অস্বীকার করে দ্বিধাহীন ভাবে, অকপটে প্রকাশ করে তাহার ভয়, সংকোচ ও বিরক্তি।—

> সন্ধ্যের সময় ঐ ঘরে (যতীনের ঘরে) ঢুকলে কেমন আমার ভয় করতে থাকে...ঐ ঘরেই আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছিল...দিনের বেলাতেও কেমন গা ছমছম করে... মনে হয় উনি অনেক দূর থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এ পৃথিবীতে না।...আমি দিনরাত এই সব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না।...কেবলি ইচ্ছে করছে, ছাড়া পাই কোথাও চলে যাই। মালিসের গন্ধ পেলে মনে হয় বাতাসকে হাসপাতালের ভূতে পেয়েছে...আমাকে তোমাদের বাগানের মালী করে দাও না—সে আমি ঠিক পারব।

স্বামীর মধ্যে সে আনন্দ পাইলে, স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম জন্মিলে, সে হয়তো স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। বিবাহের পর হইতে তাহার মনে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই এবং বহুজনের প্রতীক্ষার প্রতিকূলে সে-মন অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে। এই স্বামী-নিরপেক্ষ, সংসার-নিরপেক্ষ আত্ম-মনের আলো-ছায়ার খেলাতেই মণি মাতিয়া রহিয়াছে। মাসির মিথ্যা সংবাদে মণির মন জাগিয়াছে বলিয়া যতীন উল্লসিত হইলেও, মণির মন আর জাগিল না।

শোধ-বোধ

(১৩৩৩)

'শোধ-বোধ'—'কর্মফল' নামক গল্প হইতে নাটকাকারে রূপায়িত। ঐ গল্পও পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া সংলাপে লেখা,—মাঝে মাঝে কেবল লেখকের এক-আধটু বর্ণনা বা মন্তব্য সংযোজিত মাত্র। নাটকে গল্পের পরিচ্ছেদের অদল-বদল করিয়া দৃশ্যে পরিণত করা হইয়াছে এবং ভাষাও নাটকের উপযোগী করিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে।

সাহেবিয়ানার অনুকরণ-প্রিয়, ফ্যাশন-সর্বস্ব, ইংরেজী-শিক্ষিত, ধনশালী এক সংকীর্ণ সমাজে নরনারীর ভাবাদর্শের সহিত মধ্যবিত্ত, দেশীয়-আদর্শনিষ্ঠ নরনারীর ভাবাদর্শের সংঘাত ও তজ্জনিত বিচিত্র পরিস্থিতিই এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই সংঘাত একটি মিলনান্ত ঘটনায় শেষ হওয়ায় নাটকটি ট্র্যাজি কমেডির আকার ধারণ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই ভ্রষ্ট-আদর্শ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সাধারণ বাঙালী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল। ধন, বিলাতী ডিগ্রীর বিদ্যা ও পদমর্যাদায় তাহারাই ছিল সকলের লক্ষ্যের বিষয়, তাহারাই বিবেচিত হইত সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া। ইহাদের অধিকাংশই ছিল বিলাত-ফেরত হিন্দু বা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের,—সাধারণ মধ্যবিত্ত

বাঙালী সমাজের অনেকে ঐ শ্রেণীর লোকদের রুচি, তাহাদের বিলাস-ছন্দিত জীবন-যাত্রা অতি-মার্জিত আচার-ব্যবহার, শিক্ষিতা ও সুবেশা নারীদের সংকোচহীন চাল-চলন ও আকর্ষণীয় হাবভাব প্রভৃতি দেখিয়া উত্তেজিত কল্পনায় ঐ জীবনাদর্শের প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত এবং ঐ-আদর্শে পৌঁছিয়া জীবন সার্থক করিতে চাহিত। ক্রমে স্বাধীনতা-আন্দোলনে জাতীয় বৈশিষ্ট্য-গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায়, অর্থনৈতিক চাপে এবং অন্যান্য কারণে এই নির্লজ্জ সাহেবিয়ানার আদর্শ বিলয়ের পথে যায়, ঐ জীবনের অন্তঃসারহীন বাহ্য চাকচিক্যের মোহ দূর হয়। বর্তমানে ঐ আদর্শ ও জীবনযাত্রা অতীত ইতিহাসের একটি বস্তুমাত্র হইয়া আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত কৌতূহলের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর এই সাহেবিয়ানার প্রতি চিরদিন বিরূপ ছিলেন। অনেক স্থলেই ইহার বিরুদ্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নাটকেরও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সেই টেনিস-কোর্ট, সেই propose করা, engaged হওয়া, সেই courtship-এর রীতি, সেই birth-dayতে present করা, কৃত্রিম বিনয়পূর্ণ অতি সুললিত আলাপ প্রভৃতি কবির ব্যঙ্গ-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে।

তথাকথিত উচ্চ-জীবনের মোহগ্রস্ত, মিঃ লাহিড়ীর কন্যা নেলীর প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট এবং তাহারই উপযুক্ত হইবার যোগ্যতা-অর্জনের জন্য ভ্রান্ত-পথাবলম্বী, ব্যক্তিত্বহীন যুবক সতীশের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবন-কাহিনী এই নাটকের আখ্যান-ভাগ। সতীশের পিতা মন্মথ ছিলেন ফিরিঙ্গিয়ানার বিরোধী; ছেলেকে তাঁহার অর্থ-সামর্থ অনুযায়ী মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালীজীবনের উপযুক্ত করিয়া লালনপালন করিতে ও শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন তিনি; কিন্তু সতীশের আদর্শ ছিল লাহিড়ীপরিবারের লোকজন,—তাঁহার পুত্র ও কন্যার রুচি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করিত এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া ধন্য হইতে চাহিত। সতীশের এই আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন যোগাইত তাহার মা বিধুমুখী ও মাসী সুকুমারী। তাহারা তাহাকে উপযুক্ত বেশভূষা ও প্রসাধন করিয়া, সাহেবী সুট পরিয়া লাহিড়ী-পরিবারের সহিত মেলামেশা করিতে উৎসাহিত করিত। মাসি নিজে তাহার সুটের পয়সা যোগাইত। শেষে সতীশ নেলীর অন্যতম suitor মিঃ নন্দীর অনুকরণে নেলীর জন্মদিনের উপহার একটা দামী নেকলেস কিনিবার জন্য বাপের লোহার সিন্ধুক খুলিয়া সোনার গড়গড়া চুরি করিল। বিধুমুখী চুরি ঢাকিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও শেষে ধরা পড়িয়া গেল। সতীশের মেসোমশায় শশধরের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু মন্মথ ছেলেকে ভালো করিয়া চিনিলেন। হঠাৎ মন্মথের হইল মৃত্যু: মৃত্যুর পরে তাঁহার উইলে দেখা গেল—তিনি সতীশকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অনাথাশ্রমে দান করিয়া গিয়াছেন, কেবল স্ত্রীর জন্য মাসিক পঁচাত্তর টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। নিঃসন্তান, বিত্তশালী মেসোমশায় ও মাসি সতীশকে পোষ্যপুত্র লইতে চাহিয়াছিলেন, এখন সে মাসির বাড়ীতেই গিয়া রহিল। কিন্তু সতীশের দুর্ভাগ্য, শীঘ্রই মাসির এক পুত্র জন্মিল। তাহার পর হইতেই সতীশের উপর মাসির ব্যবহার হইল পরিবর্তিত, সতীশকে তাড়াইবার জন্য সে খুঁজিতে লাগিল নানা ছল। চলিল শ্লেষ ও কটূক্তি-বর্ষণ। অবশেষে শশধর তাঁহার বড়সাহেবকে ধরিয়া অফিসে সতীশের একটা ভালো চাকুরি করিয়া দিলেন। কিন্তু মাসির কটূক্তিতে সে মর্মাহত হইয়া আফিসের তহবিল ভাঙিয়া মাসির দেনাশোধ করিল। এদিকে তহবিল ভাঙাতে তাহার অনিবার্য জেলের সম্ভাবনা। জেলে যাওয়ার লজ্জা হইতে বাঁচিবার জন্য সে আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিল। সে একটা

পিস্তল সংগ্রহ করিয়া শশধরের বাগানের মধ্যে ঢুকিল। সামনেই দেখিল শশধরের ছেলে, তাহাকেই মারিবার জন্য উদ্যত হইল। পরক্ষণেই তাহার মত পরিবর্তন করিয়া সে জেলেই যাইবে ঠিক করিল। সতীশ আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াই নলিনীর নিকট প্রথম হইতে তাহার সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল। সেই সময় নলিনী আসিয়া উপস্থিত। সে তাহার সমস্ত গহনা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তাহাই সতীশের হাতে দিয়া বলিল, 'এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না?' শশধর নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় উদ্ধার হবে; এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েছ, তা দিয়েই সতীশ উদ্ধার হবে।' সতীশ উদ্ধার পাইল ও উভয়ে মিলিত হইল।

সতীশের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা তাহার ব্যক্তিত্বহীনতা ও নির্বুদ্ধিতা। কোনো অবস্থাতেই সে নিজেকে আয়ত্তে আনিবার জন্য আত্মশক্তির অনুশীলন করিতে শিখে নাই—কোনো পরিস্থিতিতেই নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে জানে নাই। সম্মুখের যে-পথ তাহার তখনকার প্রবৃত্তিতে ভালো লাগিয়াছে, তাহাই সে অনুসরণ করিয়াছে। সে বোঝে নাই পিতার বিরূপতার অর্থ—বোঝে নাই নলিনীর কথা ও ইঙ্গিতের তাৎপর্য। কোথাও সে তাহার নিজের অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই। কিন্তু আসলে যে-ধাতুতে সে গড়া, তাহার মধ্যে বিশেষ ভেজাল নাই,—কোনো নীচতা বা দুরভিসন্ধি তাহার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। তাই নিদারুণ আঘাতে তাহার নিজস্ব সত্তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল,—জাগিয়াছিল তাহার সুপ্ত পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব। তাহার মা ও মাসির সর্বনাশা স্নেহের স্বরূপ সে বুঝিয়াছিল; মেসোমশায়ের তালুক সে দানস্বরূপ লইতে অস্বীকার করিয়াছে; বলিয়াছে, 'নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই ভোগ করবো।' শেষে আত্মগ্লানির তাড়নায় সে মাসির অন্নঋণ শোধ করিতে অগ্রসর হইয়া বিপজ্জনক তহবিল-তছরুপ পর্যন্ত করিয়াছে। তাহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে নলিনীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নলিনী মানুষটাকে চিনিয়াছিল, আর বুঝিয়াছিল তাহার ভালোবাসার স্বরূপ। তাই সে তাহার ভালোবাসার ন্যায্য মূল্য দিতে ত্রুটি করে নাই।

নলিনীর চরিত্রটি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। সে প্রখরবুদ্ধিশালিনী, ব্যক্তিত্বশালিনী এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসিনী। সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহা কাটাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। সাহেবিয়ানার কৃত্রিম আব-হাওয়ার মধ্যে মানুষ হইলেও সে উহার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট সচেতন। মা ও বাপের অস্বাভাবিক আপত্তি ও নির্দেশ সে স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে এড়াইয়া গিয়াছে। কাপড় পরিয়াই মিঃ বরুণ নন্দীর বেয়ারার নিকট হইতে চিঠি লইয়াছিল বলিয়া মিসেস তাহার অন্যায় হইয়াছে বলিলে সে উত্তর দিয়াছিল,—'বেহারা হয়ে জন্মেছে বলেই কী এত শাস্তি দিতে হবে? বেচারা মনিব-বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুশি হ'লো যে বকশিশ চাইতে ভুলে গেলো।' আবার মিঃ লাহিড়ী যখন সতীশের সম্বন্ধে বলিলেন,—

> "ওকে নিয়ে এক এক সময় ভারি awkward হয়...সে দিন চা পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিলো যে তার মচ্‌মচ্‌ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে...তা ছাড়া তার ট্রাউজারগুলো...যেদিন বরুণরা আসবে, সে দিন বরঞ্চ ওকে..."

নলিনী। ভয় কী, বাবা, সেদিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধুতি পরে আসতে বলবো, আর দিল্লির জুতো, সে মচ্‌মচ্‌ করবে না।

লাহিড়ী। ধুতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভাল।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। সতীশকে যেমন সে নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিয়াছে, মিঃ নন্দীকেও তাহার কৃত্রিমতা ও ন্যাকামির জন্য ব্যঙ্গ করিয়াছে। সর্বত্রই তাহার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিয়াছে।

স্বল্পপরিসরের মধ্যে শশধরের চরিত্রটিও ফুটিয়াছে চমৎকার। সতীশের বিপথ-গমনের জন্য তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী যে দায়ী, একথা তিনি ভোলেন নাই। তাঁহাদের কৃত-কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সতীশকে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাটকীয় ধর্মের দিক হইতে বিচারে নাটকটি অনেকটা শিথিলবন্ধ ও অগভীর,—যেন বর্ণনামূলক, চিত্রধর্মী সংলাপের সমষ্টিমাত্র,—অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর ও জীবনাবেগে তরঙ্গায়িত নয়। সেই জন্য ইহার রঙ অনেকটা ফিকে এবং রসও গাঢ় নয়। শেষের দিকে সতীশের পিস্তল লইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা ও পরক্ষণেই হরেনকে হত্যা করিতে উদ্যত হওয়া এবং পরমুহূর্তেই শশধরের নিকট পিস্তল-সমর্পণ-ব্যাপারটি অস্বাভাবিক, অবান্তর এবং একটা কৃত্রিম রোমাঞ্চসৃষ্টির জন্যই সংযোজিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক এই স্থানটিই নাটকের সবচেয়ে দুর্বল অংশ।

নটীর পূজা

(১৩৩৩)

'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিণী' নামে একটি কবিতা এই নাটিকার ক্ষীণ ভিত্তি। ঐ কবিতাটিও অবদানশতকের একটি কাহিনী-অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এই নাটকে কবি যে-চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন ও নাটকীয় পরিবেশ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা একেবারে নূতন পরিকল্পনার একখানি নাটকে পরিণত হইয়াছে।

"১৩৩৩ সালের ২৫শে বৈশাখ সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নটীর পূজা প্রথম অভিনীত হয়।...প্রথম অভিনয়ে উপালি-চরিত্র ছিল না, উপালি-চরিত্র-সংবলিত 'সূচনা' অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সময় ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ই মাঘ কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়, উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। নটীর পূজার সূচনা অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হয়।" (গ্রন্থপরিশিষ্ট)

নাটক হিসাবে এই ক্ষুদ্র নাটকটি সার্থক রচনা। একটি ঐতিহাসিক ধর্মবিরোধের আবহাওয়া-সৃষ্টিতে, ঘটনার দ্রুতগতিতে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সম্মিলিত রূপাভিব্যক্তিতে, আবেগময়, পরিমিত, ব্যঞ্জনামুখর ভাষণে, বাস্তব জীবনচেতনার মায়া-সৃষ্টিতে এই নাটকটি সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রাচীন আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্মের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় চরিত্রগুলি আবর্তিত ও বিবর্তিত হইলেও এই দ্বন্দ্বের কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনা নাটকে সংঘটিত হয় নাই;—বিম্বিসার ও অজাতশত্রু নাটকের বাহিরে আছেন। কেবল ঐ দ্বন্দ্বের প্রভাবটি মাত্র নাটকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়াছে,—নটীর হত্যাও এই প্রভাবেরই ফল। নাটকের ঘটনার স্থান রাজপ্রাসাদ; রাজ-অন্তঃপুরিকাগণ নূতন ধর্মকে নিজ নিজ জ্ঞান, বিশ্বাস ও অনুভূতি দিয়া যে যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই চরিত্রগত অনুভূতি ও আদর্শই নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্ত হইয়া নাটকের পরিণাম পর্যন্ত ধাবিত হইয়াছে। এই নবধর্মের আদর্শ ও প্রভাব মহারানী লোকেশ্বরীর মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে এক অতি জটিল চিত্ত-দ্বন্দ্ব; শ্রীমতীর মধ্যে এ-আদর্শ জ্বলিতেছে একটি উজ্জ্বল, অকম্পিত দীপশিখার মতো; মালতীর মধ্যে এ-আদর্শ আবির্ভূত হইয়াছে ব্যর্থ প্রেম-বেদনার শেষ-সান্ত্বনাস্বরূপ; রাজকুমারী রত্নাবলী প্রভৃতির নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছে অভিজাত-মর্যাদা-ধ্বংসকারী, নীচজাতি-প্রাধান্যদায়ক, রাজধর্মনষ্টকারী ভিক্ষু-ধর্মরূপে।

নাট্যশিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে রানী লোকেশ্বরীর চরিত্র রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়। নারী-হৃদয়ের এমন বাস্তবমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র রবীন্দ্র-নাট্যে খুব কম আছে। নটীর অবিচলিত ভক্তি ও আত্মত্যাগই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রানীর ভাব-তরঙ্গের বিচিত্র উত্থান-পতন ও গর্জনে নটীর একটানা সুর আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নাটকীয় রসের দিক হইতে এই চরিত্রটিই হইয়াছে বেশি উপভোগ্য।

রানীর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে,—একটি নবধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ—গুরুধর্ম তথাগতের ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শ ও প্রভাব, অপরটি স্বামিপুত্র-সমন্বিতা রাজমহিষীর জীবনের আদর্শ; একটি উপাসিকার ভক্তিনম্র আত্মদান, অপরটি সুখসৌভাগ্যবতী ক্ষত্রিয়-নারীর জীবন-চর্চা; একটি ত্যাগ-ধর্ম, অপরটি চিরন্তন নারী-ধর্ম।

রানী চিরন্তন নারীধর্মের আদর্শ অনুসারেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—পতি-পুত্র-পরিবেষ্টিতা নারীর যে-সংসারধর্ম, তাহারই অঙ্গস্বরূপ। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই নবধর্ম গ্রহণ করিলে, ধর্ম-গুরুকে ভক্তি করিলে, গুরুর কৃপায় তাঁহার সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্য অটুট থাকিবে, জীবন হইবে পরিপূর্ণ—সুখে, ঐশ্বর্যে, সরল ভক্তির আনন্দে। এই নবধর্ম যে সর্বস্বত্যাগের ধর্ম, সংসারবিমুখতার ধর্ম, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই; এই ধর্মের মধ্যে তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, ইহাকেই হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তারপর, যখন তাঁহার স্বামী এই ধর্মের প্রেরণায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, একমাত্র পুত্র ভিক্ষু হইয়া সংসার ছাড়িল, তখনই তিনি এই ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন;—এই ধর্মের প্রতি জন্মিল তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা ও আক্রোশ। কিন্তু এই ধর্মের প্রভাব তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহার প্রতি একটা নিগূঢ় আসক্তি তাঁহার মনোজীবনের অংশস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল; তাই মুখে ইহার প্রতি বিরুদ্ধতা করিলেও অজানিতে অন্তরের মধ্যে ইহার আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। নটীর নাচে তিনি প্রথমে বাধা দিয়াছিলেন, তাহাকে বিষ খাইতে দিয়াছিলেন, শেষে তাহার নাচে আত্ম-দানের চরম রূপ দেখিয়া ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; মৃত্যুর পর শ্রীমতীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, 'নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি'।...

এ আমার।' রানীর চিত্ত-দ্বন্দ্বের শেষ পরিণামে নবধর্মেরই জয় হইল। বাহির হইল তাঁহার সত্যকার স্বরূপ।

রানীর উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলে তাঁহার চিত্ত-দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি আরও সুস্পষ্ট হইবে,—

> ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, একশ' ভিক্ষু-কে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্ম-বৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। শেষে এই পুরস্কার আমারই...আমি আজ স্বামীতত্ত্বে বিধবা, পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা...আমি চাই অন্য স্বপ্ন, যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান...যারা এই ধর্ম কোনোদিন মানে নি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে।...ওরা তো বুদ্ধকে মানেনি, শাক্যসিংহের দয়া ওদের উপর পড়েনি, তাই বেঁচে গেল ওরা, বেঁচে গেল ওরা... সেই নমঃ পরমশান্তায় মহাকারুণিকায়—এ-মন্ত্র আর নয়। আমার মন্ত্র নমো বজ্র-ক্রোধডাকিন্যৈ নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে পড়বে...হায় রে রক্তমাংস! হায় রে অনন্ত ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা। রক্তমাংসের তপস্যা এদের শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম...দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে...এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কেউ স্বীকার কোরো না।

আবার শ্রীমতীর 'মহাকারুণিকো নাথো'-আবৃত্তি শুনিয়া অভ্যাসবশে অজানিতে নিজেও একটু আবৃত্তি করিয়া হঠাৎ বলিলেন,—'হয়েছে, হয়েছে, থাক্ আর নয়। নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ।' পরক্ষণেই যখন অনুচরী আসিয়া সংবাদ দিল, 'রাজকুমার চিত্ত এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে,' তখনই বলিয়া উঠিলেন,—

> কে বলে ধর্ম মিথ্যা। পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাস-হীনারা, তোরা আমার দুঃখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো, তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায়। এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

আবার যখন বৌদ্ধধর্মবিরোধী দেবদত্তের দল উদ্যানের প্রাচীর ভাঙিতে লাগিল ও 'নমঃ পিণাকহস্তায়' 'জয় জয় করালী' শব্দে বিদীর্ণ হইতে লাগিল আকাশ, তখন রানী বলিতেছেন,—

> দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলাম তখনো তাকে মনে মনে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে আসনে আমার সেই পরম নির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি, তাঁর সেই আসনেই দেব-দত্তকে ডেকে আনব!

(জানু পাতিয়া)

ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো।

(উঠিয়া)

ভয় নেই মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে সে ভিতরেই থাকে, বাইরে আছে নিষ্ঠুরতা, আছে, রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসিগে, যখন ধুলোর সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো।

নাটকের শেষে তাঁহার দ্বন্দ্বের অবসান হইল। ভিক্ষুণীর বস্ত্র তিনি গ্রহণ করিলেন।

শ্রীমতীর চরিত্রে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংকোচ-সংশয় নাই। একটি মাত্র মূর্তিই তাহার শান্ত-স্নিগ্ধ ভক্তির মাধুর্যে, ধ্যানলোকের নির্লিপ্ততায়, আত্মনিবেদনের বিনম্র গাম্ভীর্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, দেদীপ্যমান। রাজকুমারী-দের বিদ্রূপ, রক্ষিণীদের সতর্কবাণী তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নাই—ঘটাইতে পারে নাই তাহার চরিত্রের অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন। ঊষার ভিক্ষু উপালির মুখে শুনিয়া-ছিল তাহার নিকট হইতে ভগবানের দান-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, সন্ধ্যায় সেই আত্মদানস্বরূপ ফুল উৎসর্গ করিল সে ভগবানের পূজায়।

চণ্ডালিকা

(১৩৪০)

'চণ্ডালিকা'র বিষয়বস্তুর পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই দেওয়া যাইতে পারে,—

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুল কর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকাটির গল্পটি গৃহীত। গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথ পিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি—কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হোলো। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার যাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্ক ফুল সেই আগুনে ফেলল। আনন্দ এই যাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হোলো। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণ-বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।" (সূচনা)

এই মূলকথাবস্তুকে রবীন্দ্রনাথ কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ-এর কুহকজাল-মুক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবার কথাটি নাটকে নাই। মায়া-দর্পণের মধ্য দিয়া আনন্দের অবস্থান ও মানসিক অবস্থাপর্যবেক্ষণ কবির নিজস্ব অবতারণা।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইতেছে গল্পের মূলসুরটির—আসল প্রকৃতির উন্নয়ন। চণ্ডাল-কন্যা শুধু স্থূল লালসার তাড়নায় আনন্দকে পাইতে চাহে নাই; চাহিয়াছে তাহার নবজন্মদাতার, তাহার নূতন মনুষ্যত্বচেতনার উদ্বোধকের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবার অধিকার লাভ করিতে—তাহার জীবনকে সার্থক করিতে।

চণ্ডালজাতি সকলের অস্পৃশ্য—সমাজের নিম্নস্তরে তাহাদের স্থান। কেহ তাহাদের ছোঁয়া জল খায় না, সমাজের কোনো কাজে মনুষ্যোচিত অধিকার নাই তাহাদের। এমন অবস্থায় দীপ্তগৌরকান্তি এক বৌদ্ধভিক্ষু তাহার নিকট চাহিল পানীয় জল, চণ্ডাল-পরিচয়েও নিরস্ত না হইয়া পান করিল সেই জল। এই অভূতপূর্ব ঘটনা চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির জীবনে আনিয়াছে এক যুগান্তর।

প্রকৃতি

> ...মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে...সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীতবসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলুম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললুম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে-মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থ-জল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডূষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।...
>
> কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হোলো সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।
>
> ...একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। সেই মহাপুণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হোলো পূর্ণ, সে-জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলে স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিল গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত—দাও জল, দাও জল।...
>
> আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এত বড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

নবজাগ্রত মানব-অধিকার-বোধে সদ্য-সচেতন প্রকৃতি বুঝিয়াছিল যে, সে ঘৃণ্য নয়, বুঝিয়াছিল সমাজ তাহার পক্ষে যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছে, তাহা সত্য নয়,—জগতের সকলের সেবার অধিকার তাহারও আছে। তাই এই বোধ-জাগ্রতকারী দেবতার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব-গ্রহণে তাঁহার সেবার অধিকার-লাভ, এবং তৎসঙ্গে সর্বজাতির সেবার অধিকার-লাভই ছিল প্রকৃতির আন্তরিক কামনা।

সে অবিলম্বে আনন্দকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল, কারণ এ-মর্যাদা এতোদিন অন্য লোক তাহাকে দেয় নাই। আনন্দই সর্বপ্রথম তাহাকে এ-মর্যাদা দিয়াছে।

তাহার ভয় ছিল—'আবার নেমে যাবার', 'আবার আঁধার কোঠায় ডুববার',—ভয় ছিল পাছে অন্য কেহ আসিয়া তাহার অক্ষমতা বুঝাইয়া দেয়।

কিন্তু কী উপায়ে তাহাকে লাভ করিবে সে? সে সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, কবে আবার তাঁহার দর্শন লাভ হইবে? তাই মাতৃ-আয়ত্ত মহাশক্তির সাহায্যে তাহাকে অবিলম্বে পাইতে চাহিয়াছিল। অবশ্য মায়ের ক্রিয়া আনন্দ-এর চিত্তে স্থূল ভোগলালসাকে উদ্দীপ্ত করিয়াই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল অন্য প্রকারের। সংযম ও ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ম্লান, বেদনার্ত আনন্দ-এর মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ উপস্থিত হইলে প্রকৃতির সর্বরিক্ত আত্মসমর্পণ;—

> প্রভু এসেছে আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এই দুঃখই পেলে—ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে—নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে। ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে—সার্থক হবে সেই ধুলোলাগা। আমার মায়া-আবরণ খসে পড়বে তোমার পায়ে—ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক্ তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক্।

'চণ্ডালিকা'র মধ্যে নাটকীয়ত্বের বিশেষ অভাব—বাহিরের কোনো ঘটনা ইহাতে প্রবেশ করে নাই। মূলধারাটি দুইটিমাত্র ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যেই আবদ্ধ। শেষদৃশ্যের শেষে কেবল আনন্দ প্রবেশ করিয়া একটি বুদ্ধ-স্তোত্র আবৃত্তি করিয়াছে। প্রকৃতির মনে মাঝে-মাঝে একটা দ্বন্দ্ব আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যেই ফুটিয়াছে, মনের মধ্যেই ঝরিয়াছে—সেগুলি তাহার স্বগতোক্তিবিশেষ। সে-দ্বন্দ্বের প্রভাব নাটকের কোনো ঘটনায় প্রতিফলিত হয় নাই।

মায়ের মায়া-মুকুরে চণ্ডালকন্যা যে-মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, লেলিহান অগ্নিশিখা প্রভৃতি বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াছিল, সেইগুলি আনন্দ-এর বিভিন্ন মনোভাবের প্রতীক। আনন্দ-এর মধ্যে চলিতেছিল ব্রহ্মচর্য ও যৌন-আকাঙ্ক্ষার যুদ্ধ,—যে-যুদ্ধ নিবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির। এই যুদ্ধে তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে আয়নার মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্যের সংকেতে।

বাঁশরী

(১৩৪০)

একটি বিশিষ্ট সমাজের পট-ভূমিকায় নর-নারীর ভাব-চিন্তা ও জীবন-সমস্যার রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এই নাটকখানিতে। তাহাতে ইহাকে সামাজিক নাটক আখ্যা দেওয়া যায়।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত, আধুনিক ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজের গুটিকয়েক নরনারীর জীবনে যে-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে যে-চিত্তদ্বন্দ্বের, তাহাদের

প্রকৃতি ও ভাবাদর্শের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে যে-সংঘাত—তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে এই 'বাঁশরী' নাটকে।

নাটকীয় গুণ ও কলা-কোশলের দিক দিয়া নাটকটিকে বিশেষ সমৃদ্ধ বলা চলে না। জীবন-রসের যে-স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্ব নাটকের প্রাণ, যে-জীবন্ত হৃদয়ের লীলা নাটকের শ্রেষ্ঠ আবেদন, ইহার মধ্যে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। নাটকের দুইটি প্রধান পুরুষ-চরিত্র যেন কোনো নূতন দেশ বা বহু শতাব্দী দূর হইতে এই নাটকের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে; ইহারা যেন সেই সমাজের আত্ম-সচেতন পারিপার্শ্বিক-সচেতন মানুষ নয়; একজন অভিনব তত্ত্ব ও কর্ম-পথের নির্দেশ দিতেছে, আর একজন অভিভূতের মতো নির্বিচারে তাহাই পালন করিতেছে; একজন জীবনাবেগবর্জিত পাষাণমূর্তি—অপরজন ব্যক্তিত্বহীন, বৈশিষ্ট্যহীন ছায়া-মূর্তি। ইহাদের মত ও পথ বাহিরের আমদানী বস্তু, এই সমাজের নরনারীর জীবন-ধর্ম হইতে উদ্ভূত নয়, অথচ ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার চারিদিকে অন্যান্য চরিত্র ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, তর্ক করিতেছে, চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। অন্যতম স্ত্রী-চরিত্র সুষমাকে অপরের আদেশপালনের যন্ত্রস্বরূপই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বোধ ও চিত্তের উপর সে কোনই রেখাপাত করে না। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের মধ্যেও কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না—সকলেই একই শ্রেণীর জীবন-যাত্রার মামুলী সুরে বাঁধা।

আধুনিক বাস্তববাদী কথা-সাহিত্যিক ক্ষিতীশ নাটকের মূল ঘটনা-প্রবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়; নাট্য-ঘটনার পক্ষে সে একরূপ প্রয়োজনহীন—অবান্তর। কিন্তু নাটকের পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঁশরীর হৃদয় ও মনের স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টির সে প্রদর্শনীক্ষেত্র; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই বাঁশরীর চিত্তদ্বন্দ্বের নিগূঢ় স্বরূপ, তাহার চিন্তা ও অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে। বাঁশরী-চরিত্রের সুষ্ঠু অভিব্যক্তির জন্য ক্ষিতীশের প্রয়োজন এবং নাটকের দিক হইতে ইহা একটা বিশেষ শিল্পগত প্রয়োজন। এই ব্যক্তিটিকে সৃষ্টি না করিলে বাঁশরীর বাঁশরী তীক্ষ্ণ তীব্র সুরধ্বনি নাট্যাকাশ বিদীর্ণ করিতে পারিত না এবং নাট্যকারও তরুণ বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁহার একটি বিশিষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

এই নাটকের একটিমাত্রই চরিত্র, যে একাই সঞ্চার করিয়াছে নাটকের মধ্যে যাহা-কিছু গতিবেগ, যাহা-কিছু নাটকীয়ত্ব—সে হইতেছে বাঁশরী সরকার। তাহার প্রচণ্ড চিত্তবিক্ষোভ বজ্র-বিদ্যুৎ-গর্ভ বৈশাখী ঝড়ের মতো নাটকের মধ্যে হু হু করিয়া প্রবাহিত হইয়া, নিশ্চল বস্তুপুঞ্জকে ওলট-পালট করিয়া, অন্যের মত ও আদর্শের উপর বজ্রনিক্ষেপ করিয়া, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিদ্যুৎ-চমকে চারিদিক সচকিত করিযা শেষে নাটকের দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে একটা বলীয়মান দীর্ঘশ্বাসের মতো। সমস্ত নাটকটি কম্পিত ও আবর্তিত হইয়াছে তাহার হৃদয়ের দুরন্ত ঝটিকায়। বাস্তবিক নাটকের 'বাঁশরী' নামকরণ সার্থক হইয়াছে। বাঁশরীই এই নাটক, এই নাটকই বাঁশরী।

এখন নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। এই নাটকের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপঃ—

বাঁশরী সরকার 'বিলিতি ইউনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে।' বিশেষ সুন্দরী না হইলেও 'তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুত-শক্তিতে সমুজ্জ্বল, আর আকৃতিটাতে শান্-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য।' রাজপুতনার শম্ভুগড়রাজ্যের রাজকুমার সোমশঙ্কর সিং কলিকাতায় আসে কলেজে

পড়িবার জন্য। চেহারা তখন তাহার 'খাঁটি মধ্যযুগের; ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কংকণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা বাঁকা।' বাঁশরীর সংগে হইল আলাপ-পরিচয়, মেলামেশা ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। বাঁশরীর হাতে পড়িয়া তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব সব গেল বদলাইয়া—রূপান্তরিত হইল সে 'মডার্ণ সংস্করণে'। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইতে উন্মেষ হইল প্রেম, উভয়ে উভয়কে ভালোবাসিল গভীরভাবে। তারপর যখন বিবাহের সব ঠিক ঠাক, তখনই খবর পাইয়া সোমশংকরের বাবা প্রভুশংকর তাহাকে লইলেন সরাইয়া। এই সময় পুরন্দর নামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। 'তাহার পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না, কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায় কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে, কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল।' সে গল্‌ফ খেলা শেখায়, গ্রেট্ ইস্টারন্ হোটেলে ডাক্তার উইলকক্সকে পড়ায় যোগ-বাশিষ্ঠ, কখনো যোগ দেয় পোলো খেলার টুর্নামেণ্টে, কখনো রোশেনাবাদের নবাবের অনুরোধে পরে তুর্কী বাদশার সাজ। তাহার প্রধান কাজ কলেজের ভালো ভালো ছাত্রীকে আপন ইচ্ছায় বিনা মাহিয়ানায় পড়ানো। সুষমা সেন এইরূপ একটি ভালো ছাত্রী। পুরন্দর তাহাকে পড়াইত। সুষমা তাহাকে ভক্তি করিত। ক্রমে ভক্তি পরিণত হইল গভীর ভালোবাসায়।

এদিকে সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়বংশ, ইহা প্রমাণ করিয়া সন্ন্যাসী এক বই লিখিল সংস্কৃতে। কাশীর দ্রাবিড়ী পণ্ডিত-সমাজ তাহার সমর্থন করিল। সেই বই লইয়া সে চলিয়া গেল সোমশংকরের পিতার রাজ্যে; সেখানে তাহার চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে রাজা-বাহাদুরকে মুগ্ধ করিয়া সোমশংকরের সহিত সুষমার বিবাহ স্থির করিল। সন্ন্যাসী একস্থানে তরুণ-তাপস-সংঘ নামে এক সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেখানে তাহার আদর্শের অনুযায়ী প্রবৃত্তিমুক্ত নিষ্কাম দম্পতি কর্ম-সাধনা করিবে। ইহাই তাহার ব্রত। তাহার সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য সে সোমশংকর ও সুষমাকে সেইরূপ দম্পতি-রূপে বাছিয়া লইল এবং তাহাদের বিবাহ ঘটাইল। সোমশংকর ভালোবাসে বাঁশরীকে, বিবাহ করিল সুষমাকে; সুষমা ভালোবাসে পুরন্দরকে, বিবাহ করিল সোমশংকরকে। বাঁশরী সোমশংকরকে ও সোমশংকর বাঁশরীকে ভালোবাসিয়াও বিবাহ করিতে পারিল না।

বাহিরের দিক হইতে কাঠামোটি সামাজিক নাটকের হইলেও এই নাটকের মর্ম-মূলে আছে একটি তত্ত্ব—একটি সমস্যার ইংগিত। এই সমস্যাটি কেবল সমাজজীবনের বিশেষ সমস্যা নয়; ইহা নরনারীর সম্বন্ধের চিরন্তন সমস্যা, বরং বলা যায় ইহা রবীন্দ্র-মানস-জীবনেরই সমস্যা। প্রেম সম্বন্ধে কবির যে-ভাবাদর্শ, প্রেম ও বিবাহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে কবির যে-মনোভাব, যে-দৃঢ় প্রত্যয় তাহাই কবি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন একটি সমাজের পটভূমিকায় এই সব নরনারীর মাধ্যমে।

এই সংগে কবি-চিত্তের আরও একটি ভাব-গ্রন্থিও উন্মোচিত হইয়াছে এই নাটকে। সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিকদের বহু-বিঘোষিত বস্তুনিষ্ঠতার বা রিয়ালিজম্-এর যে-স্বরূপ কবির দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাও বাঁশরীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ সঙিন-খোঁচায় বিদ্ধ হইয়া ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এখন এই ভাবগত, তত্ত্বমূলক সমস্যাটির স্বরূপ কবিচিত্তের ক্রমবিবর্তন-অনুসারে আলোচনার যোগ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, তরুণ যৌবনেই কবি প্রেমের একটা দেহনিরপেক্ষ, অনির্বচনীয়, ভাবময় সত্তাকে প্রেমের আদর্শ

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শগত প্রেম অসীম, অনন্ত, মানবিক ভোগ-কামনার ঊর্ধ্বে, মানবাত্মার চিরন্তন সম্পদ। কিন্তু প্রেমের বাস্তব প্রকাশ তো নরনারীর জীবনে, ইহার অস্তিত্ব তো তাহাদের দেহমনের সম্পর্কের মধ্যে, ইহার রূপবৈচিত্র্য তো তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া। তাই লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সেই ভাবগত রোমাণ্টিক-মিস্টিক প্রেম ও নরনারীর বাস্তব প্রেমের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন কবি বারে বারে। এই অসীম প্রেমকে কবি দেহভোগের মধ্যে আবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন—দেহের ঊর্ধ্বে উঠিয়া কেবল একটা ভাবরস, আনন্দরস উপভোগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কবির ভয়, পাছে দেহমিলনে এই প্রেম তাহার আদর্শচ্যুত হয়, তাহার অনির্বচনীয় মাধুর্যটি নষ্ট হয়। 'কড়ি ও কোমল' হইতেই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

এইটি কবি-চিত্তের প্রথম যুগের সমস্যা। প্রেমকে কেবল দেহভোগ-সর্বস্ব করিলে—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলার মধ্যে আবদ্ধ করিলে, তাহার অসীম ও অনির্বচনীয় স্বরূপকে উপলব্ধি করা যাইবে না—এই যুগে ইহাই কবির মত। এই প্রেমকে মুক্ত করা যায় কিরূপে? প্রেমকে পুত্রকন্যাশোভিত গৃহে গৃহিণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া। কেবল প্রণয়িনীর মধ্যেই প্রেম সার্থক নয়—প্রণয়িণী গৃহিণীতে পরিবর্তিত হইলেই প্রেমের সার্থকতা। এই যুগের এই সমস্যা ও ইহার সমাধান দেখি 'চিত্রাঙ্গদা'য়। সেখানে প্রণয়িনীর রসলীলাকে, তাহার রসমাধুর্যকে তিনি একটি বিশেষ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু একান্ত ভোগের দ্বারা আবদ্ধ করিলে যে পরিণামে প্রেমের অসীম ও অনির্বচনীয় সত্তাটিকে নষ্ট করা হয়, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন কবি প্রেমকে গৃহের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া; সন্তান-বাৎসল্যের অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া প্রেমের অনির্বচনীয় সত্তাকে কবি মুক্তিদান করিয়াছেন। প্রণয়িনী ও গৃহিণীর মিলনেই এই প্রেম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এইভাবে কবি প্রণয়িনী ও গৃহিণীর সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—'কোনো গৃহ নাই প্রিয়ে?' চিত্রাঙ্গদা বলিয়াছে,—তাহার 'নামধামগৃহগোত্র' কিছুই নাই। সে কেবল,—'একটি শিশিরের কণা', 'মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের, তরঙ্গের গতি'। অর্জুন বলিয়াছে,—'তাহারে যে ভালোবাসে, অভাগা সে।'

কবি এখানে গৃহকেই—বিবাহকেই প্রেমের সার্থকতার উপায়স্বরূপ মনে করিয়াছেন। গৃহ প্রেমকে সীমাবদ্ধ করে নাই, বরং ভোগলালসার গণ্ডি হইতে মুক্তি দিয়াছে। বিবাহের পর সন্তানলাভের দ্বারাই প্রেমের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে—গৃহিণীতেই প্রেমের সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অবশ্যই প্রণয়িনীকে সর্বপ্রথম প্রয়োজন—ইহা 'ফুল'; বিবাহ ও সন্তানলাভ 'ফল'। এইভাবে কবি প্রেম ও গৃহের—প্রণয়িণী ও গৃহিণীর—ফুল ও ফলের সমস্যা সমাধান করিয়াছেন। কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব'-এর মধ্যে কবি এই আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন। (চিত্রাঙ্গদার আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

'ক্ষণিকা'য় কবি কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে বলিয়াছেন,—'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি আছে তোমার তরে।' এই মনোভাব কবির মানস-জীবনে বহুদিন পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

দীর্ঘদিনের পর কবি এই প্রেম ও বিবাহ-সমস্যাকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিয়াছেন। এবার তিনি বিপরীত মতবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কবির ধারণা, এই অসীম, অনির্বচনীয় ভাবময় প্রেম গৃহপ্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে তাহার স্বরূপ

অপরিবর্তিত থাকে না; প্রণয়িনী গৃহিণী হইলে, প্রতিদিবসের সংসারচক্রের ধূলি-কর্দমে তাহার মনোহর রসমাধুর্য,—তাহার ভাবলোকের লীলা-সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়। প্রেম থাকিবে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ধূলিধূসর দিক্‌চক্রবালের ঊর্ধ্বে মায়াময় স্বপ্নলোকে, নিবিড় ধ্যানলোকে, দুর্লভ অপ্রাপ্য বস্তুর মতো; সেখান হইতে তাহার অদৃশ্য রশ্মিসম্পাতে আলোকিত করিবে প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্ত, দিবে অনির্বচনীয়ত্বের আস্বাদন, ভরিয়া দিবে বুক অমূল্য সম্পদ-লাভের আনন্দে—অদর্শনেই হইবে চির-দর্শনলাভ, বিরহের প্রেক্ষা-পটেই চলিবে নিত্য-মিলনের আয়োজন। লৌকিক সংসারের বাস্তব মিলন অপেক্ষা মানস-রাত্রের মিলনেই প্রেমের বৈশিষ্ট্য—প্রেমের সার্থকতা বজায় থাকিবে বেশি। প্রতিদিনের সান্নিধ্য ও দেহমিলনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে যে-নির্লিপ্ততা, যে-ত্যাগ-তপস্যা নিহিত, তাহা দ্বারাই প্রেমকে পাওয়া যাইবে আরো উজ্জ্বলভাবে—আরো সার্থকভাবে। প্রেমিক ও প্রেমিকার কাছে এই যে প্রেম, ইহা থাকিবে একটা অপ্রাপ্য আদর্শের মতো; ইহাতেই প্রেম হইবে চিরমুক্ত—অব্যাহত থাকিবে তাহার অসীম সত্তা। ইহাই কবি-মানসের 'শেষের কবিতা'-'মহুয়া'-যুগের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী।

'শেষের কবিতায়' কবির এই প্রেম-পরিণয়-তত্ত্বের নূতন রূপটি দেখা যায়। অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে ভালোবাসিল, কিন্তু অমিত বিবাহ করিল কেটিকে, লাবণ্য শোভনলালকে। অমিত ও লাবণ্য উভয়েই উভয়ের প্রেমকে তাহাদের মনোমন্দিরের বেদীতে বসাইয়া ধ্যান ও পূজা করিতে লাগিল। অমিত কেটিকে বিবাহ করিল তাহাকে সংসার-যাত্রায় গৃহিণী করিবার জন্য। তাহাকেও ভালোবাসিতে হইল বটে, কিন্তু সে-ভালোবাসা নিত্যকার সংসার-যাত্রায় প্রয়োজনমূলক সম্প্রীতির নামান্তরমাত্র। লাবণ্যের প্রতি অমিতের ভালোবাসা অসীম, অনির্বচনীয়, ভাবময়, আবেগময়, সত্যকার রোমাণ্টিক ভালোবাসা। লাবণ্যের 'চিরন্তন রূপ' 'প্রত্যাহের ম্লানস্পর্শ'-বর্জিত হইয়া দীপ্ত হইয়া রহিল তাহার অন্তরে—'চিরস্পর্শমণি'-রূপে সে লাভ করিল লাবণ্যকে তাহার অন্তরের অলক্ষ্যলোকে।

> "যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ...একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি...কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" (অমিতের কথা, 'শেষের কবিতা')
>
> "আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।...আমার এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—" (লাবণ্যের কথা, 'শেষের কবিতা')

'শেষের কবিতা'-রচনার পাঁচ বছর পরে 'বাঁশরী'তে কবিকে আবার এই প্রেম-পরিণয়-সমস্যার সম্মুখীন হইতে দেখা যায়। এবারেও সমাধানের ইঙ্গিত প্রায় পূর্বের মতো; একই আধারে প্রেমের দ্বৈতরূপ—প্রণয়িনী-গৃহিণী—সম্ভব নয়। বরং বিবাহের বন্ধন প্রেম-হীন হওয়াই ভালো—তাহাতে প্রবৃত্তির আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া, অপ্রমত্ত অবস্থায় ব্রত-পালনের মতো, সংসার-ধর্ম নির্বাহ করা যায়। কবি যেন এখানে আরও এক ধাপ

অগ্রসর হইয়াছেন। তবে এই অবাস্তব আদর্শ ও প্রেমহীন বিবাহের অন্তর্নিহিত একটা দুর্বলতা ও ব্যর্থতা যেন বাঁশরীর বিশ্লেষণ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিদ্যুৎ-চমকে ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ে। এইটাই এই নাটকের বৈশিষ্ট্য।

'শেষের কবিতা'য় অমিত লাবণ্যকে এবং লাবণ্য অমিতকে ভালোবাসিয়াছিল। লাবণ্যই অমিতের রস-ও-রুচিসর্বস্ব পরিবর্তনশীল আর্টিস্টের প্রকৃতিকে ভয় করিয়া, বিবাহের বন্ধন দ্বারা এই প্রেমের অমর্যাদা হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে ত্যাগ করিল। কেতকী মিত্র বহুদিন হইতে অমিতের আশায় বসিয়া ছিল এবং প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাহার 'এনামেল-করা মুখ' চোখের জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। শোভনলালও লাবণ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বুকে করিয়া দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়া ছিল। দুইটি বিবাহেই এক পক্ষ ভালোবাসিয়াছিল, সুতরাং এইরূপ বিবাহের ফাঁকিটা আমাদের বিশেষ নজরে পড়ে না। তারপর, ইহা উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি এবং গল্পের আকারে রচিত বলিয়া কবির অসাধারণ বিশ্লেষণের দ্বারা চরিত্র-গুলির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু নাটক 'বাঁশরী'তে দেখি সোমশঙ্কর ও সুষমার বিবাহ যেন দুইটি পথের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ। তাহাতেও আপত্তি ছিল না, কারণ আমাদের সমাজে এখনো অভিভাবকের মধ্যস্থতায় অপরিচিত তরুণ-তরুণী এইরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরস্পরের সাহচর্য, সহানুভূতি ও একক্রিয়তার ফলে প্রেমেরও উদ্ভব হয়। কিন্তু সোমশঙ্কর ও সুষমা—উভয়েরই মন বাঁধা রহিল অন্যত্র, অথচ দুইজনে হইল মিলিত। এই বিবাহের অস্বাভাবিকত্ব বিশেষভাবে প্রকট, এবং বাঁশরীর মন্তব্যে সেটা আমাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়।

যে-আদর্শের প্রভাবে ও যে-যুক্তির বলে সন্ন্যাসী পুরন্দর এই বিবাহ ঘটাইল, তাহা একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কয়েকটা স্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—

বাঁশরী

সন্ন্যাসী (চিঠিতে) বলছেন,—প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালো-বাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অধিকৃত করে। প্রকৃতি রঙ্গীন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাতলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচা-টাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশায় বশ করা যায়। সংসারে যতো দুঃখ, যতো বিরোধ, যতো বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে; যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতীশ

শুনলেম চিঠি, তারপরে?

বাঁশরী

...মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না শিষ্যকে বলছেন,—ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকে নয়। নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হোলো দীক্ষা-মন্ত্র।

ক্ষিতীশ

তাহোলে এর মধ্যে সোমশঙ্কর আসে কোথা থেকে?

বাঁশরী

প্রেমের সরকারী রাস্তায় যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো।...

অন্যত্র—

পুরন্দর

...ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে,—প্রেমের মিলনে মোহ নাই

অন্যত্র—

পুরন্দর

(সোমশংকর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে)

তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয় বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা, বৎসে, যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে, ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী দেয় শক্তি। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি।

-

সন্ন্যাসীর আদর্শ হইতেছে নূতনভাবে মানুষ-গড়া। যুবক-যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিরাসক্ত গৃহী-সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিবে—মুক্ত থাকিবে প্রবৃত্তির মালিন্য হইতে, দমন করিবে লোভ ও ভোগাকাঙ্ক্ষাকে। উভয়ের মধ্যে থাকিবে না ভালোবাসার আবিলতা—থাকিবে মাত্র নির্বিশেষ সর্বজনীন প্রেমের একটা অনুপ্রেরণা। সন্ন্যাসিকল্পিত এই নিরাসক্ত গৃহী-সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে সুষমা ও সোমশংকর।

সন্ন্যাসী এখানে প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে একটা মনঃকল্পিত ভেদরেখা টানিয়াছেন। তাঁহার মতে ভালোবাসা পশুপ্রকৃতিসুলভ প্রবৃত্তির উত্তেজক; ইহা কেবল দুইটি নরনারীর মধ্যে আবদ্ধ,—ইহা ঘটায় বন্ধন। আর প্রেম হইল সর্বভূতে সমান মমত্ববোধ—ইহা সর্বমানবে পরিব্যাপ্ত; ইহা দেয় মুক্তির নির্দেশ। ইহার স্থান ঘরের দেওয়ালের মধ্যে নয়। তাই সুষমা-সোমশংকরের মিলনকে সন্ন্যাসী বলিয়াছেন পথের মিলন।

তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইতেছে এই—বিবাহ-বন্ধনের জন্য নরনারী পরস্পরকে ভালোবাসিতে পারিবে না; কেননা, উভয়ের পারস্পরিক প্রেম সংকীর্ণ, কামনাপঙ্কিল, সুতরাং বিবাহের পক্ষে অযোগ্য। বিশ্বপ্রেমই বিবাহের ভিত্তি—যেখানে নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ হইবে হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউশনের মতো—যে-পরিমাণে কম থাকিবে, সে-পরিমাণে তাহার সার্থকতা বাড়িবে।

বিবাহিত সাংসারিক জীবন গুরুদায়িত্বপূর্ণ, সেখানে এই আবেগপূর্ণ কাব্যময় রোমাণ্টিক প্রেম কর্তব্য-পালনে হয়তো বিঘ্ন ঘটায়,—ইহার মধ্যে খানিকটা সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই যুগল-প্রেম যে কেবল পশুপ্রবৃত্তিকেই উত্তেজিত করিবে এবং বিবাহের গণ্ডির মধ্যে ইহার স্থান নাই—একথা আর যাহাই হউক, সত্য নয়।

বিবাহ বহু-পরীক্ষিত সুপ্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিবাহের মূল-উদ্দেশ্য মনে হয়—নর-নারীর ব্যক্তিগত প্রেমকে সংহত, সংযত ও গভীর করিয়া তাহাকে প্রথমে পরিবারের মধ্যে, পরে সমাজে এবং শেষে বিশ্বে ব্যাপ্ত করা। নরনারী নিজেরাই যদি গভীরভাবে প্রেমের

উপলব্ধি না করিল, তবে বিশ্বপ্রেম তো আকাশকুসুম। 'ঘরে' প্রেমের মূল দৃঢ় না হইলে 'বাহিরে' তাহার শোভা-সৌন্দর্য বিকশিত হইবে কি করিয়া? নারীর দুইটি রূপ—প্রণয়িনী ও গৃহিণী। রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনায় ইহারা উর্বশী ও লক্ষ্মীরূপে ধরা পড়িয়াছে। লক্ষ্মীকে তিনি বলিয়াছেন 'বিশ্বের জননী'—যে সকলকে 'ফিরাইয়া আনে'—নিখিলের 'আশীর্বাদ পানে' 'অনন্তের পূজার মন্দিরে'। সুতরাং গৃহ হইতেই তাহার প্রেম কল্যাণ-স্রোতোধারা-রূপে বাহির হইয়া বিশ্ববাসীকে অনন্তের অভিমুখী করে। তাই কবির সর্বশেষের গানটি তাহারই জন্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত দাম্পত্য-প্রেমকে প্রবৃত্তি-পঙ্কিল মনে করা ও প্রেমহীন বিবাহের আদর্শ খাড়া করা নিতান্তই কাল্পনিক ও অবান্তর। বিবাহবন্ধনের মধ্যে আসিলেই প্রেমের জাতিচ্যুতি ঘটিল আর বাহিরে থাকিলেই তাহার কৌলীন্য বজায় রহিল—ইহা যুক্তিহীন ও অর্থহীন।

আসল কথা, কবি এই যুগের বিশিষ্ট মানসিক স্তরে প্রেমকে বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দৈহিক কামনা-বাসনাহীন আদর্শ স্তরে উন্নীত করিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি এ-যুগে কবি বাস্তব-নিরপেক্ষ, জীবনবৈচিত্র্যহীন ভাবময় প্রেমের আদর্শের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছিলেন। প্রেম-সম্বন্ধে কবির বাস্তবস্পর্শ-কাতরতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। 'জন্মরোমাণ্টিক' কবি অসীম ও অনন্ত প্রেমকে জীবনের ঊর্ধ্বে উঠাইয়া কল্পলোকে তাহার অনির্বচনীয় রস-মাধুর্য উপভোগ করিয়াছেন; ভয় করিয়াছেন, পাছে বাস্তব-সংসারের সম্পর্কে আসিয়া, বিবাহ-জীবনের প্রাত্যহিক স্পর্শে ইহার অম্লান সৌন্দর্যটি ক্ষুণ্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সীমা-অসীমের মিলনদূত এবং ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার মূল-মন্ত্র। কিন্তু এ-যুগে সীমা-অসীমের মিলন ঘটাইতে যেন কবি কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন; সীমা অপেক্ষা অসীমকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বেশি—সীমার মধ্য হইতেই অসীমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—অসীমকে সীমায় আনিয়া সীমাকে সার্থক করেন নাই। শেষজীবনে প্রেমের এই অপূর্ব রোমাণ্টিক অনুভূতি যেন আরো গভীর হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমি গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি (রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা—'বীথিকা', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা)। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাই কবি কল্পলোকের এই ভাবময় প্রেমের বিগ্রহ-স্বরূপিণী প্রণয়িনীকে-বিবাহের বাস্তব-বন্ধনের মধ্যে স্থাপিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

কবি-মানসের এই স্তরে আর একটি বিষয়ও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'দুই বোন' (১৩৩৯) ও 'মালঞ্চ' (১৩৪০) 'বাঁশরী'র সমসাময়িক কালের রচনা। এই দুইটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের সহিত 'বাঁশরী'র একটা আত্মিক যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্যে, অর্থগৌরবসমৃদ্ধ কাব্যময় ব্যঞ্জনায়, বুদ্ধিশাণিত দীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গিতে, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ চমকে ইহারা বাঁশরীর সমধর্মী। বিষয়বস্তুতেও 'বাঁশরী'র সহিত ইহারা একটা গূঢ় সাদৃশ্য বহন করে।

দুইটি উপন্যাসের মধ্যেই বিবাহ-পরবর্তী প্রেমের চিত্র দেখানো হইয়াছে। দুইটি নায়কই বিবাহিত স্ত্রীতে অতৃপ্ত হইয়া বিবাহ-গণ্ডির বাহিরে তাহাদের প্রেম তৃষ্ণা মিটাইয়াছে। 'দুই বোন'-এ দেখা যায়—শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা ছিল স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী, শান্তস্বভাবা, সর্বদা সেবাপরায়ণা,—সমবেদনাময়ী মায়েরি মতো স্বামীকে সর্বদা স্নেহের দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিত সে। কিন্তু শশাঙ্ক এই স্ত্রীর মধ্যে জীবনচাঞ্চল্যদীপ্তা, আবেগময়ী, লীলাময়ী প্রিয়াকে পায় নাই। স্ত্রীর মধ্যে লাভ করে নাই সে পুরুষ-বাঞ্ছিত সার্থকতা—তাহার

অন্তর ছিল অতৃপ্ত। সে তাহার মধ্যে স্বামিগতপ্রাণা সাধ্বী পত্নীকে পাইয়াছে, কিন্তু প্রণয়িনীকে পায় নাই। তাই পরিণতবয়স্ক শশাঙ্ক পতিগতপ্রাণা, রোগশয্যাশায়িতা স্ত্রীকে ফেলিয়া প্রেমে মাতিল তাহার স্ত্রীর ভগিনী ঊর্মিলার সঙ্গে প্রণয়তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য। 'মালঞ্চ'-এর চিত্রটি আরো কঠিন—আরো নির্মম। বিবাহের দশ বৎসর পরে প্রৌঢ়বয়স্ক আদিত্য রুগ্না, মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রী নীরজাকে নির্মম তাচ্ছিল্যের দ্বারা ব্যথিত করিয়া বাগানের যত্নের অছিলায় বাল্য-বান্ধবী সরলার সঙ্গে প্রণয়-লীলা করিতে লাগিল। •

'শেষের কবিতা' হইতে শুরু করিয়া নরনারীর প্রেম ও বিবাহ-সম্বন্ধে কবিচিত্তে যে-ভাবটির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পাঁচ বছর ধরিয়া এই চারিখানি গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে—বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হইলেও ইহাদের অন্তরালে ঐক্যের একটি মূল-সূত্রই কিন্তু বর্তমান।

পুরুষের চিত্তে একটা ভাবময়, আদর্শমূলক রোমান্টিক প্রেমের সহজাত কামনা রহিয়াছে। সেই কামনার ধনকে, ভাবলোক-বিহারিণী সেই মানসীকে সে সংসারের রক্ত-মাংসের নারীর মধ্যে মূর্তিমতী দেখিতে চায়। বিবাহের দ্বারা নারীর সহিত মিলিত হইলেও তাহাতে সে বেশিদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। প্রত্যহের গ্লানি, দুর্বলতা ও ক্লান্তিতে তাহার আদর্শগত মোহ হয় দূর, ভাঙিয়া যায় তাহার ভাবময়ী মানসীর স্বপ্ন; বিবাহলব্ধ পত্নী আর তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। পুরুষ কবি, শিল্পী ও ভাবসাধক। সে সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষী—পরিপূর্ণতার পূজারী। খণ্ডের তুচ্ছতা ও ব্যক্তি-বিশেষের অপূর্ণতা পীড়া দেয় তাহাকে। আদর্শ বা ভাবরূপে যাহা তাহার হৃদয় ভরিতে পারে না, তাহাতে সে আনন্দ পায় না। নূতন নারীর মধ্যে তখন সে তাহার নিত্যকালের প্রণয়িনীকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে—আর ইহারই প্রতিক্রিয়ায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেখা দেয় সময় সময় বিপ্লব।

আবার নারী একান্তভাবে বাস্তববাদী। ভাব লইয়া তাহার কোনো কারবার নাই। সে প্রেমসর্বস্ব—বাস্তব প্রেমই তাহার জীবনের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। সে তাহার বাস্তব প্রণয়ীকেই পুরুষের মধ্যে লাভ করিতে চায়—এই প্রণয়ীকে লাভ করাই তাহার জীবনের সার্থকতা। যে পুরুষের প্রেম তাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার জন্য সে সর্বস্বত্যাগ—জীবনত্যাগ পর্যন্ত করিতে পারে। পুরুষের নিকট হইতে সে একান্তভাবে কামনা করে প্রেম এবং তাহার নিকট হইতে সেই প্রেম লাভ করিয়া সে তৃপ্ত হইতে চায়—ধন্য হইতে চায়। প্রেমহীন মিলন তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

নরনারীর প্রেমের এই মনস্তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতিতে বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়। সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—

"নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সরাইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। এইজন্যেই সাধারণত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সঙ্গবন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছে করে। .. আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিস। তাকে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তার দোষ-ত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরূপের উপর ভাবের

আবরণ টেনে দিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে।... মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম, তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনা-বৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams—এ-কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ করছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জন করে; যে-সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জমে ওঠে। নারীর সৃষ্টি ঘরে, এইজন্যে সবকিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে;... পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে চায় ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীর্তিকে বহু ব্যয়, বহু ত্যাগ, বহু পীড়নের উপর স্থাপিত করেছে।... বাস্তবের মধ্যে যে-সব বিশেষের বাহুল্য আছে তাকে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এইজন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা; এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় এত পুরুষের এত আগ্রহঃ এবং এইজন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এত বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এত বেশি সম্পদ্ লাভ করেছে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। যে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাজে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে দেখো। (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, পৃঃ ৫১-৫৪)

আলোচ্য কয়খানি উপন্যাস ও 'বাঁশরী' নাটকের ভাবের মূলসূত্র এইটিই।

অমিত চায় তাহার মনের মানসীকে নব নব রূপে ও রসে। লাবণ্যকে তাহার মানস-প্রেমের বিগ্রহরূপিণী ভাবিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল সে। কিন্তু লাবণ্য পুরা বাস্তববাদী—পাকা রিয়ালিস্ট। অমিতকে ভালোরূপে চিনিয়াছিল সে—বুঝিয়াছিল যে, ভাবের রঙ চটিয়া গেলে সে লাবণ্যকে ছাড়িয়া আবার বাহির হইবে তাহার মানসীর সন্ধানে। তাই অমিতের প্রেমের স্মৃতি তাহার চিরন্তন সম্পদ্ মনে করিয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। অমিত কেতকীকে বিবাহ করিল প্রাত্যহিক সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্য, আর লাবণ্য হইয়া রহিল তাহার লীলাময়ী মানস-প্রিয়া।

অবাঙালী সোমশঙ্কর বাঁশরীকে ভালোবাসিয়াছিল, সর্ববিষয়ে তাহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহার মধ্যেই তাহার আদর্শ-প্রণয়িনীকে পাইয়াছিল, কিন্তু ব্রতপালনের জন্য সন্ন্যাসী পুরন্দরের আদেশে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিল প্রায়-অপরিচিতা সুষমাকে। ব্রত-পালনের জন্য সংসারযাত্রার জন্য সুষমা হইল তাহার পত্নী—গৃহিণী; আর হৃদয়ের প্রেমক্ষুধা মিটাইল তাহার মানসী বাঁশরী। সোমশঙ্করের বিদায়কালীন কথা—'তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ-বিবাহে তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' বাঁশরী একান্ত প্রেমসর্বস্বা ও রিয়ালিস্ট। সে সোমশঙ্করকে ভালোবাসিয়াছিল, তাহাকেই পাইতে চায় একান্তভাবে। সে পুরুষের আদর্শকে ব্যঙ্গ করে, অর্থহীন ব্রতপালনে কোনো আস্থা নাই তাহার; প্রেমহীন মিলনের কোনো অর্থই বোঝে না সে। সন্ন্যাসী যখন তাহার সোম-

শংকরকে নিষ্ঠুরভাবে কাড়িয়া লইল, তখনই আরম্ভ হইল তাহার 'উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য'। সে-নৃত্য তখনই শান্ত হইল, যখন সোমশংকরের স্বীকৃতিতে সে বুঝিল যে, সোমশংকর তাহাকে জীবনে ভুলিবে না,—প্রত্যক্ষভাবে সোমশংকরের নিকটে সে না থামিলেও পরোক্ষভাবে তাহার স্মৃতিতে বাস করিবে এবং তাহার প্রেম অনাদৃত হয় নাই। সেই প্রেমই রহিল তাহার চিরন্তন সম্পদ্ হইয়া।

শশাংক অমন ভক্তিমতী সাধ্বী স্ত্রীকে পাইয়াও তৃপ্ত হইল না,—তাহার মানস-বিহারিণীকে পাইল ঊর্মির মধ্যে। ভুলিল সে বিবাহ বন্ধন, ভুলিল স্বামীর কর্তব্য, গ্রাহ্য করিল না সামাজিক বক্র দৃষ্টি। রুগ্না শর্মিলার কিন্তু পতিভক্তি তাহাতে কমিল না, সে রিয়ালিস্ট-এর দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়া স্বামীকে ফিরাইবার কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে।

বয়স্ক পুরুষ আদিত্য মরণোন্মুখী পত্নীকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করিয়া অন্য নারীর মধ্যে তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খুঁজিল। স্বামীর এই নির্মম ব্যবহার নীরজা চেষ্টা করিয়াও ক্ষমা করিতে পারিল না; তাহার হৃদয়ের তীব্র জ্বালা অগ্ন্যুৎপাতের মতো অভিসম্পাতরূপে বর্ষিত হইল সরলার মাথায় তাহার মরণ-ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে।

এখন দেখা যাক্ 'বাঁশরী' নাটকের মধ্যে মূলদ্বন্দ্বটি কি। একদিকে পুরুষের এই ভাবলোক-বিহারিণী মানস-প্রিয়ার রোমান্টিক আদর্শ এবং নিষ্কাম বিবাহ-ব্রত পালনেব আদর্শ, অন্যদিকে নারীর স্বাভাবিক বাস্তব প্রেমের আদর্শ—এই আইডিয়াল ও রিয়ালের দ্বন্দ্বই 'বাঁশরী'র মূলদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ হইয়াছে বাঁশরীর চিত্তে ও কর্মে। পূর্বে বলা হইয়াছে, বাঁশরী সরকারই 'বাঁশরী' নাটক। বাঁশরীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝা যাইবে।

বাঁশরী রবীন্দ্রনাথের এক অপরূপ সৃষ্টি। সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে ইহার সমকক্ষ নারী-চরিত্র আর নাই,—বাঁশরী অদ্বিতীয়, অনুপম। বাংলা-সাহিত্যের চিত্রশালায় বাঁশরী তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে। রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট নারী-চরিত্র ব্যক্তিত্ব-গর্বিতা চিত্রাংগদাকে আমরা দেখিয়াছি, দেখিয়াছি প্রেম-সর্বস্বা দেবযানীকে, প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ক্ষিপ্ত শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীকেও দেখিয়াছি, আরো এই শ্রেণীর এক-আধটি চরিত্র দেখিয়াছি,—কিন্তু বুদ্ধি ও হৃদয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠ দীপ্তিতে—বজ্র ও মেঘের অপূর্ব সম্মেলন-সৌন্দর্যে বাঁশরীর নিকটে তাহারা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এ-ঔজ্জ্বল্য কেবল আধুনিকতার ঔজ্জ্বল্য নয়;—বাঁশরী নূতনও নয়, পুরাতনও নয়, সে চিরন্তনী নারী।

বাঁশরী প্রখরবুদ্ধিশালিনী, অসাধারণ-ব্যক্তিত্বসম্পন্না, 'ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, শ্লেষবাণসন্ধান-দারুণা', বাস্তবজীবনের সত্যদর্শিনী, নরনারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক ও ভাষ্যকার এবং অচল আত্মপ্রতিষ্ঠ; তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির এই ইস্পাতের মতো কঠিন দীপ্তির তলদেশে প্রেমের দুর্দমনীর আবেগ-তরঙ্গায়িত একটা হৃদয়-ধারা প্রবাহিত। প্রেমই বাঁশরীর জীবনের ধ্রুবতারা—তাহারি নির্দেশে তাহার জীবন-তরী চালিত হইয়াছে। প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগ করিতে সে প্রস্তুত। বাঁশরী প্রেমের শিল্পী, রূপকার,—প্রেম তাহার কাছে একটা নিষ্ক্রিয় অনুভূতিমাত্র নয়, কল্পনা ও আবেগ দিয়া সে সোমশংকরকে তাহার মনোমত করিয়া গড়িয়াছিল,—সোমশংকর তাহারি সৃষ্টি। সে জীবন-রসিক—জীবন-তত্ত্বজ্ঞ, মর্মজ্ঞ।

বাঁশরী সত্যনিষ্ঠ জীবন-দর্শনের অনুরাগিণী। পুরুষ একটা জীবন-সত্যহীন ফাঁকা

আদর্শের পিছনে ছোটে, সেই আদর্শের রঙীন চশমায় সে দেখে নারীকে; তাই নারীর স্বরূপ তাহার কাছে ব্যক্ত হয় না। মেয়েরাও আত্মগোপন করিয়া, বাস্তব প্রেমই যে তাহাদের সমগ্র সত্তা, এই মূলসত্যটি লুকাইয়া, সেই আদর্শেরই রঙ মাখিয়া পুরুষদের ভুলাইতে চেষ্টা করে, —অভিসারিকার বেশে এই আদর্শধ্যানী পুরুষের মন কাড়িতে প্রয়াস পায়। উভয়েই উভয়ের সত্য গোপন করে, তাই সত্যের সংঘাতে উভয়েরই স্বপ্ন যায় ভাঙিয়া রূঢ়ভাবে। বাঁশরী এই জীবনসত্যকে প্রকাশ করিয়াছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তীব্রভাবে।

এই প্রকাশে বাস্তববাদী কথা-সাহিত্যিক ক্ষিতীশ ভৌমিক তাহার সহায়। তাহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেই সুস্পষ্ট রূপ লইয়াছে বাঁশরীর এই সত্যদর্শন। সে বাঁশরীর মনের দোসর—তাহার কাছেই প্রকাশ পাইয়াছে বাঁশরীর মনের কথা,—তাহার অভিজ্ঞতা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার ধারণা। বাঁশরীর চরিত্র-রূপায়ণে তাই ক্ষিতীশের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। এ-প্রয়োজন প্রধানত কবির শিল্পানুগত প্রয়োজন।

আপাতদৃষ্টিতে ক্ষিতীশ-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া কবি তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ-বিষয়ে কবির মনে একটি ভাব-গ্রন্থি ছিল; বাঁশরীর ব্যঙ্গের মাধ্যমে কবি যে তরুণ সাহিত্যিক ও তাহাদের সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, একথা বলা যায় না।

কিছুদিন পূর্ব হইতে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একান্ত ভাববাদী ও বাস্তবজীবনের চেতনাহীন এবং উহা উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত শ্রেণীর সাহিত্য। একদল নূতন সাহিত্যিক সমাজের অতি নিম্নস্তরের জীবন লইয়া গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিতেছিল। ঐ-সব রচনায় অধঃপতিত জীবনের জঘন্য লালসার চিত্র অঙ্কিত হইত এবং ভাষাকে যতদূর সম্ভব মোচড়াইয়া স্বাভাবিক গাঁথুনিটাকে ওলট-পালট করিয়া একটা নূতন স্টাইলের রূপ দেখাইবার চেষ্টা ছিল। উঁচু গলায় তাহারা এই-সব রচনাকে বাস্তবসাহিত্য বলিয়া প্রচার করিত। রবীন্দ্রনাথের মতে এই-সব নূতন সাহিত্যিকের নিম্নস্তরের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা নাই,—তাহাদের আক্রমণের বিষয় উচ্চ মধ্যবিত্তদের জীবনেরও কোনো জ্ঞান নাই তাহাদের; মন-গড়া একটা ভুয়া বাস্তবের বাঁধাবুলি নূতন ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া তাহারা আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলিয়া গর্ব করে। অনেক প্রবন্ধে কবি সাহিত্যের এই বাস্তববাদ ও আধুনিকত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন ('সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য)। ঐ-সব রচনা সম্বন্ধে কবির মত একটু উদ্ধৃত করা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে,—

> "আধুনিক সাহিত্যে শিশিতে সাজানো বাঁধাবুলি আছে—অপটু লেখকদের পাঠশালায় সেগুলি হচ্ছে "রিয়ালিটির কারি-পাউডার।" ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।
>
> অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ', এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেসক্রিপশনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই, দেখা যায়, নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি; ভালোরকম

উপার্জনও করেন, সুখে-স্বচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্র্যকে এ'রা কেবল নব্য-সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডার যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক কুপথ্য। (সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৯০-৯১)

দারিদ্র্যকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করিতে হইলে সাহিত্য-স্রষ্টার পক্ষে দরিদ্রের জীবনের সত্য-পরিচয় প্রয়োজন; অসত্য ও কৃত্রিমতার দ্বারা কখনই সত্যকার সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কবি শেষ জীবনে বলিয়াছিলেন 'জীবনে জীবন যোগ' করিতে।

নাহলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা।
... ...
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজদুরি।
(ঐকতান, জন্মদিন)

তবে মূলত ক্ষিতীশ-চরিত্রের অবতারণা বাঁশরী-চরিত্রকে ভালো করিয়া ফুটাইবার জন্যই। বাঁশরী নরনারীর যে-সত্যদৃষ্টিহীনতা ও দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তাহার অনেকাংশই তরুণ সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে বর্তমান। নরনারী তাহাদের হৃদয়-সত্যকে গোপন করায় বাঁশরীর জীবনে যে-শোচনীয় ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ট্র্যাজেডির একটা অবিস্মরণীয় শিল্পরূপ দেওয়া তাহার কামনা। তাহার শিল্পদৃষ্টি আছে, কিন্তু নির্মাণ-পটুতা নাই,—বুঝিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাণীরূপ-দানের শক্তি নাই, শিল্পীর মন আছে, কিন্তু শিল্পী-জনোচিত নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি নাই।—

নিজে লিখতে পারিনে যে ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুঝি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। তোমরা লেখক, আমাদের মত কলম-হারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

বাঁশরীর মর্মান্তিক অবস্থাটি ক্ষিতীশের রচনা-কুশলতার মধ্য দিয়া সে অপূর্ব-শিল্পরূপে সকলের দৃষ্টিগোচর করিতে চায়। কিন্তু তাহাতে বাধা হইল জীবন-সম্বন্ধে ক্ষিতীশের অগভীর জ্ঞান ও একচক্ষু দৃষ্টি। সেইজন্য ক্ষিতীশকে সে অপূর্ণ দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে বলে,—ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের স্বরূপ ও বাঁশরীর নিদারুণ অবস্থা জানিবার জন্য আংটি-বদলের সভায় ডাকিয়া আনে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উৎসাহ, ধিক্কার, প্রশ্রয় প্রভৃতি নানাভাবে তাহাকে জীবন-সত্যে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করে।

বাঁশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সংকেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে. এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হোলো না। এমন লেখা লেখবার শক্তি

কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছিনে আর্টিস্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তাহোলে অস্ফুট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট! তুমি যেন হীরে-মুক্তোর হরির লুট দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায় হাতে হাতে দিনে দিনে; ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।... ...লেখো লেখো, দেরি করো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফুটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

বাঁশরীর নারীস্বভাবই তাহার সার্থক সাহিত্য-রচনার বাধা। তাহার ভাব-চিন্তা ও অনুভূতিকে সে ব্যক্তি-কেন্দ্রের ঊর্ধ্বে উঠাইয়া একটা নৈর্ব্যক্তিক রসচেতনায় পরিণত করিতে পারে না, বিশেষ বা অংশকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষ বা সামগ্রিক রূপ দিতে পারে না। ক্ষিতীশের শক্তিকে সে স্বীকার করে বলিয়াই কেবল তাহার বিপথগামী শক্তিকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে চায়।

পুরুষের আদর্শ ও নারীর মনোবৃত্তির অসামঞ্জস্য বাঁশরীর অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছে,—

বাঁশরী

তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন সোমশঙ্করের হাতে যে ওকে ভালোবাসে না?

পুরন্দর

জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষাত্রিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশঙ্করই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরী

যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি?

পুরন্দর

সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাঁশরী

আপনি মানব-প্রকৃতি মানেন না?

পুরন্দর

মানব-প্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাঁশরী

এতই যদি হলো, ওরা বিয়ে নাই করত?

পুরন্দর

ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ, এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে পুরুষ অনেকদিন খুঁজছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাঁশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে,—প্রেমের মিলনে মোহ নাই।

বাঁশরী

মোহ চাই, সন্ন্যাসী, নইলে সৃষ্টি কিসের! তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে—সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়া-তাড়া দিতে বসেছ—বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ খাওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ।

পুরন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয় একথা মানতে রাজী আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে।...আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি...যতই কঠিন হোক।

বাঁশরী

সেইজন্যেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জান না মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ্, ব্যথা যাবে থেকে।...

(সুষমার প্রবেশ)

এই যে সুষমা, শোন, বলি। মরীয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস্, জ্বলে জ্বলে।...এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, মন্ত্র নিস তবু তুই পুরুষ নোস—আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

পুরুষ মেয়েদের দেখে রঙীন চোখে, তাই তাহার স্বরূপটি ধরিতে পারে না; মেয়েরাও তাহাদের স্বরূপটি করে গোপন, ভুলাতে চেষ্টা করে পুরুষকে আর নিজেদের। পানওয়ালী হইতে উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের মনের ইহাই একমাত্র সত্যকার ইতিহাস। নরনারীর সত্যগোপনের এই রহস্যটি কোনো বাস্তববাদী সাহিত্যিক উদ্ঘাটিত করে না, অথচ ইহারাই গর্ব করে রিয়ালিজমের। বাঁশরী ক্ষিতীশকে নরনারীর এই সত্য-স্বরূপকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে বলে,—

ক্ষিতীশ

কী আশ্চর্য ও'কে দেখতে! বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুন্‌হিল্‌ড্‌।

বাঁশরী

(তীব্রহাস্যে) হায়রে হায় যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্‌ট্‌ বলে দেমাক কর, ভান কর, মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে।...

ক্ষিতীশ

সেকথা মাথা হে'ট করেই মানব। পুরুষ জাত দুর্বল জাত।

বাঁশরী

তোমরা আবার রিয়লিস্‌ট্‌! রিয়লিস্‌ট্‌ মেয়েরা। যতো বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স বানাইনে। রঙ মাখাইনে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব। ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্‌ট্‌, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ

বাঁশি, বৈদিক কালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো—যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরী

সত্যি, সত্যি খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যতো ভুলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ

এর উপায়?

বাঁশরী

লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে-মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে।...পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, মেয়েদের খেলো করা হলো, অর্থাৎ তাদের মন্ত্র-শক্তিতে বোকাদের মনে খটকা লাগানো হচ্ছে। উ'চু দরের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় করো না ক্ষিতীশ, রং যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টি'কে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশের চরিত্র কবি এতোই মেরুদণ্ডহীন করিয়া আঁকিয়াছেন যে, উহাকে ব্যঙ্গ-চরিত্র বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মনে হয়, সে কেবল বাঁশরীর তুবড়ি-ছোঁড়ায় দেশালাই-কাঠির ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে; বাঁশরীর দৃষ্টি ও যুক্তিতেই সে সব দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত নিতান্ত নির্বোধের মতো বাঁশরীকে প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু কবি মাঝে মাঝে তাহার মুখে যে-ভাষণ অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে নির্বোধ বা মানবচরিত্রজ্ঞানহীন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রায় সমস্ত চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে কথা বলে, ইহা তাঁহার নাটকের একটি দোষ; কিন্তু এখানে ক্ষিতীশের এমন দুর্বল ও সামঞ্জস্যহীন চরিত্র-সৃষ্টির মূলে কবির একটি উদ্দেশ্য আছে। বাঁশরী-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্যই কবি এইরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি ক্ষিতীশকে একেবারে নির্বোধ করিতেন, তবে বাঁশরীর উচ্চ মনন-স্তরের সে নাগাল পাইত না; সুতরাং পরস্পর ভাব-বিনিময়ের অসুবিধা হওয়ায় বাঁশরী-চরিত্রের অভ্যন্তরভাগ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত না—নাটক অচল হইত। আর যদি ক্ষিতীশ বাঁশরীর সমস্তরের বুদ্ধিমান হইত, তবে প্রথম হইতেই তর্ক ও কথার মারপ্যাঁচের ঝড়ে নাটকের বিষয়বস্তুটি উড়িয়া পড়িত কোন্ খানায়। তাই কবি প্রয়োজনমতো ক্ষিতীশকে কখনো বুদ্ধিমান্ কখনো নির্বোধ করিয়াছেন। বাঁশরীর মনের যে ভাবটুকু যেখানে প্রকাশ দরকার, ক্ষিতীশকে দিয়া কবি তাহারি ভূমিকা করিয়াছেন। প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রতিশোধের রূপ ধারণ করে, তাই বাঁশরী মনে মনে স্থির করিল, সোমশঙ্করের তাচ্ছিল্য ও প্রত্যাখ্যানের যোগ্য প্রত্যুত্তর হইতেছে অবিলম্বে অন্যকে বিবাহ করা। অমনি ক্ষিতীশ বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত। বাঁশরীও তৎক্ষণাৎ রাজী। অবশ্য বাঁশরীর সম্মতিতে নিঃসন্দেহ হওয়া ক্ষিতীশের পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। নারীচরিত্রজ্ঞানের যে-সব উক্তি পূর্বে তাহার মুখে শোনা গিয়াছে, তাহাতে বাঁশরীর প্রস্তাবের হেতু ও মূল্য তাহার বুঝা উচিত ছিল। তাহার চরিত্রের অসঙ্গতিটি এখানটায়ই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু সেদিকে কবির দৃষ্টি নাই; যখনি আবার প্রয়োজন হইল, তখনি বাঁশরীকে দিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইলেন। বাঁশরীকেই কবি ফুটাইতে চাহিয়াছেন, ক্ষিতীশ তাহার পক্ষে একটা সহায়মাত্র।

মুক্তির উপায়

(১৩৪৫)

ইহা রবীন্দ্রনাথের ঐ নামের একটি গল্পের নাট্যরূপ। ১৩৪৫ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'অলকা' পত্রে ইহা প্রকাশিত হয়। কেবল পুষ্পমালা নামে একটি মেয়েকে সকল ঘটনার কেন্দ্রীয় সূত্ররূপে এই নাটকের মধ্যে ঢুকানো হইয়াছে। গুরুদেব অপ্রত্যক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে নাটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং নূতন চেলাচামুণ্ডারও নাটকে প্রবেশ ঘটিয়াছে। এখানে-ওখানে একটু-আধটু সামান্য পরিবর্তন আছে। নাট্য-ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই দেওয়া যাইতে পারেঃ—

"ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে।

ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।
পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনষ্পতি জাতের। অগুরুজঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসিয়ে আগুন লাগিয়ে খাণ্ডব-দাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তারপর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।
পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবিঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।" (কবি-লিখিত ভূমিকা)

ছোট গল্পের মধ্যে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছন্দগতি যে-কৌতুকধারা প্রবাহিত ছিল, নাট্যরূপের বন্ধন দিয়া তাহাকে একটা কৃত্রিম জলাশয়ে পরিণত করা হইয়াছে। ১২৯৮ সালে লিখিত গল্পে ১৩৪৫ সালে নাট্যরূপ দেওয়ায় সমসাময়িক কবি-মনের কিছু রঙ লাগা স্বাভাবিক: তাই এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে, হৈমর দূর-সম্পর্কের এক বোনকে কবি পল্লীপরিবেশের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। তাহারি বুদ্ধি, কর্ম ও মধ্যস্থতায় নাটকের সমস্ত ঘটনাটি পরিচালিত হইতেছে এবং সে-ই সমস্ত জটিলতা সমাধান করিয়া নাটককে মিলনান্ত পরিণতিতে লইয়া আসিয়াছে। ফকিরের গুরুভক্তি, গুরুর অর্থলোভ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ নাটকে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান জুড়িয়াছে এবং তাহাদের উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে; ফলে ফকির-মাখনের অবস্থান্তরের ও উভয় পরিবারের ভুল—যাহার মধ্যে রহিয়াছে নাটকের মূল-হাস্যরস নিহিত—সেই ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই যুগের বুদ্ধিশাণিত তির্যক্ বাগ্‌ভঙ্গীরও কিছুটা ছাপ ইহার গায়ে আছে, এবং সিনেমায় হনুমানের পার্ট অভিনয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া মাখনকে ধরিবার কৌশল অবিশ্বাস্য আধুনিক পরিমার্জন। আধুনিক প্রসাধনের ফলে নাটকের মধ্যে গল্পের চমৎকার হাস্যরসটি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

(৬)

কৌতুক নাট্য

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকের স্বরূপ বা তাঁহার হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমেই কবির মানস-ধর্মের উপর সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস একান্তভাবে কাব্যধর্মী, গীতিধর্মী ও ভাবধর্মী। এইরূপ কবি-মানস স্বভাবতই পরিপূর্ণতার প্রয়াসী,—সংশ্লেষণী শক্তির দ্বারা সমস্তকে একত্র করিয়া ভাব ও কল্পনার প্রলেপে নানা অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া ইহা আকাঙ্ক্ষা করে একটা অখণ্ড অনুভূতি—স্বভাবতই হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও আবেগের বাণীরূপের মধ্যেই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-ক্ষেত্র। এইরূপ কবি-মানস বস্তুরূপের প্রকাশের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির ছুরিকা-ঘাত করিতে পারে না,—দৃষ্টরূপের স্বাভাবিক অসামাঞ্জস্য, আতিশয্য ও অন্তর্নিহিত দুর্বলতার নির্লিপ্ত ভাবাবেগ-বর্জিত চিত্রাঙ্কনে ইহার শিল্পকর্মের সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না। কাব্যধর্ম বা গীতিধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি হইতেছে হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ, কৌতুকের মূল হইতেছে বুদ্ধি। একজন বাস করে হৃদয়ের রাজত্বে, অপরজন মস্তিষ্কের রাজত্বে। তাই উৎকৃষ্ট গীতিকবি ও রোমাণ্টিক কবির প্রতিভা প্রকৃত হাস্যরসসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। যেখানে ভাবাবেগের অনুপ্রেরণা নাই, কল্পনার বর্ণবৈচিত্র্য নাই, নাই জগৎ ও জীবনের সত্য-সন্ধান,—আছে শুধু বাস্তব জীবনের স্থানকালপাত্রের অসামঞ্জস্য, অনৌচিত্য, দুর্বলতার উপর আগেবহীন নির্লিপ্ত দর্শকের বুদ্ধিচালিত স্থির দৃষ্টিনিক্ষেপ—যেখানে গড়িবার নাই নূতন কিছুই, আছে কেবল পুরাতনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা মাত্র, সেখানে তাহার প্রতিভা আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পায় না এবং স্মরণীয় কিছু রচনা করিতেও পারে না। তাই এই কৌতুকরসাত্মক রচনাগুলি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ও রোমাণ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্মরণীয় দান নয়। এগুলি তাঁহার প্রতিভার অপ্রত্যক্ষ দান—by-product মাত্র। তবে নব নব সাহিত্যরূপস্রষ্টা কবির ইহাও একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ।

কৌতুকরসের সাধারণত তিনটি ধারা। একটি বিশুদ্ধ হাস্যরস—ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় humour ; আর একটি সংস্কৃতি-মার্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধির বাক্‌চাতুর্য—যাহাকে বলা হয় wit ; অপরটি ব্যঙ্গ বা শ্লেষ—যাহাকে satire বা irony বলিয়া ধরিতে পারি।

বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎস হইতেছে একটা বিশিষ্ট মনোভাব, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গী। এই প্রকারের হাস্যরস-স্রষ্টা মানব-জীবনের সর্ববিধ অসামঞ্জস্য, আতিশয্য, মূঢ়তা, স্বার্থপরতা, অহংকার, লোভ প্রভৃতি দেখিয়া বিন্দুমাত্র দুঃখ, বেদনা বা বিদ্বেষ অনুভব না করিয়া অনুদ্বেজিত চিত্তে, স্থির বুদ্ধিতে যদি মানব-চরিত্রের দুর্বলতার উপরে শুভ্র হাসির আলোকসম্পাত করেন, তবেই তাঁহার শিল্পকর্ম যথার্থ সার্থকতা লাভ করিবে। এই বিশুদ্ধ হাস্যরস বা হিউমার-এর আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইপ্রকার হাস্যরসের মধ্যে করুণ রসের একটা অতি সংযত ও নিগূঢ় ব্যঞ্জনা থাকে,—রসস্রষ্টার একটা আবেগহীন, উদাসীন সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। উৎকৃষ্ট হিউমারের মধ্যে করুণ রসের বা pathos এর একটা রেশ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত করুণ রস নয়,—লেখকের বিন্দুমাত্র হৃদয়াবেগে এই হাস্যরস নষ্ট হইতে পারে। Bergson বলেন,—

"Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe than emotion. I do not mean that we could not laugh at a person who inspires us with pity, for instance, or even with affection, but in such a case we must, for the moment, put our affection out of court and impose upon our pity."

হাস্যরসের সঙ্গে এই করুণ রস বা pathos-এর অনুবাসন—লেখকের একটি অতি-ক্ষীণ, নির্লিপ্ত, গূঢ় সহানুভূতির সঙ্গে হাস্যরসের এই মিশ্রণ—ইহাতেই উৎকৃষ্ট হিউমারের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়া ওঠে। ইহা আমরা Lamb-এর Essays of Elia বা Mark Twain এর রচনা, বা Dickens-এর কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করি। ইঁহাদের হাসি যেন অশ্রু-মেঘের পটভূমিকায় ইন্দ্রধনুর বর্ণদীপ্তি।

দ্বিতীয়প্রকার হাস্যরসের উদ্ভব শব্দযোজনার ভঙ্গীতে,—ভাবণের বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত কলাকৌশলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ হাস্যরস নির্ভর করে এই বাক্‌চাতুর্যের উপর, অবশ্য এ-হাস্যরস অগভীর—ও উচ্চশ্রেণীর নয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি সৃষ্টি-কুশলী কবি-মন, নানা সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের উল্লেখ-সম্বন্ধ রসব্যঞ্জনা, বিদগ্ধ-জনোচিত অপূর্ব বাক্যপ্রয়োগনৈপুণ্য। তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর হাস্যরস একটা অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করে—মুগ্ধ করে।

তৃতীয়প্রকারের হাস্যরসের উদ্দেশ্য হাসির ছলে অন্যকে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করা—হাসির ছদ্মবেশ পরিয়া অন্যকে আঘাত করা। কোনো সময় ইহা একেবারে সর্বজনবোধ্য সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে, কখনো বা চাপা শ্লেষের বক্র ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়। এই ব্যঙ্গ-রসিকদের হাত হইতে কোনো রকমের নির্বুদ্ধিতাই রেহাই পায় না। কি মানবজীবনে, কি সমাজে, কি ধর্মে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সর্বত্রই ইহারা সকলপ্রকার নির্বুদ্ধিতার মুখোশ খুলিয়া হাসির উজ্জ্বল আলোকে নিষ্করুণভাবে উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াসী। ইংরেজী সাহিত্যের একজন সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-রসিকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য,—

"Folly is the natural prey of the Comic Spirit, known to it in all her transformations, in every disguise; and it is with the springing delight of hound after fox, that it gives her chase, never fretting, never tiring, sure of having her, allowing her no rest."

(*Essay on Comedy :* George Meredith)

ইংরেজী সাহিত্যে Swift, Thackeray প্রভৃতি ব্যঙ্গ-শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের সাহিত্যে এই প্রকারের হাস্যরসের নিদর্শন মিলে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকখানি প্রহসনে এবং অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে। পরশুরামের হাস্যরসের অন্তরালেও আছে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ইঙ্গিত।

এই তিনপ্রকার হাস্যরসের মধ্যে রবীন্দ্র-রচনায় wit-জাতীয় হাস্যরসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চাঙ্গের wit বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সাধারণের বিশেষ চিত্তগ্রাহী না হইলেও শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, মার্জিতরুচি, কাব্যামোদী পাঠক বা শ্রোতার নিকট পরম উপাদেয় বস্তু। এই শ্রেণীর রসবোধ ও রুচির মধ্যেই রবীন্দ্র-হাস্যরসের স্থায়ী আসন নির্ধারিত, এইখানেই উহার প্রকৃত মূল্য-নিরূপণ।

রবীন্দ্র-কৌতুকে humour-এর অংশও সামান্য-কিছু দেখা যায়। এইপ্রকার হাস্যরস প্রধানত ব্যক্ত হয় চরিত্র সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রহসন' বা 'কমেডি' তিনখানার মধ্যে একটি চরিত্রে এইপ্রকার অশ্রু-স্নিগ্ধ হাসির আলোক-দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়। সেটি হইল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ-চরিত্র। এমন সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত, উদারহৃদয়, আত্মভোলা, খাঁটি ভদ্রলোকটি যখন কেদারের চক্রান্তে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত, তখন আমাদের হাসি যেন একটা ক্ষীণ বেদনার ছায়ায় ম্লান হইয়া যায়।

ব্যঙ্গ-হাস্যরসও রবীন্দ্র-রচনায় খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতুক'-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনায় ইহার নিদর্শন আছে। 'চিরকুমার-সভা'য় wit -এর চরম প্রকাশের সঙ্গে চিরকৌমার্যের প্রতি কবির ব্যঙ্গের একটা ক্ষীণ ঝংকার বাজে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাংলা-সাহিত্যে প্রহসন-রচনার একটা ধারা চলিয়া আসিতেছিল। এইজাতীয় রচনার পথপ্রদর্শক মাইকেল। তাঁহার রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি প্রহসন একটা নূতন সাহিত্যরূপের সৃষ্টি করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তৃপ্তিও দিয়াছিল এক শ্রেণীর বাঙালীর রসবোধকে। এই-সব রচনার মধ্যে wit ও humour থাকিলেও ব্যঙ্গরসের ধারাটি ছিল সুস্পষ্ট। পরবর্তী কালে অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে ব্যঙ্গই ছিল মূল-উদ্দেশ্য। এই-সব প্রহসনে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণকারীদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক অধঃপতন, সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের চরিত্রের নানা দুর্বলতা, পূর্ববঙ্গীয়দের ভাষা ও চাল-চলন, শিক্ষিতা মেয়েদের হাব-ভাব-চলা-ফেরা, ব্রাহ্মদের আচার-ব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতিই ছিল নির্মম বিদ্রূপের বিষয়বস্তু। একটা কুরুচি ও vulgarity-র আবহাওয়া হইতে ইহারা মুক্ত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ব্যঙ্গলেশবর্জিত, নির্দোষ, মার্জিত হাস্যরসের প্রহসন। 'চিরকুমার-সভা'র মধ্যে একটা আদর্শের উপর ব্যঙ্গদৃষ্টিপাত থাকিলেও তাহা নৈর্ব্যক্তিকতা প্রাপ্ত হইয়া অনাবিল হাস্যরসেরই পরিপুষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপহীন, স্বচ্ছ, অনাবিল হাস্যরসের প্রহসনের প্রবর্তক। বহু-পরবর্তী যুগে বাংলা-সাহিত্যে আমরা এইরূপ নির্দোষ হাস্যরসের আর একখানি প্রহসন দেখিতে পাই। ইহা রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল'।

গোড়ায় গলদ

(১২৯৯)

প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত-সমাজ'-এ অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই 'গোড়ায় গলদ' রচিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও প্রযোজনায় ঐ সমিতির সভ্যগণের দ্বারা প্রথম অভিনীত হয়।

প্রথম অভিনয়ের বিবরণটি একটু কৌতূহল উদ্রেক করে,—

'গোড়ায় গলদ' অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অত্যন্ত স্বাভাবিক করিবার জন্য অটলকুমার সেন, যিনি শিবু ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তিনি নাকি সামনের গোটা দুই দাঁত তুলিয়া কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। অভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন হইতে সকলপ্রকার কৃত্রিমতার আভাস বিলুপ্ত করিতে পারেন, ও কথাবার্তায় হাবভাবে চাল-চলনে গলার স্বরে ও শব্দের উচ্চারণে অভিনয়ে ঘরোয়া ভাবভঙ্গি ফুটাইতে পারেন, ইহাই ছিল সংগীত-সমাজের অভিনয়-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দানের বিশেষ লক্ষ্য। পটলডাঙ্গার হেমচন্দ্র বসুমল্লিক—নিবারণ, ব্যারিস্টার ভুবন-মোহন চাটুজ্জে—ললিত চাটুজ্জে, ও শ্রীশচন্দ্র বসু—চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় নামেন। শ্রীশ বাবু গান করিতে পারিতেন না, তাই রবিবাবু নিজ নামেই স্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দিলেন। তাঁহার অবতারণার জন্য নাটকীয় কথোপকথনে কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। চন্দ্রবাবু তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শুনিবার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে সকলের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল, তিনিই শেষ গানটি গাহিলেন,—'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো'। (রবীন্দ্র-জীবনী)

'গোড়ায় গলদ' নাটকের কথাবস্তু এইরূপঃ—

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ, নিমাই প্রভৃতিকে লইয়া একটি বন্ধুগোষ্ঠী। চন্দ্রকান্ত উকিল, বিবাহ করিয়াছে—স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি। অন্যান্য সকলে অবিবাহিত। বিনোদ এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া সবে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে,—পসার হয় নাই; থাকে পটলডাঙ্গার এক মেসে। নিমাই শিবচরণ ডাক্তারের ছেলে,—মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে। চন্দ্রকান্ত কবি-ভাবাপন্ন, নলিনাক্ষও তাই; বিনোদ তো দস্তুরমতো কবি,—'কানন-কুসুমিকা' কাব্যগ্রন্থের লেখক। নিমাই বলে—প্রেম একটা ব্যাধি, অজীর্ণ রোগের নামান্তর,—ভালো করিয়া খাইয়া হজম করিতে পারিলে কবিত্ব-রোগ কাছে ঘেঁষিতে পারে না। কিন্তু তাহার নিজের ব্যবহারে এ-ব্যাখ্যা খাটে নাই।

এক রবিবারের সকালে ইহারা চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানায় আড্ডা দিতেছিল। আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা চলিতেছিল অবিবাহিত লোকের মনের অবস্থা, কাহার কিরূপ স্ত্রী পছন্দ ইত্যাদি বিষয় লইয়া। এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে সুললিত কণ্ঠের গান শোনা গেল।

পাশের বাড়ীটি নিবারণবাবুর। সেই বাড়ীতে নিবারণবাবুর নিজের কন্যা ইন্দুমতী ও তাঁহার পরম বন্ধু আদিত্যবাবুর কন্যা কমল বাস করে। আদিত্যবাবু মৃত্যুকালে একমাত্র মেয়েকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করিয়া যান। সেই হইতে নিবারণবাবু নিজের কন্যার মতো কমলকে লালন-পালন করিয়াছেন ও লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। নিবারণবাবু অনেকটা আধুনিক-ভাবাপন্ন লোক। মেয়ে দুইটিকে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া ভালো-রূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সেদিন সকালে কমল গান গাহিতেছিল।

গান শুনিয়া বিনোদ ঠিক করিল—ঐ মেয়েকেই বিবাহ করিবে সে। চন্দ্রকান্তবাবু পাশের বাড়ীর সকলেরই বিশেষ পরিচিত। সে বিনোদের সঙ্গে কমলের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য নিবারণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সঙ্গে গেল বিনোদ ও নিমাই। নিবারণবাবু সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তিনি বিনোদের সম্বন্ধে আলাপে এতই

মগ্ন হইয়া পড়িলেন যে, নিমাই-এর পরিচয় লইবার কোনো অবসরই পাইলেন না। নিমাই দেখিতে বেশ সুশ্রী। ইন্দু আড়াল হইতে এই সুদর্শন যুবক ও তাহার হাব-ভাব দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু নিবারণবাবুর নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও তাহার পরিচয় পাইল না।

শিবচরণ ডাক্তার নিবারণের বাল্যবন্ধু। শিবচরণ তাঁহার ছেলে নিমাই-এর সঙ্গে ইন্দুর বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। নিবারণ আনন্দের সঙ্গে এ-প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন—বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'নিমাই' নামটি ইন্দুর পছন্দ হয় নাই। নিমাই গয়লার নাম হইতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের নাম হইতে পারে না।

এদিকে নিমাই-এর পরিচয় জানিবার জন্য ইন্দু ক্ষান্তমণির নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দুর বর্ণনা শুনিয়া ক্ষান্ত বলিল, সে নিশ্চয়ই ললিত চাটুজ্জে, তাহার স্বামীর আর একজন বন্ধু। ক্ষান্ত ভালো লেখাপড়া জানে না, তাই যথাযোগ্য কথা বলিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে না,—সে জন্য তাহার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। ইন্দুকে সে-কথা বলিতেই কৌতুকপ্রিয় ইন্দু চন্দ্রকান্তের চাপকান ও শামলা পরিয়া স্বামী সাজিয়া স্বামী কাছারী হইতে আসিলে কি ভাবে সম্ভাষণ করিবে, ক্ষান্তমণিকে শিখাইতে লাগিল। ক্ষান্ত তো হাসিয়া খুন। এমন সময় চন্দ্রকান্তবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইন্দু তাড়াতাড়ি পলাইতে চেষ্টা করিল—ক্ষান্তমণিকে অনুরোধ করিয়া গেল, চন্দ্রবাবু আসিলে সে যেন বলে, বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ীর কাদম্বিনী আসিয়াছিল—তাহার কথা যেন না বলে। বৈঠকখানা ঘর দিয়া পলাইতে গিয়া দেখে সেখানে নিমাই (নূতন পরিচয়ে ললিত) বসিয়া আছে। তখন তাড়াতাড়ি শামলা-চাপকান খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'তোমার বাবুর এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিওনা, আর শীগ্গির দেখে এস দেখি বাগ্বাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পাল্কী এসেছে কিনা।' নিমাই বাহির হইতে দেখিয়া আসিয়া বলিল—পাল্কী আসে নাই। 'আমার পাল্কী নিশ্চয়ই আসিয়াছে' বলিয়া কোনো মতে ইন্দু পলায়ন করিল।

নিমাই ইন্দুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং মনে মনে ঠিক করিল, বাগবাজারের চৌধুরীদের এই কাদম্বিনীকেই তাহার বিবাহ করা চাই। প্রথম প্রণয়োন্মেষে ডাক্তারের ঘাড়ে কবিত্বের ভূত চাপিল। কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ছন্দ মিলাইয়া তাহার পক্ষে কবিতা লেখা কঠিন, তাই হাস্যকর কবিতার কয়েকটি নমুনা খাড়া করিল,—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন ক'রে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!
পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।...ইত্যাদি আর বাগবাজারের রাস্তায় কাদম্বিনীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে বিবাহের পর স্ত্রীকে লইয়া বাসা করিয়া থাকিবার সংগতি না থাকায় বিনোদ কমলকে নিবারণবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। কমলের পিতা আদিত্যবাবু কমলের জন্য প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। পাছে টাকার লোভে অযোগ্য ব্যক্তি তাঁহার মেয়েকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হয়—এই আশঙ্কায় তাহার বিবাহের পূর্বে এই অর্থের কথা প্রকাশ করিতে নিবারণবাবুকে নিষেধ করিয়া যান। এখন নিবারণবাবু কমলকে অর্থ দিলেন। কমল এইবার বিনোদকে জব্দ করিবার এক কৌশল করিল। সে পৃথক্ একটা বাড়ী ভাড়া

লইয়া জমিদারের মতো বাড়ী সাজাইয়া বসিল এবং বিনোদকে তাহার এস্টেটের উকিল নিযুক্ত করিল, বিনোদকে আত্মপরিচয় দিল না, ঘোমটার আড়াল হইতে কথা বলিতে লাগিল। শেষে সে একা-একা থাকে বলিয়া বিনোদের স্ত্রীকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইতে অনুরোধ করিল। বিনোদ কমলের জন্য মনে মনে বিশেষ লজ্জিত ছিল, এবার বিষম মুশকিলে পড়িল। শেষে নিবারণবাবুর নিকট কমলকে আনিবার প্রস্তাব করিল।

আবার এদিকে ইন্দু ললিতাকে ছাড়া কাহাকেও বিবাহ করিবে না। কমল জানে, ললিত চাটুজ্জে বিনোদদের বন্ধু-গোষ্ঠীর একজন। সে তাহার এক বন্ধু কাদম্বিনীর সংগে ললিতের বিবাহ ঘটাইবার জন্য বিনোদকে অনুরোধ করিল। ললিতকে বিনোদ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল। ললিত সাহেবী-ভাবাপন্ন। সে বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কমলের কথামতো তাহার নিকট কাঁদম্বিনীর নাম করিয়াও বিনোদ কোনো ফল পাইল না। সে বিনোদকে একরকম অপমানিত করিয়াই চলিয়া গেল! প্রকৃতপক্ষে সে তো কোনোদিন কাদম্বিনীকে দেখে নাই বা তাহার নামে কবিতা লেখে নাই। যাহোক, অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর ইন্দুকে নিমাই-এর সম্মুখে হাজির করা হইল। তখন উভয়েই উভয়ের ভুল বুঝিতে পারিল। ইন্দু নিমাইকে এবং নিমাই ইন্দুকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। কিন্তু শিবচরণ বাবু যে চৌধুরীদের কথা দিয়াছেন, তাহা রক্ষা হয় কি করিয়া? তখন চন্দ্রকান্ত ললিতের সংগে কাদম্বিনীর বিবাহ ঠিক করিল। কাদম্বিনী কুরূপা হইলেও চৌধুরীদের প্রচুর অর্থ। ললিত টাকার জন্য বিবাহ করিতে রাজী হইল। টাকা লইয়া সে বিলাত যাইবে!

তারপর কমল বিনোদকে আত্মপরিচয় দিল। উভয়ের মিলন হইল। ইন্দুর সংগেও নিমাই-এর বিবাহ হইল। গোড়ায় গলদ থাকিলেও শেষরক্ষা হইল।

'গোড়ায় গলদ'-এর নাট্য-ঘটনার মূলে আছে ভুল—অর্থাৎ গোড়ায় গলদ। ইন্দুমতী নিমাইকে ললিত বলিয়া ভুল করিয়াছে, আর নিমাইও ইন্দুকে বাগবাজারের কাদম্বিনী বলিয়া ভুল করিয়াছে। আবার ব্রীফ্‌লেস উকিল বিনোদের স্ত্রী কমল যখন সম্পত্তির মালিক হইয়া বিনোদকে তাহার এস্টেটের উকিল নিযুক্ত করিল, তখন বিনোদ তাহাকে স্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। এই-সব ভুলের সংশোধন পর্যন্ত নাটকের ঘটনার বিভিন্ন গতি,—শেষে ভুলের সংশোধনে মিলন—শেষরক্ষা। ইহা একপ্রকার Comedy of Errors,—ঘটনা-সংস্থানের মধ্যেই ইহার নাট্যরস।

গোড়ায় গলদ যাহাতে সৃষ্টি হইল, সেই আসল ঘটনাটির সমাবেশের মধ্যে কিন্তু একটা অস্বাভাবিকত্ব নিহিত আছে। ইন্দুমতী অন্য এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি ঘরে উপবিষ্ট ভদ্রবেশধারী সুদর্শন যুবককে সেই বাড়ীর চাকর বানাইয়া পাল্‌কির সন্ধানে পাঠাইল—এই ঘটনাটি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। কবি ইন্দুকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন,—এই বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে এইরূপ ব্যবহার একেবারে অবিশ্বাস্য ছ্যাবলামির সীমায় পৌঁছিয়াছে। অন্য উপায়ে কবি ইন্দুর কাদম্বিনী-পরিচয় দেওয়াইতে পারিলে ভালো করিতেন।

বন্ধুদলের চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই। চন্দ্র-বিনোদ-নিমাই-নলিনাক্ষ প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। চন্দ্র ও বিনোদ তো দস্তুরমতো কবি; ডাক্তারির ছাত্র নিমাই—যে প্রেমকে মনে করে একটা শারীরিক ব্যাধি—সে-ও দলে ভিড়িয়া কবিতা লেখা অভ্যাস করিল এবং

বাগবাজারের কাদম্বিনীর বাড়ীর সামনে উঁকি দিতে লাগিল। সকলেই অল্পাবিস্তর কবি-দৃষ্টিসম্পন্ন, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় কথা বলে, উৎকৃষ্ট কাব্যময় ভাষায় অনর্গল মনের ভাব প্রকাশ করে।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে ইন্দু বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতুকপ্রিয় ও লীলা-চঞ্চল।

ক্ষান্তমণি সেকেলে গৃহিণীর টাইপ। স্বামীকে ইহারা গভীরভাবে ভালোবাসে,—কিন্তু প্রেমের কলাময় বাহ্য অভিব্যক্তি ইহাদের আচরণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না;—নানা সুললিত বাক্য ও আকর্ষণীয় ব্যবহারে স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার কৌশলটি ইহাদের একেবারেই জানা নাই। প্রণয়িনী অপেক্ষা গৃহিণীর অংশই ইহাদের মধ্যে বেশি পরিস্ফুট।

সমগ্র নাটকের মধ্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র চরিত্র সত্যকার বাস্তবরসের মাধুর্যে ও শিল্পগত উৎকর্ষে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই ক্ষুদ্র চরিত্র-চিত্রণে কবি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এটি শিবচরণ ডাক্তারের চরিত্র।

শিবচরণ প্রাচীনপন্থী অভিভাবক। ইহাদের কাছে বিবাহ একটি অবশ্যকরণীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় এই বিবাহ সম্পন্ন হওয়াই চিরাচরিত রীতি। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যার বিবাহে আপত্তি বা পাত্রপাত্রীর পরস্পরের পছন্দ বা ভালোবাসা প্রভৃতির বিশেষ কোনো মূল্য ইহাদের কাছে নাই। পুত্রের বিবাহের সময় হইয়াছে জানিয়া শিবচরণ তাঁহার বাল্যবন্ধু নিবারণের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন; এদিকে নিমাই বিবাহ করিতে অসম্মত। এ-বিষয়ে পিতাপুত্রের কথোপকথন।—

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিব। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন এক্‌জামিন কাছে এসেছে—

শিব। তা হোক না এক্‌জামিন। বিয়ের সঙ্গে এক্‌জামিনের যোগটা কি? বৌমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, তারপর তোমার এক্‌জামিন হয়ে গেলে ঘরে আনবো।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভালো বোধ হয় না—

শিব। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছিনে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্যে হচ্ছে?

নিমাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিব। উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হয়েছো যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে? (নিমাই নিরুত্তর) তোমার হোলো কি? বিয়ে করবে তার আবার এতো ভাবনা কি? আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিব। (সরোষে) অনুরোধ কি রে বেটা? হুকুম করবো। আমি বলছি তোকে বিয়ে করতেই হবে।

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না।

শিব। (উচ্চৈঃস্বরে) কেন পারবিনে? তোর বাপ পিতামহ তোর চোদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে আর তুই বেটা দুপাতা ইংরেজি উল্টে আর বিয়ে করতে পারবিনে। এর শক্তটা কোন্‌খানে! কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে

নিবি—তোকে গড়ের বাদ্যিও বাজাতে হবে না, ময়ূরপংখীও বইতে হবে না, আর বাতি জ্বালাবার ভারও তোর উপর দিচ্ছিনে!

প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের বিবাহে আপত্তির অর্থ শিবচরণ বুঝিতে পারেন না। উপযুক্ত পাত্রের অভিভাবক হিসাবে তিনি সব ঠিক করিয়াছেন, এক পক্ষকে কথা দিয়াছেন—এখন তাঁহার অবস্থা বেগতিক।

তারপর বাগবাজারের রাস্তায় পিতাপুত্রের দৈবাৎ সাক্ষাৎ,—

শিব। শুনছো? কালেজ কোন্ দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ঐ জান্‌লায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? (নিমাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া: এই তোর এক্‌জামিন। এইখানেই তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিব। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এসো? সহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই। এ তোমার দার্জিলিং সিম্‌লে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নায় দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্‌জামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে—তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

শিবচরণ যখন জানিতে পারিলেন যে, চৌধুরীদের কাদম্বিনী-ভূতই ঘাড়ে চাপিয়া পুত্রকে তাড়া করিয়া বাগবাজারে ঘুরাইতেছে, তখন স্নেহদুর্বল পিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাদম্বিনীর সঙ্গে নিমাই-এর বিবাহ ঠিক করিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বিবাহ দিতেই হইবে—তা ইন্দুমতীর সঙ্গেই হউক আর কাদম্বিনীর সঙ্গেই হউক। তবে বন্ধু নিবারণের সঙ্গে কথার খেলাপে তিনি দুঃখিত।

শেষে নিমাই যখন কাদম্বিনীর প্রকৃত পরিচয় পাইল, তাহার পরে পিতাপুত্রের কথোপকথনটি যেমনি চমৎকার তেমনি উপভোগ্যঃ—

নিমাই। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে—বিশেষ আপনি নিবারণ-বাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিব। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাই-এর মুখের দিকে নিরীক্ষণ)—তুই ক্ষেপেছিস না আমি ক্ষেপেছি কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল আমি বুঝি।

নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবো না।

শিব। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে বিয়ে করবি?

নিমাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিব। (উচ্চৈঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি, তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর ক্ষেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস্!

অবশ্য বাগবাজারে বিবাহ-ভাঙায় মনে-মনে তিনি হয়তো সন্তুষ্টই হইয়াছেন—কিন্তু

তাঁহার কথার মূল্য? সেকালের এই-সব অভিভাবকদের কথা ঠিক রাখা একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য,—'এখন আমি চৌধুরীদের বলি কী'—এইটাই তাঁহার বিশেষ সমস্যা। অবশ্য চন্দ্রকান্ত তাহার সমাধান করিয়া দিল ললিতকে দিয়া।

উপরি-উদ্ধৃত তিনটি অংশই এই প্রহসনটির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। চরিত্রের উপর আলোক-নিক্ষেপকারী এমন সহজ, স্বাভাবিক, হাস্যোরসোচ্ছল সংলাপ এই নাটকের আর কোথাও নাই। স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিগত যুগের সামাজিক-ব্যবহারনিপুণ, সত্যভাষী, সরল, স্নেহপ্রবণ অভিভাবকদের একটি ক্ষুদ্র জীবন্ত আলেখ্য অত্যুজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।

'শেষরক্ষা' 'গোড়ায় গলদ'-এরই সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপ। কতকগুলি গানের সংযোগে ইহাকে যথার্থ মঞ্চাভিনয়ের উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দুই-এক জায়গায় একটু-আধটু রদবদলও করা হইয়াছে। 'গোড়ায়-গলদ'-এর নিমাই 'শেষরক্ষা'য় গদাই নাম পাইয়াছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'শেষরক্ষার' অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বৈকুণ্ঠের খাতা

(১৩০৩)

'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'গোড়ায় গলদ' অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। 'গোড়ায় গলদ' পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক নাটক, আর 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র নাট্য-ঘটনা সমাপ্ত হইয়াছে মাত্র তিনটি দৃশ্যে। 'গোড়ায় গলদ'-এ হাস্যরসের কেন্দ্র ছিল ঘটনা-বিপর্যয়; 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র হাস্যরস নিহিত চিত্রসৃষ্টিতে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র গল্পাংশ সংক্ষেপে এইরূপঃ—

বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বড়ো ভাই বৈকুণ্ঠ সংসারের মানুষ, কিন্তু তাহার হালচাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার সাহিত্য-সাধনা ও জ্ঞানচর্চা লইয়াই সে মগ্ন। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র তাহার গবেষণার বিষয়। সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহার গবেষণা তাহার এক 'খাতা'র মধ্যে সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং বিপুল উৎসাহের সহিত সকলকেই সেই লেখা শুনাইতে চায়। ছোটো ভাই অবিনাশ ছশ' টাকা মাহিনার চাকুরি করে, মাহিনার সমস্ত টাকাটা দাদার হতে ধরিয়া দেয়, নিজের প্রয়োজন হইলে দাদার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লয়। তাহার বয়স প্রায় চল্লিশ, বিবাহ করে নাই, বাগান করা বিশেষ শখ।

কেদার একজন পাকা জুয়াচোর ও ঠক। অন্যকে প্রতারণা করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করাই তাহার কাজ। তিন কুলে কেহ নাই এমনি এক ছন্নছাড়া যুবক—নাম তিনকড়ি—এই কর্মে তাহাকে সহায়তা করে। কেদার ঠিক করিয়াছে, অবিনাশের সঙ্গে তাহার সুন্দরী শালীকে বিবাহ দিয়া আত্মীয়তার দাবিতে সে ক্রমে ক্রমে তাহার বাড়ীঘর দখল করিয়া বসিবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে আগে বৈকুণ্ঠকে হাত করা দরকার, তাই সে বৈকুণ্ঠের খাতা শুনিবার একজন পরম আগ্রহশীল শ্রোতা সাজিয়া বসে, তাহার লেখার প্রশংসা করে এবং এক চীনাম্যানের নিকট হইতে জুতার হিসাব চাহিয়া আনিয়া চীনা সংগীতশাস্ত্রের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বলিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করে। শেষে বৈকুণ্ঠের দ্বারা প্রস্তাব করাইয়া অবিনাশকে তাহার শালী দেখায়।

অবিনাশ তাহার শালী মনোরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও তাহাকে বিবাহ করে। বিবাহের পর কেদার তাহার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে আনিয়া বাড়ী ভর্তি করিয়া ফেলে এবং বৈকুণ্ঠকেও তাড়াইবার চেষ্টা করে। কেদারের এক বিধবা পিসী বাড়ীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যা নিরুর উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। শেষে অবিনাশ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত কুটুম্বকে দূর করিয়া দিল'।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত, সংসারানভিজ্ঞ বৈকুণ্ঠ আমাদের হাসির খোরাক জোগাইলেও আমাদের সহানুভূতি হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হয় না। বিষয়ী লোকের বিচারের মানদণ্ডে সে নিতান্ত মূর্খ ও হাসির পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার নির্মল, সরল, উদার হৃদয়, নিজের লাভ-ক্ষতি চিন্তা না করিয়া সকলকে আপন করিবার অকপট প্রয়াস এবং অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই প্রকৃত ভদ্রলোকের আদর্শটি বজায় রাখিবার চেষ্টার মধ্যে যে-অকৃত্রিম মাধুর্য আছে, তাহা আমাদের হৃদয়কে অনিবার্যরূপে স্পর্শ করে। তাহাকে দেখিয়া আমাদের হাসির উচ্ছ্বাস একটা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়।

কেদার ও তিনকড়ির চরিত্রও কবি চমৎকার আঁকিয়াছেন। কেদারের মতো স্বার্থান্বেষী, বিবেকহীন প্রতারক আমরা অবশ্য অনেকই দেখিয়া থাকি, কিন্তু তিনকড়ির মতো অবস্থার দায়ে প্রতারক খুব বেশি দেখা যায় না। এইটাই তিনকড়ির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনকড়ি আত্মীয়স্বজনহীন, ছন্নছাড়া, ভবঘুরে লোক। উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য সে কেদারের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল এবং কেদারের নীচ কাজে সাহায্যও করিয়াছিল, কিন্তু অন্তর তাহার কলুষিত হয় নাই,—বাহিরের নোংরা কাজ তাহার হৃদয়ের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, কেদারের লোভ ও স্বার্থবুদ্ধি তাহার মধ্যে নাই। বৈকুণ্ঠের উদার স্বভাবের জন্য তাহার প্রতি তাহার একটি শ্রদ্ধা ছিল, তাহাকে সে ভালোবাসিত।—

তিনকড়ি।...কিন্তু সত্যি কথা বলতে হয়, বৈকুণ্ঠকে যদি তুই ফাঁকি দিস্ তা হলে অধর্ম হবে—আমার সঙ্গে যা করিস্ সে আলাদা—

কেদার। ইস্, এতো ধর্ম শিখে এলি কোথা থেকে।

তিনকড়ি। তা যা বলিস্ ভাই—যদিচ তুমি আমি এতো দিন টিঁকে আছি, তবু ধর্ম বলে একটা কিছু আছে। দেখো কেদারদা, আমি, যখন হাঁসপাতালে পড়ে ছিলুম, বুড়োর কথা আমার সর্বদা মনে হোতো—পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই এখন কেদারদা'র হাত থেকে বুড়োকে কে ঠেকাবে! বড়ো দুঃখ হোতো।

তিনকড়ি কবির সার্থকসৃষ্টি।

চিরকুমার-সভা

(উপন্যাস ১৩১১; নাটক ১৩৩২)

'চিরকুমার-সভা' প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে উপন্যাসরূপে। ১৩০৭ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় ইহা নিয়মিত বাহির হয়। সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালে—হিতবাদী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র অংশরূপে। পরে যখন ১৩১৪ সালের গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া

প্রকাশিত হয়, তখন কবি ইহার নামকরণ করেন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। তারপর ১৩৩২ সালে কবি এই প্রহসন-উপন্যাসটিকে নাট্যরূপে রূপায়িত করেন। অনেক অংশ তখন নূতন রচনা করেন, নূতন গানও অনেক সংযোজিত হয়। এই পুনর্লিখিত সুসংস্কৃত নাট্যরূপের কবি পুনরায় নামকরণ করেন 'চিরকুমার-সভা'।

'চিরকুমার-সভা'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপঃ—

'চিরকুমার-সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত যে, তাহারা চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়া নানাভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। এই সভার সভাপতি ছিলেন চন্দ্রমাধববাবু। বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন, আত্মভোলা এই অধ্যাপকটির মাথার মধ্যে ভিড় জমাইয়াছে দেশোদ্ধারের নানা আইডিয়া। শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ প্রভৃতি যুবকগণ ইহার সভ্য। অক্ষয়ও ইহার সভ্য ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিবাহ করিয়া সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছে।

জগত্তারিণী একজন হিন্দু ভদ্রমহিলা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হিন্দু সমাজেরি লোক কিন্তু তাঁহার চালচলন ছিল নব্য। তিনি তাঁহার মেয়েদের দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জগত্তারিণী মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করিয়াছেন এবং শীঘ্র বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন।

অক্ষয়কুমার জগত্তারিণীর বড়ো জামাতা। সে আগে ছিল চিরকুমার-সভার সভ্য। অক্ষয় পুরা নব্য। শালীদিগকে পাশ করাইয়া নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে বড়ো রকমের কাজ করে সে। ছয়মাস থাকে সিমলা পাহাড়ে। শীতের কয়মাস তাহাকে কলিকাতায়ই থাকিতে হয়, সে-সময়টা শাশুড়ীর পীড়াপীড়িতে সে ধনী শ্বশুর-গৃহেই যাপন করে। বিধবা শাশুড়ী তাহাকে অনাথ পরিবারের অভিভাবক বলিয়া মনে করেন। অক্ষয়ের স্ত্রী পুরবালা জগত্তারিণীর বড়ো মেয়ে। মেজো মেয়ে শৈলবালা বিবাহের একমাস পরে বিধবা হয়। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মতো দেখিতে। সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি. এ. পাশ করিবার জন্য উৎসুক। সেজো মেয়ে নৃপবালা শান্ত-স্নিগ্ধ স্বভাবের। ছোটো মেয়ে নীরবালা চটুলা, সাবলীলা—কৌতুক ও চাঞ্চল্যে সর্বদাই আন্দোলিত—যেন বনহরিণীটি। এই সেজো ও ছোটো মেয়ে দুইটিকে শীঘ্রই সুপাত্রে দান করিবার জন্য জগত্তারিণী ব্যগ্র।

অক্ষয় কৌতুকপ্রিয়, রসজ্ঞ, স্বভাব-কবি,—মুখে মুখে কবিতা বানাইয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করিয়া গাহিতে পারে। শালী-মহলে তাহার পসার অত্যন্ত বেশি। শালীরা তাহাকে 'শালীবাহন দি গ্রেট্' উপাধি দিয়াছে।

রসিক দাদা বাড়ির মৃত কর্তার সম্বন্ধে খুড়া। সে দীর্ঘকাল এই বাড়িতে কর্তার আশ্রয়ে থাকিয়া পরিবারবর্গের সহিত একরূপ অভিন্নভাবে সুখে-দুঃখে জড়িত। বয়সে সে বৃদ্ধ এবং চিরকুমার। রসিক বাস্তবিকই রসিক এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত—অনর্গল সংস্কৃত সাহিত্যের শ্লোক আওড়াইতে পারে। এক-এক সময় মুখে মুখে বাংলা ছন্দে তাহার অনুবাদ করিয়াও শুনায়।

অক্ষয়, শৈল প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, চিরকুমার-সভার সভ্য শ্রীশ ও বিপিনকে ভাগাইয়া আনিয়া নৃপবালা ও নীরবালার সঙ্গে বিবাহ দিবে। সেজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে অক্ষয় সভাপতি চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রবাবুকে জানাইল যে, তাহার কোনো মফঃস্বলের ধনী বন্ধু তাঁহার একটি সন্তানকে তাঁহাদের কুমার-

সভার সভ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার এক বৃদ্ধ দাদাও সভ্য হইবেন। আর সেই সঙ্গে সভার জন্য বিনাভাড়ায় আলোবাতাসযুক্ত একটা ভালো ঘরও পাওয়া যাইবে। চন্দ্রবাবু পুরুষবেশী শৈলকে এবং রসিক দাদাকে সভ্য করিয়া লইলেন এবং সভার জন্য প্রদত্ত ঘরটি দেখিয়াও পছন্দ করিলেন। সভার জন্য ঘর নির্দিষ্ট হইল অক্ষয়ের শ্বশুর-বাড়ীতে। অক্ষয়, শৈল ও রসিকের উদ্দেশ্য হইল কোনোরকমে শ্রীশ ও বিপিনের সঙ্গে নৃপবালা ও নীরবালার সাক্ষাৎ ঘটানো।

সভার দিন শ্রীশ ও বিপিন অক্ষয়ের বাড়ীতে সভার ঘরে উপস্থিত হইল। একটু পূর্বে এই ঘরে নৃপ, নীর প্রভৃতি বসিয়া ছিল, শ্রীশ ও বিপিনকে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু ঘরে ছিল তাহাদের অনেক স্মৃতিচিহ্ন। শ্রীশ নৃপবালার একখানা রুমাল ও বিপিন নীরবালার একখানা গানের খাতা পকেটে পুরিল। শেষে রসিকদার নিকট হইতে উভয়েই তাহাদের খবর জানিয়া একরূপ প্রেমে পড়িয়া গেল।

রসিকদাদা হঠাৎ তাহাদের জানাইল যে, নৃপ ও নীরর মা কাশী হইতে আসিয়া দুইটি অকালকুষ্মাণ্ড ছেলের সহিত তাহাদের বিবাহ ঠিক করিতেছেন। শীঘ্রই তাহারা মেয়েদের দেখিতে আসিবে। শ্রীশ ও বিপিন সেই পাত্র দুইটির হাত হইতে নৃপ ও নীরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। যথানির্দিষ্ট দিনে তাহারা নৃপবালা ও নীরবালাকে দেখিল এবং বিবাহ করিতে পরম আগ্রহ প্রকাশ করিল। জগত্তারিণী তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন। বিবাহ ঠিক হইয়া গেল।

চন্দ্রবাবু চিরকুমার-সভায় স্ত্রীলোক সভ্য লইতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার ভাগিনেয়ী নির্মলাকে সভ্যারূপে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে কুমারসভা হইতে কুমারব্রত-গ্রহণের নিয়মই উঠাইয়া দিলেন এবং পূর্ণের সঙ্গে নির্মলার বিবাহ দিলেন।

এই 'প্রহসন' বা 'কমেডি'টির নাটকীয় শিল্পরূপ দুর্বল, ঘটনা-সমাবেশ শিথিল, চরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও হাস্যরস গভীরতা বা কেন্দ্রসংহতি লাভ করে নাই; 'গোড়ায় গলদ'-এর মতো ইহার গল্পাংশেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নাই।

ট্র্যাজেডিই হউক, আর কমেডিই হউক, নাটকের মূলে কমবেশি একটা দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধ-শক্তির সংঘাত থাকিবেই; উহা না হইলে নাটক হয় না। এখানে একদিকে আদর্শের প্রেরণায় চিরকৌমার্যব্রত, অন্যদিকে যৌবনোচিত হৃদয়-বৃত্তির দাবি বা নারীর প্রতি আকর্ষণ—এই উভয় শক্তির দ্বন্দ্বে কেমন করিয়া নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া কৌমার্যব্রত ভাঙিতেছে, তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চিত্রই যে এই নাটকের মূলবিষয়বস্তু হওয়া উচিত, তাহা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয়। সেই হাসি ততোখানি গভীর ও রসোজ্জ্বল হইবে, যতোখানি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত ব্রতচারীরা সেই আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিবে এবং পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে পরাজয় বরণ করিবে। কিন্তু এই চিরকুমার-সভার সভ্যেরা কেহই তাহাদের আদর্শকে প্রাণ-মন দিয়া গ্রহণ করে নাই। শ্রীশ, বিপিন যেন একটা সাময়িক খেয়ালের বশে চিরকুমারসভার সভ্য হইয়াছে;—কখন কৌমার্য ভাঙিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে, সেই সুবর্ণসুযোগের অপেক্ষায়ই যেন বসিয়া আছে। পূর্ণের সভ্য হওয়া তো কেবল নির্মলার জন্য। অক্ষয় প্রয়োজন বুঝিয়া আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। চিরকুমার-সভা যেন আসলে একটি বিবাহ-অফিস,—বিবাহ করিতে হইলে এখানে একবার ভর্তি হইতে হইবে। তাই অক্ষয় চিরকুমার-সভায় শালীদের জন্য পাত্রের খোঁজ করিয়াছে। রসিকের একটি সরল মন্তব্যেই এই কুমারদের স্বরূপটি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে,—'ভাই শৈল, কুমার-সভার সভ্যগুলিকে যে-রকম ভয়ংকর

কুমার ঠাউরেছিল্‌ম তার কিছ্‌ই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই ব্‌ড়ো রসিকই পারে।' বাস্তবিক মেনকা রম্ভা তো দ্‌রের কথা—মাত্র র্‌মাল আর গানের খাতাতেই দ্‌ই কুমারই একেবারে কাব্‌—বাজীমাৎ! সভাপতি চন্দ্র-বাব্‌রও চিরকৌমার্যের উপর বিশেষ আস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-সভ্য লইতে তাঁহার আপত্তি নাই, বরং সংসারে স্ত্রী-জাতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তিনি অন্‌ভব করেন—'কেবল প্‌র্‌ষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায়, তারা একপায়ে চলতে চায়।...সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দ্‌রে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না।' তাই ঘটনা-সংস্থান বা চরিত্রস্‌ষ্টির মধ্যে কোনো সত্যকার গভীর হাস্যরস-রসিকতা নাই।

ইহার সমস্ত হাস্যরস নির্ভর করিতেছে কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে—অপ্‌র্ব বাগ্-বৈদগ্ধ্যের মধ্যে—ভাবের স্‌ক্ষ্মকার্‌কার্যমণ্ডিত ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের মধ্যে। অক্ষয় ও রসিক তো বলিতে গেলে ইঙ্গিতাত্মক উৎকৃষ্ট কাব্যময় ভাষার চিরন্তন ফোয়ারা-বিশেষ,—মাঝে মাঝে অক্ষয়ের গান ও রসিকের সংস্কৃত-কাব্যের উদ্ধ্‌তি কাব্যের আবহাওয়াকে আরো ঘন করিয়াছে। শ্রীশ ও বিপিন চিরকুমার হইলেও কাব্যের ছোঁয়াচ তাহাদেরও লাগিয়াছে—কথার মধ্যে উপমা-র্‌পকের নিদর্শন বেশ আছে। বৃদ্ধ চন্দ্রবাব্‌র পল্লীসংগঠন, ভারতের দারিদ্র্য-মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বক্তৃতাগ্‌লির মধ্যেও—নাটকের পক্ষে যাহা একর্‌প অবান্তর বলিলেই হয়—আবেগপ্রবণ অতি-ভাষণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্রই কথার চমক লাগাইয়া হাস্যরস-পরিবেষণের চেষ্টা আছে।

এইপ্রকার স্‌ক্ষ্ম-সাহিত্যরস-মণ্ডিত উচ্চাঙ্গের intellectual হাস্য একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের মার্জিত মনের উপভোগের সামগ্রী। কলিকাতায় বিখ্যাত নট-নটী-সম্মেলনে পাবলিক রঙ্গমঞ্চে ইহার যে-কয়টি উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি, এক শ্রেণীর শিক্ষিত, সাহিত্যামোদী শ্রোতৃব্‌ন্দই ইহার রস যথার্থভাবে উপভোগ করিয়াছে, সাধারণ দর্শকদের চিত্ত ইহা তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। রসিক ও অক্ষয়ের ভাষণগ্‌লির তাৎপর্য ও রস এই শেষোক্ত শ্রেণী সম্যক্ উপলব্ধিই করিতে পারে নাই।

এই প্রহসনটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিরকৌমার্যের প্রতি দ্‌ষ্টিভঙ্গীটি লক্ষণীয়। সংসারবিম্‌খ, স্ত্রীপরিজনশ্‌ন্য সন্ন্যাস-ধর্ম কবি কোনোদিনই অন্‌মোদন করেন নাই। এই নেতিবাচক আদর্শ কোনোদিনই সমর্থন লাভ করে নাই তাঁহার। প্‌রাপ্‌রি সন্ন্যাস-জীবন অসম্প্‌র্ণ ও অস্বাভাবিক, আবার প্‌রাপ্‌রি সংসার-সর্বস্বতাও সংকীর্ণ, খণ্ড ও অসম্প্‌র্ণ। যাহার ঐশ্বর্য আছে, সে-ই সন্ন্যাসী হইতে পারে। যাহার ভোগের সামর্থ্য আছে, তাহার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। তাঁহার মতে সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যে সংসারকে, জীবনকে স্বীকার করিয়াও সংসারে আসক্তিহীন, ভোগের মাঝে থাকিয়াও অন্তরে যাহার বৈরাগ্যের অনির্বাণ দীপ জাজ্জ্বল্যমান। রাজার পক্ষেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া সাজে। এই মনোভাব কবির অনেক রচনায় পাওয়া যায়। ইহাই তাঁহার ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ের আদর্শ—সীমা-অসীমের মিলনের আদর্শ।

এই বিবাহবিম্‌খ সন্ন্যাসকে কবি 'ক্ষণিকা'য় ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

আমি হব না তাপস, হব না হব না,
যেমনি বল্‌ন যিনি।
আমি হব না তাপস, নিশ্চয়ই, যদি
না মেলে তপস্বিনী।

গভীরভাবে এই কথাটাই বলিয়াছিলেন 'নৈবেদ্য'তে,—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

এই সমস্তই 'চিরকুমার-সভা'র সমসাময়িক রচনা।

হাস্যকৌতুক

(১২৯২—৯৩, গ্রন্থাকারে ১৩১৪)

ও

ব্যঙ্গকৌতুক

(১২৯২—১৩০০; গ্রন্থাকারে ১৩১৪)

'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর রচনাগুলি প্রধানত শিশুদের নিকট হাস্যরস-পরিবেষণের উদ্দেশ্যেই লিখিত। তবে কতকগুলি ক্ষুদ্রনাট্যে সমসাময়িক নব্যহিন্দুধর্ম-আন্দোলন সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শিশুদের জন্য রচিত হইলেও বয়স্করাও ইহাতে প্রচুর হাস্যরসের খোরাক পাইতে পারে।

এই ক্ষুদ্র নাট্যগুলি 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৩১৪ সালে 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' নামে গ্রন্থাকারে বাহির হয়।

এই নূতন ধরণের হাস্যকৌতুক-প্রবর্তনের ভূমিকাস্বরূপ কবি লিখিয়াছিলেন,—

"সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।..বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সে-গুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।" (বালক, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২)।

এই কৌতুক-নাট্যগুলি সম্বন্ধে কবি 'হাস্যকৌতুক'-এর মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"এই ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্যগুলি হেঁয়ালি-নাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড্ (chrade) নামক এক প্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষ ভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"

কবি যাহাই বলুন, ইউরোপীয় শারাড-এর সঙ্গে এই কৌতুক-নাট্যগুলির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। ইহাদের হাস্যরসের মূল নিহিত আছে অস্বাভাবিকত্বে ও আতিশয্যে। কথোপ-কথনের মধ্যে এই অস্বাভাবিকত্বে একটা হাসির উচ্ছ্বাস আমাদিগকে উল্লসিত করিয়া আনন্দ দান করে।

'হাস্যকৌতুক'-এর মধ্যে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'টি সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইহার মধ্যে ঘটনার গতিতে বেশ একটু নাটকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন প্রকারের কৌতুক একমুখী হইয়া পরিণামে একটি চরম অবস্থা বা climax-এর সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রথম

হইতে শেষ পর্যন্ত একটা আমোদজনক কৌতূহল অক্ষুণ্ণ আছে। 'রোগীর বন্ধু'ও চমৎকার রচনা। রোগীর ভয় ও তাহার বন্ধুর উপদেশের ফলে সেই ভয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যথার্থ উপভোগ্য হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রবল আন্দোলনে ও ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারে যুক্তিবাদী শিক্ষিত-সম্প্রদায় হিন্দু-ধর্মের চিরাচরিত অনুষ্ঠান ও বদ্ধমূল সংস্কারের উপর ক্রমেই আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিল। তখন প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ-সমর্থন ও দৃঢ়ভাবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা নূতন চেতনার উদ্ভব হয়। বলিতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রই এই নূতন হিন্দু-চেতনার প্রবর্তক, এই নব্যহিন্দু-আন্দোলনের স্রষ্টা। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামক দুইটি মাসিকপত্র ছিল এই নব্যহিন্দু-ভাবধারার প্রচারক।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের নিরাকার উপাসনা, স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ-আন্দোলন প্রভৃতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ সংরক্ষণ-পন্থী। প্রাচীন হিন্দু-আদর্শের পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার ব্রত। এই হিন্দুধর্মের সমস্ত সংস্কার প্রাচীন-সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকে তিনি দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক নূতন জাতীয়-চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কি, এক নূতন ধর্মতত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। কোমত প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মনীষীদের জনহিতবাদের সহিত গীতার নিষ্কাম কর্মবাদ মিশাইয়া তিনি এক অভিনব হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই নূতন ধর্মমতের নিদর্শন তাঁহার রচিত অনেক উপন্যাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মমতের প্রতিবাদ করেন। ইহা লইয়া সাময়িক পত্রিকায় (ভারতী, ১২৯১, অগ্রহায়ণ; প্রচার, ১১৯১, অগ্রহায়ণ; ভারতী, ১২৯১, পৌষ, ইত্যাদি) এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে কিছু বাদানুবাদও হয়।

এই সময় এই নব্যহিন্দু-আন্দোলন আবার অত্যন্ত জোরালো হয় শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুর নানা সংস্কার, প্রথা, আচার-ব্যবহারকে মনগড়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে নিঃশেষ যুক্তিসিদ্ধ ও অত্যাজ্য বলিয়া প্রচার করেন; সেন মহাশয় 'কৃষ্ণানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে কল্কি-অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। হিন্দুরা যে প্রাচীন আর্যজাতির বংশধর এবং তাহাদের নিতান্ত যুক্তিহীন, অন্ধ কুসংস্কারও যে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—হিন্দুসমাজের এই দম্ভ ও আস্ফালনে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। মূর্তি-উপাসনা, গুরুবাদ, অবতারবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-প্রচারে প্রতিক্রিয়াশীল, সংরক্ষণ-পন্থী হিন্দুসমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর কয়েকটি নাটিকায় এই আর্যামি ও নব্যহিন্দুয়ানিকেই বিদ্রূপ করিয়াছেন। ঐ সময়ে রচিত তাঁহার 'দাম-চামু' নামক কবিতা (কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ) ও প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কবিতা-পত্র (ভারতী, ১২৯২, ফাল্গুন) প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই-সমস্ত রচনার মধ্যে কবি-মনের একটা আলোড়ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'হাস্যকৌতুক'-এর মধ্যে 'আর্য ও অনার্য', 'সূক্ষ্মবিচার', 'গুরুবিচার' এবং 'ব্যঙ্গ-কৌতুক'-এর মধ্যে 'নূতন অবতার' প্রভৃতি নাটিকায় এই নব্যহিন্দু-আন্দোলনের প্রতি কবির মনোভাবটি প্রতিফলিত হইয়াছে।

'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর 'বশীকরণ' নাটিকাটি নাটকীয় গুণে বেশ উজ্জ্বল। যদিও মন্ত্রের সাহায্যে বশীকরণের মধ্যে কবির একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাব আছে, তবুও ইহার মূলহাস্যরস নিহিত রহিয়াছে ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে, যাহাকে বলা যায় Comedy of errors. ইহা 'গোড়ায় গলদ'-এর সমগোত্রীয়। 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক'টি অনেক পরবর্তী কালের রচনা। বর্তমান সভ্যতার প্রসারে দেবতারা কিভাবে তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইতেছেন, বিভিন্ন দেবতার মুখে তাহার বর্ণনাটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

(৭)

ঋতুনাট্য

এই পর্যায়ের যে-সমস্ত রচনা ঋতুনাট্য নামে চিহ্নিত করা গিয়াছে, তাহাদের মূলে রহিয়াছে ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবকে গানের সূত্রে গাঁথিয়া দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার একটি প্রয়াস—ঋতুর লীলাবৈচিত্র্যকে মানবচিত্তে প্রতিফলিত করিয়া বাহির ও অন্তরের সমন্বয়ের দ্বারা—প্রকৃতি ও মানবের মিলন-সাধন দ্বারা এক অপূর্ব, ভাবগূঢ় আনন্দরস পরিবেষণ করিবার চেষ্টা। এই-সব ঋতুনাট্যে কবি প্রকৃতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া এক নূতন রূপ ও রস, এক নূতন ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন এবং সংগীতের অনির্বচনীয় রথে উঠাইয়া আমাদিগকে সেই আনন্দলোকে লইয়া গিয়াছেন। কবির এই শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা প্রকৃতিকে পাইয়াছি এক নূতন রূপে—দেখিয়াছি এক নূতন আলোকে ও তাৎপর্যে। সংস্কৃতসাহিত্যের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সঙ্গে পরিচিত আছি; ইংরেজ রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কবিতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির অন্তরালবর্তিনী এক চিন্ময়ীশক্তির ধ্যানও দেখিয়াছি আমরা, কিন্তু প্রকৃতির রূপ ও ভাবকে —এই মৃন্ময় ও চিন্ময় অংশকে সুরের ইন্দ্রজালে বন্দী করিয়া এক অনির্বচনীয় রসবস্তুতে পরিণত করার দৃষ্টান্ত এক রবীন্দ্রনাথের নিকটই মিলিয়াছে। বস্তুত এই ঋতুনাট্যগুলি অদ্বিতীয় প্রকৃতি-প্রেমিক কবির এক অভিনব শিল্পরূপ।

ঋতুর রূপ-রস-রহস্যকে অনুভবগম্য করিবার যে আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় একটা নাটকীয় আঙ্গিক। এই ঋতুনাট্যগুলিতে একজন ভাব-ব্যাখ্যাতা আছে, তা ছাড়া অন্যান্য রসজ্ঞ দর্শকও আছে, তাহাদের সম্মুখে প্রকৃতি-প্রতিনিধিরা সংগীতে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে,—বিভিন্ন ঋতু, বাদললক্ষ্মী, শরৎশ্রী, সুন্দর, নদী, বনভূমি, দখিন-হাওয়া, বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, বকুল, মাধবী, করবী, মালতী প্রভৃতির প্রবেশ ও প্রস্থান আছে,—গানে তাহাদের কথা ব্যক্ত হইতেছে। তাই বলিয়া ইহা কেবলমাত্র গানের পালাই নয়—ইহার মধ্যে আছে একটা সূক্ষ্ম নাটকের আবহাওয়া। মানুষের ব্যাখ্যার পটভূমিকায় প্রকৃতি সুরের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতিই এখানে অনেকটা অভিনেতার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে আলোচিত রূপক-সাংকেতিক নাটকে আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতি নানাভাবে শুধু পটভূমিকাই রচনা করিয়াছে। ঋতুনাট্যে কিন্তু প্রকৃতিই অভিনয় করিতেছে। মানুষ রহিয়াছে পটভূমিকায়। প্রায় সব ক'টি ঋতু-নাট্যেই ব্যাখ্যা আছে গদ্যে, কেবল 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'-য় গদ্য-ব্যাখ্যার পরিবর্তে ব্যাখ্যা আছে কবিতায়। এই কবিতাগুলিই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যসাধন করিয়া বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা যোগসূত্রের কাজ করিতেছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সংগীতে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা একান্তভাবে সংগীত-প্রাণ। অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ভাবের উপযুক্ত বাহনই গান। জগৎ ও জীবনকে কবি এক অখণ্ড দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন,—কোনো খণ্ডতা ও

আংশিকতা সেখানে দেখিতে পান নাই। সুর খণ্ডকে, বিচ্ছিন্নকে এক অখণ্ড সমগ্রতায় উন্নীত করে, খুলিয়া দেয় বাস্তবের ঊর্ধ্বে এক ভাবলোকের দ্বার এবং আমাদের সমস্ত অনুভবশক্তিকে জাগ্রত করিয়া একটা অলৌকিক রসচেতনায় হৃদয়কে পূর্ণ করে। এই দিব্য-চেতনায় ভাবের অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটিও ধরা পড়ে। কবি তাঁহার প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতিতে সুরকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার জীবনের শেষের দিকেও তিনি গানের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত নাটকেই গানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। কবি-রচিত দীর্ঘ কবিতাগুলিতেও এই সময় তাঁহাকে সুরসংযোগ করিতে দেখা যায়। এই সময় হইতেই তিনি গানের সঙ্গে নৃত্য যোগ করেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবকে, অনির্দিষ্টকে, নির্বিশেষকে কল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে ধরিতে হইলে গানের সঙ্গে নৃত্যই সে-উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান সহায়। তাই জীবনের শেষ পর্বে কবি নৃত্যনাট্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই পর্বের ঋতুসংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান। ভাবের ব্যঞ্জনায়, কল্পনার লীলায়, বাণীরূপের ঔজ্জ্বল্যে এগুলি অনবদ্য। প্রকৃতি যেন নিজেই নিজের মনের অন্তর্গূঢ় ভাবটি উদ্ঘাটন করিতেছে। এই ঋতুনাট্যগুলিতে গানের সঙ্গে নাচও প্রবর্তিত হইয়াছিল। গানের ভাবটি ফুটাইবার জন্য দেহের বিচিত্র লীলায়িত ছন্দ সাহায্য করিত। এই ঋতুনাট্য হইতেই কবি গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের অবতারণা আরম্ভ করেন। অবশ্য এগুলি ছিল খণ্ড খণ্ড ভাবের নাচ, পরবর্তী কালে কবি একটি কথাবস্তু বা প্রসঙ্গকে অবলম্বন করিয়া পুরাপুরি নৃত্যনাট্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। ঋতুনাট্যে আসলে গানেরই প্রাধান্য, যদিও নৃত্য বর্তমান—আবার নৃত্যনাট্যে নৃত্যেরই প্রাধান্য, যদিও গান বর্তমান। তবে গঙ্গা-যমুনার মতো কবির দুইটি সৃষ্টিধারাই চলিয়াছে পাশাপাশি শেষ বয়সে।

এই ঋতুনাট্যের মধ্যে কবি-মনের যে-তত্ত্বানুভূতি রূপায়িত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুপরিচিত তত্ত্ব। প্রকৃতি ও মানব একই প্রাণের অভিব্যক্তি—প্রকৃতির মধ্যে যে-প্রাণের লীলা চলিতেছে, মানুষের মধ্যেও সেই একই প্রাণের লীলা। প্রকৃতির মধ্যে যেমন একই প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন বেশ পরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে উপস্থিত হইতেছে;—বাহিরের দৃষ্টিতে আমরা তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতেছি বটে, কিন্তু সেগুলি একই চিরনবীন প্রাণের রূপান্তর মাত্র—মানুষের মধ্যেও সেই চিরনবীন প্রাণ জরা-বার্ধক্য, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া রূপ হইতে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে আমরা জরা-মৃত্যুই দেখিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা একই প্রাণ-শক্তির রূপ হইতে রূপান্তর। ('ফাল্গুনী'র আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এই ঋতুসংগীত-রচনার মধ্যে কবির একটা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যও কিন্তু বর্তমান ছিল। 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটক ও ঋতু সম্বন্ধে বহু সংগীত তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিনয় ও গানের জন্যই প্রথমে রচনা করেন। প্রকৃতি-চর্চা ছিল শান্তি-নিকেতনের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। কবির অনেক উক্তি এ সাক্ষ্য বহন করে,—

> "একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম, তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কার্যক্ষেত্র—আহ্বান করেছিলুম এখনকার জল-স্থল-আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎস-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করেছিলুম।"

"এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায়...প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্নচৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।" .

"আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম... আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারিদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে।...এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম।" (বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৯, ৭৭; আশ্রমের শিক্ষা, ইত্যাদি)

শেষবর্ষণ

(১৩৩২)

রাজসভায় ঋতু-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। 'শেষবর্ষণ' পালার গীতাভিনয় হইবে। রাজা, পারিষদবর্গ, রাজকবি বসিয়া আছেন—ইঁহারা সকলেই দর্শক। আর আছেন নটরাজ, নাট্যাচার্য—ইঁহারা ব্যাখ্যাতা, প্রযোজক; আর আছে গায়ক-গায়িকারা—ইহারা অভিনেতা। রাজা প্রকৃত সমঝদার, কিন্তু 'ছন্দরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন।' রাজকবি প্রাচীন পদ্ধতির রচনার সহিত পরিচিত, এই নূতন রচনাকে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিতেছেন; পারিষদবর্গ—সাধারণ দর্শক—এইরূপ রচনার ভাষাকে হেঁয়ালি মনে করে।

পালার বিষয়বস্তু—বর্ষার বিদায়-গ্রহণ ও শরতের আগমন। নটরাজের আদেশে গায়ক-গায়িকারা বর্ষার আবাহন করিতেছে,—

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ।

সুরে যখন বর্ষা বাহিরে রূপ ধরিয়াছে, তখন—

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো—

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।

এই যে আকাশের বাণীর সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করা—ইহার মধ্যেই তো ঋতু-উৎসবের সার্থকতা। বাহিরের বর্ষার মধ্যে আছে যে-বিরহের ভাব, আছে যে-বেদনা, অন্তরের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিলেই মিলন হইবে বাহির ও ভিতরের—একাত্ম হইবে মানুষ ও প্রকৃতি। এই বিরহের রসই বর্ষার অন্তরের রস। বর্ষার বিরহ-সংক্রামিত মানব-হৃদয়ও অকারণ উৎকণ্ঠায় হয় উদ্বিগ্ন।

কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ," সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে।—

পুব হাওয়াতে দেয় দোল আজ মরি মরি।
হৃদয় নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।...

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়াল—ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল—

অশ্রুভরা বেদন দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

বর্ষার এই বিরহের পরে মিলনও আছে,—'খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের'। মানবজীবনেও এই মিলন আসে বহুপ্রত্যাশিত মুহূর্তে অমূল্য রত্নের মতো। 'এ সংসারে বিরহের সরোবরের চারিদিক ছলছল করছে, মিলন-পদ্মটি তারই বুকে দুর্লভ ধন'।

পরিপূর্ণ বর্ষার মূর্তি শ্রাবণ। কিন্তু 'শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা। চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারায় একতারার একই সুর সে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।'

যেমনি বর্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিল, অমনি তাহার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ। ভোগ পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দে সে রিক্ত হইল। ঐশ্বর্যের সার্থকতাই ত্যাগে—পরিপূর্ণতার সফলতা রিক্ততায়। রাজাই প্রকৃত সন্ন্যাসী হইবার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি প্রিয় ভাব ('কবির দীক্ষা', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত' প্রভৃতি স্মরণীয়)। এই ভাবটি 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'রই একটি রূপ-বিশেষ।

এমন সময় পূবাকাশে আলোর আভাস দেখা গেল।—

রাজা। পুব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে?

নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্লরাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফুটাবার সঙ্গে ফুল ঝরাবার মালা বদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।

বর্ষার চরম পরিপূর্ণতা শ্রাবণ-পূর্ণিমা। শ্রাবণ-পূর্ণিমায় একদিকে যেমন পূর্ণতা অন্যদিকে তেমনি রিক্ততার সূচনা। ইহার পর হইতেই বর্ষার বিদায়ের পালা আরম্ভ হইবে,—তাই হাসি ও কান্না, আনন্দ ও বিষাদ এখানে হাত ধরাধরি করিয়াছে।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

..মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা।..
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ ঢালা।

রাজা।...হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর...বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

গায়ক-গায়িকারা গাহিল,—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা। ইত্যাদি

রাজার 'মন ভরিয়া' উঠিয়াছে; তাঁহার মত—'আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক... বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না।' কিন্তু নটরাজ বলেন,—'তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।' পালার বিষয়বস্তু তো বর্ষামঙ্গল নয়,—ইহা বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমনের পালা। বর্ষাকে তো ধরিয়া রাখা যাইবে না,—বাদলের শ্যামল ছায়ার আর সময় নাই, সে পালাতে চায়...শরতের আলোর সঙ্গে তার খেলা; আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল-মিলন।'

শরতের প্রথম প্রত্যূষে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। আকাশের আলোকের লিপিটি ভাষান্তরে লিখিয়া দিল শেফালি ধরণীতে।

রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে।

নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে...শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক—আকাশের আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এস শরতের অমল মহিমা
এস হে ধীরে।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ওকী হোলো নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ...ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছু লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যে সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলীবনে তাঁরই গান, মালতী-বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মরে বাণী বলো।

অবগুণ্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ না বাণী? একি আমায় মনের মধ্যে, না আমার চোখের সামনে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎপ্রাতের আলোর রানী।

এই শরৎপ্রতিমা রূপ ও বাণী উভয়ই,—চোখের সামনেও বটে, অন্তরের মধ্যেও বটে—বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে রূপ, অন্তরের মধ্যে বাণী।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে? বলো তো এবার কে আসবে?

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকে দেখুন।

সুন্দরের প্রবেশ.

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মর্মরিল মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?
নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিশিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন; কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গমর্তের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

সৌন্দর্য ক্ষণিকের অতিথি। তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া সংসারে ধরিয়া রাখা অসম্ভব। ক্ষণ-স্পর্শের মধ্য দিয়া সে তাহার অনির্বচনীয়ত্বের আভাস দিয়া চলিয়া যায়।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।
রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল দুদণ্ডের জন্য গান বাঁধা হল, গান সারা হল? এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা—তারপরে?
নটরাজ। 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে গান যদি বেজে থাকে সেই তো চরম।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য-পাঠকালে একটি মূলভাব স্মরণে রাখিতে হইবে। কবির মতে প্রকৃতির মধ্যে যে-প্রাণের লীলা চলিতেছে, মানবের মধ্যেও সেইরূপ একটি লীলা চলিয়াছে। একথা গোড়াতেই বলা হইয়াছে, আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—গ্রীষ্মের শুষ্ক, রুক্ষ মূর্তি ও খরতাপের মধ্যেই আছে বর্ষার সজল স্নিগ্ধ রূপ—এই শুষ্কতা শ্যামলতারি ভূমিকা মাত্র; আবার বর্ষার মেঘ ও ধারাবর্ষণের মধ্যেই সূচিত হইতেছে শরতের নির্মল আকাশ ও সোনালী রৌদ্র; তেমনি শীতের রিক্ততার মধ্যেই লুক্কায়িত আছে বসন্তের অপূর্ব সাজসজ্জা। প্রকৃতির এই ঋতুপর্যায়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে একই সত্তার বিভিন্ন অবস্থাভেদ—বিভিন্ন বেশপরিগ্রহ মাত্র। মানবের মধ্যেও একই চিরন্তন সত্তার বিভিন্ন অবস্থা—বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য, জরা-মৃত্যু প্রভৃতি। ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবগুলির সঙ্গেও মানবজীবনের ভাবের গভীর মিল আছে। বর্ষার মধ্যে আছে বিরহ, কোমলের সঙ্গে কঠোরের সমাবেশ,—শরতের মধ্যে আছে মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস; বসন্তের রাজবেশের মধ্যে আছে বৈরাগ্য। এই হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলন, ত্যাগ-ভোগের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে মানবজীবন। এই প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনকে মিলাইয়া তাহার রস, রহস্য ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই মানবজীবন হইবে সার্থক—বাহির ও ভিতরের হইবে পরিপূর্ণ মিলন। ইহাই সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-মানব-সম্বন্ধের দর্শনবাদ।

বসন্ত

(১০ই ফাল্গুন, ১৩২৯)

'বসন্ত'—'শেষবর্ষণ'-এর মতোই একটি পালাগান। ইহার বিষয়বস্তু হইল বসন্তের আগমন ও বিদায়। নাটকের আঙ্গিকে ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পালাগান রচনা। ইহার বৎসরাধিক কাল পূর্বে কবি 'বর্ষামঙ্গল' নাম দিয়া একটা গানের জলসা করেন প্রথমে শান্তি-নিকেতনে ও পরে কলিকাতায়। ইহাতে কেবল গান ও কবিতা-আবৃত্তি ছিল। পালার অঙ্গ হিসাবে কাহারো বক্তব্য ছিল না। বসন্তই প্রথম ঋতুনাট্য, যেখানে কবি রাজসভা-টেকনিক গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতেই কবি প্রথম নাচের সূত্রপাত করেন।

"দু'একটি গানে নাচ ছিল, কিন্তু সে নাচ আজকালকার মতো নৃত্যধারায় শেখানো নাচ নয়। শেষ গানটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলে-ছিলেন।" (রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৫০)

বসন্ত-পালার এই গানগুলি কিন্তু কবির উৎকৃষ্ট ঋতুসংগীতের নমুনা নয়। 'শেষবর্ষণ'-এর গানের সেই কাব্য-সমৃদ্ধি ও বাণী-রূপের দীপ্তি ইহাদের নাই। ঋতুসংগীতের মধ্যে বর্ষা ও শরতের গানগুলিই নিঃসন্দেহ কবির সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।

এখানেও পালার স্থানটি রাজসভা। রাজকোষ শূন্যপ্রায় দেখিয়া রাজা পলাইয়া আসিয়াছেন কবির দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তোৎসবের পালা শুনিতে। কবি বলিতেছেন—মহারাজ যেমন পলাতক, কবি নিজেও তেমনি জন্মপলাতক, আবার যাহার পালা গান করা হইতেছে, সে-ও চিরপলাতক।

কবি।...এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।
রাজা। রাজসঙ্গী? কে বলো তো।
কবি। ঋতুরাজ।
রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?
কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথবী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথবীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—
রাজা। বুঝেছি, বোধহয় রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছা করছেন।
কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।
রাজা। কী দুঃখে।
কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।

বসন্ত পরম-ঐশ্বর্যশালী বলিয়াই চরমদানের দ্বারা রিক্ত হয়। এই ত্যাগে তাহার কোনো দুঃখ নাই—বরং ইহাতেই তাহার পরম আনন্দ। রাজা আনন্দে সন্ন্যাসী-বেশ ধারণ করে। সে রাজ-সন্ন্যাসী। যাঁহার ঐশ্বর্য আছে, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে। ভোগীই প্রকৃত ত্যাগী হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ-প্রিয় আইডিয়া।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।
রাজা। বলছে কী।

কবি। বলছে, সব দিয়ে ফেলতে হবে।
রাজা। নিজেকে একেবারে শূন্য করে? সর্বনাশ!
কবি। না, নিজেকে পূর্ণ করে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।
রাজা। মানে কী হোলো।
কবি। যে দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

ঋতুরাজ যেমন পূর্ণতার আনন্দ সর্বদা দান করে, প্রকৃতিও তেমনি দানের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে—দানের দ্বারাই ঐশ্বর্যশালিনী হয়। বসন্তসমাগমে অজস্র দানের দ্বারাই ধরণী তাহার সৌন্দর্য বিকশিত করে—প্রকটিত করে নানা ঐশ্বর্যের বিলাস। 'শারদোৎসব'-এর 'ঋণশোধ'-আইডিয়াটি এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে।

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের পূর্বে তাহার পরিচরগণ প্রকৃতিকে সর্বস্ব-দানের আহ্বান জানাইতেছেন,—

সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
আয় আয় আয়।
আসবে-যে সে স্বর্ণরথে
জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।
আয় আয় আয়।

প্রকৃতির সকলেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে।
বনভূমি বলিতেছে,—

বাকি আমি রাখবনা কিছুই
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
বকুল বলে যূঁই।

আম্রকুঞ্জ বলিতেছে—

ফল ফলবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।

রাজা বুঝিলেন—'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না; মনের আনন্দে 'ফল চাইনে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে সাহস পায় বলেই 'তার ফল ধরে'।

এই সর্বস্বদানের আহ্বানে করবী, বেণুবন, দীপশিখা মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ঋতুরাজের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছে ও রাজঅতিথির আগমনী-সংগীত গাহিতেছে।

দখিন-হাওয়া গাহিতেছে,—

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানিনা যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।...
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাসা ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করে চিরনূতন বন্ধুরে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ওই যে খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ওই জীর্ণ বসন পরে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠ নূতন, আর একপিঠ পুরাতন। যখন উলটে পবেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরাফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ, নূতন-পুরাতনেব মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীনমূর্তিটা একবাব দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ওই-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতন-পুরাতনের মাঝখানকার নিত্য-যাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে-পথেই থাকেন?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি।

ঋতুচক্রের মধ্যে একই চিরনবীন বিভিন্ন বেশে আবির্ভূত হইতেছে। ইহা যেন একই ব্যক্তির একখানা কাপড় বদলাইয়া অন্য একখানা কাপড় পরিধান করা। আমরা বাহির হইতে সেই কাপড়েরি রঙ ও রূপ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু পরিধানকারী একই ব্যক্তি। শীতের মধ্য হইতে বসন্তের আবির্ভাব হইল বটে, কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য—তাহার রাজ-ঐশ্বর্য তো চিরদিনের নয়। ক্ষণস্থায়ী তাহার অস্তিত্ব। সে চিরপথিক, ঘরছাড়া। তাহার সৌন্দর্য-প্রাচুর্যময় রাজবেশ ছাড়িয়া তাহাকে গ্রীষ্মের রিক্ত সন্ন্যাসবেশ পরিতে হইবে। তাহার এই পূর্ণতা রিক্ততারই সূচনা করিতেছে।

যখন বসন্তের মিলন-আনন্দে প্রকৃতি হইল পরিপূর্ণ, তখনই ঘনাইয়া আসিল বসন্তের বিদায়-লগ্ন।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।...পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হাওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।
কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হাওয়ার খেলার ভয় থাকে না।
ঋতুরাজের বিদায়-বার্তা ঘোষিত হইল।—

এখন আমার সময় হলো
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হোলো দেখা, হোলো মেলা,
আলোছায়ায় হোলো খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো!

মাধবী, ঝুমকোলতা, আকন্দ, ধুতুরা, জবা, প্রভৃতি ফুল নিজ নিজ বেদনা চাপিয়া বসন্তকে বিদায় দিল। সকলেই বুঝিল,—

ওরে পথিক,-ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।

পূর্ণতা ও রিক্ততা, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাস, ভোগ ও ত্যাগ, বাঁধন-পরা ও বাঁধন-খোলা, বিরহ ও মিলন একই সত্যের বিভিন্ন দিক—এপিঠ ওপিঠ মাত্র। কোনোটাই একান্ত নয়, পূর্ণ নয়—খণ্ড মাত্র,—উভয়কে মিলাইয়া পূর্ণ সত্তা। প্রকৃতি-জীবনে ও মানব-জীবনে এই একই সত্যের প্রকাশ। এই ভাবটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মৌলিক ভাব।

নবীন

(১৩৩৭)

'নবীন' বসন্তোৎসবের পালাগান। বসন্তের আবাহন ও অভিনন্দনে ইহার আরম্ভ এবং বিদায়ে ইহার শেষ। 'বসন্ত'-এর সঙ্গে ইহার মূলতত্ত্ব ও উপস্থাপনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পূর্বের দুইটি ঋতুনাট্যের মতো রাজসভায় অভিনয়ের জন্য ইহার স্থান নির্দেশ করা হয় নাই, কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথোপকথনও ইহাতে নাই। ইহার গদ্যাংশই গানের ভাব-ব্যাখ্যা ও যোগসূত্র-রক্ষার কাজ করিতেছে। অভিনয়কালে কবিই এগুলি পাঠ করিতেন।

'নবীন'-এর একটি বিশেষ দিক্ এই যে, এই ঋতুনাট্যে কবি গানের সঙ্গে নাচকে বিশেষভাবে যুক্ত করেন। নানা ধরনের নৃত্যের সমাবেশে কবি ইহার ভাবের রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তিনি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

"জানুয়ারীতে (১৯৩১) গুরুদেব দেশে ফিরে মার্চমাসে বসন্ত উৎসবের জন্য 'নবীন'-এর আয়োজন শুরু করেন। পূর্বের 'বসন্ত' নাটিকার মতনই বসন্ত-ঋতুর নতুন গান তিনি অনেক রচনা করলেন। এর জন্যে কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন নি। রাজা বা রাজসভা ছিল না। গুরুদেব রঙ্গমঞ্চের এককোণে বসে গানগুলির মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজকণ্ঠের গানে, পাঠে ও আবৃত্তিতে। এই অভিনয়কালে শান্তিনিকেতনের বাঙালী ছাত্রেরা নাচে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। 'নবীন'-এ মণিপুরী নাচের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার বাউল, রাইবেঁশে ও ইউরোপের হাঙ্গেরী দেশের লোকনৃত্য ছিল আরো

একটি প্রধান বিশেষত্ব। এইসব নৃত্যপদ্ধতিকে নানা গানে খুব ভালোভাবেই খাপখাওয়ানো গিয়েছিল।" ('রবীন্দ্রসংগীত'—শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৫৬)

কবি বসন্তোৎসব করিবেন, কিন্তু তাহাতে একটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।—"আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোনাকাটা ত্যাড়াবাঁকা দুমদাম-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শুক্‌নো মেজাজে জোর পৌঁছচ্ছে না। কিন্তু যাঁদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন আমরা নতুন চাইনে চাই নবীনকে। এ'রা বলেন মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙীন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল'।"

কবি রসিকদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া 'নিত্যানন্দিত সহজ শোভন নবীনের উদ্দেশে' তাঁহার 'আত্মনিবেদনের' গান শুরু করিলেন।—

নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
মরণহীন চির নবীন
তব মহিমা স্ফূর্তি।

এই যে আত্মনিবেদন, এই যে দেওয়া, ইহার মধ্যেই তো পাওয়া—দেওয়া ও পাওয়ার পর্যায়ক্রমেই তো এই বিশ্ব আবর্তিত,—

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'প্যালা ভর ভর লায়ী রে'। পূর্বের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝরনার এক প্রান্তে কেবলি পাওয়া অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলি দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিক্-পানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা গান তো আমরা শুধু কেবল গাইনে, গান যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

ফাল্গুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ॥

বসন্তের দোল-উৎসবের তাৎপর্যই তো এই পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে দোল খাওয়া,—

দোল দেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। একপ্রান্তে মিলন আর এক-প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে

রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। আর ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগ্‌লো যে দোল।
স্থলে জলে বন-তলে
লাগ্‌লো যে দোল।
খোল দ্বার খোল॥

উৎসবের পরিপূর্ণতার মধ্যে, নিবিড় পাওয়ার মাঝেই বিদায়ের সুর—হারানোর বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল।—

• এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষ বনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠ্‌লো। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথ গাছের পাতায় পাতায় ঝর্ ঝর্ করে উঠছে। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার সুর বাঁধা হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন বাসন্তী রঙ ম্লান হয়ে গেরুয়া রঙে নামলো।

কেন ধরে রাখা ও-যে যাবে চলে
মিলন-লগন গত হলে।
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এইবার রাজার সন্ন্যাসিবেশ। যে-প্রকৃতি একদিন নবীনকে রাজবেশে সাজাইয়াছিল, সে-ই আজ তাহাকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাইয়া দিল।—

'শুকনো পাতাকে যে ছড়ায় ঐ দূরে'। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিলো, আজ তারা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগলো বিদায়-পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর।"

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে॥

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

(১৩৩৮)

এই পালাগানটিতে পূর্বের পালাগানগুলির মতো কবি, নটরাজ, রাজা বা ব্যক্তি-বিশেষ গদ্যভাষণে গানের ভাব ব্যাখ্যা করে নাই। এক-একটি কবিতাই ইহার গানগুলির ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছে।

কবি প্রথমে 'নটরাজ' নামে ষড়্‌ঋতুর নানা গান ও কবিতার দ্বারা গ্রথিত গীতি-মাল্য রচনা করেন। ১৩৩৩ সালের 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে দোলপূর্ণিমার দিন শান্তিনিকেতনে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। তারপর জাভা, বলি প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কয়েকটি গান সংযোজিত করিয়া কবি 'নটরাজ'কে 'ঋতুরঙ্গ' নাম দেন এবং কলিকাতায় উহার অভিনয়ের আয়োজন করেন। ১৩৩৪ সালের মাসিক বসুমতীতে ইহা প্রকাশিত হয়। তারপর এই পরিবর্ধিত সমগ্র রচনাটি 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' নামে 'বনবাণী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৩৩৮ সালে।

'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায়' কবি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে নাচ যুক্ত করেন।

"নটরাজ ছিল ছয়টি ঋতুর গানের সমষ্টিকৃত একটি গীত-কাব্য। 'বসন্ত' বা 'শেষ-বর্ষণ'-এর মতো কোনো রাজকীয় সভা বা গানের সঙ্গে উপলক্ষ্য হিসাবে কোনো কথা এই গীত-কাব্যের মধ্যে স্থান পায় নি—তার পরিবর্তে অনেক কবিতা গানের-সূত্র ধরিয়ে দেবার কাজ করেছিল। কবিতাগুলি আবৃত্তি করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। এই বারে প্রথম মণিপুরী নৃত্যাভিনয়-ধারা এই গীত-কাব্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করল। একক নৃত্য ছিল বেশি, সম্মেলক নৃত্য কয়েকটি মাত্র।'...

জাভা, বলি ইত্যাদি দ্বীপ পরিদর্শন করে গুরুদেব পূজার ছুটিতে দেশে ফিরলেন ও 'নটরাজ'কে 'ঋতুরঙ্গ' নাম দিয়ে কলকাতায় দেখবার জন্য মাস দুয়েকের মধ্যে তৈরি করে ফেললেন। এই সময় দক্ষিণভারতের তামিল দেশের নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতিতে নাচল একটি দক্ষিণী ছাত্র। তখনো ছাত্রীদের মধ্যে এ নাচের চর্চা শুরু হয় নি। 'নটরাজ' ও 'ঋতুরঙ্গ' একই বস্তু, কেবল কয়েকটি গান সংযোজিত বা পরিবর্তিত হয়েছিল মাত্র। নূতনত্ব দেখাবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই এর মধ্যে দেখা যায় নি। মেয়েরা নট-রাজের সময় যে অভিনয়পদ্ধতিতে নেচেছিল, ঋতুরঙ্গে তাকেই রক্ষা করা গেছে। পূর্বের অভিনয়ে গানের দল যেভাবে গান গেয়েছে এখানেও ঠিক সেই ধারারই রক্ষা হয়েছিল। যে দক্ষিণী ছাত্রটি এই সময় যোগ দিয়েছিল, তার নাচ কলকাতায় যেমন আনন্দ দিয়েছিল, তেমনি শান্তিনিকেতনে আমাদের মতো একদলের ঐ নাচে মন খুবই আকৃষ্ট হয়। পুরুষের নাচ দেখবার যোগ্য এবং তাও যে মনে আনন্দ দেয় এইবারই প্রথম আমরা তা উপলব্ধি করি।"

(রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৫৩-৫৪)

'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য পালাগানের মতো ইহা একটি ঋতুর পালা নয়: 'শেষবর্ষণ' বর্ষা ও শরতের পালা; 'বসন্ত' ও 'নবীন' বসন্তের পালা; 'শ্রাবণগাথা' বর্ষার পালা। শুধু তাহাই নয়,—এই ছয়টি ঋতুর মধ্য দিয়া, এই ঋতুর রঙ্গ-শালায় রঙ্গেশ্বর নটরাজ যে নৃত্য করিতেছেন, সেই নৃত্যের তাৎপর্য এবং প্রকৃতির মধ্যে ও মানবজীবনে এক অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে কবি সর্ববন্ধনমুক্ত হইতে চাহিতেছেন। নটরাজের বিশ্বনৃত্যে যে-রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে, কবি হৃদয়ের গভীর অনুভূতির মধ্যে রসরূপে তাহাকে পাইতে চাহিতেছেন। এই নৃত্যের তাৎপর্য ও রসোপলব্ধিই তাঁহাকে জগৎ ও জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়া মুক্তির আনন্দ দিবে বলিয়া কবির বিশ্বাস। এই পালার মধ্যে কবি নটরাজের নৃত্যলীলার পটভূমিকায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ও রসবৈচিত্র্য উপভোগ করিতে চাহিতেছেন।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালা-গানের এই মর্ম।

পৌরাণিক শিবের আইডিয়া প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার উপর গভীর-ভাবে রেখাপাত করিয়াছে। এই প্রভাব বিশেষ করিয়া আসিয়াছে কালিদাসের কাব্য 'কুমার-সম্ভব' হইতে। একাধিকবার তিনি 'কুমারসম্ভব'-এর রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উমা-মহেশ্বরের নানা রূপক-রূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে তাঁহার রচনায়। শিবের মধ্যেই তিনি দেখিয়াছেন একাধারে ভোগ ও বৈরাগ্যের মিলন। শিব সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, আবার সেই শিবই উমার প্রেমিক—অন্নপূর্ণার স্বামী। ত্যাগের সহিত ভোগের—ঐশ্বর্যের সহিত বৈরাগ্যের সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে শিবের মধ্যে ('পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতা, 'শিবের দীক্ষা' নাটিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কবি উপনিষদের পরমপ্রিয় শ্লোকটির—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'র পরিপূর্ণ রূপটিই যেন দেখিয়াছেন শিবের মধ্যে। শিবকে বলা হয় রুদ্র—ধ্বংসের দেবতা, আবার তিনিই শিব—মঙ্গলময়। জীবনের শেষের দিকে নৃত্যপর নটরাজ শিবের আইডিয়া তাঁহার কবি-মানসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিশ্বের মধ্যে অবিরাম চলিতেছে নটরাজের নৃত্য। তাঁহার এক পাদক্ষেপে ধ্বংস, অন্য পাদক্ষেপে নবসৃষ্টি, এই ধ্বংস ও সৃষ্টি—সৃষ্টি ও ধ্বংসই বিশ্বধারা। নৃত্যের তালে তালে তাঁহার প্রতি পদ-ক্ষেপেই বিশ্বের বুকে ফুটিয়া উঠিতেছে নব নব রূপ, ফুটিয়া উঠিয়াই তাহা আবার বুদ্বুদের মতো কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই ধ্বংস ও সৃষ্টি, এই রিক্ততা ও পূর্ণতা, এই ভীষণতা ও কমনীয়তা দুইটি নৃত্যপর পদপাতের পরিপূর্ণ রূপ—একই সত্যের দুইটি বিভিন্ন দিক্। ইহাই নটরাজের বিশ্বনৃত্যলীলার রহস্য। প্রকৃতির রাজ্যে ঋতুর রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য হইতেছে, তাহার মধ্যেও দেখা যায় এক ঋতুব ধ্বংসের মধ্যেই পরবর্তী ঋতুর সৃষ্টি-সূচনা হইতেছে। জগতে যে-নৃত্যলীলা, মানবজীবনেও সেই একই নৃত্যলীলা। সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, জন্ম-মৃত্যু একই রহস্যে, একই তাৎপর্যে বিধৃত হইয়া আছে। যাহার দৃষ্টি খণ্ডিত, সে কেবল ধ্বংসই দেখে, মৃত্যুই দেখে, কিন্তু দৃষ্টি যাহার পরিপূর্ণ, সে দেখে ধ্বংসের মধ্যে নবসৃষ্টিরই সূচনা, উপলব্ধি করিতে পারে মৃত্যুর মধ্যে নবজীবনের ইঙ্গিত, আর তাহার কাছেই প্রকটিত হয় নটরাজের নৃত্যলীলার তাৎপর্যটি। জগতে ও জীবনে নট-রাজের এই নৃত্যলীলা যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, পরিপূর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সেই ব্যক্তি জীবনকে, ঐশ্বর্যকে, যেমন অস্বাভাবিক আসক্তি দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরে না, তেমনি আবার ধ্বংসকে, মৃত্যুকেও একান্ত পরিণাম জ্ঞান করিয়া ভয় ও হতাশায় মুহ্যমান হয় না। সে একপ্রকার বন্ধনহীন মুক্তপুরুষ—সদানন্দময়; সে-ই নটরাজের নৃত্য-রহস্যের মর্মজ্ঞ। যে সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী, সে কেবল নটরাজের ধ্বংসকারী পদক্ষেপটিই দেখিয়াছে, তাই জগৎ ও জীবন তাহার কাছে অনিত্য, দুঃখজ্বালাময় ও পরিত্যাজ্য। সে 'তত্ত্বনন্দস্বামী'র বা 'তত্ত্বচূড়া-মণি'র কাছে মুক্তির দীক্ষা লইয়াছে, তাহার মুক্তি জগৎ ও জীবনকে এড়াইয়ায় যাওয়া; সাধারণ সন্ন্যাসীর ইহাই মুক্তির আদর্শ। কিন্তু কবির মুক্তির আদর্শ নটরাজের উভয়পদের রসোপলব্ধি করা। এই রসোপলব্ধিতে বৃথা আসক্তি বা ব্যর্থ সন্ন্যাসের স্বরূপ কবির নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টি খুলিয়া দিবে। এই নিরাসক্ত,

নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে আলো-ছায়া-সুখ-দুঃখ-সমন্বিত জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করাই কবির মুক্তি এবং এ-মুক্তির দীক্ষা তিনি গ্রহণ করিবেন নটরাজের নিকট হইতে।—

মুক্তি-তত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্ব-শিরোমণির পিছে?
হায়রে মিছে, হায়রে মিছে!...
আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখ্‌ছি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে!...

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে,...

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লবো।
তোমার তাণ্ডব-তালে কর্মের বন্ধন-গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি;...
প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরুদুরু।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।...
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,...
তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,...
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।...

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে।

কবি তাঁহার গুরুদেবের সুখদুঃখ, জীবন-মরণের ঘাত-প্রতিঘাত মুখর লীলানৃত্যে উপলব্ধি করিয়াই মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দুই পায়ের নৃত্যকেই—ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলিত নৃত্যকেই—কবি তাঁহার আদর্শরূপে জীবনে বরণ করিয়া লইবেন।—

"এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্‌সা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিতব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব-সংসারে দুঃখদৈন্য-শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই।' এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বলতুম।...

দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখবো না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না, তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করবো যাঁরা 'বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ'। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার লীলা।" (পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৭)

ঋতুর ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভাব বৈশাখের। বৈশাখ ধ্যান-মগ্ন তপস্বী। রিক্ত, নিঃস্ব তাহার বেশ। তাহার তপোভূমি ধরণী-গগনের রসহীন, নির্জীবমূর্তি। কিন্তু ধূসর-বসন, রক্তলোচন সন্ন্যাসীর বাহিরে এই কঠোর তপস্বিবেশ হইলেও অন্তর তাহার শুষ্ক নয়, রসহীন নয়।—

কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে
মগন হয়ে রয়েছো দিনে রাতে।...

পরাণে কার ধেয়ান আছে জাগি,
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পূরব কূলে বকুলবীথি মাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে

নবকেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরাণে তব জাগি॥
রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্য-মাল্য সাঙ্গ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।

মাধুর্যকে যথোপযুক্তভাবে উপভোগ করিবার জন্যই বৈশাখের এই তপস্যা—গ্রীষ্মের এই শুষ্কতা ও কঠোরতা বর্ষার সরসতা ও শ্যামলতারই পূর্ব-সূচনা। বৈশাখেরি কঠোর তপস্যার অন্তরালে আষাঢ়ের রস-প্লাবনের প্রত্যাশা,—

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসেব বর্ষণে,
হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর করুণ স্পর্শ নে॥

আষাঢ়ও সন্ন্যাসী। কিন্তু তাহার বেশের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। জটার আড়ালে লুকাইয়াছে তাহার রুক্ষ রৌদ্রদীর্ণ মূর্তি, শ্বেত উত্তরী হইয়াছে শ্যামল; মনে তাহার বিরহের গান ঘনাইয়া আসিতেছে। 'নিষ্ঠুর তপে নিমগ্ন', বিরহ-তপস্বিনী ধরণী-উমা এই আষাঢ়-শিবের কাছে পাঠাইয়াছে প্রেমপত্র, তাই তাহার হৃদয় মাতিয়াছে, 'বাঁকা-বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া,'—

চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

'শ্রাবণ-কবি রসবর্ষা ক্ষান্ত' করিয়া 'সুপ্রসন্ন আলোকের অভিষেকস্নান' করাইয়া মুছিয়া দিল 'নিজ হস্তে সর্ব ম্লানতার চিহ্ন' এবং 'রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র' মেঘে শরতের আগমন সূচনা করিয়া দিয়া লইল বিদায়।

তারপর শরতের আবির্ভাব। শরৎ বিজয়-শঙ্খ-বাদক। তরুণ-বীরের মানসে সে অপরূপ রূপকথা রচনা করে, বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধারের জন্য রাক্ষসপুরে জয়অভিযান-পরিচালনের উদ্দীপনা আনে সে মনে। উমা-মহেশ্বরের মিলনে যেমন দৈত্যজয়ী কুমার কার্তিকেয়ের উদ্ভব, তপস্বিনী ধরণী-উমার সহিত প্রেমোদ্বেল বর্ষা-মহেশ্বরের মিলনেই তেমনি শরৎকুমারের উদ্ভব। শরৎও দৈত্যজয়ী বীর। আলোকদেবতাদের সেনাপতিরূপে অন্ধকার-দৈত্যের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ।—

মেঘ-বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস ঃ—
"হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।"

হেমন্ত আমার লক্ষ্মী। ক্ষুধার্তকে অন্নদানের জন্য দরিদ্র ধরায় তাহার আবির্ভাব।—

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রাণে।
তোমার অমৃত নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন ধূলির ঘায়ে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

অন্নদানে মানুষের দেহকেই কেবল তিনি রক্ষা করেন না, তাহার মনকেও করেন উন্নত। গগনের দীপগুলিকে আঁচল দিয়া ঘিরিয়া গোপন করিয়া তিনি মানুষকে দীপান্বিতায় আলো জ্বালিবার সুযোগ দেন,—তাহাতে মানুষের মন হইতে বিদূরিত হয় সমস্ত কালিমা, অবসাদ।

যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকার জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো আপন আলো,
শুনাও আলোব জয়-বাণীরে।..
এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় কবো এই তামসীরে।

শীতও সন্ন্যাসী; নির্মম, সর্বহারা, কঠিন মূর্তি তাহার। উত্তরবায়ুকম্পিত ধরণীর নিকট তাহার বাণী-নির্ঘোষ—

"জীর্ণভার মোহবন্ধ ছিন্ন করো" এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখ্য নিঃশেষে বিনাশি
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।

শীতের এই ধ্বংস-বিপ্লব নবসৃষ্টির নূতন জীবনের পূর্বসূচনা মাত্র—

হে নির্মল
সংশয়-উদ্বিগ্ন-চিত্তে পূর্ণ করো বল;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শাঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি দাও মন; সর্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক শান্ত উদাত্ত মুরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জনা-ভাব
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্রপত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি; সে-শূন্যে তোমারি আয়োজন।

শীত সন্ন্যাসী হইলেও অন্তর তাহার যৌবনরসসিক্ত। বসন্তই ধরিয়াছে শীতের ছদ্মবেশ। উমা ভূষণরিক্তা, উগ্র তপে নিমগ্না, শীত-মহেশ্বর সন্ন্যাসিবেশে তাহার নিকট

উপস্থিত হইলেও অন্তর তাহার মিলন-ব্যাকুল ('কুমারসম্ভব', ৫ম সর্গ)—সে উমার ছদ্মবেশী বর।

ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী
প্রলয়-বেদনা, নিল বুক পাতি,
রুদ্র এবারে বর-বেশে তারে
কর গো ধন্য;
হও প্রসন্ন।

বসন্তের অনিন্দ্য-সুন্দর নবযৌবনমূর্তি,—

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন!
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

ধরণীর সঙ্গে বসন্তের এই যে প্রেম-মিলন, ইহা ক্ষণস্থায়ী,—

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে!
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদ-বেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্ত-সন্ধ্যা-স্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জরী-ধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তি-ক্লান্তি-ভরে।

বসন্ত স্বর্গের নিত্যানন্দমূর্তি, বৎসরান্তে মাত্র একটিবার ক্ষণকালের জন্য আসিয়া ধরণীর প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রেমানন্দেরি প্রতীক দোলউৎসব। দোলের দোলায়, কাব্যে ও সংগীতে এই স্বর্গ ও মর্ত্যের ক্ষণ-মিলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য মানুষের প্রয়াস।—

সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানস-সরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সংগীত-নির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার।

কবির কাব্য ও সংগীতও নৃত্য করিবে আজ নটরাজের এই দোলননৃত্যের তালে তালে —নব নব ভঙ্গীতে—এই বিশ্বব্যাপী আনন্দনৃত্যের সঙ্গে কবিও যোগ দিয়া জগতে এক অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে বন্ধনমুক্ত হইবেন।

এসো গো এস দোল-বিলাসী,
বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেকদিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজ তোমার নাচে
সময় তারি হোলো।

শ্রাবণগাথা

(১৩৪১)

শ্রাবণগাথা বর্ষার পালা। মূলভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়া 'শেষবর্ষণ'-এর সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রাজা, নটরাজ, সভাকবি সকলেই উপস্থিত,—নটরাজ পালার মর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, রাজা রসিক যোদ্ধা, সভাকবি সাধারণ দর্শক,—স্থূল জিনিসকে বোধ ও অনুভূতির মধ্যে ধরিতে পারেন—কিন্তু এইপ্রকার সূক্ষ্মরসানুভূতি তাঁহার পক্ষে সহজ নয়। তাই মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিক্ষেপ করেন নটরাজের কথা ও ভাবের উপর। কবি এখানেও পলাতকা,—'পালাবার তাৎপর্য—পাছে এখানকার বুদ্ধিমানেরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরও দুঃখের বিষয়—যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।' অধিকাংশ গানই এক, সংলাপেরও স্থানে স্থানে মিল আছে। 'শ্রাবণগাথা'তেই রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট বর্ষা-সংগীতের সমাবেশ হইয়াছে।

ধরণী এতোদিন তপস্যা করিতেছিল,—'ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদগ্নি-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামল জটাভার—প্রসন্ন তাঁর মুখ।'

বর্ষা-ঋতুর মধ্যে আছে একটা বিরহ। এই বিশ্ব-বেদনার সঙ্গে অন্তরে বিরহের রাগিণীর মিল করিতে হইবে-

ঝর ঝর ঝর ভাদর-বাদর
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমায় প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে:

বর্ষায় শুধু বিরহই নাই,—মিলনও আছে,—

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।

আবার কেবল বিরহ-মিলনই নাই বর্ষার মধ্যে—আছে তাহাতে শ্যামলিমার সঙ্গে উগ্রতা, মাধুর্যের সঙ্গে কাঠিন্য,—

সঘনবর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত
ঝিল্লিঝংকৃত।

আছে আরো শ্রাবণের ভেরীধ্বনি,—

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে—
এই বরষার নবশ্যামের আগমনের কালে।

আছে ঐরাবতের গর্জন, উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়—মেঘ, বিদ্যুৎ,—

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।...
পথিক মেঘের দল জোটে এ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
মনরে আমার উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।...
বেদনা তোর বিজুলিশিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন;
শেষ করে দিস্ আপ্‌নারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

আবার একটা মুক্তির উদ্বেগও আছে শ্রাবণের অন্তরে,—

হাবে, রে রে, বে রে, আমায় ছেড়ে দেরে, দেরে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।

রাজা। নটরাজ, তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পৌঁছল—এইবার গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগবো আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।

নটরাজ। বিশ্ববেদীতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম ঊষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।

ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—
আয় আয় আয়।

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌঁচেছে, এইবার বিদায়গান।—

বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেকদূর।

ঋতুনাট্যের এই সবগুলি পালাতেই, মনে রাখিতে হইবে, কবি প্রথমে গীত রচনা করেন, তারপর এইগুলির যোগসূত্র রক্ষা করিবার ও ভাবের সংকেত দিবার জন্য সংলাপ যোজনা করিয়া নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

"প্রথমে গানগুলির সৃষ্টি আপনা থেকেই, তারপরে তাকে সাজান হ'ত ভাবসাম্য বজায় রেখে। পরে তাতে ভাবপারম্পর্য রাখবার জন্য গুরুদেব কথা বসাতেন। এককথায় গানগুলির জন্যই নাটকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে।" (রবীন্দ্রসংগীত)

(৮)

নৃত্যনাট্য

ঋতুনাট্যের মতো নৃত্যনাট্যও বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক নূতন সৃষ্টি। ঋতুনাট্যে ছিল গানের প্রাধান্য; শুধু গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল এই পালাগুলি। শেষে নাচের প্রবর্তন করা হইল দুইটি উদ্দেশ্যে.—প্রথমত গানের প্রত্যেক লাইন নাচের অভিনয়ে প্রকাশ করিয়া সমগ্র গানের ভাবটি ফুটাইয়া তোলা, দ্বিতীয়ত প্রত্যেক লাইনের সঙ্গে নাচগুলিকে অলংকারের মতো গ্রহণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য বর্ধন করা। স্বভাবতই নৃত্য গড়িয়া উঠিল বিভিন্ন গানকে অবলম্বন করিয়া। এই ঋতুনাট্যেরই পূর্ণ পরিণতি বলা যায় নৃত্যনাট্য। ঋতুনাট্যে ছিল ছোটো ছোটো নাচ—খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে; সেই টুকরো-টুকরো নাচগুলি ফুলঝুরির মতো দর্শকের চক্ষুকে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হইত;—হৃদয়ে কোনো 'স্থায়ী রসের পদচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিত না।' তাই চেষ্টা করা হইল নাটকের কোনো ঘটনাকে নাচের বিষয়বস্তু করিবার জন্য, যাহাতে স্থায়ী রসসঞ্চারের পথটি সুগম হয়। এই ভাবেই কবির নৃত্যনাট্যগুলির উৎপত্তি।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য অতি উচ্চাঙ্গের এক অভিনব শিল্পরূপ। সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্য—এই ত্রিবেণী-সংগমে ইহার অনিন্দ্যসুন্দর রসমন্দির প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যকে গীতরসে গলাইয়া, তাহার অন্তরের অনির্বচনীয় মাধুর্যটিকে দেহছন্দের পাত্রে ধরিয়া, অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকার এক আহার্য পরিবেশন করিয়াছেন কবি রসিকজনের নিকটে।

প্রথমে ভারতীয় নৃত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য সহজবোধ্য হইবে।

বিশ্বজগতের মধ্যে নিরন্তর গতির চাঞ্চল্য ও আবেগ আত্মপ্রকাশ করিতেছে নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র ছন্দে। প্রকৃতি তাহার বৃক্ষ-ফুল-ফলের সৃষ্টি ও পরিণতিতে, ষড়্‌ঋতুর আবর্তনে, এই গতিছন্দকে রূপায়িত করিতেছে প্রতি মুহূর্তে নানাভাবে। বিশ্বের এই গতিছন্দই প্রাণিজগতে নৃত্যের মূল প্রেরণা। ভাষাহীন পশু এই ছন্দকেই অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করিয়াছে তাহার নানা ভঙ্গীর লাফ-ঝাঁপ-দৌড়ে, পাখি তাহার বিচিত্র লেজ-দোলানো নাচে—নব নব ভঙ্গীতে আকাশে উড়িবার প্রয়াসে। মানুষও যে-গতিভঙ্গী দেখিয়াছে পশুপক্ষীর দেহ-বিক্ষেপের মধ্যে—যে-ছন্দ দেখিয়াছে সৃষ্টির অগ্রগতির মধ্যে, তাহারই অনুকরণ করিয়া প্রথম নৃত্যের চেষ্টা করিয়াছে। এই গতির দোলার মধ্য দিয়াই সে তাহার আনন্দ-বেদনা, বিরাগ-অনুরাগকে প্রকাশ করিবার পথ খুঁজিয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্বে নৃত্যই হইয়াছে তাহার ভাবপ্রকাশের বাহন। নৃত্যই তাহার আত্মপ্রকাশের—তাহার শিল্প-প্রেরণার প্রথম স্তর।

তারপর যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে নৃত্য—উদ্ভব হইয়াছে নূতন নূতন আঙ্গিকের—তাহার ব্যবহার হইয়াছে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে।

বাস্তবিক কোথাও সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্তব্য হিসাবে, কোথাও ধর্মসাধনার অংগরূপে, কোথাও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আনন্দ ও দুঃখ-প্রকাশের বাহন হিসাবে নৃত্য জীবনের সংগে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে।

বহু-প্রাচীন কাল হইতে নৃত্যকলা ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত হইয়া আছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং নৃত্য করিতেন বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। দেবসভায় উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচি প্রভৃতি অপ্সরারা বিখ্যাত নর্তকী বলিয়া খ্যাতিসম্পন্না ছিল। কাব্য-পুরাণাদিতে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবতী দেবীমুণ্ডে রণনৃত্যে মাতিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে অনেক নৃত্যপরা দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবর্ষি নারদ স্বর্গে বীণা বাজাইয়া নৃত্য করিতেন।

মহাদেবের নৃত্য-পরিকল্পনা ভারতীয় কাব্য ও শিল্প-প্রতিভার চরম দান। মহাদেবই নৃত্যাভিনয়ের আদিগুরু বলিয়া কল্পিত, তাই তাঁহার নাম নটরাজ। নটরাজ মহাদেবের নৃত্য-পর মূর্তি দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্যের পরিকল্পনাটি অপূর্ব। বিশ্বের অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া জড়জগৎ ও প্রাণিজগতের মধ্যে আত্মসংরক্ষণ ও বিলয়ের একটা প্রলয় ঝড় অনুক্ষণ বহিতেছে। সৃষ্টি ক্রমাগত রূপ হইতে রূপান্তরে পরিণতি লাভ করিতেছে—ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত, ধ্বংস হইতে সৃষ্টিতে বিরামহীন সঞ্চরণ করিতেছে। বিশ্বের মধ্যেই চলিয়াছে এই বিরামহীন পরিবর্তন। বিশ্বসৃষ্টির এই ক্রমাগত পরিবর্তনের উদ্ভব হইয়াছে নটরাজের নৃত্যেরি ফলে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়িয়া এই তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে। রুদ্রের প্রতিপদক্ষেপে হইতেছে ধ্বংস, করুণার প্রতিস্পন্দনে জাগিতেছে নবসৃষ্টি। যিনি রুদ্র তিনিই যে শিব। সৃষ্টির সংগে ধ্বংস, ধ্বংসের সংগে সৃষ্টি শিবতাণ্ডবের তালে তালে চলিতেছে। সমস্ত সৃষ্টির গতিশীল বৈচিত্র্যই তাঁহার নৃত্যের রূপ। শিবের তাণ্ডব-নৃত্য 'সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-বিধানানুগ্রহঃ'—সৃষ্টি, সৃষ্টি-রক্ষা, ধ্বংস, মানবাত্মার বন্ধন ও সেই বন্ধন হইতে মুক্তি,—এই 'পঞ্চকৃত্য'-এর প্রতীক। চতুর্ভুজ নটরাজের দক্ষিণ দিকের প্রথম হস্তে যে মন্দিরা আছে, তাহার শব্দ সৃষ্টির সংকেত, বামদিকে প্রথম হস্তের অগ্নিশিখা ধ্বংস বা পরিবর্তনের প্রতীক। 'অভিনয়দর্পণ'-এর 'নর্মক্রিয়া'র শ্লোকে শিব-প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে, এই সৃষ্টি—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বভুবন—যাঁহার আঙ্গিক-অভিনয়—যাঁহার নৃত্যের পরিণতি, সমস্ত শব্দ যাঁহার বাক্য বা বাচিক অভিনয়সম্ভূত, চন্দ্র-তারাদি যাঁহার অলংকার-স্বরূপ, সেই পরিপূর্ণ-সত্ত্বগুণময়-বিগ্রহ নটরাজ শিবই আমাদের প্রণম্য।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি ও ধ্বংসকে—শিব-তাণ্ডব-নৃত্যের অংগরূপে দেখিয়াছেন,—

"...যখন আদিদেবের আহ্বানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়-ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর; সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী।" (শ্রাবণ-গাথা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১১৯)

গোপিনীগণ সহ কৃষ্ণের রাসনৃত্য, কালীয়দমননৃত্য, বালগোপালের ননীচুরিনৃত্যে প্রভৃতি আমাদের নিকট বিশেষ সুপরিচিত। বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞাদি ও ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যের প্রচলন ছিল। বেদে মণ্ডল-নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মহাব্রত'-অনুষ্ঠানে জলপূর্ণ কলসী

মাথায় করিয়া বীণার তালে তালে এবং স্তোত্রগানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা অগ্নির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত এবং আগুনের উপর জল ঢালিয়া দিয়া বৃষ্টি কামনা করিত। অশ্বমেধযজ্ঞের শেষেও জলপাত্র মাথায় বহিয়া স্ত্রীলোকেরা 'মধিনদং'—এই অংশটুকু গান করিতে করিতে 'মাজালীয়' অগ্নির চতুর্দিকে নৃত্য করিত। এইরূপ নৃত্যে যজ্ঞকারীর বলবৃদ্ধি হয় বলিয়া বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

পুরাণাদি প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সোপান বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'হরিভক্তি-বিলাস'-এ আছে,—

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্বে পাতকপক্ষিণঃ॥

'বরাহপুরাণ'-এ দেবোদ্দেশে নৃত্যের বিধি দৃষ্ট হয়, তাহার ফলে বলা হইয়াছে,—

মনুজা যেন গচ্ছন্তি ছিত্ত্বা সংসারসাগরম্।

'পদ্মপুরাণ'-এ কৃষ্ণভক্তের নৃত্যের শক্তি বর্ণিত হইয়াছে,—

পদ্ভ্যাং ভূম্যে দিশো দৃগ্ভ্যাম্
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্যতে রাজন্
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

হে রাজন্, কৃষ্ণভক্তের নৃত্য হইতে জগতের নানারূপ অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীর, নয়নযুগল দিক্‌সমূহের এবং বাহুদ্বয় আকাশের সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত করে।

'মহাভারত'-এর বিরাট-পর্বে দেখা যায়, অর্জুন বৃহন্নলারূপে বিরাট-রাজের অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্যশিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 'মনুসংহিতা'য় নৃত্য ও নটজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ দেখা যায়, সে-যুগে রাজদরবারে নর্তকী-নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। তা'ছাড়া সর্বসাধারণের আনন্দবর্ধনের জন্য পেশাদার নর্তকীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্র'-গ্রন্থে নৃত্যকে চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে নৃত্যশিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 'দিব্যাবদান'-এ রাজা রুদ্রায়ণ বীণা বাজাইতেন ও তাঁহার পত্নী চন্দ্রাবতী নৃত্য করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। 'মহাবংশ'-এ আছে সিংহল-রাজা ররাক্রম বাহু(১ম)র রানী রূপাবতী যেমন ছিলেন সুন্দরী, তেমনি ছিলেন নৃত্যে পটীয়সী। অজন্তা, ইলোরা, বাঘগুহা, কণারক-মন্দির প্রভৃতির প্রাচীরগাত্রে নৃত্যরত নর-নারীর বহু চিত্র দেখা যায়। মন্দিরে দেবদাসী-নিয়োগ-প্রথায় মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের ব্যাপক প্রচলনের দৃষ্টান্ত মিলে। বিগ্রহের নৈবেদ্য, ভোগ, আরতি প্রভৃতি ছিল যেমন প্রাত্যহিক পূজার অঙ্গ, নৃত্যও সেইরূপ দৈনিক পূজার অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। এই নৃত্যের উদ্দেশ্যে

প্রত্যেক মন্দিরেই স্থায়িভাবে নৃত্যকুশলা দেবদাসী নিযুক্ত করা হইত। রাজরাজ ও অন্যান্য চোলরাজগণের তাম্রশাসনে (১১ শতাব্দী) দেখা যায়, মন্দিরে দেবদাসীনিয়োগের জন্য প্রভূত দান করা হইয়াছে। রাজরাজ নানা মন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া তান্‌জোরে চারশত দেবদাসীকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এক সময়ে ভারতীয় নৃত্যকলা সমস্ত এশিয়াখণ্ড ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বিখ্যাত চীন-প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টেইন মধ্য-এশিয়ার মন্দিরগাত্রে নৃত্যরত মূর্তি অঙ্কিত দেখিয়াছেন। ঐ সব মূর্তিতে ভারতীয় নৃত্যকলার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া সারা ভারতে নানাবিধ লোক-নৃত্যের প্রচলন ছিল। রাজশেখরের প্রাকৃত নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী'তে দণ্ডরাস নামে একপ্রকার নৃত্যের উল্লেখ আছে। উহাতে নর্তক-নর্তকী এক-একখানা ছোট লাঠি হাতে করিয়া চক্রাকারে নাচিতে থাকে এবং প্রত্যেকবারে পার্শ্ববর্তী নর্তক-নর্তকীর লাঠিতে আঘাত করে। ইহারি অনুরূপ নৃত্য আমাদের বাংলার কাঠি-নৃত্য। এই দণ্ডরাসের চিত্র অনেক মন্দিরগাত্রে খোদিত দেখা যায়। বেজওয়াদের মল্লেশ্বর মন্দিরগাত্রে এই কাঠি-নৃত্যের একটি সুন্দর চিত্র খোদিত আছে। (১৬ শতাব্দী)

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতেই ভারতীয় নৃত্যকলার বিশেষ অবনতি ঘটে। ইহার প্রধান কারণ—মুসলমানী প্রভাব। আরবী ও পারসী নৃত্যের স্বরূপ এই যে, ইহা একটা বিলাসের উপকরণমাত্র—স্থূল দৈহিক ভোগাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করার মধ্যেই ইহার সার্থকতা। ভারতীয় নৃত্যে যে-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত রসের আবেদন রহিয়াছে, রহিয়াছে যে-বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রেরণা—যাহা একমাত্র কল্পনা ও গভীর অনুভূতির মধ্যেই ধরা দেয়—সেটি ঐ-নৃত্যে পাওয়া যায় না। মোগল বাদশাহদের যুগে ভারতীয় নৃত্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল,—(ক) হিন্দুস্থানী বা উত্তর-ভারতীয় এবং (খ) দাক্ষিণী বা দক্ষিণ-ভারতীয়। হিন্দুস্থানী নৃত্যে আঙ্গিকের বিশেষ নৈপুণ্য থাকিলেও উহার ঘাড়ের ভঙ্গী, চোখের খেলা ও কোমরের দোলায় আদিম ইন্দ্রিয়াসক্তির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। অবশ্য ভারতীয় নৃত্যেও গ্রীবাভঙ্গী, কটাক্ষক্ষেপ প্রভৃতি বিহিত, কিন্তু সেগুলি যেমন অতি-পরিমিত তেমনি সংযত এবং বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক হইয়া রসসৃষ্টির সহায়তা করে। হিন্দুস্থানী নৃত্যের উপর মুসলমানী প্রভাব পড়ায় ভারতীয় নিজস্ব রূপটির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব কম বলিয়া ভারতীয় রূপটি তাহাতে অনেক পরিমাণে বজায় রহিয়াছে।

বাদশাহী আমলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বহু পরিবর্তন ঘটায় নৃত্য ক্রমে ক্রমে সভ্যজীবনের অংগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তারপর ভারতীয় নৃত্যের চরম অবনতি ঘটিল ইংরেজ আমলে এবং সভ্য ও শিক্ষিত জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা থিয়েটার ও বাইজীর নাচের মধ্যে দাক্ষিণী, মুসলমানী ও ইউরোপীয় নৃত্যের এক জগা-খিচুড়িরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। অপরদিকে ভারতীয় নৃত্যের ক্ষীণ কঙ্কালটুকু শ্রীহীন রূপ ধারণ করিয়া নানা লোকনৃত্যের মধ্যে—বিশেষ করিয়া বাংলায় রামায়ণ-গান, জারিগান প্রভৃতির মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ', 'নর্তননির্ণয়', 'নৃত্যবিলাস', 'নৃত্যসর্বস্ব', 'নৃত্যশাস্ত্র', অশোকমল্ল-বিরচিত 'নৃত্যাধ্যায়', 'সংগীতনারায়ণ', 'সংগীতদামোদর' প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় নৃত্যের একটা রূপ আমরা দেখিতে পাই। মল্লিনাথ 'কিরাতার্জুনীয়' নাটকের টীকায় 'নৃত্যবিলাস' ও 'নৃত্যসর্বস্ব'-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

'সংগীতদামোদর'-এ নৃত্যকে বলা হইয়াছে,—

...তালমানরসাশ্রয়ঃ
সাবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

তালমান ও রসযুক্ত এবং বিলাসপূর্ণ অঙ্গবিক্ষেপকে পণ্ডিতগণ নৃত্য বলিয়া থাকে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা,—

উদ্ধতং নৃত্যং তাণ্ডবং
সুকুমারন্তু লাস্যং
ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং

ভাব সমস্ত ভারতীয় নৃত্যের প্রাণ বলিয়া এবং সুকুমার নৃত্য একান্তভাবে নারীর পক্ষেই শোভন বলিয়া বোধ হয় পরবর্তী নৃত্যশাস্ত্রে নৃত্যকে মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—

স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুংনৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতং
(সংগীতনারায়ণ)

তাণ্ডব ও লাস্য উভয় নৃত্যেই আবার দুইপ্রকার। তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে অভিনয়-শূন্য অঙ্গবিক্ষেপকে পেবলি, আর বহুবিধ অভিনয়-সহকারে যে-অঙ্গবিক্ষেপ, তাহাকে বহুরূপ বলে। লাস্যও দুইপ্রকার—ছুরিত ও যৌবত। ভাবরসাদিব্যঞ্জক অভিনয়-সহকারে নায়ক-নায়িকার উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন ও চুম্বনপূর্বক যে-নৃত্য, তাহাকে ছুরিত বলে, আর নর্তকী লীলাসহকারে যে নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত বলে। (সংগীত-দামোদর)

তারপর মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, গ্রীবা, বাহু, চরণ, কটি প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত প্রকার ভঙ্গীতে কখন, কিরূপে, কতটুকু চালনা করিতে হইবে, তাহার এমন বিস্তৃত সূক্ষ্ম ও মনোবিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা আছে যে, ভারতীয় নৃত্যশিল্প যে কতদূর উন্নত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই সব অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে নৃত্যের বহু শ্রেণী আছে, যথা—কমলবর্তনিকানৃত্য, মকরবর্তনিকানৃত্য, ময়ূরীনৃত্য, মৃগীনৃত্য, হংসীনৃত্য, রঞ্জনী-নৃত্য, গজগামিনীনৃত্য, চিত্রনৃত্য, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ, পদ্মবন্ধ, বৃত্তলতিকা প্রভৃতি।

ইহাই ভারতীয় নৃত্যের বাহ্য রূপ—তাহার অন্তরের রূপ আরো বিচিত্র—আরো রমণীয়।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে মনের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে মূল নয়টি ভাব,—যথা, রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা, ক্রোধ, হাস্য, বিস্ময়, ভয়, শোক ও শম। কয়েকপ্রকার অবস্থার সাহায্যে এই-সব ভাবের মধ্যে একটা আবেগ উপস্থিত হয়। ঐ আবেগ সংহত, গভীর ও নৈর্ব্যক্তিক মূর্তি ধারণ করিয়া যথাক্রমে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, রুদ্র, হাস্য, অদ্ভুত, ভয়ানক, করুণ ও শান্ত রসে পরিণত হয়। এই সংযত ঘন আবেগের প্রকাশ দ্বারা রসসৃষ্টি করাই প্রত্যেক শিল্পকলার আদর্শ। তালমানগীতসংযোগে দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়া সৌন্দর্য ও সুসামঞ্জস্য সহকারে মনের সংযত ঘন আবেগের বাহ্য অভিব্যক্তি ও তদ্দ্বারা অনির্বচনীয় ও পরমরমণীয় রসসৃষ্টিই ভারতীয় নৃত্যের পরিপূর্ণ রূপ।

যে-সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনাকে ভাষায় ভালো করিয়া প্রকাশ করা যায় না, রঙ ও রেখার মধ্যে ও যাহার সুস্পষ্ট রূপটি মূর্ত হইয়া ওঠে না, অন্তর-গহন-বিহারী সেই ভাবকল্পনা ও

বেদনার নিগূঢ় চাঞ্চল্য রূপায়িত হইয়া ওঠে নৃত্যে দেহের রেখা-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া। নৃত্যের রাজ্য একটা গূঢ় ভাবের রাজ্য—ইহার কাজ সূক্ষ্ম ভাবকল্পনাকে ছন্দায়িত করিয়া একটা অনির্বচনীয় রসে আমাদের মনকে প্লাবিত করা। ভারতীয় নৃত্যে কণ্ঠ-সংগীত ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। এই কণ্ঠ-সংগীত বিভিন্ন সুরের মোহিনী মায়ায় আমাদের অন্তরে বিস্তার করে ভাষাতীত এক রস-রহস্যের জাল,—এক অনির্বচনীয় অনির্দিষ্ট আনন্দ-বেদনায় আমাদের চিত্ত হইয়া উঠে চঞ্চল। নৃত্য সেই আনন্দ-বেদনাকে দেহের ছন্দের মধ্য দিয়া অনির্বচনীয় রসরূপে সংবেদনশীল রসিক-চিত্তে সংক্রামিত করে। ইহাই ভারতীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

নন্দিকেশ্বর তাঁহার 'অভিনয়দর্পণ'-এ বলিয়াছেন,—

আস্যোনলম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতোদৃষ্টিস্ততো মনঃ
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥

মুখের দ্বারা সংগীতকে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমেই মুখ হইতে গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। গীতের অর্থ হস্তসঞ্চালনের দ্বারা অর্থাৎ বিভিন্ন মুদ্রাদির দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। চক্ষুর দ্বারা ভাব দেখাইতে হইবে, অর্থাৎ অন্তরস্থিত ভাবের প্রতিচ্ছবি চোখেই প্রতিফলিত হয়, তাই চোখের চাহনির দ্বারা সেই ভাবকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে। পায়ের দ্বারা তাল রাখিতে হইবে। অর্থাৎ নৃত্য ব্যতীত ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ হয় না; গীত ও মুদ্রাদির সঙ্গে নৃত্যের প্রয়োজন। তাই নর্তক-নর্তকীর পদদ্বয় তালানুগত হইয়া নৃত্য প্রদর্শন করিবে।

হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই হস্তসঞ্চালন যদি চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে মন উহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইবে; মন একাগ্রতা ও স্থৈর্যলাভ করিলে নৃত্যগীতের দ্বারা অভিব্যজ্যমান ভাবটির পূর্ণ উদ্রেক হইবে। দর্শকের মনে এই ভাবটির উদ্রেক হইলেই উহা রসাকারে পরিণত হইয়া যথার্থ আস্বাদন-যোগ্য হইবে।

তাহা হইলে সংগীত হইতে নৃত্য, নৃত্য-গীতের দ্বারা ভাবের উদ্রেক, এবং ভাব হইতেই অনির্বচনীয় রসসৃষ্টি। ইহাই ভারতীয় নৃত্যের স্বরূপ।

পাশ্চাত্ত্য নৃত্যে কণ্ঠ-সংগীতের একান্ত অভাব, সুতরাং এই নৃত্যের সঙ্গে সুরের অনির্বচনীয় ভাবলোক রচিত হয় না। নানা যন্ত্রের ছন্দ-বহুল ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্ত্য নৃত্য। ইহার মূলভিত্তি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তাল। খণ্ড খণ্ড নৃত্যের মধ্যে কোনো লোকোত্তর রস-ব্যঞ্জনা নাই। দীর্ঘায়িত ব্যালে (ballet) নৃত্যের মধ্যেও নানা যন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনি ও তালের অক্ষুণ্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য নৃত্যের আদর্শ চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তিসাধন—ইন্দ্রিয়জ-ভোগবর্ধন। ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ সূক্ষ্ম ভাবের রসপরিবেষণ দ্বারা প্রাণের তৃপ্তিসাধন। পাশ্চাত্ত্যের ওয়াল্‌স্ (Waltz), কোয়াড্রিল (Quadrille), ল্যান্‌সারস্ (Lancers), পোল্‌কা (Polka), পোল্‌কা-মাজুরকা (Polka-Mazurka), ব্যালে (Ballet), মিনেট (Minnet) প্রভৃতি নৃত্য নিঃসন্দেহে নিখুঁত ও অপূর্বকারুকার্যময় দেহ-সঞ্চালনের দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাহাদের অন্তরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা নাই—দেহসঞ্চালনকে কেন্দ্র করিয়া মূলগত ভাবরসের কোনো ইঙ্গিত নাই। ভারতীয় নৃত্যশিল্প অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্ত্য নৃত্যশিল্প বহির্মুখী। ভারতীয় নৃত্য-

শিল্প সুরের অপরূপ মায়ার সহিত মিলিয়া হৃদয়াবেগকে দেহের প্রতি অংগ-প্রত্যংগ ব্যক্ত করিয়া অন্তর্নিহিত রসমূর্তি উদ্ঘাটিত করে; পাশ্চাত্ত্য নৃত্যশিল্প কেবল বিভিন্ন রূপের বাস্তব বহির্ভাগের অতি-মার্জিত প্রকাশ দ্বারা দর্শকের সাময়িক চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করে। পাশ্চাত্ত্য নৃত্য কেবল রূপময়, ভারতীয় নৃত্যে রূপের যথেষ্ট সমাবেশ থাকিলেও তাহা প্রধানত ভাবময়—অথবা একাধারে রূপময়, ভাবময়, রসময়—সর্বোপরি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। দেহের রূপ সীমার দ্বারা আবদ্ধ, তাই পাশ্চাত্ত্য নৃত্য সসীম; ভাব অনন্ত, তাই ভারতীয় নৃত্য অসীম। ভারতীয় নৃত্য সীমার মধ্য হইতে অসীমের ইংগিত করে, রূপের মধ্য হইতে অরূপের সন্ধান দেয়; পাশ্চাত্ত্য নৃত্য কেবল দেহের মধ্যেই আবদ্ধ, দেহাতীত কোনো ভাবের ইংগিত তাহাতে নাই।

পাশ্চাত্ত্য নৃত্যকলার এই দুর্বলতা সম্বন্ধে সে-দেশের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌গণ দিন দিনই সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। নৃত্যের মধ্যে তাঁহারা দৈহিক ব্যায়ামের অনবদ্য কৌশলের উপরেও আরও কিছু চাহিয়াছেন। বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য নর্তকী Isadora Duncan তাঁহার আত্মজীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"This method (পাশ্চাত্ত্য ব্যালে নৃত্যের প্রথা) produces an artificial mechanical movement not worthy of the soul." তাই তিনি ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ খুঁজিতেছিলেন। তিনি উহাকে বলিয়াছেন,— "...the source of the spiritual expression to flow into the channels of the body filling it with vibrating light—the centifrugal force reflecting the spirit's vision." সুবিখ্যাত নর্তকী Anna Pavlovaও পাশ্চাত্ত্য নৃত্যের প্রাণহীনতার কথা বহুবার বলিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সংগে তাহার নৃত্যকলাও যে-একপ্রকার যান্ত্রিক-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—একথা বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী অনুভব করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভারতীয় নৃত্যের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য নৃত্যের টেকনিক বা আংগিক অতি উচ্চস্তরের। অবশ্য দেহের কসরতের এমন নির্ভুল, নিখুঁত, চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত তার নাই, কিন্তু নৃত্যের এই যান্ত্রিক বাহ্যরূপই কি সবখানি? Beauty of form কি beauty of spirit এর উপরে? এই প্রসংগে Browning এর Andrea Del Sarto কবিতাটির কথা মনে হয়। Andrea নিখুঁত শিল্পী,—প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ করিতে পারেন। কিন্তু Raphael এর চিত্রশিল্পে অনেক খুঁত ছিল; Anatomyতে তাঁহার তেমন দখল ছিল না। Andrea তাঁহার চিত্রের অনেক পরিবর্তন করিতে পারিতেন, কিন্তু র‍্যাফেল যে অন্তর্নিহিত আত্মাকে ফুটাইয়া তুলিতেন, সেটা Andreaর সাধ্যাতীত ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

> ...its soul is right.
> He means right, that a child may understand.
> Still what an arm ! and I could alter it.
> But all the play, the insight and the stretch
> Out of me : out of me !

এই insight, এই অন্তর্নিহিত আত্মাকে ফুটাইয়া তোলার মধ্যেই সমস্ত আর্টের সার্থকতা। ভারতীয় নৃত্যে এই অন্তর্নিহিত আত্মার রূপটিই আমরা লক্ষ্য করি।

এখন রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নৃত্য বা শান্তিনিকেতনী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য কি, দেখা যাক্। রবীন্দ্র-নৃত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত কয়টি উপাদান পাওয়া যায়,—

(ক) নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের উৎকৃষ্ট অঙ্গ।

(খ) কবি-রচিত সাহিত্য বা কাব্যই এই নৃত্যের মূল বিষয়বস্তু।

(গ) এই কাব্য-রচনার সহিত সুরযোজনা করায় প্রকৃত সংগীতের সৃষ্টি। এই সংগীতই রবীন্দ্রনাট্যের মূলভিত্তি।

(ঘ) সেই সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাবকে নাচের অভিনয় দ্বারা দেহচ্ছন্দে ব্যঞ্জিত করিয়া দর্শকের চিত্তে অনির্বচনীয় রসের উদ্বোধন।

এই নৃত্য মূলত ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'অভিনয়দর্পণ'-এর পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির নির্দেশে দেখা যায়—সংগীতের ভাবকে নৃত্যের তাল ও মুদ্রাদি কায়িক অভিনয়ের দ্বারা দর্শক-মনে সঞ্চারিত করিয়া রসের উদ্রেক করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যও অনেকটা তাহাই। এই নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছে সম্পূর্ণ গানের উপর নির্ভর করিয়া। গীতাভিনয়ের পরিপূর্ণতা নৃত্যাভিনয়।

কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিকে কবি হুবহু গ্রহণ করেন নাই; মূলত ঐ পদ্ধতির উপরেই তাঁহার নবসৃষ্টি নূতন রূপ ধরিয়া আধুনিক কালের রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রার ছিল একান্ত প্রাধান্য। প্রথমে মুদ্রা-প্রদর্শন, তারপর নৃত্য। কিন্তু ঐ প্রাচীন মুদ্রার অর্থ বর্তমান যুগে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য নয়, দুর্বোধ্য মুদ্রাভিনয় ব্যঙ্গাভিনয়ে পরিণত হইতে পারে। তাই তিনি মুদ্রাকে যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, দাক্ষিণী নৃত্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রূপ অনেকটা অবিকৃত আছে; বর্তমান কথাকলি-নৃত্যে মুদ্রার বিশেষ প্রাধান্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৃত্যনাট্যে—বিশেষ করিয়া 'চণ্ডালিকা'য় কথাকলির আঙ্গিক—অর্থাৎ ভঙ্গিমা ও তাল—গ্রহণ করিলেও তাহার মুদ্রা-অংশটি গ্রহণ করেন নাই।

প্রাচীন নৃত্যে সংগীতের একটা নিজস্ব পরিপূর্ণতা ছিল না; খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে নৃত্য—এই ছিল প্রথা; বাদ্যের তালের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াই সংগীতযুক্ত নৃত্য তাহার পূর্ণরূপটি প্রকটিত করিত। কিন্তু রবীন্দ্রনৃত্যে সংগীতই হইল মূলভিত্তি, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত নৃত্য-প্রযোজনা গড়িয়া উঠিয়াছে। গানের কথা অনুসরণ করিয়া সাহানা, ভৈরবী, বাগেশ্রী, পরজ, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি বহু বিচিত্র সুরের ধারা ছুটিয়াছে, এইসব ধারা-সম্মিলনে নৃত্যনাট্য একটা বিরাট সুরের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার সহিত নানাবিধ তালের নৃত্য মিলিত হইয়া কথার ভাব-ব্যঞ্জনাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সংগীত ও নৃত্য চলিয়াছে পাশাপাশি; একে অন্যের প্রকাশকে রুদ্ধ করে নাই। এই সুরের মধ্যে ও তালের মধ্যেও নানা সংমিশ্রণ আছে। মিশ্র সুর ও মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর সহযোগে রবীন্দ্র-নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা কোনো বিশেষ নৃত্যপদ্ধতিকে আগাগোড়া অনুসরণ করে নাই। মণিপুরী, কথাকলি, কথক, ভরতনাট্যম্, লোকনৃত্য, ইউরোপীয় নৃত্য প্রভৃতির ভঙ্গী ও তাল কবি যেখানে যতটুকু প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন; এই নানা মিশ্রণের দ্বারা তাঁহার ভাবকল্পানুযায়ী এক অভিনব নৃত্যপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

কবি জীবনে প্রথম নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন সম্পূর্ণভাবে গানকে অবলম্বন করিয়াই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্য আগাগোড়া গান গাহিয়াই অভিনয় করা হয়। এগুলি দস্তুরমতো নাটক,—কোনো বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা নানা দৃশ্যে বিভক্ত। ইহাতে পাত্রপাত্রীর সমস্ত সংলাপ ছিল গানে।

কথাবার্তার ভংগীতে হাত পা নাড়িয়া গানের সুরে তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন চালাইত। এগুলি ছিল সুরের নাটক, ইহার সংগে কোনো নৃত্য ছিল না।

তারপর বিভিন্ন ধরনের অনেক নাটক কবি লিখিয়াছেন, কিন্তু এইপ্রকার সংগীত-সর্বস্ব নাটক আর লিখেন নাই। মধ্যজীবন হইতে দেখা যায়, কবির নাটকে উত্তরোত্তর গানের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রকৃতি-সম্পূর্ণযুক্ত নাটক 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' প্রভৃতিতে কবি গানের সংগে একটু-আধটু নাচ প্রথম প্রবর্তন করেন। 'শারদোৎসব'-এর গান 'আজ আমাদের ছুটি', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' প্রভৃতি গানের সংগে নাচের আমেজ আনিবার প্রথম চেষ্টা করেন। 'ফাল্গুনী'তে কবি অন্ধ বাউল সাজিয়া গানের সংগে সংগে নিজেই নাচিয়াছিলেন।

তারপর নানা ঋতুনাট্যের মধ্যে কবি বিশেষভাবে নাচ প্রবর্তন করেন। এই ঋতুনাট্যগুলি গানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া গঠিত। পালাগানের মণিপুরী নৃত্যের ভংগীই বেশির ভাগ গ্রহণ করা হইয়াছিল, অন্যান্য নৃত্যও সামান্য কিছু ছিল। এইসব নৃত্য গানকে অনুসরণ করিয়াই নানা ভংগীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তালের ছন্দের সহিত পৃথকভাবে নৃত্যপ্রদর্শনের চেষ্টা ইহাদের মধ্যে করা হয় নাই।

এই সময় 'নটীর পূজা' নাটকে শ্রীমতীর শেষনৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। ইহা শান্তি-নিকেতনে নিযুক্ত মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষকের শিক্ষার ফল, তখন হইতেই শান্তিনিকেতনের মেয়েরা এই নৃত্যাভিনয়প্রথা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। 'নটীর পূজা' ও ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে নাচের প্রবর্তনে ভাবের যে-অপূর্বসুন্দর রসমূর্তি রচিত হইতে পারে, কবির উচ্চাংগের আর্টিস্ট মন তাহা বুঝিতে পারিয়া নাচের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং নাচের নানা-রূপ সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা চিন্তা করিতে থাকেন।

এই সময় কবি জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপ-পরিদর্শনে বাহির হন। সেইখানে ঐসব দেশবাসীর নাচ দেখিয়া কবি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির এক-একটি ঘটনা কেবল নাচের দ্বারাই যে ব্যক্ত করা যায়, কবি তাহা সেই প্রথম দেখিলেন।

> "এদেশে উৎসবের প্রধান অংগ নাচ।...এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রাভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ।...সেদিন এখানকার এক রাজবাড়ীতে নাচ দেখছিলুম।...এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে...আমাদের দেশে এক-দিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অংগই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশ তাদের বলে অডিয়েন্স্, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ, তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যই অভিনয়।...(জাভাযাত্রীর পত্র, পৃঃ ২৫৪)
>
> "গামেলান বাজনার সংগে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে; তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অংগ-প্রত্যংগে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী

সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা! অন্য নাচে দেখা যায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে; এদের দেখে মনে হতে লাগল, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা।

(ঐ, ২৫৫)

"মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ, সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল মাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে।...এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা।......

"কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প বলা। এর থেকে এটা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ হয়; নাচটা এদের ভাষা! এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ।. ." (ঐ, ২৯২-৯৩)

একটা ঘটনাকে সম্পূর্ণ নাচের দ্বারা প্রকাশ করিবার প্রেরণা কবি এদেশের নৃত্য দেখিয়াই লাভ করেন। এই সফর হইতে ফিরিয়া কবি 'ঋতুরঙ্গ', 'নবীন' প্রভৃতি পালাগানের মধ্যে বহুল পরিমাণে নাচের প্রবর্তন করেন। তারপর একটা আখ্যানভাগ বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইল 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন'। 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপ-মোচন'-এর মূলভিত্তি হইল কবির 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ঐ নামীয় দীর্ঘ দুইটি গদ্য-কবিতা। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটিকে নাটকের প্রয়োজনে দশটি সর্গ বা দৃশ্যে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সর্গের ভাবের উপযোগী সংগীত সংযোজন করিলেন এবং আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যাভিনয়ে উহার রূপদান করিলেন।

'শাপমোচন' কবিতাটিও কবি নাটকের প্রয়োজনে নূতন করিয়া লেখেন। ইহাকেও 'শিশুতীর্থ'-এর মতোই আবৃত্তি ও গানের সাহায্যে নৃত্য-রূপ দেওয়া হয়। অবশ্য ইংরেজী ব্যালে নাচের আদর্শে এই গল্পগুলি সাজানো হইলেও কবি সেই প্রথাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। ব্যালে-নাচের ভিত্তি মূলত যন্ত্রসংগীত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য আবৃত্তি ও গানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় নাট্যেই নাচের ঢঙ ছিল দেশী ও বিদেশী পদ্ধতির মিশ্রণ। কবি রঙ্গমঞ্চের একপাশ হইতে কথিকার গদ্য-অংশ আবৃত্তি করেন।

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৮-এর মধ্যে কবি 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ব্যালের আদর্শে এই-সব নৃত্যাভিনয় পরিকল্পিত হইলেও এগুলি গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের স্বরূপবিচারে এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় যে গীতিনাট্যকে বিচিত্র ভঙ্গীর নাচের সাহায্যে অতীব হৃদয়গ্রাহী ও অপূর্ব রসসংবেদনক্ষম করিবার একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ হইতেই এই নৃত্যনাট্যের উদ্ভব।

কবি জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্যে মুগ্ধ হইলেও তাহার আঙ্গিককে গ্রহণ করেন নাই, কেবল একটা দীর্ঘ আখ্যায়িকার রূপায়ণ যে নৃত্যের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, এই বিশ্বাস-

টুকু লাভ করিয়াছেন। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত সংগীতের উপরই ঐ দেশের নাচ প্রতিষ্ঠিত; উহাতে কণ্ঠ-সংগীতের কোনো স্থান নাই, সুরের অনির্বচনীয়ত্ব নাই। গানের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতি তাহাদের নাই। তাহাদের নৃত্যাভিনয় যন্ত্র-সংগীতের ছন্দে বাঁধা দেহ-ভঙ্গিমার অভিনয়মাত্র—চোখ, মুখ ও কণ্ঠে ভাবাভিব্যক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। কিন্তু রবীন্দ্র-নৃত্যের ভিত্তিই সংগীত—গীতিনাট্যই নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত। বাদ্যযন্ত্রের তালের প্রভাবের দ্বারা এই নৃত্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই।

'নীচের দিক থেকে পরীক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন যে, গীতিনাট্যই নৃত্যনাট্য হবার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত। এই গীতিনাট্য সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রথম জীবনেই হয়েছিল। তা ছাড়া গানকে অভিনয়ে রূপ দেওয়াও যে সম্ভব, সে কথা তিনি তখন থেকেই ভালো করে জেনেছিলেন। আর জেনেছিলেন যে, সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ নাচের সাহায্যে সম্ভব। তিনি নিজে কবি ও সুরকার। এইসব গুণের সমবায় হয়েছিল বলেই শেষজীবনে নৃত্যনাট্য লেখায় তিনি উৎসাহিত হন। এ-সব নাটকে আর গদ্য ভাষায় কথা বসাবার দরকার তিনি বোধ করলেন না। কারণ গানের সুরে কথাবার্তা কওয়া যে যায়, সে ত তিনি 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' যুগেই ভালো করে জেনে গেছেন এবং পরেও জেনেছেন 'শাপমোচন'-এ। 'চিত্রাঙ্গদা'য় পর্যন্ত--গদ্য-ছন্দের আবৃত্তি আছে, কিন্তু 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'য় তাকেও তিনি বর্জন করে গেছেন।"

(রবীন্দ্র-সংগীত—শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৬৭)

"শান্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয় নি; তার কারণ গুরুদেবের সংগীত ও সুর বাজনার অভাব পুরিয়ে দেয়। এখানে তাঁর সুরের ও গানের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যের এক অভাবনীয় মিলন হয়েছে। এই ত্রিবেণীসংগমের ধারা এক নূতন রসসৃষ্টির পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। এই সংগীত ও নৃত্যের অপূর্ব ঐক্য এখানে কেউ কাউকে পূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা না দিয়ে নিজের শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে।...বাংলার নূতন চিত্রকলা যেমন ভারতের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির সুর ফিরিয়ে দিয়ে চারুশিল্প-জগতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করল, বাংলার বা শান্তিনিকেতনের নাচ সেই একই কাজ করেছে নৃত্যকলা-জগতে।"

(নৃত্য—প্রতিমা দেবী, পৃঃ ২২)

ভারতীয় নৃত্যকলার নবরূপায়ণে আমরা রবীন্দ্রনাথকে যুগ-প্রবর্তক মনে করি; এই প্রসঙ্গে আর একটি বাঙালীর নৃত্য-প্রতিভার কথা আমাদের মনে স্বতই উদিত হয়। তিনি উদয়শংকর। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, এই অসামান্য প্রতিভাশালী নট ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছেন। যে-চিত্র শুধু মন্দিরগাত্রে খোদিত ছিল, যে-উপদেশ কেবল পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, উদয়শংকর তাহাকে নিজ দেহভঙ্গীর মধ্যে রূপায়িত করিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। উদয়শংকরই প্রথম শিবতাণ্ডবনৃত্যের একটা রূপ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। তাঁহারই একান্ত সাধনায় পাশ্চাত্ত্য জগৎ ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু উদয়শংকরের নৃত্যের সহিত রবীন্দ্র-নৃত্যের অনেকখানি প্রভেদ আছে।

উদয়শংকরের নৃত্য খণ্ড খণ্ড নৃত্যের সমষ্টি, এক-একটি কারুকার্যময় দেহভঙ্গীর ক্ষণিক উদয় ও বিলয়। ইহা একান্তভাবে বাদ্যযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। ইহাতে ইউরোপীয় ব্যালে-নৃত্যের আদর্শানুযায়ী কেবল যন্ত্রসংগীতেরই অক্ষুণ্ণ প্রভাব বর্তমান। ইহার মধ্যে

গান নাই। উদয়শংকরের নৃত্যের কাঠামোটা ভারতীয় হইলেও প্রাণটা যেন বিদেশী। তাঁহার নৃত্য যতোখানি চোখের আনন্দ দেয়, ততোখানি হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না—কোনো অনির্বচনীয় ভাবলোকে, রসলোকে, দর্শককে উত্তীর্ণ করিতে পারে না। রবীন্দ্র-নৃত্য কোনো কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠায় এবং সংগীতের সংগে অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত হওয়ায় ইহার ভাব-রসের আবেদন প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী। ভাবরসই রবীন্দ্র-নৃত্যকে পরম আস্বাদনীয় করিয়াছে।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

কাব্য-নাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও নৃত্য-নাট্যের চিত্রাঙ্গদা মূলত একই জিনিস। ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়া উভয়েই এক। কেবল কাব্যকে সংগীতে গলাইয়া লইয়া নৃত্যের ছাঁচে ঢালিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাব্যের চিত্রাঙ্গদা সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের সংগীতের উপরই এই নৃত্যনাট্যটি প্রতিষ্ঠিত। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

> "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।" (বিজ্ঞপ্তি)

কবি ইহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

প্রভাতে আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণবৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটিই 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের মর্মকথা।

এই নাট্য-কাহিনীতে আছে—

প্রথম প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়॥

এই মর্মকথাটিই সংগীত ও নৃত্যের সাহায্যে রূপায়িত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

নাটক 'চণ্ডালিকা'রই ইহা নৃত্য-নাট্যরূপ। প্রথমে গদ্য-ভাষণকে সংগীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ফুলওয়ালী, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা প্রভৃতির উপস্থিতি নৃত্যনাট্যে নূতন সংযোজন।

'চণ্ডালিকা'র মূলভাবটি নরনারীর একটি চিরন্তন চিত্ত-দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডালিকা দেহের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আনন্দের মনে আদিম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তাহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, শেষে তাহার দেহাভোগাকাঙ্ক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে আত্মবিলোপী প্রেমে। আনন্দের মধ্যেও জাগিয়াছে ত্যাগের আদর্শ ও মনোবৃত্তির সঙ্গে যৌনক্ষুধার দ্বন্দ্ব, শেষে দেহলালসার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াও সে পরে তাহা হইতে পাইয়াছে মুক্তি। নাটক 'চণ্ডালিকা'য় নরনারীর এই মানসিক দ্বন্দ্ব, এই জটিলতা সুর ও তালের ছন্দ ও দেহ-ভঙ্গিমার মধ্য দিয়া বোধ ও অনুভবগম্য করিয়া তোলাই নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র উদ্দেশ্য।

নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নৃত্যকলারসিক প্রতিমা দেবী বলিয়াছেন,—

"চণ্ডালিকার ভূমিকা হ'ল খাঁটি সাহিত্য; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ-বিষাদ-করুণার আতিশয্যে। তালের ছন্দ ও সুরের প্রেরণায় মূক হৃদয়ের বাণী মুখরিত হয়েছিল সুরের বিচিত্র কারুকার্যে।

যেখানে অবসাদক্লান্ত মন, পূরবী এল তার আমেজ নিয়ে, যেখানে দৃঢ়তায় দর্পিত চিত্তের ঝংকার—বাউল বেজে উঠল গৌরবে। এইরূপে অধৈর্যের ঐক্যতানের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বিচিত্র সুরের ব্যঞ্জনা।

সুর চলেছে নদীর স্রোতের মতো—কখনো তার উদ্দাম মূর্তি, কখনো তার অবসাদের বিরাম, আর কোথাও বা সে অধৈর্যের ছন্দে ত্রস্ত। তারপর সে স্রোত পৌঁছল গিয়ে অগাধ সমুদ্রে! বাসনা তলিয়ে গেল প্রেমের অকূল পাথারে। ঝড় থামল, এল শান্তি। দেহের কামনা চিত্তের অন্তরতম তলায় প্রেমের মহিমাকে খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হ'ল, পূর্ণ হ'ল।" (নৃত্য, পৃঃ ২৭-২৮)

নৃত্যনাট্য শ্যামা

'শ্যামা'র মূলভিত্তি হইল 'কথা' কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতাটি। এই কবিতার ভাবকে সংগীতে পরিবর্তিত করিয়া নৃত্যনাট্যের উপযোগী করা হইয়াছে।

ধর্মচেতনা ও ন্যায়বোধের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব অতি সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়াছে বজ্রসেনের চরিত্রে। সরল, নিরপরাধ যথার্থ প্রেমিক উত্তীয়ের জীবন গ্রহণ করিয়াছে শ্যামা বজ্রসেনের জন্য। বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে যথার্থ প্রেমের অপ্রতিদান-রূপ হৃদয়হীনতা, স্বীয় প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত সরল, শুভ্র, আবেগ-বিহ্বল একটি জীবনকে হত্যার মহাপাপ। বজ্রসেন বুঝিল, মহাপাপমূল্যে-কেনা তাহার জীবন একটা

বর্বরোচিত পাপের চরম নিদর্শন, আর বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেম এক পাষাণ-হৃদয়া দানবী নারীর যে-কোনো উপায়ে জঘন্য দেহ-লিপ্সা-চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষামাত্র। তাই বজ্রসেন নিজের জীবনকে শতবার ধিক্কার দিল ও শ্যামার প্রেমকে ঘৃণিত বোধ করিল। দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় শ্যামার সঙ্গ সে বিষবৎ ত্যাগ করিল এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য দারুণ আঘাত করিল। কিন্তু হৃদয়ের দিক্ দিয়া সে শ্যামাকে ভালবাসিয়াছিল। শ্যামার সঙ্গ তাহার বহু-বাঞ্ছিত। তাই শ্যামাকে ত্যাগ করিয়াও সে আবার বহ্নিমুখ-পতঙ্গের মতো শ্যামার জন্য ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত অন্তর দিয়া শ্যামাকে কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্যামার আবির্ভাবে আবার তাহার বিবেক ও ধর্মবুদ্ধি মাথা উঁচু করিয়া হৃদয়কে ঢাকিয়া ফেলিল। সে শ্যামাকে আবার তাড়াইয়া দিল। বুদ্ধির সংগে হৃদয়ের—বিবেকের সংগে প্রেমের দ্বন্দ্বই বজ্রসেন-শ্যামা-আখ্যায়িকার মূলবস্তু।

নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'য় কবি বজ্রসেনের চরিত্রে শেষের দিকে একটু বৈশিষ্ট্য আনিয়াছেন। 'পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না'—এই মহাজনবাক্য মনে করিয়া বজ্রসেন শ্যামাকে প্রত্যাখ্যানের দরুণ ভগবানের নিকট তাহার দুর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে,—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।. . .
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।

"উত্তীয়ের হত্যার দৃশ্যটি সমালোচকদের কারো কারো মতে 'শ্যামা' নাটকের একটি দুর্বল অংশ। গুরুদেবও তাই মনে করতেন, তবুও তিনি ঐ অংশটি নাটক থেকে বাদ দেন নি। হত্যাটি তালযন্ত্রের বোলের সংগে রেখেছিলেন। এই অংশটা নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃশ্যে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে রসান্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম দেয় বলেই এটি দুর্বল হলেও দর্শকবৃন্দ এ নিয়ে আপত্তি করেন নি। সেইজন্য হয়তো গুরুদেব এ অংশটি বাদ দেন নি।...

"এই নাটকেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে ভারতের তিনটি প্রধান নৃত্যধারার অপূর্ব সম্মিলন হয়েছিল।...বজ্রসেনের চরিত্র অভিনীত হয়েছিল ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি পদ্ধতিতে, উত্তীয় হয়েছিল নিখুঁত কথকের আদর্শে, শ্যামার অভিনয় হয়েছিল শান্তি-নিকেতনে প্রচলিত মণিপুরী ভংগীতে আর প্রহরী নাচ খাঁটি কথাকলির আঙ্গিকে।"

(রবীন্দ্রসংগীত, পৃঃ ২৬৯)

নটীর পূজা

'নটীর পূজা' প্রকৃতপক্ষে নৃত্যনাট্য নয়। ইহা সাধারণ নাটক (পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তবে দুই কারণে নৃত্যনাট্য-পর্যায়ে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। নটীর পূজাই হইতেছে নৃত্যের দ্বারা—নটীর চরম আত্মোৎসর্গের নৃত্যের উপরেই এই নাটকের রসবস্তু নির্ভর করিতেছে। নটীর নৃত্য এই নাটকের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই নৃত্যের মধ্য দিয়া নাটকটি একটি চরম অবস্থায় উঠিয়া এক করুণ-গম্ভীর মাধুর্যে শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, 'নটীর পূজা'র নৃত্য হইতেই রবীন্দ্রনাথ নাচের ভাবী সম্ভাবনায় স্থিরনিশ্চয় হইলেন। 'নটীর পূজা' প্রথমে শান্তিনিকেতন ও পরে কলিকাতায় কয়েকবার অভিনীত হইয়া বাঙালী-সমাজে নৃত্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব সাড়া জাগাইয়া তোলে। মণিপুরী নাচের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীমতীর নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নৃত্যনাট্য শাপমোচন

এই নামে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ গদ্য-কবিতা এই নাটকের মূল।

ইহার মধ্যে সৌন্দর্যের মোহ ও প্রকৃত প্রেমের দ্বন্দ্ব রূপায়িত। রাণী কমলিকা অরুণেশ্বরের কুৎসিত চেহারা দেখিয়া ঘৃণায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল, স্বামীর প্রেমের মূল্য বুঝিতে পারিল না; তারপর বিরহের দুঃখ ও আত্মগ্লানির অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া সে প্রেমের মূল্য বুঝিল, বুঝিল কালোর বুকেই বাস করে নয়ন-ভুলানো আলো। তখনই গদগদ-কণ্ঠে, অপলকচোখে বলিল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার।"

ইহার আখ্যানবস্তু ও 'রাজা' নাটকের আখ্যানবস্তু প্রায় এক।

গদ্য-কবিতা হইতে আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যে ইহার রূপ দেওয়া হয়। প্রথম অভিনয়ে কবি স্বয়ং ইহার গদ্য-অংশসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন।

> "'শাপমোচন'-এর যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জয়ন্তী উৎসবের সময় য়ুনিভার্সিটি ছাত্রদের অনুরোধে তিনি 'শাপমোচন'-এর কথাবস্তু লিখেছিলেন এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির দালানে স্টুডেন্টস্ ডে'-তে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের গল্পাংশকে অনুসরণ ক'রে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে মূক-অভিনয়ের দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল।...এই নাটক প্রথমে লক্ষ্ণৌয়ে ও পরে বহুবার মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিংহলে অভিনীত হতে হতে পরিণতি লাভ করেছে।" (নৃত্য, প্রতিমা দেবী)

রবীন্দ্র নাট্যগ্রন্থসমূহের প্রথম প্রকাশ সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ-সূচী

১. **বাল্মীকি প্রতিভা**	প্রকাশ :	ফাল্গুন ১৮০২ শক [১৮৮১]
	সংস্করণ :	ফাল্গুন ১২৯২ [১৮৮৬]
	গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা :	৮ বৈশাখ ১৮১৫ শক [১৮৯৩]
		১৬. ৩. ১৯১২
	স্বরলিপিসহ :	আশ্বিন ১৩৩৫
	সংস্করণ :	চৈত্র ১৩৬৩
	পুনর্মুদ্রণ :	বৈশাখ ১৩৬৯
২. **ভগ্নহৃদয়**	প্রকাশ :	১৮০৩ শক। [২৩ জুন ১৮৮১]
	পুনর্মুদ্রণ (র-র অ-১) :	আশ্বিন ১৩৪৭
৩. **রুদ্রচণ্ড**	প্রকাশ :	১৮০৩ শক [২৫ জুন ১৮৮১]
	পুনর্মুদ্রণ (র-র অ-১) :	আশ্বিন ১৩৪৭
৪. **কাল-মৃগয়া**	প্রকাশ :	অগ্রহায়ণ ১২৮৯ [১৮৮২]
	পুনর্মুদ্রণ : র-র অ-১ :	আশ্বিন ১৩৪৭
	গীতবিতান ৩ :	আশ্বিন ১৩৫৭
৫. **প্রকৃতির প্রতিশোধ**	প্রকাশ :	১২৯১।২৯ এপ্রিল ১৮৮৪
	সংস্করণ ·	কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩।১৮৯৬ ১৩১৮।১৯১১
		ভাদ্র ১৩৩৫।১৯২৮
৬. **নলিনী**	প্রকাশ	১২৯১ [১০ মে ১৮৮৪]
	পুনর্মুদ্রণ	র-র অ-১ : আশ্বিন ১৩৪৭
৭. **মায়ার খেলা**	প্রকাশ	অগ্রহায়ণ ১৮৯০ [২২ ডিসেম্বর ১৮৮৮]
	স্বরলিপিসহ	আষাঢ় ১৩৩২
	নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা নামে	গীতবিতান ৩ : আশ্বিন ১৩৫৭
	স্বরলিপি : সংস্করণ	ভাদ্র ১৩৬৩
		শ্রাবণ ১৩৬৮
		জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬
৮. **রাজা ও রানী**	প্রকাশ	২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ [৯ অগস্ট ১৮৮৯]
	দ্বিতীয় সংস্করণ	৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
	কাব্যগ্রন্থাবলী	আশ্বিন ১৩০৩
	কাব্য-গ্রন্থ।৯ম ভাগ।৩য় খণ্ড	১৩১০
	রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী	১৩১১
	কাব্যগ্রন্থ।৬ষ্ঠ খণ্ড	১৯১৫
		১৯২১
	? ইণ্ডিয়ান প্রেস	১৩৩৪

র-র।১ম খণ্ড : আশ্বিন ১৩৪৬
স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৪৭
শ্রাবণ ১৩৫২
আষাঢ় ১৩৫৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯
ভাদ্র ১৩৭১
আশ্বিন ১৩৭১
চৈত্র ১৩৭২
ভাদ্র ১৩৭৪
ফাল্গুন ১৩৭৫
সংস্করণ : পৌষ ১৩৭৮

৯. **চিত্রাঙ্গদা** প্রথম প্রকাশ :
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রভূষিত : ২৮ ভাদ্র ১২৯৯
সংস্করণ : ১৬ শ্রাবণ ১৩০১
(বিদায়-অভিশাপ সহ)
স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রণ : ১৩১৭
১৩২৯
১৩৩৬
১৩৪১
আশ্বিন ১৩৪৮
মাঘ ১৩৫১
ফাল্গুন ১৩৫৬
চৈত্র ১৩৬১
বৈশাখ ১৩৬৫
আষাঢ় ১৩৬৭
শ্রাবণ ১৩৭০
আষাঢ় ১৩৭২
চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ ২৮ ভাদ্র ১৩৭৩

১০. **বিসর্জন** প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭
কাব্যগ্রন্থাবলী সং আশ্বিন ১৩০৩
দ্বিতীয় সং আষাঢ় ১৩০৬
১৩২৮?
তৃতীয় সং ১৩৩৩
চতুর্থ সং জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৪১
চৈত্র ১৩৪৬
চৈত্র ১৩৪৯

ফাল্গুন ১৩৫১
ভাদ্র ১৩৫৫
ভাদ্র ১৩৫৯
ফাল্গুন ১৩৬২
ভাদ্র ১৩৬৪
চৈত্র ১৩৬৬
আষাঢ় ১৩৬৮
অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
ভাদ্র ১৩৭২
অগ্রহায়ণ ১৩৭২
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৮
মাঘ ১৩৭১

১১. গোড়ায় গলদ প্রকাশ : ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ [১৮৯২]

১২. বৈকুণ্ঠের খাতা প্রকাশ : চৈত্র ১৩০৩ [১৮৯৭]
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৪৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
আষাঢ় ১৩৫৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
চৈত্র ১৩৬৮
আষাঢ় ১৩৭২

১৩. কাহিনী প্রকাশ : ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৪২
শ্রাবণ ১৩৪৩
শ্রাবণ ১৩৪৪
শ্রাবণ ১৩৪৭
ফাল্গুন ১৩৪৯
ফাল্গুন ১৩৫১
কার্তিক ১৩৫৬
আশ্বিন ১৩৬২
শ্রাবণ ১৩৬৫
মাঘ ১৩৬৬
আশ্বিন ১৩৬৮
আষাঢ় ১৩৬৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০
ভাদ্র ১৩৭৪
ফাল্গুন ১৩৭৬

১৪. হাস্যকৌতুক প্রকাশ (গদ্যগ্রন্থ ৬) ১৩১৪।১০ ডিসেম্বর ১৯০৭

পুনর্মুদ্রণ : ১৯২১
১৩৩৪
ফাল্গুন ১৩৩৯
ভাদ্র ১৩৪৬
ভাদ্র ১৩৫৩
অগ্রহায়ণ ১৩৬১
অগ্রহায়ণ ১৩৬৪
শ্রাবণ ১৩৬৭
পরিবর্ধিত সং অগ্রহায়ণ ১৩৬৮
পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১
বৈশাখ ১৩৭৫

১৫. ব্যঙ্গকৌতুক প্রকাশ (গদ্যগ্রন্থ ৭) ১৩১৪।২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭
পুনর্মুদ্রণ ১৯২৪
ফাল্গুন ১৩৩৭
দ্বিতীয় সং কার্তিক ১৩৪৫
পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৫৬
বৈশাখ ১৩৬৩
ভাদ্র ১৩৬৭
বৈশাখ ১৩৬৯
ভাদ্র ১৩৭৩

১৬. লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রকাশ : ('কাহিনী' গ্রন্থে) : ১৩০৬।১৯০০
স্বতন্ত্র প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৯
পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৭৫

১৭. শারদোৎসব প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫১
আষাঢ় ১৩৪৩
আশ্বিন ১৩৫৪
ফাল্গুন ১৩৬৪/মার্চ ১৯৫৮
আশ্বিন ১৩৬৮
বৈশাখ ১৩৭৪

১৮. মুকুট প্রকাশ : [পৌষ ১৩১৫।১৯০৮]
পুনর্মুদ্রণ : ১৯২১
১৯২৭
আষাঢ় ১৩৫০
পৌষ ১৩৫২
বৈশাখ ১৩৫৯
বৈশাখ ১৩৬৩
বৈশাখ ১৩৬৬
বৈশাখ ১৩৬৮

চৈত্র ১৩৬৮
মাঘ ১৩৭১
১৯৬৮

১৯. প্রায়শ্চিত্ত — প্রকাশ : [বৈশাখ ১৩১৬ । ১৯০৬]
পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৫
আশ্বিন ১৩৬৫
অগ্রহায়ণ ১৩৬৬
চৈত্র ১৩৬৯
অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

২০. রাজা — প্রকাশ : ১৩১৭
সংস্করণ : ১৩২৭
পুনর্মুদ্রণ : কার্তিক ১৩৫০
আষাঢ় ১৩৬৮
আশ্বিন ১৩৭১
বৈশাখ ১৩৭৮

২১. ডাকঘর — প্রকাশ ১৩১৮। জানুয়ারি ১৯১২
১৩১৮ জানুয়ারি ১৯১২
১৯২১ ?
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৩৪
ফাল্গুন ১৩৩৯
কার্তিক ১৩৪৫
ফাল্গুন ১৩৪৮
ফাল্গুন ১৩৫০
ফাল্গুন ১৩৫২
বৈশাখ ১৩৫৮
শ্রাবণ ১৩৬১
বৈশাখ ১৩৬৩
আষাঢ় ১৩৬৫
আষাঢ় ১৩৬৭
চৈত্র ১৩৬৮
সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৭১

২২. মালিনী প্রকাশ — কাব্যগ্রন্থাবলী : বৈশাখ ১৩৭৬
স্বতন্ত্র মুদ্রণ : ১৩০৩
পুনর্মুদ্রণ : ২৩ মার্চ ১৯১২
অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
বৈশাখ ১৩৬৩
শ্রাবণ ১৩৬৫
শ্রাবণ ১৩৬৭
অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

ফাল্গুন ১৩৭২
অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

২৩. **বিদায়-অভিশাপ** চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়
অভিশাপ নামে প্রথম প্রকাশ : ১৩০১
স্বতন্ত্র প্রকাশ : ১৩১৯ [১০ মে ১৯১২]
১৩২৮
১৩৩৮
১৩৪৫
ফাল্গুন ১৩৫২
শ্রাবণ ১৩৫৮
শ্রাবণ ১৩৬৪
কার্তিক ১৩৬৭
আষাঢ় ১৩৭০
চৈত্র ১৩৭১
বৈশাখ ১৩৭৮

২৪. **অচলায়তন** প্রকাশ : ১৩১৮। অগস্ট ১৯১২
পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৩৩৪
আষাঢ় ১৩৪৬
পৌষ ১৩৫৬
বৈশাখ ১৩৬৪
আষাঢ় ১৩৬৭
বৈশাখ ১৩৬৯
বৈশাখ ১৩৭৪
মাঘ ১৩৭৭

২৫. **গুরু** প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৪।১৯১৮
পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৩৩১

২৬. **অরূপরতন** প্রকাশ : মাঘ ১৩২৬।১৯২০
সংস্করণ : কার্তিক ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
শ্রাবণ ১৩৭০

২৭. **ঋণশোধ** প্রকাশ : ১৯২১

২৮. **ফাল্গুনী** প্রকাশ : ১৯১৬
পুনর্মুদ্রণ : ১৯২২
আষাঢ় ১৩৪২
২৫ বৈশাখ ১৩৫৪
আষাঢ় ১৩৬৭
বৈশাখ ১৩৭৩

২৯. **মুক্তধারা** প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২৯।১৯২২
ভাদ্র ১৩৫৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪
আষাঢ় ১৩৬৮
শ্রাবণ ১৩৭০
অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

৩০. **বসন্ত** প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯
স্বরলিপিসহ " : ১৩৩০
১৩৩৭
আশ্বিন ১৩৫৪
শ্রাবণ ১৩৬৩
ভাদ্র ১৩৬৮
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

৩১. **গৃহপ্রবেশ** প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩২
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৪৬
বৈশাখ ১৩৫৫
আশ্বিন ১৩৬৬
মাঘ ১৩৬৭
মাঘ ১৩৭৫

৩২. **চিরকুমার-সভা** প্রকাশ : ১৩১১
গদ্যগ্রন্থ ৮ : ১৩১৪
পুনর্মুদ্রণ : ১৯১৯
সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৩২।১৯২৬
পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
চৈত্র ১৩৪০
শ্রাবণ ১৩৪৮
সং : র-র ১৬ : শ্রাবণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৫৩
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
কার্তিক ১৩৬৭
কার্তিক ১৩৭২
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

৩৩. **শোধ-বোধ** প্রকাশ : ১৩৩৩
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৫০
আষাঢ় ১৩৫৭
আষাঢ় ১৩৬৭
অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
বৈশাখ ১৩৭৫

৩৪. নটীর পূজা	প্রকাশ :	১৩৩৩। ১৯২৬
	দ্বিতীয় সং :	পৌষ ১৩৩৮
	পুনর্মুদ্রণ :	চৈত্র ১৩৪৯
		মাঘ ১৩৫২
		বৈশাখ ১৩৬০
		বৈশাখ ১৩৬৩
		ফাল্গুন ১৩৬৫
		মাঘ ১৩৬৭
		আষাঢ় ১৩৭০
		মাঘ ১৩৭৫
৩৫. রক্তকরবী	প্রকাশ :	১৩৩৩। ডিসেম্বর ১৯২৬
	পুনর্মুদ্রণ :	ভাদ্র ১৩৫২
		আষাঢ় ১৩৫৭
		শ্রাবণ ১৩৬১
		বৈশাখ ১৩৬৪
	সংস্করণ :	২৫ বৈশাখ ১৩৬৭
	পুনর্মুদ্রণ :	আষাঢ় ১৩৬৭
		বৈশাখ ১৩৭০
		নবেম্বর ১৯৬৮?
৩৬. ঋতুরঙ্গ	প্রকাশ :	২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। ১৯২৭
৩৭. শেষ রক্ষা	প্রকাশ :	শ্রাবণ ১৩৩৫। ১৯২৮
	পুনর্মুদ্রণ :	অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
		জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩
		আষাঢ় ১৩৫৬
		আষাঢ় ১৩৬২
		শ্রাবণ ১৩৬৭
		মাঘ ১৩৬৮
		ভাদ্র ১৩৭১
৩৮. পরিত্রাণ	প্রকাশ :	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬
৩৯. তপতী	প্রকাশ :	ভাদ্র ১৩৩৬। ১৯২৯
		জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
		চৈত্র ১৩৪৩
		বৈশাখ ১৩৫৬
		শ্রাবণ ১৩৬৭
		অগ্রহায়ণ ১৩৭৩
৪০. নবীন	প্রকাশ :	৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭। ১৯৩১
৪১. শাপমোচন	প্রকাশ :	১৫ পৌষ ১৩৩৮। ১৯৩১
	পরিমার্জিত :	চৈত্র ১৩৩৯

র-র ভুক্ত : আষাঢ় ১৩৫৩
স্বরলিপি সংবলিত সং : ফাল্গুন ১৩৭১
চৈত্র ১৩৭৭

৪২. **কালের যাত্রা** প্রকাশ : ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯। ১৯৩২
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৫০
আষাঢ় ১৩৫৬
কার্তিক ১৩৬৭
ভাদ্র ১৩৭৩
পরিবর্ধিত সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৮

৪৩. **চণ্ডালিকা** প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪০
পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৪৯
আষাঢ় ১৩৫৬
পৌষ ১৩৬৪
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
ফাল্গুন ১৩৬৯
বৈশাখ ১৩৭৬

৪৪. **তাসের দেশ** প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪০
দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৪৫
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৫৭
আশ্বিন ১৩৬৬
আষাঢ় ১৩৭০
ভাদ্র ১৩৭৪

৪৫. **বাঁশরী** প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৪০। ১৯৩৩
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৫৪
পৌষ ১৩৬৮
আষাঢ় ১৩৭৭

৪৬. **শ্রাবণ গাথা** প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৪১। ১১. ৮. ১৯৩৪

৪৭. **নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা** প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৪২। ১৯৩৬
সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৪৩
বৈশাখ ১৩৫৮
শ্রাবণ ১৩৭৬

৪৮. **চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য** প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৪৪। ১৯৩৮
সং : চৈত্র ১৩৪৫
চৈত্র ১৩৫৭
আষাঢ় ১৩৭১
চৈত্র ১৩৭৬
ভাদ্র ১৩৪৬। ১৯৩৯

৪৯. **শ্যামা নৃত্যনাট্য** প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৮

আশ্বিন ১৩৭০
আশ্বিন ১৩৭৬

৫০. **মুক্তির উপায়**

প্রকাশ : শ্রাবণ **১৩৫৫।১৯৪৮**
পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন **১৩৬৭**
অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩[illegible]

এই তালিকা প্রণয়নে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ গ্রন্থাগার এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয় কর্তৃক প্রস্তুয়মান রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীর সহায়তা লাভ করেছি। কারণ সমস্ত সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ না দেখতে পারায় তালিকাটিতে অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে।

—সুবিমল লাহিড়ী

রবীন্দ্র-নাট্যনাটকে পাত্রপাত্রী

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

অক্ষয়
অখিল
অচ্যুত
অজিতা
অদ্বৈত
অধ্যাপক
অধ্যেতা
অনাথ কলু
অনিল
অনুচর
অন্ধ ঋষি
অন্ধ বাউল
অন্নদা
অপর্ণা
অপূর্ব
অবন্তী
অবিনাশ
অভিজিৎ
অভিভাবক
অমর
অমর মাণিক্য
অমরুরাজ
অমল
অমাত্য
অমাবাই
অমিয়া
অম্বা
অর্চনা
অর্জুন
অশোক
অশ্লেষা

আ

আচার্য
আড্ডি এস্কোয়ার
আকন্দ
আদ্যানাথ
আনন্দ
আম্রকুঞ্জ
আরাকানরাজ
আশু

ই

ইন্দুমতী
ইন্দ্র
ইন্দ্রকিশোর
ইন্দ্রকুমার
ইলা
ইশা খাঁ
ইস্কাবনী

ঈ

ঈশান

উ

উগ্রসেন
উৎপলপর্ণা
উৎসববালক
উত্তরকূট
উত্তীয়
উদয়াদিত্য
উদ্ধব
উপনন্দ
উপাচার্য
উপাধ্যায়
উপালি, ভিক্ষু
উমেশ

ঋ

ঋতুরাজ
ঋত্বিক্
ঋষিকুমার

ও

ওলাবিবি

এই সূচীতে বিভিন্ন নাটকের একই নামের চরিত্রের একবারই উল্লেখ করেছি। এছাড়া ছাত্র, ছেলের দল, বালক ইত্যাদি পার্শ্বচরিত্র তালিকাভুক্ত করি নি। —সুবিমল লাহিড়ী

শব্দসূচী

[গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য শব্দসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকা]

সংকেতসূত্র : গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ ও গ্রন্থসমূহের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শব্দসূচীতে সংকেতচিহ্নরূপে উহাদের নিম্নলিখিত আদ্যক্ষরগুলি ব্যবহৃত হইল :

উ. = উপন্যাস; **ক.** = কবিতা, কবিতাবলী; **কা.** = কাব্য; **গ.** = গল্প; **গ-না.** = গদ্য-নাটক; **না.** = নাটক; **প্র.** = প্রহসন; **ঋ-না.** = ঋতুনাট্য; **কা-না.** = কাব্যনাট্য; **কৌ-না.** = কৌতুকনাট্য; **গী-না.** = গীতিনাট্য; **নৃ-না.** = নৃত্যনাট্য; **রূ-সাং. না.** = রূপক-সাংকেতিক নাটক; **রো-ট্র্যা.** = রোমান্টিক ট্র্যাজেডি; **সা-না.** = সামাজিক নাটক; **অ.** = অচলায়তন; **ঋ. শো.** = ঋণশোধ; **ক. কু. সং.** = কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ; **ক. দী.** = কবির দীক্ষা; **কা. মৃ.** = কালমৃগয়া; **কা. যা.** = কালের যাত্রা; **গা. আ.** = গান্ধারীর আবেদন; **গৃ. প্র.** = গৃহ প্রবেশ; **গো. গ.** = গোড়ায় গলদ; **চ.** = চণ্ডালিকা; **চি.** = চিত্রাঙ্গদা; **চি. স.** = চিরকুমার সভা; **ডা. ঘ.** = ডাকঘর; **ত.** = তপতী; **তা. দে.** = তাসের দেশ; **ন. (ঋ-নাঃ ন.** = নবীন **ন. (সা-নাঃ ন.)** = নলিনী; **ন. ঋ.** = নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা; **ন. পূ.** = নটীর পূজা; **ন. বা.** = নরকবাস; **প্র. প্র.** = প্রকৃতির প্রতিশোধ; **প্রা.** = প্রায়শ্চিত্ত; **ফা.** = ফাল্গুনী; **ব.** = বসন্ত; **বাঁ.** = বাঁশরী; **বা. প্র.** = বাল্মীকি-প্রতিভা; **বি.** = বিসর্জন; **বি. অ.** = বিদায়-অভিশাপ; **বৈ. খা.** = বৈকুণ্ঠের খাতা; **ব্য. কৌ.** = ব্যঙ্গকৌতুক; **মা.** = মালিনী; **মা. খে.** = মায়ার খেলা; **মু. উ.** = মুক্তির উপায়; **মু. ধা.** = মুক্তধারা; **র. ক.** = রক্তকরবী; **র. র.** = রথের রশি; **র-র.** = রবীন্দ্ররচনাবলী; **রা.** = রাজা; **রা. রা** = রাজা ও রানী; **ল. প.** = লক্ষ্মীর পরীক্ষা; **শা.** = শারদোৎসব; **শা. মো.** = শাপমোচন; **শে. ক.** = শেষের কবিতা; **শে. ব.** = শেষবর্ষণ; **শে. র.** = শেষরক্ষা; **শো. বো.** = শোধবোধ; **শ্যা.** = শ্যামা; **শ্রা. গা.** = শ্রাবণগাথা; **স.** = সতী; **হা. কৌ.** = হাস্যকৌতুক।

জ

ট

ঠ

ড

ত

প

ফ

ব